জীবনানন্দ রচনাবলী

বাংলা ডিজিটাল বুক

বনলতা সেন

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারি দিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতিদূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

কুড়ি বছর পরে

আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি।
আবার বছর কুড়ি পরে—

হয়তো ধানের ছড়ার পাশে
কার্তিকের মাসে—
তখন সন্ধ্যার কাক ঘরে ফেরে—তখন হলুদ নদী
নরম নরম হয় শর কাশ হোগলায়—মাঠের ভিতরে।

অথবা নাইকো ধান ক্ষেতে আর ;
ব্যস্ততা নাইকো আর,
হাঁসের নীড়ের থেকে খড়
পাখির নীড়ের থেকে খড়
ছড়াতেছে ; মনিয়ার ঘরে রাত, শীত, আর শিশিরের জল।

জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার—
তখন হঠাৎ যদি মেঠো পথে পাই আমি তোমারে আবার।

হয়তো এসেছে চাঁদ মাঝরাতে একরাশ পাতার পিছনে
সরু সরু কালো কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার,
শিরীষের অথবা জামের,
ঝাউয়ের—আমের ;
কুড়ি বছরের পরে তখন তোমারে নাই মনে !

জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার—
তখন আবার যদি দেখা হয় তোমার-আমার !

তখন হয়তো মাঠে হামাগুড়ি দিয়ে পেঁচা নামে—
বাবলার গলির অন্ধকারে
অশথের জানালার ফাঁকে
কোথায় লুকায় আপনাকে।

চোখের পাতার মতো নেমে চুপি কোথায় চিলের ডানা থামে—

সোনালি সোনালি চিল—শিশির শিকার করে নিয়ে গেছে তারে—
কুড়ি বছরের পরে সেই কুয়াশায় পাই যদি হঠাৎ তোমারে।

ঘাস

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা ;
কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস—তেমনি সুঘ্রাণ—
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে।
আমারও ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

হাওয়ার রাত

গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল—অসংখ্য নক্ষত্রের রাত ;
সারারাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে ;
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনও মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো,
কখনও বিছানা ছিঁড়ে

নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে ;
এক-একবার মনে হচ্ছিল আমার—আধো-ঘুমের ভিতর হয়তো—
                    মাথার উপরে মশারি নেই আমার,
স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো, উড়ছে সে !
কাল এমন চমৎকার রাত ছিল।

সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিল—আকাশে এক তিল ফাঁক ছিল না ;
পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি ;
অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা চোখের মতো
                    ঝলমল করছিল সমস্ত নক্ষত্রেরা ;
জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
                    শালের মতো জ্বলজ্বল করছিল বিশাল আকাশ !
কাল এমন আশ্চর্য রাত ছিল।

যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে করে এনেছে ;
যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূর আকাশের সীমানার কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে করে
                    কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন—
মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য ?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য ?
প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য ?

আড়ষ্ট—অভিভূত হয়ে গেছি আমি,
কাল রাতের প্রবল নীল অত্যাচার আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে যেন ;
আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভিতর
পৃথিবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে কাল !

আর উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে
আমার জানালার ভিতর দিয়ে শাঁই শাঁই করে,
সিংহের হুঙ্কারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো।

হৃদয় ভরে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে,
দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে
মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে,
জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায় !

আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল,
নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে,
একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায় তারায় উড়িয়ে নিলে চলল
একটা দুরন্ত শকুনের মতো।

আমি যদি হতাম

আমি যদি হতাম বনহংস
বনহংসী হতে যদি তুমি,
কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে
ছিপছিপে শরের ভিতর
এক নিরালা নীড়ে ;

তা হলে আজ এই ফাল্গুনের রাতে
ঝাউয়ের শাখার পেছনে চাঁদ উঠতে দেখে
আমরা নিম্নভূমির জলের গন্ধ ছেড়ে
আকাশের রুপালি শস্যের ভিতর গা ভাসিয়ে দিতাম—

তোমার পাখনায় আমার পালক, আমার পাখায় তোমার রক্তের স্পন্দন—
নীল আকাশে খইক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা,
শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড়ে
সোনার ডিমের মতো
ফাল্গুনের চাঁদ।
হয়তো গুলির শব্দ :
আমাদের তির্যক গতিস্রোত,
আমাদের পাখায় পিস্‌টনের উল্লাস,
আমাদের কণ্ঠে উত্তর হাওয়ায় গান !
হয়তো গুলির শব্দ আবার :
আমাদের স্তব্ধতা,
আমাদের শান্তি।
আজকের জীবনের এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকত না ;
থাকতনা আজকের জীবনের এই টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার ;
আমি যদি বনহংস হতাম ;
বনহংসী হতে যদি তুমি ;
কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে।

হায় চিল

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে।
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে।
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে ;
আবার তাহারে কেন ডেকে আন ? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে
ভালোবাসে !

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে।

বুনো হাঁস

পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে যায় নক্ষত্রের পানে—
জলা মাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আহ্বানে

বুনো হাঁস পাখা মেলে—শাঁই শাঁই শব্দ শুনি তার ;
এক—দুই—তিন—চার—অজস্র—অপার—

রাত্রির কিনার দিয়ে তাহাদের ক্ষিপ্র ডানা ঝাড়া
এঞ্জিনের মতো শব্দে ; ছুটিতেছে—ছুটিতেছে তারা।

তারপর পড়ে থাকে নক্ষত্রের বিশাল আকাশ,
হাঁসের গায়ের ঘ্রাণ—দু একটা কল্পনার হাঁস ;

মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ ;
উড়ুক উড়ুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক
কল্পনার হাঁস সব—পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রঙ মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

শঙ্খমালা

কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে
সে কে এক নারী এসে ডাকিল আমারে,

বলিল, তোমারে চাই :
বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ
খুঁজেছি নক্ষত্রে আমি—কুয়াশার পাখনায়—
সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে আলোক
জোনাকির দেহ হতে—খুঁজেছি তোমারে সেইখানে—
ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অঘ্রানের অন্ধকারে
ধানসিড়ি বেয়ে বেয়ে
সোনার সিঁড়ির মতো ধানে আর ধানে
তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে।

দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা :
সন্ধ্যার আঁধারে ভিজে শিরীষের ডালে যেই পাখি দেয় ধরা—
বাঁকা চাঁদ থাকে যার মাথার উপর,
শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ শোনে যার স্বর।

কড়ির মতন শাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম ;
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে : দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে আগুনে হায়।

চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার !
স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র—কবেকার শঙ্খিনীমালার !
এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।

নগ্ন নির্জন হাত

আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে :
আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার।

যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে
অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখিনি,
সেই নারীর মতো
ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠছে।

মনে হয় কোন্ বিলুপ্ত নগরীর কথা
সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে।

ভারতসমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে
আজ নেই, কোনো এক নগরী ছিল একদিন,
কোন্ এক প্রাসাদ ছিল ;
মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ :
পারস্য গালিচা, কাশ্মিরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা,
আর তুমি নারী—
এইসব ছিল সেই জগতে একদিন।

অনেক কমলারঙের রোদ ছিল,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল,
মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিল অনেক ;

অনেক কমলারঙের রোদ ছিল,
অনেক কমলারঙের রোদ ;
আর তুমি ছিলে ;
তোমার মুখের রূপ কত শত শতাব্দী আমি দেখি না,
খুঁজি না।

ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী,
অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,
লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি,
রামধনু রঙের কাচের জানালা,
ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায়-পর্দায়
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস—
আয়ূহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।

পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ !
তোমার নগ্ন নির্জন হাত ;

তোমার নগ্ন নির্জন হাত।

শিকার

ভোর ;
আকাশের রঙ ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল :
চারি দিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ।
একটি তারা এখনো আকাশে রয়েছে :

পাড়াগাঁর বাসরঘরে সব চেয়ে গোধূলি মদির মেয়েটির মতো ;
কিংবা মিশরের মানুষী তার বুকের থেকে যে মুক্তা
   আমার নীল মদের গেলাসে রেখেছিল
হাজার হাজার বছর আগে এক রাতে তেমনি—
তেমনি একটি তারা আকাশে জ্বলছে এখনও।

হিমের রাতে শরীর 'উম্' রাখবার জন্য দেশোয়ালীরা
   সারারাত মাঠে আগুন জ্বেলেছে—
মোরগফুলের মতো লাল আগুন ;
শুকনো অশ্বত্থপাতা দুমড়ে এখনও আগুন জ্বলছে তাদের ;

সূর্যের আলোয় তার রঙ কুঙ্কুমের মতো নেই আর ;
হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।
সকালের আলোয় টলমল শিশিরে চার দিকের বন ও আকাশ
   ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে।

ভোর ;
সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে
নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে
সুন্দর বাদামি হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল !
এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে ;
কচি বাতাবিলেবুর মতো সবুজ সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে ;
নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে সে নামল—
ঘুমহীন ক্লান্ত বিহ্বল শরীরটাকে স্রোতের মতো একটা আবেগ দেওয়ার জন্য
অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের মতো
                    একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাবার জন্য ;
এই নীল আকাশের নীচে সূর্যের সোনার বর্শার মতো জেগে উঠে

সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।

একটা অদ্ভুত শব্দ।
নদীর জল মচকাফুলের পাঁপড়ির মতো লাল।
আগুন জ্বলল আবার—উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হয়ে এল।
নক্ষত্রের নীচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরানো শিশিরভেজা গল্প ;
সিগারেটের ধোঁয়া ;
টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা ;
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক—হিম—নিস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।

হরিণেরা

স্বপ্নের ভিতরে বুঝি—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে
দেখিলাম পলাশের বনে খেলা করে

হরিণেরা ; রূপালি চাঁদের হাত শিশিরে পাতায় ;
বাতাস ঝাড়িছে ডানা—মুক্তা ঝরে যায়

পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে—বনে বনে—হরিণের চোখে ;
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর মুক্তার আলোকে।

হীরের প্রদীপ জ্বেলে শেফালিকা বোস যেন হাসে
ছিজল ডালের পিছে অগণন বনের আকাশে,—

বিলুপ্ত ধূসর কোন্ পৃথিবীর শেফালিকা, আহা,
ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় হরিণেরা জানে শুধু তাহা।

বাতাস ঝাড়িছে ডানা, হীরা ঝরে হরিণের চোখে—
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর হীরার আলোকে।

বেড়াল

সারাদিন একটা বেড়ালের সঙ্গে ঘুরে ফিরে কেবলই আমার দেখা হয় ;
গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাদামি পাতার ভিড়ে ;
কোথাও কয়েক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর
তারপর শাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর
নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হয়ে আছে দেখি ;
কিন্তু তবুও তারপর কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে,
সারাদিন সূর্যের পিছনে পিছনে চলছে সে।
একবার তাকে দেখা যায়,
একবার হারিয়ে যায় কোথায়।
হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে ;
তারপর অন্ধকারকে ছোটো ছোটো বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনল সে,
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল।

সংযোজন
১৯৫২

সুদর্শনা

একদিন ম্লান হেসে আমি
তোমার মতন এক মহিলার কাছে
যুগের সঞ্চিত পণ্যে লীন হতে গিয়ে
অগ্নিপরিধির মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে
শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছে,
দেখেছি অমৃতসূর্য আছে।

সব চেয়ে আকাশ নক্ষত্র ঘাস চন্দ্রমল্লিকার রাত্রি ভালো ;
তবুও সময় স্থির নয় ;
আরেক গভীরতর শেষ রূপ চেয়ে
দেখেছে সে তোমার বলয়।

এই পৃথিবীর ভালো পরিচিত রোদের মতন
তোমার শরীর ; তুমি দান করো নি তো ;
সময় তোমাকে সব দান করে মৃতদার ব'লে
সুদর্শনা, তুমি আজ মৃত।

অন্ধকার

গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল চ্ছল শব্দে জেগে উঠলাম আবার ;
তাকিয়ে দেখলাম পাণ্ডুর চাঁদ বৈতরণীর থেকে তার অর্ধেক ছায়া
গুটিয়ে নিয়েছে যেন
কীর্তিনাশার দিকে।

ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম—পউষের রাতে—
কোনোদিন আর জাগব না জেনে
কোনোদিন জাগব না আমি—কোনোদিন জাগব না আর—
হে নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
তুমি দিনের আলো নও, উদ্যম নও, স্বপ্ন নও,
হৃদয়ে যে মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে
রয়েছে যে অগাধ ঘুম
সে আস্বাদ নষ্ট করবার মতো শেলতীব্রতা তোমার নেই,
তুমি প্রদাহ প্রবহমান যন্ত্রণা নও—
জানো না কি চাঁদ,
নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
জানো না কি নিশীথ,
আমি অনেক দিন—
অনেক-অনেক দিন
অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে
হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব বলে
বুঝতে পেরেছি আবার ;
ভয় পেয়েছি,
পেয়েছি অসীম দুর্নিবার বেদনা ;

দেখেছি রক্তিম আকাশে সূর্য জেগে উঠে
মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য
আমাকে নির্দেশ দিয়েছে ;
আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায়—আক্রোশে ভরে গিয়েছে ;
সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শুয়োরের আর্তনাদে
উৎসব শুরু করেছে।
হায়, উৎসব !
হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে
থাকতে চেয়েছি।

কোনোদিন মানুষ ছিলাম না আমি।
হে নর, হে নারী,
তোমাদের পৃথিবীকে চিনিনি কোনোদিন ;
আমি অন্য কোনো নক্ষত্রের জীব নই।
যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রন্থি,
শত শত শূকরের চীৎকার সেখানে,
শত শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর ;
এই সব ভয়াবহ আরতি !
গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত ;
আমাকে কেন জাগাতে চাও ?
হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম হাওয়া
আমাকে জাগাতে চাও কেন।

অরব অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল চ্ছল শব্দে জেগে উঠব না আর ;

তাকিয়ে দেখব না নির্জন বিমিশ্র চাঁদ বৈতরণীর থেকে
অর্ধেক ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে
কীর্তিনাশার দিকে।
ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকব—ধীরে—পউষের রাতে—
কোনোদিন জাগব না জেনে—

কোনোদিন জাগব না আমি—কোনোদিন আর।

কমলালেবু

একবার যখন দেহ থেকে বার হয়ে যাব
আবার কি ফিরে আসব না আমি পৃথিবীতে ?
আবার যেন ফিরে আসি
কোনো এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে
কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে।

শ্যামলী

শ্যামলী, তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন ;
যখন জাহাজে চড়ে যুবকের দল
সুদূর নতুন দেশে সোনা আছে ব'লে,
মহিলারই প্রতিভায় সে ধাতু উজ্জ্বল
টের পেয়ে, দ্রাক্ষা দুধ ময়ূরশয্যায় কথা ভুলে
সকালের রূঢ় রৌদ্রে ডুবে যেত কোথায় অকূলে।

তোমার মুখের দিকে তাকালে এখনও
আমি সেই পৃথিবীর সমুদ্রের নীল,
দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা,
বিকেলের উপকণ্ঠে সাগরের চিল,
নক্ষত্র, রাত্রির জল, যুবাদের ক্রন্দন সব—
শ্যামলী, করেছি অনুভব।
অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল ;
মানুষকে স্থির—স্থিরতর হতে দেবে না সময় ;
সে কিছু চেয়েছে বলে এত রক্তনদী।
অন্ধকার প্রেরণার মতো মনে হয়
দূর সাগরের শব্দ—শতাব্দীর তীরে এসে ঝরে ;
কাল কিছু হয়েছিল ;—হবে কি শাশ্বতকাল পরে।

দুজন

'আমাকে খোঁজো না তুমি বহুদিন—কতদিন আমিও তোমাকে
খুঁজি নাকো ;—এক নক্ষত্রের নীচে তবু—একই আলো পৃথিবীর পারে
আমরা দুজনে আছি ; পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয় ;
প্রেম ধীরে মুছে যায়, নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয় ;
হয় নাকি ?'—বলে সে তাকাল তার সঙ্গিনীর দিকে ;
আজ এই মাঠ সূর্য সহধর্মী অঘ্রান-কার্তিকে
প্রাণ তার ভরে গেছে।

দুজনে আজকে তারা চিরস্থায়ী পৃথিবী ও আকাশের পাশে
আবার প্রথম এল—মনে হয়—যেন কিছু চেয়ে—কিছু একান্ত বিশ্বাসে।
লালচে হলদে পাতা অনুষঙ্গে জাম বট অশত্থের শাখার ভিতরে

অন্ধকারে ন'ড়ে-চ'ড়ে ঘাসের উপর ঝরে পড়ে ;
তারপর সান্ত্বনায় থাকে চিরকাল

যেখানে আকাশে খুব নীরবতা, শান্তি খুব আছে,
হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হলে ক্রমে ক্রমে যেখানে মানুষ
আশ্বাস খুঁজেছে এসে সময়ের দায়ভাগী নক্ষত্রের কাছে ;
সেই ব্যাপ্ত প্রান্তরে দুজন ; চারি দিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
হেমন্ত আসিয়া গেছে ;—চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি ;
ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে—শালিকের নেই আর দেরি,
হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমাবে সে শিশিরের জলে ;
ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে।

নারী তার সঙ্গীকে : 'পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
জানি আমি ;—তারপর আমাদের দুঃস্থ হৃদয়
কী নিয়ে থাকিবে বল ;—একদিন হৃদয়ে আঘাত ঢের দিয়েছে চেতনা,
তারপর ঝরে গেছে ; আজ তবু মনে হয় যদি ঝরিত না
হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ আমাদের—প্রেমের অপূর্ব শিশু আরক্ত বাসনা
ফুরত না যদি, আহা, আমাদের হৃদয়ের থেকে—'

এই বলে ম্রিয়মাণ আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে
উদ্‌বেল কাশের বনে দাঁড়ায়ে রহিল হাঁটুভর।
হলুদরঙের শাড়ি, চোরকাঁটা বিঁধে আছে, এলোমেলো অঘ্রানের খড়
চারিদিকে শূন্য থেকে ভেসে এসে ছুঁয়ে ছেনে যেতেছে শরীর ;
চুলের উপর তার কুয়াশা রেখেছে হাত, ঝরিছে শিশির ;—

প্রেমিকের মনে হল : 'এই নারী—অপরূপ—খুঁজে পাবে নক্ষত্রের তীরে ;
যেখানে রব না আমি, রবে না মাধুরী এই, রবে না হতাশা,

কুয়াশা রবে না আর—জনিত বাসনা নিজে—বাসনার মতো ভালোবাসা
খুঁজে নেবে অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ঈপ্সিতেরে তার।’

অবশেষে

এখানে প্রশান্ত মনে খেলা করে উঁচু উঁচু গাছ।
সবুজ পাতার ’পরে যখন নেমেছে এসে দুপুরের সূর্যের আঁচ
নদীতে স্মরণ করে একবার পৃথিবীর সকালবেলাকে।
আবার বিকেল হলে অতিকায় হরিণের মতো শান্ত থাকে
এই সব গাছগুলো ;—যেন কোনো দূর থেকে অস্পষ্ট বাতাস
বাঘের ঘ্রাণের মতো হৃদয়ে জাগায়ে যায় ত্রাস ;
চেয়ে দেখ—ইহাদের পরস্পর নীলিম বিন্যাস
নড়ে ওঠে ত্রস্ততায় ;—আধো নীল আকাশের বুকে
হরিণের মতো দ্রুত ঠ্যাঙের তুরুকে
অন্তর্হিত হয়ে যেতে পারে তারা বটে ;
একজোটে কাজ করে মানুষেরা যে রকম ভোটের ব্যালটে ;
তবুও বাঘিনী হয়ে বাতাসকে আলিঙ্গন করে—
সাগরের বালি আর রাত্রির নক্ষত্রের তরে।

স্বপ্নের ধ্বনিরা

স্বপ্নের ধ্বনিরা এসে বলে যায় : স্থবিরতা সবচেয়ে ভালো ;
নিস্তব্ধ শীতের রাতে দীপ জ্বেলে
অথবা নিভায়ে দীপ বিছানায় শুয়ে

স্থবিরের চোখ যেন জমে ওঠে অন্য কোন্ বিকেলের আলো
সেই আলো চিরদিন হয়ে থাকে স্থির ;
সব ছেড়ে একদিন আমিও স্থবির
হয়ে যাব ; সেদিন শীতের রাতে সোনালি জরির কাজ ফেলে
প্রদীপ নিভায়ে রবো বিছানায় শুয়ে ;
অন্ধকারে ঠেস দিয়ে জেগে রব
বাদুড়ের আঁকাবাঁকা আকাশের মতো।

স্থবিরতা, কবে তুমি আসিবে বল তো।

আমাকে তুমি

আমাকে
তুমি দেখিয়েছিলে একদিন :
মস্ত বড়ো ময়দান—দেবদারু পামের নিবিড় মাথা—মাইলের পর মাইল ;
দুপুরবেলার জনবিরল গভীর বাতাস
দূর শূন্যে চিলের পাটকিলে ডানার ভিতর অস্পষ্ট হয়ে হারিয়ে যায় ;
জোয়ারের মতো ফিরে আসে আবার ;
জানালায় জানালায় অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে :
পৃথিবীকে মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়।
তারপর
দূরে
অনেক দূরে
খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে—গান গায়—গান গায়—
এই দুপুরের বাতাস।

এক-একটা দুপুরে এক-একটা পরিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত হয়ে যায় যেন।
বিকেলে নরম মুহূর্ত ;

নদীর জলের ভিতর শম্বর, নীলগাই, হরিণের ছায়ার আসা-যাওয়া ;
একটা ধবল চিতল-হরিণীর ছায়া
আতার ধূসর ক্ষীরে গড়া মূর্তির মতো
নদীর জলে
সমস্ত বিকেলবেলা ধরে
স্থির !
মাঝে মাঝে অনেক দূর থেকে শ্মশানের চন্দনকাঠের চিতার গন্ধ,
আগুনের—ঘিয়ের ঘ্রাণ ;
বিকেলে
অসম্ভব বিষণ্নতা।
ঝাউ হরীতকী শাল, নিভন্ত সূর্যে
পিয়াশাল পিয়াল আমলকী দেবদারু—
বাতাসের বুকে স্পৃহা, উৎসাহ, জীবনের ফেনা ;

শাদা শাদাছিট কালো পায়রার ওড়াউড়ি জ্যোৎস্নায়—ছায়ায়,
রাত্রি ;
নক্ষত্র ও নক্ষত্রের
অতীত নিস্তব্ধতা।

মরণের পরপারে বড়ো অন্ধকার
এইসব আলো প্রেম ও নির্জনতার মতো।

তুমি

নক্ষত্রের চলাফেরা ইশারায় চারি দিকে উজ্জ্বল আকাশ ;
বাতাসে নীলাভ হয়ে আসে যেন প্রান্তরের ঘাস ;
কাঁচপোকা ঘুমিয়েছে—গঙ্গাফড়িং সেও ঘুমে ;
আম নিম হিজলের ব্যাপ্তিতে পড়ে আছ তুমি।

'মাটির অনেক নীচে চলে গেছ ? কিংবা দূর আকাশের পারে
তুমি আজ ? কোন্ কথা ভাবছ আঁধারে ?
ঐ যে ওখানে পায়রা একা ডাকে জামিরের বনে :
মনে হয় তুমি যেন ঐ পাখি—তুমি ছাড়া সময়ের এ উদ্ভাবনে

আমার এমন কাছে—আশ্বিনের এত বড় অকূল আকাশে
আর কাকে পাব এই সহজ গভীর অনায়াসে—'
বলতেই নিখিলের অন্ধকার দরকারে পাখি গেল উড়ে
প্রকৃতিস্থ প্রকৃতির মতো শব্দে—প্রেম অপ্রেম থেকে দূরে।

ধান কাটা হয়ে গেছে

ধান কাটা হয়ে গেছে কবে যেন—ক্ষেতে মাঠে পড়ে আছে খড়
পাতা কুটো ভাঙা ডিম—সাপের খোলস নীড় শীত।
এইসব উৎরায়ে ঐখানে মাঠের ভিতর
ঘুমাতেছে কয়েকটি পরিচিত লোক আজ—কেমন নিবিড়।

ঐখানে একজন শুয়ে আছে—দিনরাত দেখা হত কত কত দিন,
হৃদয়ের খেলা নিয়ে তার কাছে করেছি যে কত অপরাধ ;
শান্তি তবু : গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ।

শিরীষের ডালপালা

শিরীষের ডালপালা লেগে আছে বিকেলের মেঘে,

পিপুলের ভরা বুকে চিল নেমে এসেছে এখন ;
বিকেলের শিশুসূর্যকে ঘিরে মায়ের আবেগে
করুণ হয়েছে ঝাউবন।

নদীর উজ্জ্বল জল কোরালের মতো কলরবে
ভেসে নারকোলবনে কেড়ে নেয় কোরালীর ভ্রূণ ;
বিকেল বলেছে এই নদীটিকে : 'শান্ত হতে হবে—'
অকূল শুপুরিবন স্থির জলে ছায়া ফেলে এক মাইল শান্তি কল্যাণ

হয়ে আছে। আর মুখ মনে পড়ে এ রকম স্নিগ্ধ পৃথিবীর
পাতাপতঙ্গের কাছে চলে এসে ; চারি দিকে রাত্রি নক্ষত্রের আলোড়ন
এখন দয়ার মতো ; তবুও দয়ার মানে মৃত্যুতে স্থির
হয়ে থেকে ভুলে যাওয়া মানুষের সনাতন মন।

হাজার বছর শুধু খেলা করে

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো ;
চারি দিকে চিরদিন রাত্রির নিধান ;
বালির উপরে জ্যোৎস্না—দেবদারু ছায়া ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো : দ্বারকার ;—দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।
শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন ;
'মনে আছে ?' শুধাল সে—শুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন ?'

সুরঞ্জনা

সুরঞ্জনা, আজও তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছ ;
পৃথিবীর বয়সিনী তুমি এক মেয়ের মতন ;
কালো চোখ মেলে ঐ নীলিমা দেখেছ ;

গ্রীক হিন্দু ফিনিশিয় নিয়মের রূঢ় আয়োজন
শুনেছ ফেনিল শব্দে তিলোত্তমা-নগরীর গায়ে
কী চেয়েছে ? কী পেয়েছে ?—গিয়েছে হারায়ে।

বয়স বেড়েছে ঢের নরনারীদের ;
ঈষৎ নিভেছে সূর্য নক্ষত্রের আলো ;
তবুও সমুদ্র নীল ; ঝিনুকের গায়ে আলপনা ;
একটি পাখির গান কী রকম ভালো।
মানুষ কাউকে চায়—তার সেই নিহত উজ্জ্বল
ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোনো সাধনার ফল।

মনে পড়ে কবে এক তারাভরা রাতের বাতাসে
ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে
উতরোল বড়ো সাগরের পথে অন্তিম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রাণে
তবুও কাউকে আমি পারি নি বোঝাতে
সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয় শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,
আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

যেন সব অন্ধকার সমুদ্রের ক্লান্ত নাবিকেরা
মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো এক বিহ্বল বাতাসে
ভূমধ্যসাগরলীন দূর এক সভ্যতার থেকে
আজকের নব সভ্যতায় ফিরে আসে ;—
তুমি সেই অপরূপ সিন্ধু রাত্রি মৃতদের রোল
দেহ দিয়ে ভালোবেসে, তবু আজ ভোরের কল্লোল।

মিতভাষণ

তোমার সৌন্দর্য নারি, অতীতের দানের মতন।
মধ্যসাগরের কালো তরঙ্গের থেকে
ধর্মাশোকের স্পষ্ট আহ্বানের মতো
আমাদের নিয়ে যায় ডেকে
শান্তির সঙ্ঘের দিকে—ধর্মে—নির্বাণে ;
তোমার মুখের স্নিগ্ধ প্রতিভার পানে।

অনেক সমুদ্র ঘুরে ক্ষয়ে অন্ধকারে
দেখেছি মণিকা-আলো হাতে নিয়ে তুমি
সময়ের শতকের মৃত্যু হলে তবু
দাঁড়িয়ে রয়েছ শ্রেয়তর বেলাভূমি :
যা হয়েছে যা হতেছে এখুনি যা হবে
তার স্নিগ্ধ মালতী সৌরভে।

মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে ;
বড়ো বড়ো নগরীর বুকভরা ব্যথা ;
ক্রমেই হারিয়ে ফেলে তারা সব সঙ্কল্প স্বপ্নের
উদ্যমের অমূল্য স্পষ্টতা।
তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো ;
এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো।

সবিতা

সবিতা, মানুষজন্ম আমরা পেয়েছি
মনে হয় কোনো এক বসন্তের রাতে :

ভূমধ্যসাগর ঘিরে যেই সব জাতি,
তাহাদের সাথে
সিন্ধুর আঁধার পথে করেছি গুঞ্জন ;
মনে পড়ে নিবিড় মেরুন আলো, মুক্তার শিকারী,
রেশম, মদের সার্থবাহ,
দুধের মতন শাদা নারী।

অনন্ত রৌদ্রের থেকে তারা
শাশ্বত রাত্রির দিকে তবে
সহসা বিকেলবেলা শেষ হয়ে গেলে
চলে যেত কেমন নীরবে।
চারি দিকে ছায়া ঘুম সপ্তর্ষি নক্ষত্র ;
মধ্যযুগের অবসান
স্থির করে দিতে গিয়ে ইয়োরোপ গ্রীস
হতেছে উজ্জ্বল খৃষ্টান।
তবুও অতীত থেকে উঠে এসে তুমি আমি ওরা—
সিন্ধুর রাত্রির জল জানে—
আধেক যেতাম নব পৃথিবীর দিকে ;
কেমন অনন্যোপায় হাওয়ার আহ্বানে
আমরা অকূল হয়ে উঠে
মানুষকে মানুষের প্রয়াসকে শ্রদ্ধা করা হবে
জেনে তবু পৃথিবীর মৃত সভ্যতায়
যেতাম তো সাগরের স্নিগ্ধ কলরবে।

এখন অপর আলো পৃথিবীতে জ্বলে :
কী এক অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন।
তোমার নিবিড় কালো চুলের ভিতরে

কবেকার সমুদ্রের নুন ;
তোমার মুখের রেখা আজও
মৃত কত পৌত্তলিক খৃষ্টান সিন্ধুর
অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন ;
কত কাছে—তবু কত দূর।

সুচেতনা

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে ;
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।
এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য ; তবু শেষ সত্য নয়।
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে ;
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।

আজকে অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ
পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো
ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু,
দেখেছি আমারই হাতে হয়তো নিহত
ভাই বোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে ;
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন ;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।
কেবলই জাহাজ এসে আমাদের বন্দরের রোদে
দেখেছি ফসল নিয়ে উপনীত হয় ;
সেই শস্য অগণন মানুষের শব ;

শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়
আমাদের পিতা বুদ্ধ কনফুশিয়সের মতো আমাদেরও প্রাণ
মূক করে রাখে ; তবু চারি দিকে রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান।

সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে ;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ ;
এ বাতাস কী পরম সূর্যকরোজ্জ্বল ;—
প্রায় তত দূর ভালো মানব-সমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গড়ে দেব, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।

মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হত অনুভব করে ;
এসে যে গভীরতর লাভ হল সে সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে ;
দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলই অনন্ত সূর্যোদয়।

অঘ্রান প্রান্তরে

‘জানি আমি তোমার দু চোখ আজ আমাকে খোঁজে না আর, পৃথিবীর ’পরে—’
বলে চুপে থামলাম, কেবলই অশত্থপাতা পড়ে আছে ঘাসের ভিতরে
শুকনো মিয়োনো ছেঁড়া ;—অঘ্রান এসেছে আজ পৃথিবীর বনে :
সে সবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে
হেমন্ত এসেছে তবু ; বললে সে, ‘ঘাসের ওপরে সব বিছানো পাতার
মুখে এই নিস্তব্ধতা কেমন যে—সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার
ছড়িয়ে পড়েছে জলে’ ;—কিছুক্ষণ অঘ্রানের অস্পষ্ট জগতে

হাঁটলাম, চিল উড়ে চলে গেছে—কুয়াশার প্রান্তরের পথে
দু-একটা সজারুর আসা-যাওয়া ; উচ্ছল কলার ঝাড়ে উড়ে চুপে সন্ধ্যার বাতাসে
লক্ষ্মীপেঁচা হিজলের ফাঁক দিয়ে বাবলার আঁধার গলিতে নেমে আসে ;
আমাদের জীবনের অনেক অতীত ব্যাপ্তি আজও যেন লেগে আছে বহতা পাখায়
ঐ সব পাখিদের ; ঐ সব দূর দূর ধানক্ষেতে, ছাতকুড়োমাখা ক্লান্ত জামের শাখায় ;
নীলচে ঘাসের ফুলে ফড়িঙের হৃদয়ের মতো নীরবতা
ছড়িয়ে রয়েছে এই প্রান্তরের বুকে আজ…হেঁটে চলি…আজ কোনো কথা
নেই আর আমাদের ; মাঠের কিনারে ঢের ঝরা ঝাউফল
পড়ে আছে ; শান্ত হাত, চোখে তার বিকেলের মতন অতল
কিছু আছে ; খড়কুটো উড়ে এসে লেগে আছে শাড়ির ভিতরে,
সজনে পাতার গুঁড়ি চুলে বেধে গিয়ে নড়ে-চড়ে ;
পতঙ্গ পালক জল—চারিদিকে সূর্যের উজ্জ্বলতা নাশ ;
আলেয়ার মতো ঐ ধানগুলো নড়ে শূন্যে কী রকম অবাধ আকাশ
হয়ে যায় ; সময়ও অপার—তাকে প্রেম আশা চেতনার কণা
ধরে আছে বলে সেও সনাতন ;—কিন্তু এই ব্যর্থ ধারণা
সরিয়ে মেয়েটি তার আঁচলের চোরকাঁটা বেছে
প্রান্তর নক্ষত্র নদী আকাশের থেকে সরে গেছে
যেই স্পষ্ট নির্লিপ্তিতে—তাই-ই ঠিক—ওখানে স্নিগ্ধ হয় সব।
অপ্রেমে বা প্রেমে নয়—নিখিলের বৃক্ষ নিজ বিকাশে নীরব।

কবিতা। আশ্বিন ১৩৫৮

পথ হাঁটা

কী এক ইশারা যেন মনে রেখে একা একা শহরের পথ থেকে পথে
অনেক হেঁটেছে আমি ; অনেক দেখেছি আমি ট্রাম-বাস সব ঠিক চলে ;
তারপর পথ ছেড়ে শান্ত হয়ে চলে যায় তাহাদের ঘুমের জগতে :

সারারাত গ্যাসলাইট আপনার কাজ বুঝে ভালো করে জ্বলে।
কেউ ভুল করে নাকো—ইঁট বাড়ি সাইনবোর্ড জানালা কপাট ছাদ সব
চুপ হয়ে ঘুমাবার প্রয়োজন বোধ করে আকাশের তলে।

একা একা পথ হেঁটে এদের গভীর শান্তি হৃদয়ে করেছি অনুভব ;
তখন অনেক রাত—তখন অনেক তারা মনুমেন্ট মিনারের মাথা
নির্জনে ঘিরেছে এসে ;—মনে হয় কোনোদিন এর চেয়ে সহজ সম্ভব

আর কিছু দেখেছি কি : একরাশ তারা-আর-মনুমেন্ট-ভরা কলকাতা ?
চোখ নীচে নেমে যায়—চুরুট নীরবে জ্বলে—বাতাসে অনেক ধুলো খড় ;
চোখ বুজে একপাশে সরে যাই—গাছ থেকে অনেক বাদামি জীর্ণ পাতা

উড়ে গেছে ; বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর
কেন যেন ; আজও আমি জানি নাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর।

সংযোজন
১৯৫৪

আবহমান

পৃথিবী এখন ক্রমে হতেছে নিঝুম।
সকলেরই চোখ ক্রমে বিজড়িত হয়ে যেন আসে ;
যদিও আকাশ সিন্ধু ভরে গেল অগ্নির উল্লাসে ;
যেমন যখন বিকেলবেলা কাটা হয় ক্ষেতের গোধূম
চিলের কান্নার মতো শব্দ করে মেঠো ইঁদুরের ভিড় ফসলের ঘুম

গাঢ় করে দিয়ে যায়।—এইবার কুয়াশায় যাত্রা সকলের।
সমুদ্রের রোল থেকে একটি আবেগ নিয়ে কেউ

নদীর তরঙ্গে—ক্রমে—তুষারের স্তূপে তার ঢেউ।
একবার টের পাবে—দ্বিতীয়বারের
সময় আসার আগে নিজেকেই পাবে না সে টের।

এইখানে সময়কে যতদূর দেখা যায় চোখে
নির্জন ক্ষেতের দিকে চেয়ে দেখি দাঁড়ায়েছে অভিভূত চাষা ;
এখনও চালাতে আছে পৃথিবীর প্রথম তামাশা
সকল সময় পান ক'রে ফেলে জলের মতন এক ঢোকে ;
অঘ্রানের বিকেলের কমলা আলোকে
নিড়োনো ক্ষেতের কাজ করে যায় ধীরে ;
একটি পাখির মতো ডিনামাইটের 'পরে ব'সে।
পৃথিবীর মহত্তর অভিজ্ঞতা নিজের মনের মুদ্রাদোষে
নষ্ট হয়ে খ'সে যায় চারি দিকে আমিষ তিমিরে ;
সোনালি সূর্যের সাথে মিশে গিয়ে মানুষটা আছে পিছু ফিরে।

ভোরের স্ফটিক রৌদ্রে নগরী মলিন হয়ে আসে।
মানুষের উৎসাহের কাছ থেকে শুরু হল মানুষের বৃত্তি আদায়।
যদি কেউ কানাকড়ি দিতে পারে বুকের উপরে হাত রেখে
তবে সে প্রেতের মতো ভেসে গিয়ে সিংহদরজায়
আঘাত হানিতে গিয়ে মিশে যায় অন্ধকার বিশ্বের মতন।
অভিভূত হয়ে আছে—চেয়ে দেখে—বেদনার নিজের নিয়ম।
নেউলধূসর নদী আপনার কাজ বুঝে প্রবাহিত হয় ;
জলপাই-অরণ্যের ওই পারে পাহাড়ের মেধাবী নীলিমা ;
ওই দিকে সৃষ্টি যেন উষ্ণ স্থির প্রেমের বিষয় ;
প্রিয়ের হাতের মতো লেগে আছে ঘড়ির সময় ভুলে গিয়ে
আকাশের প্রসারিত হাতের ভিতরে।

সেই আদি অরণির যুগ থেকে শুরু করে আজ
অনেক মনীষা, প্রেমে, নিমীল ফসলরাশি ঘরে
এসে গেছে মানুষের বেদনা ও সংবেদনাময়।
পৃথিবীর রাজপথে—রক্তপথে—অন্ধকার অববাহিকায়
এখনও মানুষ তবু খোঁড়া ঠ্যাঙে তৈমুরের মতো বার হয়।
তাহার পায়ের নীচে তৃণের নিকটে তৃণ মূক অপেক্ষায় ;
তাহার মাথার ’পরে সূর্য, স্বাতী, সরমার ভিড় ;
এদের নৃত্যের রোলে অবহিত হয়ে থেকে ক্রমে একদিন
কবে তার ক্ষুদ্র হেমন্তের বেলা হবে নিসর্গের চেয়েও প্রবীণ ?

চেয়েছে মাটির দিকে—ভূগর্ভে তেলের দিকে
সমস্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অবিরল যারা,
মাথার উপরে চেয়ে দেখেছে এবার ;
দূরবীনে কিমাকার সিংহের সাড়া
পাওয়া যায় শরতের নির্মেঘ রাতে।
বুকের উপরে হাত রেখে দেয় তারা।
যদিও গিয়েছে ঢের ক্যারাভান ম’রে।
মশালের কেরোসিনে মানুষেরা অনেক পাহারা
দিয়ে গেছে তেল, সোনা, কয়লা ও রমণীকে চেয়ে ;
চিরদিন এই সব হৃদয় ও রুধিরের ধারা।
মাটিও আশ্চর্য সত্য। ডান হাত অন্ধকারে ফেলে
নক্ষত্রও প্রামাণিক ; পরলোক রেখেছে সে জ্বেলে ;
অনৃত সে আমাদের মৃত্যুকে ছাড়া।

মোমের আলোয় আজ গ্রন্থের কাছে বসে—অথবা ভোরের বেলা নদীর ভিতরে
আমরা যতটা দূর চলে যাই—চেয়ে দেখি আরো-কিছু আছে তারপরে।
অনির্দিষ্ট আকাশের পানে উড়ে হরিয়াল আমারও বিবরে

ছায়া ফেলে। ঘুরোনো সিঁড়ির পথ বেয়ে যারা উঠে যায় ধবল মিনারে,
কিংবা যারা ঘুমন্তের মতো জেগে পায়চারি করে সিংহদ্বারে,
অথবা যে সব থাম সমীচীন মিস্ত্রির হাত থেকে উঠে গেছে বিদ্যুতের তারে
তাহারা ছবির মতো পরিতৃপ্ত বিবেকের রেখায় রয়েছে অনিমেষ।
হয়তো অনেক এগিয়ে তারা দেখে গেছে মানুষের পরম আয়ুর পারে শেষ
জলের রঙের মতো স্বচ্ছ রোদে একটিও বোলতার নেই অবলেশ।

তাই তারা লোষ্ট্রের মতন স্তব্ধ। আমাদেরও জীবনের লিপ্ত অভিধানে
বর্জাইস অক্ষরে লেখা আছে অন্ধকার দলিলের মানে।
সৃষ্টির ভিতরে তবু কিছুই সুদীর্ঘতম নয়—এই জ্ঞানে
লোকসানী বাজারের বাক্সের আতাফল মারীগুটিকার মতো পেকে
নিজের বীজের তরে জোর করে সূর্যকে নিয়ে আসে ডেকে।
অকৃত্রিম নীল আলো খেলা করে ঢের আগে মৃত প্রেমিকের শব থেকে।

একটি আলোক নিয়ে বসে থাকা চিরদিন ;
নদীর জলের মতো স্বচ্ছ এক প্রত্যাশাকে নিয়ে ;
সে সবের দিন শেষ হয়ে গেছে
এখন সৃষ্টির মনে—অথবা মনীষীদের প্রাণের ভিতরে।
সৃষ্টি আমাদের শত শতাব্দীর সাথে ওঠে বেড়ে।
একদিন ছিল যাহা অরণ্যের রোদে—বালুচরে,
সে আজ নিজেকে চেনে মানুষের হৃদয়ের প্রতিভাকে নেড়ে।
আমরা জটিল ঢের হয়ে গেছি—বহুদিন পুরাতন গ্রহে বেঁচে থেকে।
যদি কেউ বলে এসে : 'এই সেই নারী,
একে তুমি চেয়েছিলে ; এই সেই বিশুদ্ধ সমাজ—'
তবুও দর্পণে অগ্নি দেখে কবে ফুরায়ে গিয়েছে কার কাজ ?

আমাদের মৃত্যু নেই আজ আর,

যদিও অনেক মৃত্যুপরম্পরা ছিল ইতিহাসে ;
বিস্তৃত প্রাসাদে তারা দেয়ালের অব্‌লঙ ছবি ;
নানারূপ ক্ষতি ক্ষয়ে নানা দিকে মরে গেছি—মনে পড়ে বটে
এইসব ছবি দেখে ; বন্দীর মতন তবু নিস্তব্ধ পটে
নেই কোনো দেবদত্ত, উদয়ন, চিত্রসেনী স্থাণু।
এক দরজায় ঢুকে বহিষ্কৃত হয়ে গেছে অন্য-এক দুয়ারের দিকে
অমেয় আলোয় হেঁটে তারা সব।
(আমাদের পূর্বপুরুষেরা কোন্ বাতাসের শব্দ শুনেছিল ;
তারপর হয়েছিল পাথরের মতন নীরব ?)
আমাদের মণিবন্ধে সময়ের ঘড়ি
কাচের গেলাসে জলে উজ্জ্বল শফরী ;
সমুদ্রের দিবারৌদ্রে আরক্তিম হাঙরের মতো ;
তারপর অন্য গ্রহ-নক্ষত্রেরা আমাদের ঘড়ির ভিতরে
যা হয়েছে, যা হতেছে, অথবা যা হবে সব একসাথে প্রচারিত করে।
সৃষ্টির নাড়ীর 'পরে হাত রেখে টের পাওয়া যায়
অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে রয়ে গেছে অমোঘ আমোদ ;
তবু তারা করে নাকো পরস্পরের ঋণশোধ।

ভিখিরি

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি আহিরীটোলায়,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি বাদুড়বাগানে,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
তবে আমি হেঁটে চলে যাব মানে মানে।
—ব'লে সে বাড়ায়ে দিল অন্ধকারে হাত।
আগাগোড়া শরীরটা নিয়ে এক কানা যেন বুনে যেতে চেয়েছিল তাঁত ;
তবুও তা নুলো শাঁখারির হাতে হয়েছে করাত।

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি মাঠকোটা ঘুরে,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি পাথুরিয়াঘাটা,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
তা হলে ঢেঁকির চাল হবে কলে ছাঁটা।
—ব'লে সে বাড়ায়ে দিল গ্যাসলাইটে মুখ।
ভিড়ের ভিতরে তবু—হ্যারিসন রোডে—আরো গভীর অসুখ
এক পৃথিবীর ভুল ; ভিখিরির ভুলে : এক পৃথিবীর ভুলচুক।

তোমাকে

একদিন মনে হত জলের মতন তুমি।
সকালবেলার রোদে তোমার মুখের থেকে বিভা—
অথবা দুপুরবেলা—বিকেলের আসন্ন আলোয়—
চেয়ে আছে—চলে যায়—জলের প্রতিভা।

মনে হত তীরের উপরে বসে থেকে।
আবিষ্ট পুকুর থেকে সিঙাড়ার ফল
কেউ কেউ তুলে নিয়ে চলে গেলে—নীচে
তোমার মুখের মতন অবিকল

নির্জন জলের রঙ তাকায়ে রয়েছে ;
স্থানান্তরিত হয়ে দিবসের আলোর ভিতরে
নিজের মুখের ঠাণ্ডা জলরেখা নিয়ে
পুনরায় শ্যাম পরগাছা সৃষ্টি করে ;

এক পৃথিবীর রক্ত নিপতিত হয়ে গেছে জেনে
এক পৃথিবীর আলো সব দিকে নিভে যায় ব'লে
রঙিন সাপকে তার বুকের ভিতরে টেনে নেয় :
অপরাহ্ণে আকাশের রঙ ফিকে হলে।

তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর অমোঘ সকাল ;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের বিকেলের রক্তিল বিন্যাস ;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর রাত :
নদীর সাপিনী, লতা, বিলীন বিশ্বাস।

বেলা অবেলা কালবেলা
১৯৬১

মাঘসংক্রান্তির রাতে

হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে
তোমার পবিত্র অগ্নি জ্বলে।
অমাময়ী নিশি যদি সৃজনের শেষ কথা হয়,
আর তার প্রতিবিম্ব হয় যদি মানবহৃদয়,
তবুও আবার জ্যোতি সৃষ্টির নিবিড় মনোবলে
জ্ব'লে ওঠে সময়ের আকাশের পৃথিবীর মনে ;
বুঝেছি ভোরের বেলা রোদে নীলিমায়,
আঁধার অরব রাতে অগণন জ্যোতিষ্কশিখায় ;
মহাবিশ্ব একদিন তমিস্রার মতো হয়ে গেলে
মুখে যা বল নি, নারি, মনে যা ভেবেছ তার প্রতি
লক্ষ্য রেখে অন্ধকার শক্তি অগ্নি সুবর্ণের মতো
দেহ হবে মন হবে—তুমি হবে সে-সবের জ্যোতি।

দ্বন্দ্ব। [?]

আমাকে একটি কথা দাও

আমাকে একটি কথা দাও যা আকাশের মতো
সহজ মহৎ বিশাল,
গভীর—সমস্ত ক্লান্ত হতাহত গৃহবলিভুক্‌দের রক্তে
মলিন ইতিহাসের অন্তর ধুয়ে চেনা হাতের মতন :
আমি যাকে আবহমান কাল ভালোবেসে এসেছি সেই নারীর।
সেই রাত্রির নক্ষত্রালোকিত নিবিড় বাতাসের মতো ;
সেই দিনের—আলোর অন্তহীন এঞ্জিন-চঞ্চল ডানার মতন
সেই উজ্জ্বল পাখিনীর—পাখির সমস্ত পিপাসাকে যে
অগ্নির মতো প্রদীপ্ত দেখে অন্তিমশরীরিণী মোমের মতন।

কবিতা। আশ্বিন ১৩৫৮

তোমাকে

মাঠের ভিড়ে গাছের ফাঁকে দিনের রৌদ্র অই :
কুলবধূর বহিরাশ্রয়িতার মতন অনেক উড়ে
হিজল গাছে জামের বনে হলুদ পাখির মতো
রূপসাগরের পার থেকে কি পাখনা বাড়িয়ে
বাস্তবিকই রৌদ্র এখন ? সত্যিকারের পাখি ?
কে যে কোথায় কার হৃদয়ে কখন আঘাত করে।
রৌদ্রবরন দেখেছিলাম কঠিন সময়-পরিক্রমার পথে—
নারীর, তবু ভেবেছিলাম বহিঃপ্রকৃতির।
আজকে সে-সব মীনকেতনের সাড়ার মতো, তবু
অন্ধকারের মহাসনাতনের থেকে চেয়ে
আশ্বিনের এই শীত স্বাভাবিক ভোরের বেলা হলে
বলে : 'আমি রোদ কি ধুলো পাখি না সেই নারী ?'
পাতা পাথর মৃত্যু কাজের ভূকন্দরের থেকে আমি শুনি ;

নদী শিশির পাখি বাতাস কথা ব'লে ফুরিয়ে গেলে পরে
শান্ত পরিচ্ছন্নতা এক এই পৃথিবীর প্রাণে
সফল হতে গিয়েও তবু বিষণ্নতার মতো।
যদিও পথ আছে—তবু কোলাহলে শূন্য আলিঙ্গনে
নায়ক সাধক রাষ্ট্র সমাজ ক্লান্ত হয়ে পড়ে ;
প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের দ্বীপের মতো—
কী এক বিরাট অবক্ষয়ের মানবসাগরে।
তবুও তোমায় জেনেছি, নারি, ইতিহাসের শেষে এসে ; মানবপ্রতিভার
রূঢ়তা ও নিষ্ফলতার অধম অন্ধকারে
মানবকে নয়, নারি, শুধু তোমাকে ভালোবেসে
বুঝেছি নিখিল বিষ কী রকম মধুর হতে পারে।

মাসিক বসুমতী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩

সময়সেতুপথে

ভোরের বেলার মাঠ প্রান্তর নীলকণ্ঠ পাখি,
দুপুরবেলার আকাশে নীল পাহাড় নীলিমা,
সারাটি দিন মীনরৌদ্রমুখর জলের স্বর,—
অনবসিত বাহির-ঘরের ঘরণীর এই সীমা।

তবুও রৌদ্র সাগরে নিভে গেল ;
বলে গেল : 'অনেক মানুষ মরে গেছে' ; 'অনেক নারীরা কি
তাদের সাথে হারিয়ে গেছে ?'—বলতে গেলাম আমি ;
উঁচু গাছের ধূসর হাড়ে চাঁদ না কি সে পাখি
বাতাস আকাশ নক্ষত্র নীড় খুঁজে
বসে আছে এই প্রকৃতির পলকে নিবিড় হয়ে ;

পুরুষনারী হারিয়ে গেছে শষ্প নদীর অমনোনিবেশে,
অমেয় সুসময়ের মতো রয়েছে হৃদয়ে।

একক। ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৫৪

যতিহীন

বিকেলবেলা গড়িয়ে গেলে অনেক মেঘের ভিড়
কয়েক ফলা দীর্ঘতম সূর্যকিরণ বুকে
জাগিয়ে তুলে হলুদ নীল কমলা রঙের আলোয়
জ্বলে উঠে ঝরে গেল অন্ধকারের মুখে।
যুবারা সব যে যার ঢেউয়ে—
মেয়েরা সব যে যার প্রিয়ের সাথে
কোথায় আছে জানি না তো ;
কোথায় সমাজ, অর্থনীতি ?—স্বর্গগামী সিঁড়ি
ভেঙে গিয়ে পায়ের নীচে রক্তনদীর মতো,—
মানব ক্রমপরিণতির পথে লিঙ্গশরীরী
হয়ে কি আজ চারি দিকে গণনাহীন ধূসর দেয়ালে
ছড়িয়ে আছে যে যার দ্বৈপসাগর দখল করে !
পুরাণপুরুষ, গণমানুষ, নারীপুরুষ, মানবতা, অসংখ্য বিপ্লব
অর্থবিহীন হয়ে গেলে—তবু আর এক নবীনতর ভোরে
সার্থকতা পাওয়া যাবে ভেবে মানুষ সঞ্চারিত হয়ে
পথে পথে সবের শুভ নিকেতনের সমাজ বানিয়ে
তবুও কেবল দ্বীপ বানাল যে যার নিজের অবক্ষয়ের জলে।
প্রাচীন কথা নতুন করে এই পৃথিবীর অনন্ত বোনভায়ে।
ভাবছে একা একা ব'সে
যুদ্ধ রক্ত রিরংসা ভয় কলরোলের ফাঁকে :

আমাদের এই আকাশ সাগর আঁধার আলোয় আজ
যে দোর কঠিন ; নেই মনে হয় ;—সে দ্বার খুলে দিয়ে
যেতে হবে আবার আলোয় অসার আলোর ব্যসন ছাড়িয়ে।

চতুরঙ্গ। [?]

অনেক নদীর জল

অনেক নদীর জল উবে গেছে—
ঘর বাড়ি সাঁকো ভেঙে গেল ;
সে-সব সময় ভেদ ক'রে ফেলে আজ
কারা তবু কাছে চলে এল।
যে সূর্য অয়নে নেই কোনো দিন,
—মনে তাকে দেখা যেত যদি—
যে নারী দেখেনি কেউ—ছ-সাতটি তারার তিমিরে
হৃদয়ে এসেছে সেই নদী।
তুমি কথা বল—আমি জীবন-মৃত্যুর শব্দ শুনি :
সকালে শিশিরকণা যে-রকম ঘাসে
অচিরে মরণশীল হয়ে তবু সূর্য আবার
মৃত্যু মুখে নিয়ে পরদিন ফিরে আসে।
জন্মতারকার ডাকে বারবার পৃথিবীতে ফিরে এসে আমি
দেখেছি তোমার চোখে একই ছায়া পড়ে :
সে কি প্রেম ? অন্ধকার ?—ঘাস ঘুম মৃত্যু প্রকৃতির
অন্ধ চলাচলের ভিতরে।
স্থির হয়ে আছে মন ; মনে হয় তবু
সে ধ্রুব গতির বেগে চলে,
মহা-মহা রজনীর ব্রহ্মাণ্ডকে ধরে ;

সৃষ্টির গভীর গভীর হংসী প্রেম
নেমেছে—এসেছে আজ রক্তের ভিতরে।

‘এখানে পৃথিবী আর নেই—’
ব’লে তারা পৃথিবীর জনকল্যাণেই
বিদায় নিয়েছে হিংসা ক্লান্তির পানে ;
কল্যাণ-কল্যাণ ; এই রাত্রির গভীরতর মানে।
শান্তি এই আজ ;
এইখানে স্মৃতি ;
এখানে বিস্মৃতি তবু ; প্রেম
ক্রমায়ত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি।

চতুরঙ্গ। শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৯

শতাব্দী

চার দিকে নীল সাগর ডাকে অন্ধকারে, শুনি ;
ঐখানেতে আলোকস্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে ঢের
একটি-দুটি তারার সাথে ;—তারপরেতে অনেকগুলো তারা ;
অন্নে ক্ষুধা মিটে গেলেও মনের ভিতরের
ব্যথার কোনো মীমাংসা নেই জানিয়ে দিয়ে আকাশ ভ’রে জ্বলে ;
হেমন্ত রাত ক্রমেই আরো অবোধ ক্লান্ত অধোগামী হয়ে
চলবে কি না ভাবতে আছে—ঋতুর কামচক্রে সে তো চলে ;
কিন্তু আরো আশা আলো চলার আকাশ রয়েছে কি মানবহৃদয়ে।
অথবা এ মানবপ্রাণের অনুতর্ক ; হেমন্ত খুব স্থির
সপ্রতিভ ব্যাপ্ত হিরণগভীর সময় ব’লে
ইতিহাসের করুণ কঠিন ছায়াপাতের দিনে

উন্নতি প্রেম কাম্য মনে হলে
হৃদয়কে ঠিক শীত সাহসিক হেমন্তলোক ভাবি ;
চারি দিকে রক্তে রৌদ্রে অনেক বিনিময়ে ব্যবহারে
কিছুই তবু ফল হল না ; এসো মানুষ, আবার দেখা যাক
সময় দেশ ও সন্ততিদের কী লাভ হতে পারে।
ইতিহাসের সমস্ত রাত মিশে গিয়ে একটি রাত্রি আজ পৃথিবীর তীরে ;
কথা ভাবায়, ভ্রান্তি ভাঙে, ক্রমেই বীতশোক
করে দিতে পারে বুঝি মানবভাবনাকে ;
অন্ধ অভিভূতের মতো যদিও আজ লোক
চলছে, তবু মানুষকে সে চিনে নিতে বলে :
কোথায় মধু—কোথায় কালের মক্ষিকারা—কোথায় অহ্বান
নীড় গঠনের সমবায়ের শান্তি-সহিষ্ণুতার ;—
মানুষও জ্ঞানী ; তবুও ধন্য মক্ষিকাদের জ্ঞান।
কাছে-দূরে এই শতাব্দীর প্রাণনদীরা রোল
স্তব্ধ করে রাখে গিয়ে যে-ভূগোলের অসারতার পরে
সেখানে নীলকণ্ঠ পাখি ফসল সূর্য নেই,
ধূসর আকাশ—একটি শুধু মেরুন রঙের গাছের মর্মরে
আজ পৃথিবীর শূন্য পথ ও জীবনবেদের নিরাশা তাপ ভয়
জেগে ওঠে—এ সুর ক্রমে নরম—ক্রমে হয়তো আরও কঠিন হতে পারে ;
সোফোক্লেস ও মহাভারত মানবজাতির এ ব্যর্থতা জেনেছিল ; জানি ;
আজকে আলো গভীরতর হবে কি অন্ধকারে।

দেশ। ৩০ ভাদ্র ১৩৫৭

সূর্য নক্ষত্র নারী

তোমার নিকট থেকে সর্বদাই বিদায়ের কথা ছিল
সবচেয়ে আগে ; জানি আমি।

সে দিনও তোমার সাথে মুখ-চেনা হয় নাই।
তুমি যে এ পৃথিবীতে রয়ে গেছ
আমাকে বলে নি কেউ।
কোথাও জলকে ঘিরে পৃথিবীর অফুরান জল
রয়ে গেছে—
যে যার নিজের কাজে আছে, এই অনুভবে চ'লে
শিয়রে নিয়ত স্ফীত সূর্যকে চেনে তারা ;
আকাশের সপ্রতিভ নক্ষত্রকে চিনে উদীচীর
কোনো জল কী করে অপর জল চিনে নেবে অন্য নির্ঝরের ?
তবুও জীবন ছুঁয়ে গেলে তুমি ;
আমার চোখের থেকে নিমেষনিহত
সূর্যকে সরায়ে দিয়ে।

সরে যেত ; তবুও আয়ুর দিন ফুরোবার আগে
নব নব সূর্যকে কে নারীর বদলে
ছেড়ে দেয় ? কেন দেব ? সকল প্রতীতি উৎসবের
চেয়ে তবু বড়ো
স্থিরতর প্রিয় তুমি ;—নিঃসূর্য নির্জন
করে দিতে এলে।
মিলন ও বিদায়ের প্রয়োজনে আমি যদি মিলিত হতাম
তোমার উৎসের সাথে, তবে আমি অন্য সব প্রেমিকের মতো
বিরাট পৃথিবী আর সুবিশাল সময়কে সেবা করে আত্মস্থ হতাম।
তুমি তা জান না, তবু, আমি জানি, একবার তোমাকে দেখেছি—
পিছনের পটভূমিকায় সময়ের
শেষনাগ ছিল, নেই—বিজ্ঞানের ক্লান্ত নক্ষত্রেরা
নিভে যায়—মানুষ অপরিজ্ঞাত সে অমায় ; তবুও তাদের একজন
গভীর মানুষী কেন নিজেকে চেনায় !

আহা, তাকে অন্ধকার অনন্তের মতো আমি জেনে নিয়ে, তবু,
অল্পায়ু রঙিন রৌদ্রে মানবের ইতিহাসে কে না জেনে কোথায় চলেছি !

দুই

চারি দিকে সৃজনের অন্ধকার রয়ে গেছে, নারি,
অবতীর্ণ শরীরের অনুভূতি ছাড়া আরো ভালো
কোথাও দ্বিতীয় সূর্য নেই, যা জ্বালালে
তোমার শরীর সব আলোকিত করে দিয়ে স্পষ্ট করে দেবে কোনো কালে
শরীরে যা রয়ে গেছে।
এইসব ঐশী কাল ভেঙে ফেলে দিয়ে
নতুন সময় গ'ড়ে নিজেকে না গড়ে তবু তুমি
ব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকারে একবার জন্মাবার হেতু
অনুভব করেছিলে—
জন্ম-জন্মান্তের মৃত স্মরণের সাঁকো
তোমার হৃদয় স্পর্শ করে ব'লে আজ
আমাকে ইশারাপাত করে গেলে তারই ;—
অপার কালের স্রোত না পেলে কি ক'রে তবু, নারি,
তুচ্ছ, খণ্ড, অল্প সময়ের স্বত্ব কাটায়ে অঋণী তোমাকে কাছে পাবে—
তোমার নিবিড় নিজ চোখ এসে নিজের বিষয় নিয়ে যাবে ?
সময়ের কক্ষ থেকে দূর কক্ষে চাবি
খুলে ফেলে তুমি অন্য সব মেয়েদের
আত্মঅন্তরঙ্গতার দান
দেখায়ে অনঙ্ককাল ভেঙে গেলে পরে,
যে দেশে নক্ষত্র নেই—কোথাও সময় নেই আর—
আমারও হৃদয়ে নেই বিভা—
দেখাবে নিজের হাতে—অবশেষে—কী মকরকেতনে প্রতিভা।

তিন

তুমি আছো জেনে আমি অন্ধকার ভালো ভেবে যে অতীত আর
যেই শীত ক্লান্তিহীন কাটায়েছিলাম,
তাই শুধু কাটায়েছি।
কাটায়ে জেনেছি এই-ই শূন্য, তবু হৃদয়ের কাছে ছিল অন্য-কোনো নাম।
অন্তহীন অপেক্ষার চেয়ে তবে ভালো
দ্বীপাতীত লক্ষ্যে অবিরাম চলে যাওয়া।
শোককে স্বীকার ক'রে অবশেষে তবে
নিমেষের শরীরের উজ্জ্বলায় অনন্তের জ্ঞানপাপ মুছে দিতে হবে।
আজ এই ধ্বংসমত্ত অন্ধকার ভেদ ক'রে বিদ্যুতের মতো
তুমি যে শরীর নিয়ে রয়ে গেছ, সেই কথা সময়ের মনে
জানাবার আধার কি একজন পুরুষের নির্জন শরীরে
একটি পলক শুধু—হৃদয়বিহীন সব অপার আলোকবর্ষ ঘিরে?
অধঃপতিত এই অসময়ে কে-বা সেই উপচার পুরুষমানুষ?—
ভাবি আমি—জানি আমি, তবু
সে কথা আমাকে জানাবার
হৃদয় আমার নেই—
যে-কোনো প্রেমিক আজ এখন আমার
দেহের প্রতিভূ হয়ে নিজের নারীকে নিয়ে পৃথিবীর পথে
একটি মুহূর্তে যদি আমার অনন্ত হয় মহিলার জ্যোতিষ্কজগতে।

পূর্বাশা। কার্তিক ১৩৫৩

চারি দিকে প্রকৃতির

চারি দিকে প্রকৃতির ক্ষমতা নিজের মতো ছড়ায়ে রয়েছে।
সূর্য আর সূর্যের বনিতা তপতী—
মনে হয় ইহাদের প্রেম

মনে করে নিতে গেলে, চুপে
তিমিরবিদারী রীতি হয়ে এরা আসে
আজ নয়—কোনো এক আগামী আকাশে।
অন্নের ঋণ, বিমলিন স্মৃতি সব
বন্দরবস্তির পথে কোনো এক দিন
নিমেষের রহস্যের মতো ভুলে গিয়ে
নদীর নারীর কথা—আরো প্রদীপ্তির কথা সব
সহসা চকিত হয়ে ভেবে নিতে গেলে বুঝি কেউ
হৃদয়কে ঘিরে রাখে, দিতে চায় একা আকাশের
আশেপাশে অহেতুক ভাঙা শাদা মেঘের মতন।
তবুও নারীর নাম ঢের দূরে আজ,
ঢের দূরে মেঘ ;
সারাদিন নিলেমের কালিমার খারিজের কাজে মিশে থেকে
ছুটি নিতে ভালোবেসে ফেলে যদি মন
ছুটি দিতে চায় না বিবেক।
মাঝে মাঝে বাহিরের অন্তহীন প্রসারের থেকে
মানুষের চোখে-পড়া-না-পড়া সে কোনো স্বভাবের
সুর এসে মানবের প্রাণে
কোনো এক মানে পেতে চায় :
যে-পৃথিবী শুভ হতে গিয়ে হেরে গেছে সেই ব্যর্থতার মানে।
চারি দিকে কলকাতা টোকিয়ো দিল্লি মস্কৌ অতলান্তিকের কলরব,
সরবরাহের ভোরে,
অনুপম ভোরাইয়ের গান ;
অগণন মানুষের সময় ও রক্তের যোগান
ভাঙে গড়ে ঘর বাড়ি মরুভূমি চাঁদ
রক্ত হাড় বসার বন্দর জেটি ডক ;
প্রীতি নেই—পেতে গেলে হৃদয়ের শান্তি স্বর্গের

প্রথম দুয়ারে এসে মুখরিত করে তোলে মোহিনী নরক।
আমাদের এ পৃথিবী যতদূর উন্নত হয়েছে
ততদূর মানুষের বিবেক সফল।
সে চেতনা পিরামিডে পেপিরাসে প্রিন্টিং-প্রেসে ব্যাপ্ত হয়ে
তবুও অধিক আধুনিকতর চরিত্রের বল।
শাদাসিদে মনে হয় সে সব ফসল :
পায়ের চলার পথে দিন আর রাত্রির মতন—
তবুও এদের গতি স্নিগ্ধ নিয়ন্ত্রিত ক'রে বারবার উত্তরসমাজ
ঈষৎ অনন্যসাধারণ।

চুন্‌টা প্রকাশ। [?]

মহিলা

এইখানে শূন্যে অনুধাবনীয় পাহাড় উঠেছে
ভোরের ভিতর থেকে অন্য এক পৃথিবীর মতো ;
এইখানে এসে প'ড়ে—থেমে গেলে—একটি নারীকে
কোথাও দেখেছি ব'লে স্বভাববশত

মনে হয়—কেননা এমন স্থান পাথরের ভারে কেটে তবু
প্রতিভাত হয়ে থাকে নিজের মতন লঘুভারে ;
এইখানে সে দিনও সে হেঁটেছিল—আজও ঘুরে যায় ;
এর চেয়ে বেশি ব্যাখ্যা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দিতে পারে ;

অনিত্য নারীর রূপ বর্ণনায় যদিও সে কুটিল কলম
নিয়োজিত হয় নাই কোনোদিন—তবুও মহিলা
না ম'রে অমর যারা তাহাদের স্বর্গীয় কাপড়
কোঁচকায়ে পৃথিবীর মসৃণ গিলা

অন্তরঙ্গ করে নিয়ে বানায়েছে নিজের শরীর।
চুলের ভিতরে উঁচু পাহাড়ের কুসম বাতাস।
দিনগত পাপক্ষয় ভুলে গিয়ে হৃদয়ের দিন
ধারণ করেছে তার শরীরের ফাঁস।

চিতাবাঘ জন্মাবার আগে এই পাহাড়ে সে ছিল ;
অজগর সাপিনীর মরণের পরে।
সহসা পাহাড় বলে মেঘখণ্ডকে
শূন্যের ভিতরে

ভুল হলে—প্রকৃতিস্থ হয়ে যেতে হয় ;
(চোখ চেয়ে ভালো করে তাকালেই হত ;)
কেননা কেবলই যুক্তি ভালোবেসে আমি
প্রমাণের অভাববশত

তাহাকে দেখিনি তবু আজও ;
এক আচ্ছন্নতা খুলে শতাব্দী নিজের মুখের নির্থলতা
দেখাবার আগে নেমে ডুবে যায় দ্বিতীয় ব্যথায় ;
আদার ব্যাপারী হয়ে এইসব জাহাজের কথা

না ভেবে মানুষ কাজ করে যায় শুধু
ভয়াবহভাবে অনায়াসে।
কখনো সম্রাট শনি শেয়াল ও ভাঁড়
সে নারীর রাং দেখে হো-হো ক'রে হাসে।

দুই

মহিলা তবুও নেমে আসে মনে হয় :
(বমারের কাজ সাঙ্গ হলে

নিজের এয়ারোড্রোমে—প্রশান্তির মতো ?)
আছেও জেনেও জনতার কোলাহলে

তাহার মনের ভাব ঠিক কী রকম—
আপনারা স্থির করে নিন ;
মনে পড়ে, সেন রায় নওয়াজ কাপুর
আয়াঙ্গার আপ্তে পেরিন—

এমনই পদবী ছিল মেয়েটির কোনো একদিন ;
আজ তবু উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল ;
সম্বর মৃগের বেড় জড়ায়েছে যখন পাহাড়ে
কখনও বিকেলবেলা বিরাট ময়াল,

অথবা যখন চিল শরতের ভোরে
নীলিমার আধপথে তুলে নিয়ে গেছে
রসুয়েকে ঠোনা দিয়ে অপরূপ চিতলের পেটি—
সহসা তাকায়ে তারা উৎসারিত নারীকে দেখেছে ;

এক পৃথিবীর মৃত্যু প্রায় হয়ে গেলে
অন্য-এক পৃথিবীর নাম
অনুভব করে নিতে গিয়ে মহিলার
ক্রমেই জাগছে মনস্কাম ;

ধূমাবতী মাতঙ্গী কমলা দশ-মহাবিদ্যা নিজেদের মুখ
দেখায়ে সমাপ্ত হলে সে তার নিজের ক্লান্ত পায়ের সংকেতে
পৃথিবীকে জীবনের মতো পরিসর দিতে গিয়ে
যাদের প্রেমের তরে ছিল আড়ি পেতে

তাহারা বিশেষ কেউ কিছু নয়—
এখনও প্রাণের হিতাহিত
না জেনে এগিয়ে যেতে চেয়ে তবু পিছু হটে গিয়ে
হেসে ওঠে গৌড়জনোচিত

গরম জলের কাপে ভবেনের চায়ের দোকানে ;
উত্তেজিত হয়ে মনে করেছিল (কবিদের হাড়
যতদূর উদ্‌বোধিত হয়ে যেতে পারে—
যদিও অনেক কবি প্রেমিকের হাতে স্ফীত হয়ে গেছে রাঁঢ়) :

'উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে এসে উনিশশো পঁচিশের জীব—
সেই নারী আপনার হংসীশ্বেত রিরংসার মতন কঠিন ;
সে না হলে মহাকাল আমাদের রক্ত ছেঁকে নিয়ে
বার করে নিত না কি জনসাধারণভাবে স্যাকারিন।

আমাদের প্রাণে যেই অসন্তোষ জেগে ওঠে, সেই স্থির করে ;
পুনরায় বেদনায় আমাদের সব মুখ স্থূল হয়ে গেলে
গাধার সুদীর্ঘ কান সন্দেহের চোখে দেখে তবু
শকুনের শেয়ালের চেক্‌নাই কান কেটে ফেলে।'

নিরুক্ত। চৈত্র ১৩৪৯

সামান্য মানুষ

একজন সামান্য মানুষকে দেখা যেত রোজ
ছিপ হাতে চেয়ে আছে ; ভোরের পুকুরে
চাপেলি পায়রাচাঁদা মৌরলা আছে ;
উজ্জ্বল মাছের চেয়ে খানিকটা দূরে

আমার হৃদয় থেকে সেই মানুষের ব্যবধান ;
মনে হয়েছিল এক হেমন্তের সকালবেলায় ;
এমন হেমন্ত ঢের আমাদের গোল পৃথিবীতে
কেটে গেছে ; তবুও আবার কেটে যায়।

আমার বয়স আজ চল্লিশ বছর ;
সে আজ নেই এ পৃথিবীতে ;
অথবা কুয়াশা ফেঁসে—ওপারে তাকালে
এ রকম অঘ্রানের শীতে

সে সব রুপোলি মাছ জ্বলে ওঠে রোদে,
ঘাসের ঘ্রাণের মতো স্নিগ্ধ সব জল ;
অনেক বছর ধরে মাছের ভিতরে হেসে খেলে
তবু সে তাদের চেয়ে এক তিল অধিক সরল,

এক বীট অধিক প্রবীণ ছিল আমাদের থেকে ;
ঐখানে পায়চারি করে তার ভূত—
নদীর ভিতরে জলে তলতা বাঁশের
প্রতিবিম্বের মতন নিখুঁত ;

প্রতিটি মাঘের হাওয়া ফাল্গুনের আগে এসে দোলায় সে সব।
আমাদের পাওয়ার ও পার্টি-পোলিটিক্স
জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরেক রকম শ্রীছাঁদ।
কমিটি মিটিং ভেঙে আকাশে তাকালে মনে পড়ে—
সে আর সপ্তমী তিথি : চাঁদ।

নিরুক্ত। চৈত্র ১৩৪৯

প্রিয়দের প্রাণে

অনেক পুরোনো দিন থেকে উঠে নতুন শহরে
আমি আজ দাঁড়ালাম এসে।
চোখের পলকে তবু বোঝা গেল জনতাগভীর তিথি আজ ;
কোনো ব্যতিক্রম নেই মানুষবিশেষে।

এখানে রয়েছে ভোর—নদীর সমস্ত প্রীত জল—
কবের মনের ব্যবহারে তবু হাত বাড়াতেই
দেখা গেল স্বাভাবিক ধারণার মতন সকাল—
অথবা তোমার মতো নারী আর নেই।

তবুও রয়েছে সব নিজেদের আবিষ্ট নিয়মে
সময়ের কাছে সত্য হয়ে,
কেউ যেন নিকটেই রয়ে গেছে বলে—
এই বোধ ভোর থেকে জেগেছে হৃদয়ে।

আগাগোড়া নগরীর দিকে চেয়ে থাকি ;
অতীব জটিল বলে মনে হল প্রথম আঘাতে ;
সে-রীতির মতো এই স্থান যেন নয় ;
সেই দেশ বহুদিন সয়েছিল ধাতে

জ্ঞান মানমন্দিরের পথে ঘুরে বই হাতে নিয়ে ;
তারপর আজকের লোকসাধারণ রাতদিন চর্চা ক'রে,
মনে হয় নগরীর শিয়রের অনিরুদ্ধ উষা সূর্য চাঁদ
কালের চাকায় সব আর্ষপ্রয়োগের মতো ঘোরে।

কেমন উচ্ছিন্ন শব্দ বেজে ওঠে আকাশের থেকে ;
        মানে বুঝে নিতে গিয়ে তবুও ব্যাহত হয় মন ;
একদিন হবে তবু এরোপ্লেনের—
        আমাদেরও শ্রুতিবিশোধন।

দূর থেকে প্রপেলার সময়ের দৈনিক স্পন্দনে
        নিজের গুরুত্ব বুঝে হতে চায় আরো সাময়িক ;
রৌদ্রের ভিতরে ঐ বিচ্ছুরিত এলুমিনিয়ম
        আকাশ-মাটির মধ্যবর্তিনীর মতো যেন ঠিক।

ক্রমে শীত, স্বাভাবিক ধারণার মতো এই নীচের নগরী
        আরো কাছে প্রতিভাত হয়ে আসে চোখে ;
সকল দুরূহ বস্তু সময়ের অধীনতা মেনে
        মানুষ ও মানুষের মৃত্যু হয়ে সহজ আলোকে

দেখা দেয়—সর্বদাই মরণের অতীব প্রসার—
        জেনে কেউ অভ্যাসবশত তবু দু-চারটে জীবনের কথা
ব্যবহার করে নিতে গিয়ে দেখে অল্‌-ক্লিয়ারেরও চেয়ে বেশি
        প্রত্যাশায় ব্যাপ্ত কাল ভোলে নি প্রাণের একাগ্রতা।

আশা-নিরাশার থেকে মানুষের সংগ্রামের জন্মজন্মান্তর—
প্রিয়দের প্রাণে তবু অবিনাশ, তমোনাশ আভা নিয়ে এসে
স্বাভাবিক মনে হয় : উর ময় লণ্ডনের আলো ক্রেমলিনে
না থেমে অভিজ্ঞভাবে চলে যায় প্রিয়তর দেশে।

অলকা। ৪র্থ সংখ্যা ১৩৪৯

তার স্থির প্রেমিকের নিকট

বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই—আমি বলি না তা।
কারও লাভ আছে—সকলেরই ;—হয়তো বা ঢের।
ভাদ্রের জ্বলন্ত রৌদ্রে তবু আমি দূরতর সমুদ্রের জলে
পেয়েছি ধবল শব্দ—বাতাসতাড়িত পাখিদের।

মোমের প্রদীপ বড়ো ধীরে জ্বলে—ধীরে জ্বলে—আমার টেবিলে ;
মনীষার বইগুলো আরো স্থির—শান্ত—আরাধনাশীল ;
তবু তুমি রাস্তায় বার হলে—ঘরেরও কিনারে বসে টের পাবে না কি
দিকে দিকে নাচিতেছে কী ভীষণ উন্মত্ত সলিল।
তারই পাশে তোমারও রুধির কোনো বই—কোনো প্রদীপের মতো আর নয় ;
হয়তো শঙ্খের মতো সমুদ্রের পিতা হয়ে সৈকতের 'পরে
সেও সুর আপনার প্রতিভায়—নিসর্গের মতো :
রূঢ়—প্রিয়—প্রিয়তম চেতনার মতো তারপরে।
তাই আমি ভীষণ ভিড়ের ক্ষোভে বিস্তীর্ণ হাওয়ার স্বাদ পাই ;
না হলে মনের বনে হরিণীকে জড়ায় ময়াল :
দণ্ডী সত্যাগ্রহে আমি সে রকম জীবনের করুণ আভাস
অনুভব করি ; কোনো গ্লাসিয়ার-হিম স্তব্ধ কর্মোরেন্ট পাল—
বুঝিবে আমার কথা ; জীবনের বিদ্যুৎ-কম্পাস্ অবসানে
তুষার-ধূসর ঘুম খাবে তারা মেরুসমুদ্রের মতো অনন্ত ব্যাদানে।

কবিতা। পৌষ ১৩৪৫

অবরোধ

বহুদিন আমার এ হৃদয়কে অবরোধ ক'রে রয়ে গেছে ;
হেমন্তের স্তব্ধতায় পুনরায় করে অধিকার।

কোথায় বিদেশে যেন
এক তিল অধিক প্রবীণ এক নীলিমার পারে
তাহাকে দেখি নি আমি ভালো করে—তবু মহিলার
মনন-নিবিড় প্রাণ কখন আমার চোখঠারে
চোখ রেখে বলে গিয়েছিল :
‘সময়ের গ্রন্থি সনাতন, তবু সময়ও তা বেঁধে দিতে পারে ?’

বিবর্ণ জড়িত এক ঘর ;
কী করে প্রাসাদ তাকে বলি আমি ?
অনেক ফাটল নোনা আরসোলা কৃকলাস দেয়ালের ’পর
ফ্রেমের ভিতরে ছবি খেয়ে ফেলে অনুরাধাপুর—ইলোরার ;
মাতিসের—সেজানের—পিকাসোর ;
অথবা কিসের ছবি ? কিসের ছবির হাড়গোড় ?

কেবল আধেক ছায়া—
ছায়ায় আশ্চর্য সব বৃত্তের পরিধি রয়ে গেছে।
কেউ দেখে—কেউ তাহা দেখে নাকো—আমি দেখি নাই।
তবু তার অবলঙ কালো টেবিলের পাশে আধাআধি চাঁদনির রাতে
মনে পড়ে আমিও বসেছি একদিন।
কোথাকার মহিলা সে ? কবেকার ?—ভারতী নর্ডিক গ্রীক মুশ্লিম মার্কিন ?
অথবা সময় তাকে শনাক্ত করে না আর ;
সর্বদাই তাকে ঘিরে আধোঅন্ধকার ;
চেয়ে থাকি—তবুও সে পৃথিবীর ভাষা ছেড়ে পরিভাষাহীন।
মনে পড়ে সেখানে উঠোনে এক দেবদারু গাছ ছিল।
তারপর সূর্যালোকে ফিরে এসে মনে হয় এইসব দেবদারু নয়।
সেইখানে তম্বুরার শব্দ ছিল।
পৃথিবীতে দুন্দুভি বেজে ওঠে—বেজে ওঠে ; সুর তান লয়

গান আছে পৃথিবীতে জানি, তবু গানের হৃদয় নেই।
একদিন রাত্রি এসে সকলের ঘুমের ভিতরে
আমাকে একাকী জেনে ডেকে নিল—অন্য এক ব্যবহারে
মাইলটাক দূরে পুরোপুরি।
সবই আছে—খুব কাছে ; গোলকধাঁধার পথে ঘুরি
তবুও অনন্ত মাইল তারপর—কোথাও কিছুই নেই বলে।
অনেক আগের কথা এই সব—এই
সময় বৃত্তের মতো গোল ভেবে চুরুটের আস্ফোটে জানুহীন, মলিন সমাজ
সেই দিকে অগ্রসর হয় রোজ—একদিন সেই দেশ পাবে।
সেই নারী নেই আর ভুলে তারা শতাব্দীর অন্ধকার ব্যসনে ফুরাবে।

চতুরঙ্গ। আশ্বিন ১৩৪৮

পৃথিবীর রৌদ্রে

কেমন আশার মতো মনে হয় রোদের পৃথিবী—
যত দূর মানুষের ছায়া গিয়ে পড়ে
মৃত্যু আর নিরুৎসাহের থেকে ভয় আর নেই
এ রকম ভোরের ভিতরে।

যত দূর মানুষের চোখ চলে যায়
উর ময় হরপ্পা আথেন্‌স্ রোম কলকাতা রোদের সাগরে
অগণন মানুষের শরীরের ভিতরে বন্দিনী
মানবিকতার মতো : তবুও তো উৎসাহিত করে ?

সে অনেক লোক লক্ষ্য অসম্ভবভাবে মরে গেছে।
ঢের আলোড়িত লোক বেঁচে আছে তবু।

আরও স্মরণীয় উপলব্ধি জন্মাতেছে।
যা হবে তা আজকের নরনারীদের নিয়ে হবে।
যা হল তা কালকের মৃতদের নিয়ে হয়ে গেছে।

*

কঠিন অমেয় দিন রাত এই সব।
চারি দিকে থেকে থেকে মানব ও অমানবিকতা
সময়সীমার ঢেউয়ে অধোমুখ হয়ে
চেয়ে দেখে শুধু মরণের
কেমন অপরিমেয় ছটা।
তবু এই পৃথিবীর জীবনই গভীর।
এক—দুই—শত বছরের
পাথর নুড়ির পথে স্রোতের মতন
কোথায় যে চলে গেছে কোন্ সব মানুষের দেহ,
মানুষের মন।
আজ ভোরে সূর্যালোকিত জল তবু
ভাবনালোকিত সব মানুষের ক্রম—
তোমরা শতকী নও ;
তোমরা তো উনিশশো অনন্তের মতন সুগম।
আলো নেই? নরনারী কলরোল আলোর আবহ
প্রকৃতির? মানুষেরও ; অনাদির ইতিহাসসহ।

প্রয়াণপটভূমি

বিকেলবেলার আলো ক্রমে নিভেছে আকাশ থেকে।
মেঘের শরীর বিভেদ করে বর্শাফলার মতো
সূর্যকিরণ উঠে গেছে নেমে গেছে দিকে-দিগন্তরে ;
সকলই চুপ কী এক নিবিড় প্রণয়বশত।

কমলা হলুদ রঙের আলো—আকাশ নদী নগরী পৃথিবীকে
সূর্য থেকে লুপ্ত হয়ে অন্ধকারে ডুবে যাবার আগে
ধীরে ধীরে ডুবিয়ে দেয় ;—মানবহৃদয়, দিন কি শুধু গেল ?
শতাব্দী কি চলে গেল !—হেমন্তের এই আঁধারের হিম লাগে ;
চেনা জানা প্রেম প্রতীতি প্রতিভা সাধ নৈরাজ্য ভয় ভুল
সব-কিছুকেই ঢেকে ফেলে অধিকতর প্রয়োজনের দেশে
মানবকে সে নিয়ে গিয়ে শান্ত—আরো শান্ত হতে যদি
অনুজ্ঞা দেয় জনমানবসভ্যতার এই ভীষণ নিরুদ্দেশে—
আজকে যখন সান্ত্বনা কম, নিরাশা ঢের, চেতনা কালজয়ী
হতে গিয়ে প্রতি পলেই আঘাত পেয়ে অমেয় কথা ভাবে—
আজকে যদি দীন প্রকৃতি দাঁড়ায় যতি যবনিকার মতো
শান্তি দিতে মৃত্যু দিতে—জানি তবু মানবতা নিজের স্বভাবে
কালকে ভোরের রক্ত প্রয়াস সূর্যসমাজ রাষ্ট্রে উঠে গেছে ;
ইতিহাসের ব্যাপক অবসাদের সময় এখন, তবু, নরনারীর ভিড়
নব নবীন প্রাক্‌সাধনার ;—নিজের মনের সচল পৃথিবীকে
ক্রেমলিনে লণ্ডনে দেখে তবুও তারা আরো নতুন অমল পৃথিবীর।

সূর্য রাত্রি নক্ষত্র

এইখানে মাইল মাইল ঘাস ও শালিক রৌদ্র ছাড়া কিছু নেই।
সূর্যালোকিত হয়ে শরীর ফসল ভালোবাসি :
আমারই ফসল সব—মীন কন্যা এসে ফলালেই
বৃশ্চিক কর্কট তুলা মেষ সিংহ রাশি
বলয়িত হয়ে উঠে আমাকে সূর্যের মতো ঘিরে
নিরবধি কাল নীলাকাশ হয়ে মিলে গেছে আমার শরীরে।
এই নদী নীড় নারী কেউ নয়—মানুষের প্রাণের ভিতরে
এ পৃথিবী তবুও তো সব।
অধিক গভীরভাবে মানবজীবন ভালো হলে

অধিক নিবিড়তরভাবে প্রকৃতিকে অনুভব
করা যায়। কিছু নয় অন্তহীন ময়দান অন্ধকার রাত্রি নক্ষত্র—
তারপর কেউ তাকে না চাইতে নবীন করুণ রৌদ্রে ভোর—
অভাবে সমাজ নষ্ট না হলে মানুষ এই সবে
হয়ে যেত এক তিল অধিক বিভোর।

জয়জয়ন্তীর সূর্য

কোনো দিন নগরীর শীতের প্রথম কুয়াশায়
কোনো দিন হেমন্তের শালিখের রঙে ম্লান মাঠের বিকেলে
হয়তো বা চৈত্রের বাতাসে
চিন্তার সংবেগ এসে মানুষের প্রাণে হাত রাখে ;
তাহাকে থামায়ে রাখে।
সে চিন্তার প্রাণ
সাম্রাজ্যের উত্থানের পতনের বিবর্ণ সন্তান
হয়েও যা কিছু শুভ্র রয়ে গেছে আজ—
সেই সোম-সুপর্ণের থেকে এই সূর্যের আকাশে—
সে রকম জীবনের উত্তরাধিকার নিয়ে আসে।
কোথাও রৌদ্রের নাম—
অন্নের নারীর নাম ভালো করে বুঝে নিতে গেলে
নিয়মের নিগড়ের হাত এসে ফেঁদে
মানুষকে যে আবেগে যত দিন বেঁধে
রেখে দেয়,
যত দিন আকাশকে জীবনের নীল মরুভূমি মনে হয়,
যত দিন শূন্যতার ষোলো কলা পূর্ণ হয়ে—তবে
বন্দরে সৌধের ঊর্ধ্বে চাঁদের পরিধি মনে হবে—
ততদিন পৃথিবীর কবি আমি—অকবির অবলেশ আমি
ভয় পেয়ে দেখি—সূর্য ওঠে ;
ভয় পেয়ে দেখি—অস্তগামী।

যে সমাজ নেই তবু রয়ে গেছে, সেখানে কায়েমী
মরুকে নদীর মতো মনে ভেবে অনুপম সাঁকো
আজীবন গড়ে তবু আমাদের প্রাণে
প্রীতি নেই—প্রেম আসে নাকো।
কোথাও নিয়তিহীন নিত্য নরনারীদের খুঁজে
ইতিহাস হয়তো ক্রান্তির শব্দ শোনে ; পিছে টানে ;
অনন্ত গণনাকাল সৃষ্টি করে চলে ;
কেবলই ব্যক্তির মৃত্যু গণনাবিহীন হয়ে পড়ে থাকে জেনে নিয়ে—তবে
তাহাদের দলে ভিড়ে কিছু নেই—তবু
সেই মহাবাহিনীর মতো হতে হবে ?

সংকল্পের সকল সময়
শূন্য মনে হয়।
তবুও তো ভোর আসে—হঠাৎ উৎসের মতো ; আন্তরিকভাবে ;
জীবনধারণ ছেপে নয়—তবু
জীবনের মতন প্রভাবে ;
মরুর বালির চেয়ে মিল মনে হয়
বালিছুট সূর্যের বিস্ময়।
মহীয়ান কিছু এই শতাব্দীতে আছে—আরো এসে যেতে পারে :
মহান সাগর গ্রাম নগর নিরুপম নদী ;—
যদিও কাহারও প্রাণে আজ রাতে স্বাভাবিক মানুষের মতো ঘুম নেই,
তবু এই দ্বীপ, দেশ, ভয়, অভিসন্ধানের অন্ধকারে ঘুরে
সসাগরা পৃথিবীর আজ এই মরণের কালিমাকে ক্ষমা করা যাবে ;
অনুভব করা যাবে স্মরণের পথ ধরে চ'লে :
কাজ ক'রে ভুল হলে, রক্ত হলে মানুষের অপরাধ ম্যামথের নয়
কত শত রূপান্তর ভেঙে জয়জয়ন্তীর সূর্য পেতে হলে।

দৈনিক কৃষক। শারদীয় ১৩৫২

হেমন্তরাতে

শীতের ঘুমের থেকে এখন বিদায় নিয়ে বাহিরের অন্ধকার রাতে
হেমন্তলক্ষ্মীর সব শেষ অনিকেত আবছায়া তারাদের
সমাবেশ থেকে চোখ নামায়ে একটি পাখির ঘুম কাছে
পাখিনীর বুকে ডুবে আছে—
চেয়ে দেখি ; তাদের উপরে এই অবিরল কালো পৃথিবীর
আলো আর ছায়া খেলে—মৃত্যু আর প্রেম আর নীড়।
এ ছাড়া অধিক কোনো নিশ্চয়তা নির্জনতা জীবনের পথে
আমাদের মানবীয় ইতিহাসচেতনায়ও নেই—(তবু আছে।)
এমনই অঘ্রানরাতে মনে পড়ে—কত সব ধূসর বাড়ির
আমলকীপল্লবের ফাঁক দিয়ে নক্ষত্রের ভিড়
পৃথিবীর তীরে তীরে ধূসরিম মহিলার নিকটে সন্নত
দাঁড়ায়ে রয়েছে কত মানবের বাষ্পাকুল প্রতীকের মতো—

দেখা যেত ; এক-আধ মুহূর্ত শুধু ;—সে-অভিনিবেশ ভেঙে ফেলে
সময়ের সমুদ্রের রক্ত ঘ্রাণ পাওয়া গেল ; ভীতিশব্দ রীতিশব্দ মুক্তিশব্দ এসে
আরো ঢের পটভূমিকার দিকে-দিগন্তরে ক্রমে
মানবকে ডেকে নিয়ে চলে গেল প্রেমিকের মতো সসম্ভ্রমে।
তবুও সে প্রেম নয়, সুধা নয়—মানুষের ক্লান্ত অন্তহীন
ইতিহাস-আকূতির প্রবীণতা ক্রমায়াত ক'রে সে বিলীন ?

আজ এই শতাব্দীতে সকলেরই জীবনের হৈমন্ত সৈকতে
বালির উপরে ভেসে আমাদের চিন্তা কাজ সংকল্পের তরঙ্গকঙ্কাল
দ্বীপসমুদ্রের মতো অস্পষ্ট বিলাপ ক'রে তোমাকে আমাকে
অন্তহীন দ্বীপহীনতার দিকে অন্ধকারে ডাকে।

কেবলই কল্লোল আলো—জ্ঞান প্রেম পূর্ণতর মানবহৃদয়
সনাতন মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে—তবু—উনিশশো অনন্তের জয়

হয়ে যেতে পারে, নারি, আমাদের শতাব্দীর দীর্ঘতর চেতনার কাছে
আমরা সজ্ঞান হয়ে বেঁচে থেকে বড়ো সময়ের
সাগরের কূলে ফিরে আমাদের পৃথিবীকে যদি
প্রিয়তর মনে করি প্রিয়তম মৃত্যু অবধি ;
সকল আলোর কাজ বিষণ্ন জেনেও তবুও কাজ ক'রে—গানে
গেয়ে লোকসাধারণ করে দিতে পারি যদি আলোকের মানে।

চতুরঙ্গ। আশ্বিন ১৩৫৩

নারীসবিতা

আমরা যদি রাতের কপাট খুলে ফেলে এই পৃথিবীর নীল সাগরের বারে
প্রেমের শরীর চিনে নিতাম চারি দিকের রোদের হাহাকারে—
হাওয়ায় তুমি ভেসে যেতে দখিন দিকে—যেইখানেতে যমের দুয়ার আছে ;
অভিচারী বাতাসে বুক লবণ-বিলুণ্ঠিত হলে আবার আমার কাছে
উতরে এসে জানিয়ে দিতে পাখিদেরও—শাদা পাখিদেরও স্খলন আছে ;
আমরা যদি রাতের কপাট খুলে দিতাম নীল সাগরের দিকে,
বিষণ্নতার মুখের কারুকার্যে বেলা হারিয়ে যেত জ্যোতির মোজেয়িকে।
দিনের উজান রোদের ঢলে যতটা দূর আকাশ দেখা যায়
তোমার পালক শাদা আরো শাদা হয়ে অমেয় নীলিমায়
ঐ পৃথিবীর সাটিন-পরা দীর্ঘগড়ন নারীর মতো—তবুও তো এক পাখি ;
সকল অলাত ইতিহাসের হৃদয় ভেঙে বৃহৎ সবিতা কি !
যা হয়েছে যা হতেছে সকল পরখ এইবারেতে নীল সাগরের নীড়ে
গুঁড়িয়ে সূর্য নারী হল, অকূলপাথার পাখির শরীরে।

গভীর রৌদ্রে সীমান্তের এই ঢেউ—অতিবেল সাগর, নারী, শাদা
হতে হতে নীলাভ হয় ;—প্রেমের বিসার, মহীয়সী, ঠিক এ রকম আধা
নীলের মতো, জ্যোতির মতো। মানব ইতিহাসের আধেক নিয়ন্ত্রিত পথে
আমরা বিজোড় ; তাই তো দুধের-বরন-শাদা পাখির জগতে
অন্ধকারের কপাট খুলে শুকতারাকে চোখে দেখার চেয়ে
উড়ে গেছি সৌরকরের সিঁড়ির বহিরাশ্রয়িতা পেয়ে।

অনেক নিমেষ অই পৃথিবীর কাঁটা গোলাপ শিশিরকণা মৃতের কথা ভেবে
তবু আরো অনঙ্ককাল বসে থাকা যেত—তবু সময় কি তা দেবে।
সময় শুধু বালির ঘড়ি সচল ক'রে বেবিলনের দুপুরবেলার পরে
হৃদয় নিয়ে শিপ্রা নদীর বিকেলবেলা হিরণ সূর্যকরে
খেলা ক'রে না ফুরোতেই কলকাতা রোম বৃহৎ নতুন নামের বিনিপাতে
উড়ে যেতে বলে আমায় তোমার প্রাণের নীল সাগরের সাথে।

না হলে এই পৃথিবীতে আলোর মুখে অপেক্ষাতুর বসে থাকা যেত
পাতা ঝরার দিকে চেয়ে অগণ্য দিন—কীটে মৃণালকাঁটায় অনিকেত
শাদা রঙের সরোজিনীর মুখের দিকে চেয়ে,
কী এক গভীর বসে থাকার বিষণ্নতার কিরণে ক্ষয় পেয়ে,
নারি, তোমায় ভাবা যেত।—বেবিলনে নিনেভে নতুন কলকাতাতে কবে
ক্রান্তি, সাগর, সূর্য জ্বলে অনাথ ইতিহাসের কলরবে।

উত্তরসামরিকী

আকাশের থেকে আলো নিভে যায় বলে মনে হয়।
আবার একটি দিন আমাদের মৃগতৃষ্ণার মতো পৃথিবীতে
শেষ হয়ে গেল তবে—শহরের ট্রাম

উত্তেজিত হয়ে উঠে সহজেই ভবিতব্যতার
যাত্রীদের বুকে নিয়ে কোন্-এক নিরুদ্দেশ কুড়োতে চলেছে।
এই দিকে পায়দলদের ভিড়—অই দিকে টর্চের মশালে বারবার
যে যার নিজের নামে সকলের চেয়ে আগে নিজের নিকটে
পরিচিত—ব্যক্তির মতন নিঃসহায় ;
জনতাকে অবিকল অমঙ্গল সমুদ্রের মতো মনে ক'রে
যে যার নিজের কাছে নিবারিত দ্বীপের মতন
হয়ে পড়ে অভিমানে—ক্ষমাহীন কঠিন আবেগে।

সে মুহূর্ত কেটে যায় ; ভালোবাসা চায় না কি মানুষ নিজের
পৃথিবীর মানুষের ?—শহরে রাত্রির পথে হেঁটে যেতে যেতে
কোথাও ট্রাফিক থেকে উৎসারিত অবিরল ফাঁস
নাগপাশ খুলে ফেলে কিছুক্ষণ থেমে থেমে এ রকম কথা
মনে হয় অনেকেরই—
আত্মসমাহিতিকূট ঘুমায়ে গিয়েছে হৃদয়ের।

তবু কোনো পথ নেই এখনও অনেক দিন, নেই।
একটি বিরাট যুদ্ধ শেষ হয়ে নিভে গেছে প্রায়।
আমাদের আধো-চেনা কোনো-এক পুরোনো পৃথিবী
নেই আর। আমাদের মনে চোখে প্রচারিত নতুন পৃথিবী
আসে নি তো।
এই দুই দিগন্তের থেকে সময়ের
তাড়া খেয়ে পলাতক অনেক পুরুষ-নারী পথে
ফুটপাতে মাঠে জীপে ব্যারাকে হোটেলে অলিগলির উত্তেজে
কমিটি-মিটিঙে ক্লবে অন্ধকারে অনর্গল ইচ্ছার ঔরসে
সঞ্চারিত উৎসবের খোঁজে আজও সূর্যের বদলে
দ্বিতীয় সূর্যকে বুঝি শুধু অন্ন, শক্তি, অর্থ, শুধু মানবীর

মাংসের নিকটে এসে ভিক্ষা করে। সারাদিন—অনেক গভীর
রাতের নক্ষত্র ক্লান্ত হয়ে থাকে তাদের বিলোল কাকলিতে।
সকল নেশন আজ এই এক বিলোড়িত মহা-নেশনের
কুয়াশায় মুখ ঢেকে যে যার দ্বীপের কাছে তবু
সত্য থেকে—শতাব্দীর রাক্ষসী বেলায়
দ্বৈপ-আত্মা-অন্ধকার এক-একটি বিমুখ নেশন।

শীত আর বীতশোক পৃথিবীর মাঝখানে আজ
দাঁড়ায়ে এ জীবনের কতকগুলো পরিচিত সত্ত্বশূন্য কথা—
যেমন নারীর প্রেম, নদীর জলের বীথি, সারসের আশ্চর্য ক্রেংকার
নীলিমায়, দীনতায় যেই জ্ঞান, জ্ঞানের ভিতর থেকে যেই
ভালোবাসা ; মানুষের কাছে মানুষের স্বাভাবিক
দাবির আশ্চর্য বিশুদ্ধতা ; যুগের নিকটে ঋণ, মনবিনিময়,
এবং নতুন জননীতিকের কথা—আরো স্মরণীয় কাজ
সকলের সুস্থতার—হৃদয়ের কিরণের দাবি করে ; আর অদূরের
বিজ্ঞানের আলাদা সজীব গভীরতা ;
তেমন বিজ্ঞান যাহা নিজের প্রতিভা দিয়ে জেনে সেবকের
হাত দিব্য আলোকিত করে দেয়—সকল সাধের
কারণ-কর্দম-ফেনা প্রিয়তর অভিষেকে স্নিগ্ধ ক'রে দিতে—
এই সব অনুভব করে নিয়ে সপ্রতিভ হতে হবে না কি।
রাত্রির চলার পথে এক তিল অধিক নবীন
সম্মুখীন—অবহিত আলোকবর্ষের নক্ষত্রেরা
জেগে আছে। কথা ভেবে আমাদের বহিরাশ্রয়িতা
মানবস্বভাবস্পর্শে আরো ঋত—অন্তর্দীপ্ত হয়।

দৈনিক বসুমতী। শারদীয় [?]

বিস্ময়

কখনও বা মৃত জনমানবের দেশে
দেখা যাবে বসেছে কৃষাণ :
মৃত্তিকা-ধূসর মাথা
আপ্ত বিশ্বাসে চক্ষুষ্মান।

কখনও ফুরুনো ক্ষেতে দাঁড়ায়েছে
সজারুর গর্তের কাছে ;
সেও যেন বাবলার কাণ্ড এক
অঘ্রানের পৃথিবীর কাছে।

সহসা দেখেছি তারে দিনশেষে :
মুখে তার সব প্রশ্ন সম্পূর্ণ নিহত ;
চাঁদের ও-পিঠ থেকে নেমেছে এ পৃথিবীর
অন্ধকার ন্যুব্জতার মতো।

সে যেন প্রস্তুরখণ্ড—স্থির—
নড়িতেছে পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তের সাথে ;
পুরাতন ছাতকুড়ো ঘ্রাণ দিয়ে
নবীন মাটির ঢেউ মাড়াতে মাড়াতে।

তুমি কি প্রভাতে জাগ ?
সন্ধ্যায় ফিরে যাও ঘরে ?
আস্তীর্ণ শতাব্দী বহে যায় নি কি
তোমার মৃত্তিকাঘন মাথার উপরে ?

কী তারা গিয়েছে দিয়ে—

নষ্ট ধান ? উজ্জীবিত ধান ?
সুষুম্না নাড়ীর গতি—অজ্ঞাত ;
তবু আমি আরো অজ্ঞান

যখন দেখেছি চেয়ে কৃষাণকে
বিশীর্ণ পাগড়ি বেঁধে অস্তাক্ত আলোকে
গঙ্গাফড়িঙের মতো উদ্বাহু
মুকুর উঠেছে জেগে চোখে ;

যেন এই মৃত্তিকার গর্ভ থেকে
অবিরাম চিন্তারাশি—নব নব নগরীর আবাসের থাম
জেগে ওঠে একবার ;
আর একবার ঐ হৃদয়ের হিম প্রাণায়াম।

সময়ঘড়ির কাছে রয়েছে অক্লান্তি শুধু :
অবিরল গ্যাসে আলো, জোনাকীতে আলো ;
কর্কট, মিথুন, মীন, কন্যা, তুলা ঘুরিতেছে ;—
আমাদের অমায়িক ক্ষুধা তবে কোথায় দাঁড়ালো।

কবিতা। পৌষ ১৩৪৬

গভীর এরিয়েলে

ডুবল সূর্য ; অন্ধকারের অন্তরালে হারিয়ে গেছে দেশ।
এমনতর আঁধার ভালো আজকে কঠিন রুক্ষ শতাব্দীতে।
রক্ত ব্যথা ধনিকতার উষ্ণতা এই নীরব স্নিগ্ধ অন্ধকারের শীতে
নক্ষত্রদের স্থির সমাসীন পরিষদের থেকে উপদেশ ;

পায় না নব ; তবুও উত্তেজনাও যেন পায় না এখন আর ;
চার দিকেতে সার্থবাহের ফ্যাক্টরি ব্যাঙ্ক মিনার জাহাজ—সব,
ইন্দ্রলোকের অপ্সরীদের ঘাটা,
গ্লাসিয়ারের যুগের মতন আঁধারে নীরব।

অন্ধকারের এ হাত আমি ভালোবাসি ; চেনা নারীর মতো
অনেক দিনের অদর্শনার পরে আবার হাতের কাছে এসে
জ্ঞানের আলো দিনকে দিয়ে কী অভিনিবেশে
প্রেমের আলো প্রেমকে দিতে এসেছে সময়মতো ;
হাত দুখানা ক্ষমাসফল ; গণনাহীন ব্যক্তিগত গ্লানি
ইতিহাসের গোলকধাঁধায় বন্দী মরুভূমি—
সবের পরে মৃত্যুতে নয়—নীরবতায় আত্মবিচারের
আঘাত দেবার ছলে কি রাত এমন স্নিগ্ধ তুমি।
আজকে এখন আঁধারে অনেক মৃত ঘুমিয়ে আছে।
অনেক জীবিতেরা কঠিন সাঁকো বেয়ে মৃত্যুনদীর দিকে
জলের ভিতর নামছে—ব্যবহৃত পৃথিবীটিকে
সন্ততিদের চেয়েও বেশি দৈব আঁধার আকাশবাণীর কাছে
ছেড়ে দিয়ে—স্থির করে যায় ইতিহাসের গতি।
যারা গেছে যাচ্ছে—রাতে যাব সকলই তবে।
আজকে এ রাত তোমার থেকে আমায় দূরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে
তবুও তোমার চোখে আত্মা আত্মীয় এক রাত্রি হয়ে রবে।

তোমায় ভালোবেসে আমি পৃথিবীতে আজকে প্রেমিক, ভাবি।
তুমি তোমার নিজের জীবন ভালোবাস ; কথা
এইখানেতেই ফুরিয়ে গেছে। শুনেছি তোমার আত্মলোলুপতা
প্রেমের চেয়ে প্রাণের বৃহৎ কাহিনীদের কাছে গিয়ে দাবি
জানিয়ে নিদয় খৎ দেখিয়ে আদায় করে নেয়

ব্যাপক জীবন শোষণ ক'রে যে-সব নতুন সচল স্বর্গ মেলে ;
যদিও আজ রাষ্ট্র সমাজ অতীত অনাগতের কাছে তমসুকে বাঁধা,
প্রাণাকাশে বচনাতীত রাত্রি আসে তবুও তোমার গভীর এরিয়েলে।

দৈনিক বসুমতী। শারদীয় ১৩৫৬

ইতিহাসযান

সেই শৈশবের থেকে এ-সব আকাশ মাঠ রৌদ্র দেখেছি ;
এইসব নক্ষত্র দেখেছি।
বিস্ময়ের চোখে চেয়ে কতবার দেখা গেছে মানুষের বাড়ি
রোদের ভিতরে যেন সমুদ্রের পারে পাখিদের
বিষণ্ন শক্তির মতো আয়োজনে নির্মিত হতেছে ;
কোলাহলে—কেমন নিশিত উৎসবে গড়ে ওঠে।
একদিন শূন্যতায় স্তব্ধতায় ফিরে দেখি তারা
কেউ আর নেই।
পিতৃপুরুষেরা সব নিজ স্বার্থ ছেড়ে দিয়ে অতীতের দিকে
সরে যায়—পুরোনো গাছের সাথে সহমর্মী জিনিসের মতো
হেমন্তের রৌদ্রে-দিনে-অন্ধকারে শেষবার দাঁড়ায়ে তবুও
কখনও শীতের রাতে যখন বেড়েছে খুব শীত
দেখেছি পিপুল গাছ
আর পিতাদের ঢেউ
আর সব জিনিস : অতীত।
তারপর ঢের দিন চলে গেলে আবার জীবনোৎসব
যৌনমত্ততার চেয়ে ঢের মহীয়ান, অনেক করুণ।
তবুও আবার মৃত্যু।—তারপর একদিন মউমাছিদের
অনুরণনের বলে রৌদ্র বিচ্ছুরিত হয়ে গেলে নীল

আকাশ নিজের কণ্ঠে কেমন নিঃসৃত হয়ে ওঠে ;—হেমন্তের
অপরাহ্ণে পৃথিবী মাঠের দিকে সহসা তাকালে
কোথাও শণের বনে—হলুদ রঙের খড়ে—চাষার আঙুলে
গালে—কেমন নিমীল সোনা পশ্চিমের
অদৃশ্য সূর্যের থেকে চুপে নেমে আসে ;
প্রকৃতি ও পাখির শরীর ছুঁয়ে মৃতোপম মানুষের হাড়ে
কী যেন কিসের সৌরব্যবহারে এসে লেগে থাকে।
অথবা কখনও সূর্য—মনে পড়ে—অবহিত হয়ে
নীলিমার মাঝপথে এসে থেমে রয়ে গেছে—বড়ো
গোল—রাহুর আভাস নেই—এমনই পবিত্র নিরুদ্‌বেল।
এই সব বিকেলের হেমন্তের সূর্যছবি—তবু
দেখাবার মতো আজ কোনো দিকে কেউ
নেই আর, অনেকেই মাটির শয়ানে ফুরাতেছে।
মানুষেরা এই সব পথে এসে চলে গেছে—ফিরে
ফিরে আসে ;—তাদের পায়ের রেখায় পথ
কাটে তারা, হাল ধরে, বীজ বোনে, ধান
সমুজ্জ্বল কী অভিনিবেশে সোনা হয়ে ওঠে—দেখে ;
সমস্ত দিনের আঁচ শেষ হলে সমস্ত রাতের
অগণন নক্ষত্রেও ঘুমোবার জুড়োবার মতো
কিছু নেই ;—হাতুড়ি করাত দাঁত নেহাই তুর্‌পুন্‌
পিতাদের হাত থেকে ফিরেফির্‌তির মতো অন্তহীন
সন্ততির-সন্ততির হাতে
কাজ ক'রে চলে গেছে কত দিন।
অথবা এদের চেয়ে আরেক রকম ছিল কেউ-কেউ :
ছোটো বা মাঝারি মধ্যবিত্তদের ভিড়—
সেইখানে বই পড়া হত কিছু—লেখা হত ;
ভয়াবহ অন্ধকারে সরু সলতের

রেড়ির আলোর মতো কী যেন কেমন এক আশাবাদ ছিল
তাহাদের চোখে মুখে মনের নিবেশে বিমনস্কতায় ;
সংসারে সমাজ দেশে প্রত্যন্তেও পরাজিত হলে
ইহাদের মনে হত দীনতা জয়ের চেয়েও বড়ো ;
অথবা বিজয় পরাজয় সব কোনো-এক পলিত চাঁদের
এপিঠ-ওপিঠ শুধু ;—সাধনা মৃত্যুর পরে লোকসফলতা
দিয়ে দেবে ; পৃথিবীতে হেরে গেলে কোনো ক্ষোভ নেই।

*

মাঝে-মাঝে প্রান্তরের জ্যোৎস্নায় তারা সব জড়ো হয়ে যেত—
কোথাও সুন্দর প্রেতসত্য আছে জেনে তবু পৃথিবীর মাটির কাঁকালে
কেমন নিবিড়ভাবে বিচলিত হয়ে উঠে, আহা।
সেখানে স্থবির যুবা কোনো-এক তন্বী তরুণীর
নিজের জিনিস হতে স্বীকার পেয়েছে ভাঙা চাঁদে
অর্ধ সত্যে অর্ধ নৃত্যে আধেক মৃত্যুর অন্ধকারে ;
অনেক তরুণী যুবা—যৌবরাজ্য যাহাদের শেষ
হয়ে গেছে—তারাও সেখানে অগণন
চৈত্রের কিরণে কিংবা হেমন্তের আরো
অনবলুণ্ঠিত ফিকে মৃগতৃষ্ণিকার
মতন জ্যোৎস্নায় এসে গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে প্রান্তরের পথে
চাঁদকে নিখিল করে দিয়ে তবু পরিমেয় কলঙ্কে নিবিড়
করে দিতে চেয়েছিল,—মনে মনে—মুখে নয়—দেহে
নয় ; বাংলার মানসসাধনশীত শরীরের চেয়ে আরো বেশি
জয়ী হয়ে শুক্ল রাতে গ্রামীণ উৎসব
শেষ করে দিতে গিয়ে শরীরের কবলে তো তবুও ডুবেছে বারবার
অপরাধী ভীরুদের মতো প্রাণে।
তারা সব মৃত আজ।
তাহাদের সন্ততির সন্ততিরা অপরাধী ভীরুদের মতন জীবিত।

‘ঢের ছবি দেখা হল—ঢের দিন কেটে গেল—ঢের অভিজ্ঞতা
জীবনে জড়িত হয়ে গেল, তবু, হাতে খননের
অস্ত্র নেই—মনে হয়—চারি দিকে ঢিবি-দেয়ালের
নিরেট নিঃসক্ত অন্ধকার’—ব’লে যেন কেউ যেন কথা বলে।
হয়তো সে বাংলার জাতীয় জীবন।
সত্যের নিজের রূপ তবুও সবের চেয়ে নিকট জিনিস
সকলের ; অধিগত হলে প্রাণ জানালার ফাঁক দিয়ে চোখের মতন
অনিমেষ হয়ে থাকে নক্ষত্রের আকাশে তাকালে।
আমাদের প্রবীণেরা আমাদের আচ্ছন্নতা দিয়ে গেছে ?
আমাদের মনীষীরা আমাদের অর্ধসত্য বলে গেছে
অর্ধমিথ্যার ? জীবন তবুও অবিস্মরণীয় সততাকে
চায় ; তবু ভয়—হয়তো বা চাওয়ার দীনতা ছাড়া আর কিছু নেই।

ঢের ছবি দেখা হল—ঢের দিন কেটে গেল—ঢের অভিজ্ঞতা
জীবনে জড়িত হয়ে গেল, তবু, নক্ষত্রের রাতের মতন
সফলতা মানুষের দূরবীনে রয়ে গেছে,—জ্যোতির্গ্রন্থে ;
জীবনের জন্যে আজও নেই।
অনেক মানুষী খেলা দেখা হল, বই পড়া সাঙ্গ হল—তবু
কে বা কাকে জ্ঞান দেবে—জ্ঞান বড়ো দূর পৃথিবীর
রুক্ষ গল্পে ; আমাদের জন্যে দূর—দূরতর আজ।
সময়ের ব্যাপ্তি যেই জ্ঞান আনে আমাদের প্রাণে
তা তো নেই ;—স্থবিরতা আছে—জরা আছে।
চারি দিক থেকে ঘিরে কেবলই বিচিত্র ভয় ক্লান্তি অবসাদ
রয়ে গেছে। নিজেকে কেবলই আত্মক্রীড় করি ; নীড়
গড়ি। নীড় ভেঙে অন্ধকারে এই যৌন যৌথ মন্ত্রণার
মালিন্য এড়ায়ে উৎক্রান্ত হতে ভয়

পাই। সিন্ধুশব্দ বায়ুশব্দ রৌদ্রশব্দ রক্তশব্দ মৃত্যুশব্দ এসে
ভয়াবহ ডাইনীর মতো নাচে—ভয় পাই—গুহায় লুকাই ;
লীন হতে চাই—লীন—ব্রহ্মশব্দে লীন হয়ে যেতে
চাই। আমাদের দু হাজার বছরের জ্ঞান এ-রকম।
নচিকেতা ধর্মধনে উপবাসী হয়ে গেলে যম
প্রীত হয়। তবুও ব্রহ্মে লীন হওয়াও কঠিন।
আমরা এখনও লুপ্ত হই নি তো।

এখনও পৃথিবী সূর্যে সুখী হয়ে রৌদ্রে অন্ধকারে
ঘুরে যায়। থামালেই ভালো হত—হয়তো বা ;
তবুও সকলই উৎস গতি যদি—রৌদ্রশুভ্র সিন্ধুর উৎসবে
পাখির প্রমাথী দীপ্তি সাগরের সূর্যের স্পর্শে মানুষের
হৃদয়ে প্রতীক ব'লে ধরা দেয় জ্যোতির পথের থেকে যদি,
তাহলে যে আলো অর্ঘ্য ইতিহাসে আছে ; তবু উৎসাহ নিবেশ
যেই জনমানসের অনির্বচনীয় নিঃসঙ্কোচ
এখনও আসে নি তাকে বর্তমান অতীতের দিকচক্রবালে বারবার
নেভাতে জ্বালাতে গিয়ে মনে হয় আজকের চেয়ে আরো দূর
অনাগত উত্তরণলোক ছাড়া মানুষের তরে
সেই প্রীতি, স্বর্গ নেই, গতি আছে ; তবু
গতির ব্যসন থেকে প্রগতি অনেক স্থিরতর ;
সে অনেক প্রতারণাপ্রতিভার সেতুলোক পার
হল ব'লে স্থির ;—হতে হবে বলে দীন, প্রমাণ, কঠিন ;
তবুও প্রেমিক—তাকে হতে হবে ; সময় কোথাও
পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন জেনে বিরচিত নয় ; তবু
সে তার বহির্মুখ চেতনার দান সব দিয়ে গেছে বলে
মনে হয় ; এর পর আমাদের অন্তর্দীপ্ত হবার সময়।

পূর্বাশা। বৈশাখ ১৩৫৩

মৃত্যু স্বপ্ন সংকল্প

আঁধারে হিমের রাতে আকাশের তলে
এখন জ্যোতিষ্ক কেউ নেই।
সে কারা কাদের এসে বলে :
এখন গভীর পবিত্র অন্ধকার ;
হে আকাশ, হে কালশিল্পী, তুমি আর
সূর্য জাগিয়ো না ;
মহাবিশ্বকারুকার্য, শক্তি, উৎস, সাধ :
মহনীয় আগুনের কী উচ্ছ্রিত সোনা ?

তবুও পৃথিবী থেকে—
আমরা সৃষ্টির থেকে নিভে যাই আজ ;
আমরা সূর্যের আলো পেয়ে
তরঙ্গকম্পনে কালো নদী
আলো নদী হয়ে যেতে চেয়ে
তবুও নগরে যুদ্ধে বাজারে বন্দরে
জেনে গেছি কারা ধন্য,
কারা স্বর্ণপ্রাধান্যের সূত্রপাত করে।

তাহাদের ইতিহাসধারা
ঢের আগে শুরু হয়েছিল ;
এখুনি সমাপ্ত হতে পারে ;
তবুও আলেয়াশিখা আজও জ্বালাতেছে
পুরাতন আলোর আঁধারে।

আমাদের জানা ছিল কিছু ;

কিছু ধ্যান ছিল ;
আমাদের উৎস-চোখে স্বপ্নছটা প্রতিভার মতো
হয়তো-বা এসে পড়েছিল ;
আমাদের আশা সাধ প্রেম ছিল ;—নক্ষত্রপত্রের
অন্তঃশূন্যে অন্ধ হিম আছে জেনে নিয়ে
তবুও তো ব্রহ্মাণ্ডের অপরূপ অগ্নিশিল্প জাগে ;
আমাদেরও গেছিল জাগিয়ে
পৃথিবীতে ;

আমরা জেগেছি—তবু জাগাতে পারিনি ;
আলো ছিল—প্রদীপের বেষ্টনী নেই ;
কাজ ছিল—শুরু হল না তো ;
তা হলে দিনের সিঁড়ি কী প্রয়োজনের ?
নিঃস্বত্ব সূর্যকে নিয়ে কার তবে লাভ !
সচ্ছল শাণিত নদী, তীরে তার সারসদম্পতি
ঐ জল ক্লান্তিহীন উৎসানল অনুভব ক'রে ভালোবাসে ;
তাদের চোখের রঙ অনন্ত আকৃতি পায় নীলাভ আকাশে ;
দিনের সূর্যের বর্ণে রাতের নক্ষত্র মিশে যায় ;
তবু তারা প্রণয়কে সময়কে চিনেছে কি আজও ?
প্রকৃতির সৌন্দর্যকে কে এসে চেনায় !

আমরা মানুষ ঢের ক্রূরতর অন্ধকূপ থেকে
অধিক আয়ত চোখে তবু ঐ অমৃতের বিশ্বকে দেখেছি ;
শান্ত হয়ে স্তব্ধ হয়ে উদ্‌বেলিত হয়ে অনুভব করে গেছি
প্রশান্তিই প্রাণরণনের সত্য শেষ কথা, তাই
চোখ বুজে নীরবে থেমেছি।
ফ্যাক্টরির সিটি এসে ডাকে যদি,

ব্রেন কামানের শব্দ হয়,
লরিতে বোঝাই করা হিংস্র মানবিকী
অথবা অহিংস নিত্য মৃতদের ভিড়
উদ্দাম বৈভবে যদি রাজপথ ভেঙে চলে যায়,
ওরা যদি কালোবাজারের মোহে মাতে,
নারীমূল্যে অন্ন বিক্রি করে,
মানুষের দাম যদি জল হয়, আহা,
বহমান ইতিহাসমরুকণিকার
পিপাসা মেটাতে,
ওরা যদি আমাদের ডাক দিয়ে যায়—
ডাক দেবে, তবু তার আগে
আমরা ওদের হাতে রক্ত ভুল মৃত্যু হয়ে
হারায়ে গিয়েছি ?

জানি ঢের কথা কাজ স্পর্শ ছিল, তবু
নগরীর ঘণ্টা-রোল যদি কেঁদে ওঠে,
বন্দরে কুয়াশা বাঁশি বাজে,
আমরা মৃত্যুর হিম ঘুম থেকে তবে
কী ক'রে আবার প্রাণকম্পনলোকের নীড়ে নভে
জ্বলন্ত তিমিরগুলো আমাদের রেণুসূর্যশিখা
বুঝে নিয়ে হে উড্ডীন ভয়াবহ বিশ্বশিল্পলোক,
মরণে ঘুমোতে বাধা পাব ?—
নবীন নবীন জনজাতকের কল্লোলের ফেনশীর্ষে ভেসে
আর একবার এসে এখানে দাঁড়াব।
যা হয়েছে—যা হতেছে—এখন যা শুভ্র সূর্য হবে
সে বিরাট অগ্নিশিল্প কবে এসে আমাদের ক্রোড়ে করে লবে।

মাসিক বসুমতী। [?]

পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে

পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে ঘুরে গেলে দিন
আলোকিত হয়ে ওঠে—রাত্রি অন্ধকার
হয়ে আসে ; সর্বদাই, পৃথিবীর আহ্নিক গতির
একান্ত নিয়ম, এই সব ;
কোথাও লঙ্ঘন নেই তিলের মতন আজও ;
অথবা তা হতে হলে আমাদের জ্ঞাতকুলশীল
মানবীয় সময়কে রূপান্তরিত হয়ে যেতে হয় কোনো
দ্বিতীয় সময়ে ; সে-সময় আমাদের জন্যে নয় আজ।
রাতের পরের দিন—দিনের পরের রাত নিয়ে সুশৃঙ্খল
পৃথিবীকে বলয়িত মরুভূমি ব'লে
মনে হতে পারে তবু ; শহরে নদীতে মেঘে মানুষের মনে
মানবের ইতিহাসে সে অনেক সে অনেক কাল
শেষ ক'রে অনুভব করা যেতে পারে কোনো কাল
শেষ হয় নিকো তবু ; শিশুরা অনপনেয়ভাবে
কেবলই যুবক হল—যুবকেরা স্থবির হয়েছে,
সকলেরই মৃত্যু হবে—মরণ হতেছে।

অগণন অঙ্কে মানুষের নাম ভোরের বাতাসে
উচ্চারিত হয়েছিল শুনে নিয়ে সন্ধ্যার নদীর
জলের মুহূর্তে সেই সকল মানুষ লুপ্ত হয়ে গেছে জেনে
নিতে হয় ; কলের নিয়মে কাজ সাঙ্গ হয়ে যায় ;
কঠিন নিয়মে নিরঙ্কুশভাবে ভিড়ে মানবের কাজ
অসমাপ্ত হয়ে থাকে—কোথাও হৃদয় নেই তবু।
কোথাও হৃদয় নেই মনে হয়, হৃদয়যন্ত্রের
ভয়াবহভাবে সুস্থ সুন্দরের চেয়ে এক তিল

অবান্তর আনন্দের অশোভনতায়।
ইতিহাসে মাঝে-মাঝে এ-রকম শীত অসারতা
নেমে আসে ;—চারি দিকে জীবনের শুভ্র অর্থ রয়ে গেছে তবু,
রৌদ্রের ফলনে সোনা নারী শস্য মানুষের হৃদয়ের কাছে,
বন্ধ্যা বলে প্রমাণিত হয়ে তার লোকোত্তর মাথার নিকটে
স্বর্গের সিঁড়ির মতো—হুণ্ডি হাতে অগ্রসর হয়ে যেতে হয়।

আমাদের এই শতাব্দী আজ এই পৃথিবীর সাথে
নক্ষত্রলোকের এই অবিরল সিঁড়ির পসরা
খুলে আত্মক্রীড় হল ; মাঘসংক্রান্তির রাত্রি আজ
এমন নিষ্প্রভ হয়ে সময়ের বুনোনিতে অন্ধকার কাঁটার মতন
কাকে বোনে ? কেন বোনে ? কোন্ দিকে কোথায় চলেছে ?
এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে—ঝাউ শিশু জারুলে হাওয়ার শব্দ থেমে
আরো থেমে-থেমে গেলে—আমাদের পৃথিবীর আহ্নিক গতির
অন্ধ কণ্ঠ শোনা যায়—শোনো, এক নারীর মতন,
জীবন ঘুমায়ে গেছে ; তবু তার আঁকাবাঁকা অস্পষ্ট শরীর
নিশির ডাকের শব্দ শুনে বেবিলনে পথে নেমে
উজ্জয়িনী গ্রীসে রেনেসাঁসে রুশে আধো জেগে, তবু,
হৃদয়ে বিকিয়ে গিয়ে ঘুমায়েছে আর একবার
নির্জন হ্রদের পারে জেনিভার পপলারের ভিড়ে
অন্ধ সুবাতাস পেয়ে ; গভীর গভীরতর রাত্রির বাতাসে
লোকার্নো হ্বের্সাই মিউনিখ অতলন্তের চার্টারে
ইউ-এন-ওয়ের ভিড়ে আশা দীপ্তি ক্লান্তি বাধা ব্যাসকূট বিষ—
আরো ঘুম—রয়ে গেছে হৃদয়ের—জীবনের ;—নারী,
শরীরের জন্যে আরো আশ্চর্য বেদনা
বিমূঢ়তা লাঞ্ছনার অবতার রয়ে গেছে ; রাত
এখনও রাতের স্রোতে মিশে থেকে সময়ের হাতে দীর্ঘতম

রাত্রির মতন কেঁপে মাঝে-মাঝে বুদ্ধ সোক্রাতেস্
কনফুচ লেনিন গ্যেটে হ্যোল্ডেরলিন রবীন্দ্রের রোলে
আলোকিত হতে চায় ; বেলজেনের সবচেয়ে বেশি অন্ধকার
নীচে আরো নীচে নীচে টেনে নিয়ে যেতে চায় তাকে ;
পৃথিবীর সমুদ্রের নীলিমায় দীপ্ত হয়ে ওঠে
তবুও ফেনার ঝর্না, রৌদ্রে প্রদীপ্ত হয়, মানুষের মন
সহসা আকাশপথে বনহংসী-পাখির বর্ণালি
কী রকম সাহসিকা চেয়ে দেখে—সূর্যের কিরণে
নিমেষেই বিকীরিত হয়ে ওঠে ; অমর ব্যথায়
অসীম নিরুৎসাহে অন্তহীন অবক্ষয়ে সংগ্রামে আশায় মানবের
ইতিহাস-পটভূমি অনিকেত না কি ? তবু, অগণন অর্ধসত্যের
উপরে সত্যের মতো প্রতিভাত হয়ে নব নবীন ব্যাপ্তির
সর্গে সঞ্চারিত হয়ে মানুষ সবার জন্যে শুভ্রতার দিকে
অগ্রসর হতে চায়—অগ্রসর হয়ে যেতে পারে।

মাসিক বসুমতী। শারদীয় ১৩৫৩

পটভূমির

পটভূমির ভিতরে গিয়ে কবে তোমায় দেখেছিলাম আমি
দশ-পনেরো বছর আগে ; সময় তখন তোমার চুলে কালো
মেঘের ভিতর লুকিয়ে থেকে বিদ্যুৎ জ্বালালো
তোমার নিশিত নারীমুখের—জানো তো অন্তর্যামী।
তোমার মুখ : চারি দিকে অন্ধকারে জলের কোলাহল,
কোথাও কোনো বেলাভূমির নিয়ন্তা নেই—গভীর বাতাসে
তবুও সব রণক্লান্ত অবসন্ন নাবিক ফিরে আসে ;

তারা যুবা, তারা মৃত ; মৃত্যু অনেক পরিশ্রমের ফল।
সময় কোথাও নিবারিত হয় না, তবু, তোমার মুখের পথে
আজও তাকে থামিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছো, নারি—
হয়তো ভোরে আমরা সবাই মানুষ ছিলাম, তারই
নিদর্শনের সূর্যবলয় আজকের এই অন্ধ জগতে।
চারি দিকে অলীক সাগর—জ্যাসন ওডিসিয়ুস ফিনিশিয়
সার্থবাহের অধীর আলো—ধর্মাশোকের নিজের তো নয়, আপতিত কাল
আমরা আজও বহন ক'রে, সকল কঠিন সমুদ্রে প্রবাল
লুটে তোমার চোখের বিষাদ ভর্ৎসনা...প্রেম নিভিয়ে দিলাম, প্রিয়।

অন্ধকার থেকে

গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা এ পৃথিবীর আজকের মুহূর্তে এসেছি।
বীজের ভেতর থেকে কী ক'রে অরণ্য জন্ম নেয়—
জলের কণার থেকে জেগে ওঠে নভোনীল মহান সাগর,
কী ক'রে এ প্রকৃতিতে—পৃথিবীতে, আহা,
ছায়াচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে মানব প্রথম এসেছিল,
আমরা জেনেছি সব ; অনুভব করেছি সকলই।

সূর্য জ্বলে—কল্লোলে সাগরজল কোথাও দিগন্তে আছে, তাই
শুভ্র অপলক সব শঙ্খের মতন
আমাদের শরীরের সিন্ধুতীর।

এই সব ব্যাপ্ত অনুভব থেকে মানুষের স্মরণীয় মন
জেগে ব্যথা বাধা ভয় রক্তফেনশীর্ষ ঘিরে প্রাণে
সঞ্চারিত করে গেছে আশা আর আশা ;
সকল অজ্ঞান করে জ্ঞান আলো হবে,

সফল লোভের চেয়ে সৎ হবে না কি
সব মানুষের তরে সব মানুষের ভালোবাসা।

আমরা অনেক যুগ ইতিহাসে সচকিত চোখ মেলে থেকে
দেখেছি আসন্ন সূর্য আপনাকে বলয়িত করে নিতে জানে
নব-নব মৃত সূর্যে শীতে ;
দেখেছি নির্ঝর নদী বালিয়াড়ি মরুর উঠানে
মরণেরই নামরূপ অবিরল কী যে !
তবুও শ্মশান থেকে দেখেছি চকিত রৌদ্রে কেমন জেগেছে শালিধান ;
ইতিহাস-ধুলো-বিষ উৎসারিত ক'রে নব নবতর মানুষের প্রাণ
প্রতিটি মৃত্যুর স্তর ভেদ করে এক তিল বেশি
চেতনার আভা নিয়ে তবু
খাঁচার পাখির কাছে কী নীলাভ আকাশনির্দেশী !

        হয়তো এখনও তাই—তবু
রাত্রি শেষ হলে রোজ পতঙ্গ-পালক-পাতা
                        শিশির-নিঃসৃত শুভ্র ভোরে
আমরা এসেছি আজ অনেক হিংসার খেলা অবসান ক'রে ;
অনেক দ্বেষের ক্লান্তি মৃত্যু দেখে গেছি।

আজও তবু
আজও ঢের গ্লানি-কলঙ্কিত হয়ে ভাবি :
রক্তনদীদের পারে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির
শোকাবহ অঙ্ক কঙ্কালে কি মাছি তোমাদের মৌমাছির নীড়
অল্পায়ু সোনালি রৌদ্রে ;
প্রেমের প্রেরণা নেই—শুধু নির্ঝরিত শ্বাস
পণ্যজাত শরীরের মৃত্যু-ম্লান পণ্য ভালোবেসে ;

তবুও হয়তো আজ তোমরা উড্ডীন নব সূর্যের উদ্দেশে।

ইতিহাস-সঞ্চারিত হে বিভিন্ন জাতি, মন, মানবজীবন,
এই পৃথিবীর মুখ যত বেশি চেনা যায়—চলা যায় সময়ের পথে,
তত বেশি উত্তরণ সত্য নয়—জানি ; তবু জ্ঞানের বিষণ্ণলোকী আলো
অধিক নির্মল হলে নটীর প্রেমের চেয়ে ভালো
সফল মানব-প্রেমে উৎসারিত হয় যদি, তবে
নব নদী নব নীড় নগরী নীলিমা সৃষ্টি হবে।
আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে।

মাসিক বসুমতী। মাঘ ১৩৫৩

একটি কবিতা

আমার আকাশ কালো হতে চায় সময়ের নির্মম আঘাতে ;
জানি, তবু ভোরে রাত্রে, এই মহাসময়েরই কাছে
নদী ক্ষেত বনানীর ঝাউয়ের ঝরা সোনার মতন
সূর্যতারাবীথির সমস্ত অগ্নির শক্তি আছে।
হে সুবর্ণ, হে গভীর গতির প্রবাহ,
আমি মন সচেতন ; আমার শরীর ভেঙে ফেলে
নতুন শরীর করো—নারীকে যে উজ্জ্বল প্রাণনে
ভালোবেসে আভা আলো শিশিরের উৎসের মতন,
সজ্জন স্বর্ণের মতো শিল্পীর হাতের থেকে নেমে :
হে আকাশ, হে সময়গ্রন্থি সনাতন,
আমি জ্ঞান আলো গান মহিলাকে ভালোবেসে আজ ;
সকালের নীলকণ্ঠ পাখি জল সূর্যের মতন।

সারাৎসার

এখন কিছুই নেই—এখানে কিছুই নেই আর,
অমল ভোরের বেলা রয়ে গেছে শুধু ;
আশ্বিনের নীলাকাশ স্পষ্ট করে দিয়ে সূর্য আসে ;
অনেক আবছা জল জেগে উঠে নিজ প্রয়োজনে
নদী হয়ে সমস্ত রৌদ্রের কাছে জানাতেছে দাবি ;

নক্ষত্রেরা মানুষের আগে এসে কথা কয় ভাবি ;
পল অনুপল দিয়ে অন্তহীন নিপলের চকমকি ঠুকে
ঐ সব তারার পরিভাষার উজ্জ্বলতা ;
আমার লক্ষ্য ছিল মানুষের সাধারণ হৃদয়ের কথা
সহজ সঙ্গের মতো জেগে নক্ষত্রকে
কী করে মানুষ ও মানুষীর মতো করে রাখে।

তবু তার উপচার নিয়ে সেই নারী
কোথায় গিয়েছে আজ চলে ;
এই তো এখানে ছিল সে অনেক দিন ;
আকাশের সব নক্ষত্রের মৃত্যু হলে
তারপর একটি নারীর মৃত্যু হয় :
অনুভব করে আমি অনুভব করেছি সময়।

কবিতা। চৈত্র ১৩৫৫

সময়ের তীরে

নীচে হতাহত সৈন্যদের ভিড় পেরিয়ে,
মাথার ওপর অগণন নক্ষত্রের আকাশের দিকে তাকিয়ে,
কোনো দূর সমুদ্রের বাতাসের স্পর্শ মুখে রেখে,
আমার শরীরের ভিতর অনাদি সৃষ্টির রক্তের গুঞ্জরন শুনে,

কোথায় শিবিরে গিয়ে পৌঁছলাম আমি।
সেখানে মাতাল সেনানায়কেরা
মদকে নারীর মতো ব্যবহার করছে,
নারীকে জলের মতো ;
তাদের হৃদয়ের থেকে উত্থিত সৃষ্টিবিসারী গানে
নতুন সমুদ্রের পারে নক্ষত্রের নগ্নলোক সৃষ্টি হচ্ছে যেন ;
কোথাও কোনো মানবিক নগর বন্দর মিনার খিলান নেই আর ;
এক দিকে বালিপ্রলেপী মরুভূমি হু হু করছে ;
আর-এক দিকে ঘাসের প্রান্তর ছড়িয়ে আছে—
আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্যের মধ্যে অপার অন্ধকারে
মাইলের পর মাইল।
শুধু বাতাস উড়ে আসছে :
স্খলিত নিহত মনুষ্যত্বের শেষ সীমানাকে
সময়সেতুলোকে বিলীন করে দেবার জন্যে,
উচ্ছ্রিত শববাহকের মূর্তিতে।
শুধু বাতাসের প্রেতচারণ
অমৃতলোকের অপস্রিয়মাণ নক্ষত্রযান-আলোর সন্ধানে।
পাখি নেই—সেই পাখির কঙ্কালের গুঞ্জরণ ;
কোনো গাছ নেই—সেই তুঁতের পল্লবের ভিতর থেকে
অন্ধ অন্ধকার তুষারপিচ্ছিল এক শোণ নদীর নির্দেশে।

সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল, নারি,
অবাক হলাম না।
হতবাক হবার কী আছে ?
তুমি যে মর্ত্যনারকী ধাতুর সংঘর্ষ থেকে জেগে উঠেছ নীল
স্বর্গীয় শিখার মতো ;
সকল সময় স্থান অনুভবলোক অধিকার করে সে তো থাকবে

এইখানেই,
আজ আমাদের এই কঠিন পৃথিবীতে।

কোথাও মিনারে তুমি নেই আজ আর
জানালার সোনালি নীল কমলা সবুজ কাচের দিগন্তে ;
কোথাও বনচ্ছবির ভিতরে নেই ;
শাদা সাধারণ নিঃসংকোচ রৌদ্রের ভিতরে তুমি নেই আজ ;
অথবা ঝর্নার জলে
মিশরী শঙ্খরেখাসর্পিল গাগরীর সমুৎসুকতায়
তুমি আজ সূর্যজলস্ফুলিঙ্গের আত্মা-মুখরিত নও আর।

তোমাকে আমেরিকার কংগ্রেস-ভবনে দেখতে চেয়েছিলাম,
কিংবা ভারতের ;
অথবা ক্রেমলিনে কি বেতসতন্বী সূর্যশিখার কোনো স্থান আছে
যার মানে পবিত্রতা শান্তি শক্তি শুভ্রতা—সকলের জন্যে।
নিঃসীম শূন্যে শূন্যের সংঘর্ষে স্বতরুৎসারা নীলিমার মতো
কোনো রাষ্ট্র কি নেই আজ আর
কোনো নগরী নেই
সৃষ্টির মরালীকে যা বহন করে চলেছে মধু বাতাসে
নক্ষত্রে—লোক থেকে সূর্যলোকান্তরে !

ডানে বাঁয়ে ওপরে নীচে সময়ের
জ্বলন্ত তিমিরের ভিতরে তোমাকে পেয়েছি।
শুনেছি বিরাট শ্বেতপক্ষীসূর্যের
ডানার উড্ডীন কলরোল ;
আগুনের মহান পরিধি গান করে উঠছে।

মাসিক বসুমতী। [?]

যতদিন পৃথিবীতে

যতদিন পৃথিবীতে জীবন রয়েছে
দুই চোখ মেলে রেখে স্থির
মৃত্যু আর বঞ্চনার কুয়াশার পারে
সত্য সেবা শান্তি যুক্তির
নির্দেশের পথ ধরে চ'লে
হয়তো-বা ক্রমে আরো আলো
পাওয়া যাবে বাহিরে—হৃদয়ে ;
মানব ক্ষয়িত হয় না জাতির ব্যক্তির ক্ষয়ে।

ইতিহাস ঢের দিন প্রমাণ করেছে
মানুষের নিরন্তর প্রয়াণের মানে
হয়তো-বা অন্ধকার সময়ের থেকে
বিশৃঙ্খল সমাজের পানে
চলে যাওয়া ;—গোলকধাঁধার
ভুলের ভিতর থেকে আরো বেশি ভুলে ;
জীবনের কালোরঙা মানে কি ফুরুবে
শুধু এই সময়ের সাগর ফুরুলে।

জেগে ওঠে তবুও মানুষ রাত্রিদিনের উদয়ে ;
চারি দিকে কলরোল করে পরিভাষা
দেশের জাতির দ্ব্যর্থ পৃথিবীর তীরে ;
ফেনিল অস্ত্র পাবে আশা ?
যেতেছে নিঃশেষ হয়ে সব ?
কী তবে থাকবে ?

আধার ও মননের আজকের এ নিষ্ফল রীতি
মুছে ফেলে আবার সচেষ্ট হয়ে উঠবে প্রকৃতি ?

ব্যর্থ উত্তরাধিকারে মাঝে-মাঝে তবু
কোথাকার স্পষ্ট সূর্য-বিন্দু এসে পড়ে :
কিছু নেই উত্তেজিত হলে ;
কিছু নেই স্বার্থের ভিতরে ;
ধনের অদেয় কিছু নেই, সেই সবই
জানে এ খণ্ডিত রক্ত বণিক পৃথিবী ;
অন্ধকারে সব চেয়ে সে-শরণ ভালো :
যে-প্রেম জ্ঞানের থেকে পেয়েছে গভীরভাবে আলো।

দেশ। ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০

মহাত্মা গান্ধী

অনেক রাত্রির শেষে তারপর এই পৃথিবীকে
ভালো বলে মনে হয় ; সময়ের অমেয় আঁধারে
জ্যোতির তারণকণা আসে,
গভীর নারীর চেয়ে অধিক গভীরতরভাবে
পৃথিবীর পতিতকে ভালোবাসে, তাই
সকলেরই হৃদয়ের 'পরে এসে নগ্ন হাত রাখে ;
আমরাও আলো পাই—প্রশান্ত অমল অন্ধকার
মনে হয় আমাদের সময়ের রাত্রিকেও।

একদিন আমাদের মর্মরিত এই পৃথিবীর
নক্ষত্র শিশির রোদ ধূলিকণা মানুষের মন
অধিক সহজ ছিল—শ্বেতাশ্বতর যম নচিকেতা যুদ্ধদেবের।

কেমন সফল এক পর্বতের সানুদেশ থেকে
ঈশা এসে কথা বলে চলে গেল—মনে হল প্রভাতের জল
কমনীয় শুশ্রূষার মতো বেগে এসেছে এ পৃথিবীতে মানুষের প্রাণ
আশা করে আছে বলে—চায় বলে—
নিরাময় হতে চায় বলে।

পৃথিবীর সেই সব সত্য অনুসন্ধানের দিনে
বিশ্বের কারণশিল্পে অপরূপ আভার মতন
আমাদের পৃথিবীর হে আদিম উষাপুরুষেরা,
তোমরা দাঁড়িয়েছিলে, মনে আছে, মহাত্মার ঢের দিন আগে ;
কোথাও বিজ্ঞান নেই, বেশি নেই, জ্ঞান আছে তবু ;
কোথাও দর্শন নেই, বেশি নেই, তবুও নিবিড় অন্তর্ভেদী
দৃষ্টিশক্তি রয়ে গেছে : মানুষকে মানুষের কাছে
ভালো স্নিগ্ধ আন্তরিক হিত
মানুষের মতো এনে দাঁড় করাবার ;
তোমাদের সে-রকম প্রেম ছিল, বহ্নি ছিল, সফলতা ছিল।
তোমাদের চার পাশে সাম্রাজ্য রাজ্যের কোটি দীন সাধারণ
পীড়িত রক্তাক্ত হয়ে টের পেত কোথাও হৃদয়বত্তা নিজে
নক্ষত্রের অনুপম পরিসরে হেমন্তের রাত্রির আকাশ
ভ'রে ফেলে তারপর আত্মঘাতী মানুষের নিকটে নিজের
দয়ার দানের মতো একজন মানবীয় মহানুভবকে
পাঠাতেছে,—প্রেম শান্তি আলো
এনে দিতে—মানুষের ভয়াবহ লৌকিক পৃথিবী
ভেদ করে অন্তঃশীলা করুণার প্রসারিত হাতের মতন।

তারপর ঢের দিন কেটে গেছে ;
আজকের পৃথিবীর অবদান আরেক রকম হয়ে গেছে ;

যেই সব বড়ো-বড়ো মানবেরা আগেকার পৃথিবীতে ছিল
তাদের অন্তর্দান সবিশেষ সমুজ্জ্বল ছিল, তবু আজ
আমাদের পৃথিবী এখন ঢের বহিরাশ্রয়ী।
যে সব বৃহৎ আত্মিক কাজ অতীতে হয়েছে—
সহিষ্ণুতায় ভেবে সে-সবের যা দাম তা দিয়ে
তবু আজ মহাত্মা গান্ধীর মতো আলোকিত মন
মুমুক্ষার মাধুরীর চেয়ে এই আশ্রিত আহত পৃথিবীর
কল্যাণের ভাবনায় বেশি রত ; কেমন কঠিন
ব্যাপক কাজের দিনে নিজেকে নিয়োগ করে রাখে
আলো অন্ধকারে রক্তে—কেমন শান্ত দৃঢ়তায়।

এই অন্ধ বাত্যাহত পৃথিবীকে কোনো দূর স্নিগ্ধ অলৌকিক
তনুবাত শিখরের অপরূপ ঈশ্বরের কাছে
টেনে নিয়ে নয়—ইহলোক মিথ্যা প্রমাণিত ক'রে পরকাল
দীনাত্মা বিশ্বাসীদের নিধান স্বর্গের দেশ বলে সম্ভাষণ করে নয়—
কিন্তু তার শেষ বিদায়ের আগে নিজেকে মহাত্মা
জীবনের ঢের পরিসর ভরে ক্লান্তিহীন নিয়োজনে চালায়ে নিয়েছে
পৃথিবীরই সুধা সূর্য নীড় জল স্বাধীনতা সমবেদনাকে
সকলকে—সকলের নীচে যারা সকলকে সকলকে দিতে।

আজ এই শতাব্দীতে মহাত্মা গান্ধীর সচ্ছলতা
এ-রকম প্রিয় এক প্রতিভাদীপন এনে সকলের প্রাণ
শতকের আঁধারের মাঝখানে কোনো স্থিরতর
নির্দেশের দিকে রেখে গেছে ;
রেখে চলে গেছে—বলে গেছে : শান্তি এই, সত্য এই।

হয়তো-বা অন্ধকারই সৃষ্টির অন্তিমতম কথা ;
হয়তো-বা রক্তেরই পিপাসা ঠিক, স্বাভাবিক—
মানুষও রক্তাক্ত হতে চায় ;
হয়তো-বা বিপ্লবের মানে শুধু পরিচিত অন্ধ সমাজের
নিজেকে নবীন ব'লে—অগ্রগামী (অন্ধ) উত্তেজের
ব্যাপ্তি বলে প্রচারিত করার ভিতর ;
হয়তো-বা শুভ পৃথিবীর কয়েকটি ভালোভাবে লালিত জাতির
কয়েকটি মানুষের ভালো থাকা—সুখে থাকা—রিরংসারক্তিম হয়ে থাকা ;
হয়তো-বা বিজ্ঞানের, অগ্রসর, অগ্রসৃতির মানে এই শুধু, এই।

চারি দিকে অন্ধকার বেড়ে গেছে—মানুষের হৃদয় কঠিনতর হয়ে গেছে ;
বিজ্ঞান নিজেও এসে শোকাবহ প্রতারণা করেই ক্ষমতাশালী দেখ ;
কবেকার সরলতা আজ এই বেশি শীত পৃথিবীতে—শীত :
বিশ্বাসের পরম সাগররোল ঢের দূরে সরে চলে গেছে ;
প্রীতি প্রেম মনের আবহমান বহতার পথে
যেই সব অভিজ্ঞতা বস্তুত শান্তির কল্যাণের
সত্যিই আনন্দসৃষ্টি
সে সব গভীর জ্ঞান উপেক্ষিত মৃত আজ, মৃত,
জ্ঞানপাপ এখন গভীরতর ব'লে ;
আমরা অজ্ঞান নই—প্রতিদিনই শিখি, জানি, নিঃশেষে প্রচার করি, তবু
কেমন দূরপনেয় স্খলনের রক্তাক্তের বিয়োগের পৃথিবী পেয়েছি।

তবু এই বিলম্বিত শতাব্দীর মুখে
যখন জ্ঞানের চেয়ে জ্ঞানের প্রশ্রয় ঢের বেড়ে গিয়েছিল,
যখন পৃথিবী পেয়ে মানুষ তবুও তার পৃথিবীকে হারিয়ে ফেলেছে,
আকাশে নক্ষত্র সূর্য নীলিমার সফলতা আছে—

আছে, তবু মানুষের প্রাণে কোনো উজ্জ্বলতা নেই,
শক্তি আছে, শান্তি নেই, প্রতিভা রয়েছে, তার ব্যবহার নেই,
প্রেম নেই, রক্তাক্ততা অবিরল,
তখন তো পৃথিবীতে আবার ঈশার পুনরুদয়ের দিন
প্রার্থনা করার মতো বিশ্বাসের গভীরতা কোনো দিকে নেই ;
তবুও উদয় হয়—ঈশা নয়—ঈশার মতন নয়—আজ এই নতুন দিনের
আর-একজনের মতো ;
মানুষের প্রাণ থেকে পৃথিবীর মানুষের প্রতি
যেই আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ফিরে আসে, মহাত্মা গান্ধীকে
আস্থা করা যায় বলে ;
হয়তো-বা মানবের সমাজের শেষ পরিণতি গ্লানি নয় ;
হয়তো-বা মৃত্যু নেই, প্রেম আছে, শান্তি আছে, মানুষের অগ্রসর আছে ;
  একজন স্থবির মানুষ দেখ অগ্রসর হয়ে যায়
  পথ থেকে পথান্তরে—সময়ের কিনারার থেকে সময়ের
  দূরতর অন্তঃস্থলে—সত্য আছে, আলো আছে ; তবুও সত্যের আবিষ্কারে।
  আমরা আজকে এই বড়ো শতকের
  মানুষেরা সেই আলোর পরিধির ভিতরে পড়েছি।
  আমাদের মৃত্যু হয়ে গেলে এই অনিমেষ আলোর বলয়
  মানবীয় সময়কে হৃদয়ে সফলকাম সত্য হতে বলে
  জেগে রবে ; জয়, আলো সহিষ্ণুতা স্থিরতার জয় !

পূর্বাশা। ফাল্গুন ১৩৫৪

যদিও দিন

যদিও দিন কেবলই নতুন গল্পবিশ্রুতির
তারপরে রাত অন্ধকারে থেমে থাকা ; লুপ্তপ্রায় নীড়
সঠিক করে নেয়ার মতো শান্ত কথা ভাবা ;

যদিও গভীর রাতের তারা (মনে হয়) ঐশী শক্তির ;

তবুও কোথাও এখন আর প্রতিভা আভা নেই ;
অন্ধকারে কেবলই সময় হৃদয় দেশ ক্ষয়ে
যেতেছে দেখে নীলিমাকে অসীম করে তুমি
বলতে যদি মেঘনা নদীর মতন অকূল হয়ে :

'আমি তোমার মনের নারী শরীরিণী—জানি ;
কেন তুমি স্তব্ধ হয়ে থাকো।
তুমি আছো বলে আমি কেবলই দূরে চলতে ভালোবাসি,
চিনি না কোনো সাঁকো।

যতটা দূরে যেতেছি আমি সূর্যকরোজ্জ্বলতাময় প্রাণে
ততই তোমার স্বত্বাধিকার ক্ষয়
পাচ্ছে বলে মনে কর ? তুমি আমার প্রাণের মাঝে দ্বীপ,
কিন্তু সে দ্বীপ মেঘনা নদী নয়।'—

এ কথা যদি জলের মতো উৎসারণে তুমি
আমাকে—তাকে—যাকে তুমি ভালোবাস তাকে
বলে যেতে—শুনে নিতাম, মহাপ্রাণের বৃক্ষ থেকে পাখি
শোনে যেমন আকাশ বাতাস রাতের তারকাকে।

দেশ। শারদীয় ১৩৬০

দেশ কাল সন্ততি

কোথাও পাবে না শান্তি—যাবে তুমি এক দেশ থেকে দূরদেশে ?
এ মাঠ পুরোনো লাগে—দেয়ালে নোনার গন্ধ—পায়রা শালিক সব চেনা ?

এক ছাদ ছেড়ে দিয়ে অন্য সূর্যে যায় তারা—লক্ষ্যের উদ্দেশে
তবুও অশোকস্তম্ভ কোনো দিকে সান্ত্বনা দেবে না।

কেন লোভে উদ্‌যাপনা ? মুখ ম্লান—চোখে তবু উত্তেজনা সাধ ?
জীবনের ধার্য বেদনার থেকে এ নিয়মে নির্মুক্তি কোথায়।
ফড়িং অনেক দূরে উড়ে যায় রোদে ঘাসে—তবু তার কামনা অবাধ
অসীম ফড়িংটিকে খুঁজে পাবে প্রকৃতির গোলকধাঁধায় ?

ছেলেটির হাতে বন্দী প্রজাপতি শিশুসূর্যের মতো হাসে ;
তবে তার দিন শেষ হয়ে গেল ; একদিন হতই তো, যেন এই সব
বিদ্যুতের মতো মৃদু ক্ষুদ্র প্রাণ জানে তার ; যতবার হৃদয়ের গভীর প্রয়াসে
বাধা ছিঁড়ে যেতে চায়—পরিচিত নিরাশায় ততবার হয় সে নীরব।

অলঙ্ঘ্য অন্তঃশীল অন্ধকার ঘিরে আছে সব ;
জানে তাহা কীটেরাও, পতঙ্গেরা, শান্ত শিব পাখির ছানাও ;
বনহংসীশিশু শূন্যে চোখ মেলে দিয়ে অবাস্তব
স্বস্তি চায় ;—হে সৃষ্টির বনহংসী, কী অমৃত চাও ?

যুগান্তর। শারদীয় ১৩৫৭

মহাগোধূলি

সোনালি খড়ের ভারে অলস গোরুর গাড়ি—বিকেলের রোদ পড়ে আসে।
কালো নীল হলদে পাখিরা ডানা ঝাপটায় ক্ষেতের ভাঁড়ারে ;
শাদা পথ ধুলো মাছি—ঘুম হয়ে মিশছে আকাশে ;
অস্ত-সূর্য গা এলিয়ে অড়র ক্ষেতের পারে পারে

শুয়ে থাকে ; রক্তে তার এসেছে ঘুমের স্বাদ এখন নির্জনে ;

আসন্ন এ ক্ষেতটিকে ভালো লাগে—চোখে অগ্নি তার
নিভে নিভে জেগে ওঠে ; স্নিগ্ধ কালো অঙ্গারের গন্ধ এসে মনে
একদিন আগুনকে দেবে নিস্তার।

কোথায় চার্টার প্যাক্ট কমিশন প্ল্যান ক্ষয় হয় ;
কেন হিংসা ঈর্ষা গ্লানি ক্লান্তি ভয় রক্ত কলরব ;
বুদ্ধের মৃত্যুর পরে যেই তন্বী ভিক্ষুণীকে এই প্রশ্ন আমার হৃদয়
করে চুপ হয়েছিল—আজও সময়ের কাছে তেমনই নীরব।

উত্তরসূরি। আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৩৬১

মানুষ যা চেয়েছিল

গোধূলির রঙ লেগে অশ্বত্থ বটের পাতা হতেছে নরম ;
খয়েরি শালিকগুলো খেলছে বাতাবি গাছে—তাদের পেটের শাদা রোম
সবুজ পাতার নীচে ঢাকা প'ড়ে একবার পলকেই বার হয়ে আসে,
হলুদ পাতার কোলে কেঁপে-কেঁপে মুছে যায় সন্ধ্যার বাতাসে।
ও কার গোরুর গাড়ি রয়ে গেছে ঘাসে ঐ পাখা মেলে ফড়িঙের মতো।
হরিণী রয়েছে বসে নিজের শিশুর পাশে বড়ো চোখ মেলে ;
আঁকাবাঁকা শিং ছুঁয়ে তাদের মেরুন গোধূলির
মেঘগুলো লেগে আছে ; সবুজ ঘাসের 'পরে ছবির মতন যেন স্থির ;
দিঘির জলের মতো ঠাণ্ডা কালো নিশ্চিন্ত চোখ ;
সৃষ্টির বঞ্চনা ক্ষমা করবার মতন অশোক
অনুভূতি জেগে ওঠে মনে।...
আঁধার নেপথ্য সব চারি দিকে—কূল থেকে অকূলের দিক-নিরূপণে
শক্তি নেই আজ আর পৃথিবীর—তবু এই স্নিগ্ধ রাত্রি নক্ষত্রে ঘাসে ;
কোথাও প্রান্তরে ঘরে অথবা বন্দরে নীলাকাশে ;
মানুষ যা চেয়েছিল সেই মহাজিজ্ঞাসার শান্তি দিতে আসে।

আনন্দবাজার পত্রিকা। শারদীয় ১৩৬৪

আজকে রাতে

আজকে রাতে তোমায় আমার কাছে পেলে কথা
বলা যেত ; চারি দিকে হিজল শিরীষ নক্ষত্র ঘাস হাওয়ার প্রান্তর।
কিন্তু যেই নিট নিয়মে ভাবনা আবেগ ভাব
বিশুদ্ধ হয় বিষয় ও তার যুক্তির ভিতর ;

আমিও সেই ফলাফলের ভিতরে থেকে গিয়ে
দেখেছি ভারত লণ্ডন রোম নিউইয়র্ক চীন
আজকে রাতের ইতিহাস ও মৃত ম্যামথ সব
নিবিড় নিয়মাধীন।

কোথায় তুমি রয়েছ কোন্ পাশার দান হাতে :
কী কাজ খুঁজে ;—সকল অনুশীলন ভালো নয় ;
গভীরভাবে জেনেছি যে-সব সকাল বিকাল নদী নক্ষত্রকে
তারই ভিতর প্রবীণ গল্প নিহিত হয়ে রয়।

হে হৃদয়

হে হৃদয়,
নিস্তব্ধতা ?
চারি দিকে মৃত সব অরণ্যেরা বুঝি ?
মাথায় ওপরে চাঁদ
চলছে কেবলই মেঘ কেটে পথ খুঁজে—

পেঁচার পাখায়
জোনাকির গায়ে
ঘাসের ওপরে কী যে শিশিরের মতো ধূসরতা
দীপ্ত হয় না কিছু ?
ধ্বনিও হয় না আর ?

হলুদ দু ঠ্যাং তুলে নেচে রোগা শালিকের মতো যেন কথা
বলে চলে তবুও জীবন :
বয়স তোমার কত ? চল্লিশ বছর হল ?
প্রণয়ের পালা ঢের এল গেল—
হল না মিলন ?

পর্বতের পথে পথে রৌদ্রে রক্তে অক্লান্ত সফরে
খচ্চরের পিঠে কারা চড়ে ?
পতঞ্জলি এসে বলে দেবে
প্রভেদ কী যারা শুধু বসে থেকে ব্যথা পায় মৃত্যুর গহ্বরে
মুখে রক্ত তুলে যারা খচ্চরের পিঠ থেকে পড়ে যায় ?

মৃত সব অরণ্যেরা ;
আমার এ জীবনের মৃত অরণ্যেরা বুঝি বলে :
কেন যাও পৃথিবীর রৌদ্র কোলাহলে
নিখিল বিষের ভোক্তা নীলকণ্ঠ আকাশের নীচে
কেন চলে যেতে চাও মিছে ;
কোথাও পাবে না কিছু ;
মৃত্যুই অনন্ত শান্তি হয়ে
অন্তহীন অন্ধকারে আছে
লীন সব অরণ্যের কাছে।

আমি তবু বলি :
এখনও যে কটা দিন বেঁচে আছি সূর্যে-সূর্যে চলি,
দেখা যাক পৃথিবীর ঘাস
সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর
নিষ্পেষিত মনুষ্যতার
আঁধারের থেকে আনে কী করে যে মহানীলাকাশ,
ভাবা যাক—ভাবা যাক—
ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত শত
শত জলঝর্নার ধ্বনি।

ময়ূখ। কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৬১

ছায়া আবছায়া

১

চারিদিকে রিট্রেঞ্চমেন্ট—বিজিনেট—ডিপ্রেশন
আমি বেকার
অনেক বছর ধ'রে কোনও আজ নেই
কোথাও কাজ পাবার আশা নেই
একটা পয়সা খুঁজে বার করবার জন্য
          আমার সমস্ত শক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে
পৃথিবী যেন বলছে : তোমার এই শক্তি : বরং তা
                    কবিতা লিখুক গিয়ে
আমি বলি : আমিও কবিতা লিখতেই চাই
          কিন্তু পেটে কিছু পাব না কি
          যার জোরে আশাপ্রদ কবিতা লিখতে পারা যায়
          পৃথিবীর জয়গান ক'রে
          কিন্তু তার বদলে পেটে কিছু পেতে চাই
          পেটে কিছু পেতে চাই।

২

দু' হাত লম্বা অবিনাশ দত্তকে রোজ
অফিশে যেতে দেখি
চুল পেকে যাচ্ছে

চিন্তায় ব্যস্ততায় কপাল কালো
জিনের কোট খদ্দরের ধুতি কেমন বেখাপ্পা
চারিদিকে উচ্ছন্ন উচ্ছিষ্ট জীবনের ইসারা
এমন চমৎকার দু' হাত, চেহারা
এমন দোহারা উঁচু লোক
এমন অবাধ্য অতৃপ্ত চোখ
কেমন ক'রে যে একটা চামড়ার কোম্পানীর
কেরানীর ডেস্কে মানায় !

অবিনাশ দত্ত তার প্রকাণ্ড লোমশ হাতে একটা
মদের বোতল ধরে
একটা বিরাট জাহাজের ডেকের ওপর সমুদ্রের
তালে তালে নাচবে না কি ?

চারিদিকে অগাধ নীল আকাশ

বাতাস হু-হু ক'রে ছুটছে
হাজার হাজার উত্তাল বেলুনের মত !

৩

এ এক পুরোনো বাড়ি
এ এক ভূতের বাড়ি, আহা
তিন শো বছর আগে এখানে থেকেছি যেন
মানুষ গিয়েছে ভুলে তাহা
এ শুধু পুরোনো বাড়ি, আহা

জ্যোৎস্না জামের বনে
জ্যোৎস্না খড়ের চালে আজ
পুরোনো বাড়ির ঝাঁপি জানালা দাওয়ায় এই
এখনও আছে কী কারুকাজ
জ্যোৎস্না রয়েছে তবু আজ

এখনও কী যেন আছে
এখনও কী যেন আছে বাকী
হুতোম প্যাঁচার মত জ্যোৎস্না এসেছে চুপে
লেবুও ফলেছে একাকী
এখনও কী যেন আছে বাকী !

৪

আমি যতই নতুন কবিতা আবিষ্কার করি না কেন
তোমরা এসে বলবে : ও যুগ গিয়েছে, ও এক হাল ছিল
ও-সবের ঢের ঢের হয়েছে
আমাদের কল্পনা জাল ছিঁড়ে বাঁচল
আমাদের কলম
মায়ার পাহাড়মুখো ময়নাদের মত
নীল আকাশ বিঁধে : চলছে।

৫

এই দুপুরের বেলা
আকাশ যখন নীল সমুদ্রের মত
দরজা জানালা পর্দাগুলো যখন সহসা
বাতাসে বেলুনের মত কেঁপে ওঠে

আকাশের দিকে উড়ে যেতে চাচ্ছে

কলকাতার এই মস্ত বড় বাড়িটাকে
একটা জাহাজের মত মনে হচ্ছে
না জানি কোন বন্দর ছেড়ে চ'লে গেছি
কোন অগাধ মাঝসাগরের ভেতর
এই চৈত্রের দুপুরবেলা
আকাশ যখন নীল সমুদ্রের মত

৬

এই মাঠে ক্ষেতে
বৈশাখের দুপুর
হৃদয়কে কোন দূর সমুদ্রের শব্দ শোনায় ;—
কোথায় নিয়ে যায় !
আকাশের বিস্মিত চিলগুলো
না জানি কোন বিপদসঙ্কুল শাদা ফেনার চলকানির ভিতর
অদ্ভুত সমুদ্রে
কাকে দেখতে পেয়েছে !
আমিও দেখেছি !
আমরা আর ফিরে যাব না
সাগরের পথে ধূসর ভূত হয়ে থাকব
লক্ষ লক্ষ বছর।

৭

যখন ট্রামের ঘণ্টা শুনেছে সকলে
ট্র্যাক্সি লরির শব্দ সব

তখন বেগুনি-নীল
আকাশে ডাকে যে-চিল
করেছি অনুভব
ভুলে গেছি সব।

হঠাৎ দেখেছি কোন নদী
শিশির হিজল-শাখা তারা
যখন মুছেছি চোখ— দেখি
সে নদী শিশির হিজল তারা শাখা
ট্রামের স্টিলের লাইনে ঢাকা।

৮

যখন ছিলাম ছোট
তখন ছিলাম শিশু ঢের
তবুও তখন থেকে
কী যেন পেয়েছি আমি টের

হঠাৎ গিয়েছে ভেঙে ঘোর
বেতের শব্দ শুনে, আহা
টেবিলে টিচার তবুও
বোঝে নি বোঝে নি কিছু, আহা

ছেলেরাও বোঝে নি ক' কিছু
গিয়েছে খেলার মাঠে চলে
আমার হৃদয় ধ'রে শুধু
কে যেন কোথায় গেছে চ'লে

যেখানে নদীর জল
গোলাপী—ধূসর যেন—চুপ
সেখানে মানুষ নাই—তাই
লুকায়ে রয়েছে সব রূপ

তখন ছিলাম ছোট
তখন ছিলাম শিশু ঢের
তবুও তখন থেকে
এ সব পেয়েছি আমি টের

হঠাৎ গিয়েছে ভেঙে ঘোর
বেতের শব্দ শুনে, আহা
টেবিলে টিচার তবুও
বোঝে নি বোঝে নি কিছু, আহা

৯

সেই মেয়েটি এর থেকে নিকটতর হ'ল না :
কেবল সে দূরের থেকে আমার দিকে এক বার তাকাল
আমি বুঝলাম
চকিত হয়ে মাথা নোয়াল সে
কিন্তু তবুও তার তাকাবার প্রয়োজন সপ্রতিভ হয়ে
সাত দিন আট দিন ন' দিন দশ দিন
সপ্রতিভ হয়ে—সপ্রতিভ হয়ে
সমস্ত চোখ দিয়ে আমাকে নির্দিষ্ট ক'রে
অপেক্ষা ক'রে—অপেক্ষা ক'রে—

সেই মেয়েটি এর থেকে নিকটতর হল না
কারণ আমাদের জীবন পাখিদের মত নয়
যদি হই
সেই মাঘের নীল আকাশে
(আমি তাকে নিয়ে) এক বার ধবলাটের সমুদ্রের দিকে চলতাম
গাঙ্‌শালিখের মত আমরা দু'টিতে

আমি কোনও এক পাখির জীবনের জন্য অপেক্ষা করছি
তুমি কোনও এক পাখির জীবনের জন্য অপেক্ষা করছ
হয়তো হাজার হাজার বছর পরে
মাঘের নীল আকাশে
সমুদ্রের দিকে যখন আমরা উড়ে যাব
আমাদের মনে হবে
হাজার হাজার বছর আগে আমরা এমন
উড়ে যেতে চেয়েছিলাম।

১০

হরিদাস ঘোষ পোস্ট-অফিশের কেরানী
বল্লে আমাকে এসে : মেসের চারতলার চিলেকোঠায় বসে :
ভাবছিলাম আমাদের মত হাতে-পায়ে জড়ানো বিপন্ন লোকদের
মরাই ভালো
মরাই দরকার
এমন সময় হঠাৎ শাঁখ বেজে উঠল চারদিকে
দালানের ভিতসুদ্ধু কেঁপে উঠছে
...ভূমিকম্প
নেহাৎ কম ভূমিকম্প নয়

প্রাণ শুকিয়ে গিয়েছিল—মেসের ফোঁপরা দালানটা
হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়লে কী করতাম !
মৃত্যুকে ভালো লাগে বটে
কিন্তু নক্ষত্রের তলে—শান্ত রাতে
যখন মরবার কোনও সম্ভাবনা নেই
যখন জীবনকে ভালোবাসা উচিত
কিন্তু আমরা হাঁসফাসের ভিতর—গুমোটের মধ্যে
                মারীমড়ক যুদ্ধের হাহাকারের ভিতর
জীবনকে ভালোবাসি

নিতান্ত মাংসকে ভালোবাসি আমরা
জীবনকে নিতান্ত মাংস মনে করি।

১১

কলকাতার ময়দানে
বৈশাখের রাতে—বিশাল নক্ষত্রের রাতে
বিস্তৃত বাতাসে
দু' জন লোক চার হাজার ছাপ্পান্ন টাকার কথা বলছিল
পরের দল সাড়ে-ছ' হাজার সাড়ে-ছ' হাজার করছিল
সাড়ে-ছ' হাজার (কী ?) নক্ষত্র ? অরব রাত ? চুমো ? সমুদ্রের ঢেউ ?
সাড়ে-ছ' হাজার টাকা
তার পরের লোকটি চার টাকা পাঁচ আনার হিসেব দিয়ে চলেছে
পরের লোকটি রুপেয়ার কথা বলছে
আমিও ভাবছিলাম একটা ঘষা সিকি দিয়ে
                কে আমাকে ঠকাল
এই সিকিটি দিয়ে কী হবে

বৈশাখের বিশাল নক্ষত্রের রাতে
বিস্তৃত বাতাসে।

১২

রোমান্স ম'রে গেছে
রোমান্সকে মারা খুব শক্ত কাজ—
কী ক'রে তা শেষ হ'ল ?
রোমান্স করতে গিয়েই তা শেষ হয়েছে
আমিও যেন সেন্ট পলের মত
দামাস্কাসের পথে চলেছিলাম
কোনও এক সাধ নিয়ে
ইশা যেমন পলকে বলেছিল
তোমাকে আমি আমার কাজের জন্য মনোনীত করেছি
রোমান্সহীন জীবন তেম্নি আমাকে বরেছে :
তোমাকে আমি আমার কাজের জন্য মনোনীত করেছি।

সেন্ট পল (খ্রি. ৫-৬৭)। টারসাসের সল নামেও খ্যাত। ঈশ্বরের বাণী প্রচার করবার জন্য যিশু যে বারোজন শিষ্যকে মনোনীত করেছিলেন, তাঁদের একজন সেন্ট পল, অ-ইহুদি। শুরুতে ছিলেন খ্রিষ্টবিরোধী, কিন্তু খ্রিষ্ট ধর্ম-নিধনের সদুদ্দেশ্য নিয়ে দামাস্কাসে যাওয়ার পথে তাঁর দিব্যদর্শন হয় : দৈবী আলোকের ঝলকের মধ্যে দিব্যভাষণ শোনেন তিনি : 'কেন তুমি আমাকে শাস্তি দেবে ?' তিনি খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেন তখন ; সল হয়ে গেলেন পল ; আদি খ্রিষ্টধর্মপ্রচারকদের মধ্যে সর্বোত্তম : নিকট-প্রাচ্যে গেলেন, গ্রীসে গেলেন, ধর্মান্তরিত করলেন অনেকানেক স্থানীয়দের, চার্চের পর চার্চ গড়ে তুললেন, মথি-কথিত সুসমাচার প্রচার করে বেড়ালেন। দাঙ্গা বাঁধিয়ে তুলেছিলেন প্রায় জেরুজালেমে, দু' বছর জেল খাটলেন সেখানে, তার পরে রোমে আরও দু' বছর। শহিদ হলেন পিটারের সঙ্গে একসাথে, নিরো-র লোকজন যখন তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দিলেন শিরশ্ছেদন করে।

ঈশা : যিশুখ্রিষ্ট

১৩

এইখানে ঢের মরা বন ছিল এক দিন।
সূতার আঁশের মত পৃথিবীর তলে
সেই সব চলে গেছে ;
কয়েকটা গাছ তবু মুখ দেখে অইখানে হাঙরের জলে
যখন পেঁচার পাখা করাতের মত
হাঙরের জল চিরে চলে যায়
তখন তাদের দেখি আমি
কখনও জলের শব্দে দিনের বাতাসে
তবু রোজ এক বার বুঝে লই
হাঙরের পারে আজ নাই আর যারা
কোথাও—কোথাও তারা বেঁচে আছে।

১৪

প্রান্তরের পথে ঠুঁটো তাল গাছ
—মরা নদীটির বাঁক—আর হাঁসশিকারীর গুলির আঘাত
লোনা মৃত কুকুরের শব ঘিরে এক রাশ শকুনের ভিড়
এই সব দেখি আমি—কথা ভাবি—ব্যথা পাই—চুপে অকস্মাৎ
দেখা যায় : সন্ধ্যার শালিখ তার খুঁজিতেছে নীড়
পাটনির নৌকায় এক দল চ'লে যায়—এখন বাড়িছে কি-না রাত
পাটনি চলিয়া যায়—আমি দেখা চাই প্রেতিনীর।

১৫

শীতল মুচি
তাকে আমি ধরলাম
মাথায় টাক প'ড়ে গেছে

খাঁদা নাক
চোখ ঘোলাটে হয়ে আসছে
সাইলেনাসের মত।
পৃথিবীর রস সে চায় :
মদ—মেয়েমানুষ—বাঁশি—গ্রামোফোনের গান—রেডিও।
ফুটপাতে ব'সে যখন সে জুতো সেলাই করে
চর্বি ঘাঁটে
কেউ তা বোঝে না

আমার জুতো রি-সোল ক'রে সে ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল
আমি তাকে ধরলাম
তার কথা শুনি
তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি
দেখি...সাইলেনাস

কলকাতার মাঠে ঘাটে এরা অগণন
এই সাইলেনাসের দল
(যদিও জীবনে এরা এক ফোঁটা মদ পায় নি
না পেয়েছে মেয়েমানুষ)
শুধু তার খাঁদা নাক পেয়েছে এরা
আর ঘোলাটে চোখ
আর মাথার টাক
আর পৃথিবীর রস চেখে দেখবার স্পৃহা
বার্থকন্ট্রোল বা স্টেরিলিজেশনের বজ্রাঘাতে
এদের জন্ম যারা নাকচ করতে চায়
তারা কী নীরস !
কেমন অর্থহীন জিওমেট্রির মত !

ভগবান তবু জিওমেট্রি নয়
পোলিটিক্যাল ইকনমিস্ট নয়
প্রফেসর নয়
দেবতা রসের
শীতল মুচির দেবতা সে।

শীতল মুচি

সাইলেনাস : গ্রিক পুরাণে স্যাটুরয়-রা (Satyrs) ডায়োনুসাস (Dionysus)-এর সহচর, অরণ্যানী ও পর্বতমালার দৈব তারা ; বিশেষ ভাবে তারা প্রজননের প্রতিভাটা সঙ্গে জড়িত। কিম্ভুতকিমাকার চেহারা তাদের ; চেহারার বেশির-ভাগটা তাদের মানুষের মতো, অধিকন্তু তাদের কাছে জন্তুজানোয়ারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—ঘোড়ার লেজ, ছাগলের পা—এ রকম। তাদের কামনাবাসনাটা খুব তীব্র, প্রবল তাদের ফুর্তি করার বাতিক। সাইলেনাস এ রকম একজন স্রাটুরয়। একাধিক সাইলেনাসের কথা কবিরা বলেছেন অবশ্য ; তাদের চেহারা ও চরিত্রের ঘরানা প্রায় সবারই এক রকম, একজন মাতাল ও বৃদ্ধ স্যাটুরয়। এদের কখনো-কখনো ডায়োনুসাসের শিক্ষক বলা হয়েছে, বলা হয়েছে সঙ্গীতের ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের লোক। ঝর্নার জলের সঙ্গে মদ মিশিয়ে খাইয়ে রাজা মিডাস একজন সাইলেনাসকে ধরে ফেলেছিলেন ; সাইলেনাস তাঁকে এই জ্ঞানটা দান করেছিলেন যে, না জন্মানোর চেয়ে সুখের জিনিস আর নেই ; আর যদি জন্মে থেকেই থাকো, তাহলে যত তাড়াতাড়ি পারো, মরে যাও।

১৬

প্রেসিডেন্সি কলেজ আমাকে ডাকল
সন্ধ্যার অন্ধকারে
তার উঁচু উঁচু গাছের ইসারা নিয়ে
কয়েকটা চির চাকির মত গাছগুলোর মাথায় ঘুরছে
নেমে পড়ছে তারা
অনেক পাখি ডালপালার ভিজে নরম হৃদয়ে স্থান পেল
কলেজ আমাকে তেন্নি ক'রে বুকে নিতে চায় যেন
তার শরীরের ঘ্রাণ অন্ধকারকে ভ'রে রেখেছে

এই অন্ধকারে একটু স্থির হয়ে থাকি
তার সন্তানেরা তার থেকে ঢের দূরে
ঢের ঢের দূরে
আমিও তার এক সন্তান : ঢের পুরোনো...ঢের প্রতারিত
এক দিন সে আমাকে ছেড়ে দিয়েছে—সে কত বছর আগে ?
তার পর অনেক দেবতার পেছনে আমি ঘুরেছি—অনেক পথে
—অনেক বিশ্বাসে

আজ আমি ব্যস্ত নই
চমৎকার ক্লান্তি ও সরলতা নেই আর
অস্থির জীবনের আহ্বানের থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে এনেছি আমি
অন্ধকারের ভিতর নিঃশব্দ এই ধূসর দেয়ালগুলোর মত
আমারও জীবন বিমর্ষ—একাকী—স্থগিত—
আমারও জীবন অসম্বৃত—অগোচর—শীতাক্ত
এই ধূসর দেয়ালগুলোর মত
এই নিঃশব্দ দেয়ালগুলোর মত
আমার এই কলেজের
এই কলেজ : তার শরীরের ঘ্রাণ অন্ধকারকে ভ'রে রেখেছে
(এই অন্ধকারে একটু স্থির হয়ে থাকি)

প্রেসিডেন্সি কলেজ

১৭

এমনি তো দেখা যেত : এ বিবর্ণ আরশির মর্মস্পর্শে দাঁড়ায়ে গোপনে
হয়তো বাঁধিছে বেণী, খোঁপার ভিতরে দিন গুণিতেছে ধীরে,
হয়তো মাখিছে ক্রিম—জাপানি ফেরির কেনা—
সেই সব দরিদ্র অঘ্রাণ

সজীব মৃত্তিকাগন্ধ হয়ে আজ মুকুলিছে সুদূর শিশিরে

কিন্তু এই আরশিতে স্বাদ পায় এক ফুটো বায়ুপায়ী মাকড়ের জাল :
একটি মাকড় শুধু ম'রে মমি হয়ে গিয়ে তবুও মরিছে চিরকাল।

১৮

ধীরে ধীরে—ক্রমে—তবু ঢের বেশি ক্লোরোফর্ম দাও তারে
অকস্মাৎ আবিষ্কার হয় যেন সমুদ্রের পারে অন্ধকারে
টাহিটি মেয়ের মত ;—তবুও বৃহৎ সূর্য চিনাদের লণ্ঠনের মত
কমলারঙের স্বাদে নিভিতেছে ঢেউয়ের ভিতরে
পৃথিবীর শেষ কালো গম্বুজের চিকীর্ষারে পিছে ফেলে
তোমারে বাতাস টেনে নিয়ে যাবে ধীরে ধীরে
(তৃতীয়ার প্যারাফিন-চাঁদটিরে জ্বেলে)
মৃতদার সারসের লঘু এক পালকের মত

তা না হলে, হে যুবক, এই বয়স্কার প্রেমে
তুমি হবে কী ক'রে বিরত।

১৯

এখন অনেক রাতে বিছানা পেয়েছ
নরম আঁধার ঘর
শান্তি নিস্তব্ধতা
এখন ভেবো না কোনও কথা
এখন শুনো না কোনোও স্বর
রক্তাক্ত হৃদয় মুছে

ঘুমের ভিতর
রজনীগন্ধার মত মুদে থাক।

২০

চারিদিকে ন্যুব্জ সব অক্ষর ছবি
(মাঝে মাঝে দু' চারটে ইন্দ্রপতন
জীবদের স্মরণ করায়ে দেয়
কেউ কেউ করেছিল অস্পষ্ট অব্যয়ে আরোহণ)
তা ছাড়া ভূমার কোনও প্রতিভাস নাই
নরকেরও নাই কোনও স্পষ্ট প্রদর্শনী
কারণ, এখনও সব বিপর্যয়ে
রাত্রিচর বিড়ালের চক্ষুর মণি

শুভ লাঞ্ছনের মত মনস্বীর টেবিলের পাশে
বিচারকদের ধুম্র পরচুল ঘিরে
অথবা ফুটন্ত জলে যে সব ডিমের মৃত্যু
সেই সব চেতনার তীরে।

২১

"তুমি
কোনও এক মৃত মুখ দেখেছ কি
কোথাও নদীর ধারে পাড়াগাঁয়
পউষের চাঁদ?"

"আমি?
এখন ধানের ক্ষেত মৃত
মড়ার মুখের 'পরে কাপড়ের মত

এ কুয়াশা
এখন পাখির গান মরে গেছে
ডিম নাই
বীজ নাই
প্রেম নাই
আশা নাই কিছু
পউষের নিস্তব্ধ আকাশ
ভালোবাসি তবু
তুমি আছ বলে।”

২২

মাছির মতন
করি গুঞ্জরণ ;
পৃথিবীর সব মধুবিন্দু ফুরুলে
(মৌমাছিদের মত পোড়ো ভিটের সর্ষে ফুলে ফুলে)
আজও গাই গান ;
তোমার সন্ধান
তবু নেই—নেই—

গান নাই—থেমে থেমে কার্পেট বুনি ;
সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনি ;
তোমারই পায়ের শব্দ—জানি আমি—তবু—
এ গান শুনতে তুমি আসবে না কোনও দিন ;
আসবে না কাছে ;
সেই প্রেম,—বাসনা, প্রেমের শিশু—আজ মরে গেছে।
আসবে না তুমি।
চেরাপুঞ্জীর মেঘ জড়ো ক’রে একটি অপার মরুভূমি

সৃষ্টি করতে গিয়ে সময় ব্যর্থ হয়ে মানুষের হৃদয়ের কাছে
দেখেছে সে মরুভূমি আর সেই মেঘ পাশাপাশি শুয়ে আছে।

২৩

আমি
অনেক বিয়োগ মৃত্যু বুঝিয়াছি—বেদনা গভীর
অনেক জেনেছি আমি—তবু স্তব্ধ স্থির
র'য়ে গেছি
শুধু—
অন্ধকারে শেষ রাতে এক দিন ঘুম ভেঙে যায়
সারা রাত পাশাপাশি শুয়েছিল কে যেন বিছানায়
সারা রাত পাশাপাশি একটি বছর ধ'রে, হায়
তবু তার মুখ আমি দেখি নাই—চাই নাই
আমি ভালোবাসি নাই তারে
হিম—কষ্ট—অন্ধকারে তার উষ্ণতারে।

কোথায় যে চ'লে গেল ? আমারই বিধবা যেন—সুন্দর একাকী
ভালোবেসেছিল যারে—সে যে ছায়া—সে যে মৃত—মৃত, মৃত না-কি !
সংসর্গ তাহারে খোঁজে—ভালোবাসা খুঁজে যায়—তারপর কুড়ানির মত
গরিব বিধবা মোর, হে বছর, শুধু পাতা শুধু খড়ে তৃপ্তি পেয়েছ ত ?

২৪

যেখানে মৃতরা সব বৈতরণী পার হ'ল, আহা,
তার পর অন্ধকারে ডুবে গেল সব
যেখানে ফড়িং এক গিয়েছিল পথ খুঁজে
ডানা দিয়ে করেছিল মৃদু কলরব

কেন যে, তা ফড়িঙই তা জানে
সোনালি বিকাল মেঘ ঘাস নদী জানে শুধু তাহা
আমিও জানিব শুধু যেই দিন চ'লে যাব
যেখানে মৃতরা সব বৈতরণী পার হ'ল, আহা !

২৫

অন্ধকারে অবিরল এই ট্রেন চলে
হাজার হাজার মাইল পথ শেষ হ'লে
মা যে কত দূরে রবে—রবে কত পিছে
মা যে এই শীত রাতে—আকাশের নিচে
একখানা লাঠি ভর দিয়ে শুধু হাঁটে
এত নদী ঝোপ বন অন্ধকারে যান
কোথায় মা রবে তুমি
চাই যদি আবার তোমারে
তোমারে খুঁজিতে হবে—এই ঝোপ—মাঠ—অন্ধকারে।

২৬

এক দিন রেশমের ফিতা দিয়ে আমার যে চিঠিখানা রেখেছিলে বেঁধে
আমারই বুকের সাথে যেন আছে ; তুমিও মসলিন যেন পশমের তুমি
আমার সে চিঠিগুলো—গুলি খাওয়া পায়রার পালকের মত যেন কাঁদে

তোমার বেগুনি-নীল জানালায়, এই ক্লান্ত জীবনের শেষ মরুভূমি
ফুরায়েছে এই বুঝে স্থির হ'ল ; তুমি ছিলে রূপ শান্তি ক্ষমা প্রেম সব ;
অনেক লিখেছি তাই—হৃদয়ের ভাষা ছিল সে-দিন শিশুর ঝুমঝুমি ;

তুমিও তো শিশু ছিলে—আমার চিঠির সেই শালিখ-শ্যামার কলরব—
তাই ভালোবেসেছি যে—জ্ঞান তবু বেড়ে ওঠে—রেশমের ফিতা খুলে তাই
গালে হাত দিয়ে তুমি ব্যথা নয় মৃত্যু নয়—জীবন করেছ অনুভব ;
নতুন জীবন, আহা ; পুরোনো চিঠির ফাইল তাই পুড়ে হয়ে গেছে ছাই।

২৭

প্রাইভেট টিউটর একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে গিয়ে বসেছে
পাশে ছেলেটি
ছেলেটিকে ছ' বছর পড়িয়েছে সে
কাল ছেলেটির 'এগজামিন'
তার পর ইউনিভার্সিটির থেকে বেরিয়ে যাবে সে
আর ফিরবে না
একেবারে জীবনের ভিতর ভিড়ে যাবে এই যুবক
যে জীবনের জন্য লালসা মাস্টারের মনে জেগে উঠতে পারে
কিন্তু সে জীবনের ভিতর মাস্টারের কোনও প্রবেশ নেই
চার মাস পরে—ছ' মাস পরে—এই কোঠায় এই সেক্রেটারিয়েট টেবিল থাকবে
চেয়ার—সোফা—আলমারি—ছবিগুলো থেকে যাবে
জানালার পাশ দিয়ে কামিনীর ডালপালা তখনও এম্নি নড়তে থাকবে
সোনালি চিলটা এম্নি চুপে চুপে আকাশ থেকে নেমে
                    চেৎলার দিকে বেহালার দিকে উড়ে যাবে
সন্ধ্যায়
কিন্তু তবু এ-সবের আস্বাদ বদলে যাবে
যদিও এ সোনালি চিল কিছু নয়
এমন সন্ধ্যা কিছু নয়
কামিনী গাছটা টিম্বার হবারও উপযুক্ত নয়
এই ছেলেটি
প্র্যাকটিক্যাল

অনেক দিনের সুবিধাবোধের রক্ত এর শরীরে
না জানি ছ' মাস পরে—দু' বছর পরে
এই নিরিবিলি ধূসর কামরাটিকে—বাহিরটাকে—আকাশটাকে
কেমন ওক প্যানেল ও জিল্যান্ডার পালিশে ভদ্রসদ্র ক'রে তুলবে সে
সবার হয়ে ভাবছে মাস্টার
কামিনী গাছটা ভাবছে

২৮

স্টিমারের তৃতীয় ক্লাশ ডেক থেকে এই সব বোঝা যায় :
জীবনের বিমর্ষতা "আজও তুমি তৃতীয় ক্লাশ ?"
সিন্ধুর তিমিরের মত জাহাজের প্রাণ
পদ্মার উপরে ;—যেন দূর-তিমির আহ্বান
শুনেছে সে ; —আমিও শুনেছি যেন—আর কেউ শোনে নি কি ?
কম্বলের গভীর আরাম—ঘুম—অন্ধকার চারিদিকে
শুধু এক পাখি
কেঁদে ওঠে ; বাটলার গলা ছিঁড়ে ফেলেছে তাহার
তার পর শুধু হিম—শুধু ঘুম—শুধু অন্ধকার
অন্ধকার বাটলার—আর তার পাখি
জাহাজ তিমির মত—আমিও আমার মত না-কি ?
যেন : তিমি—অন্ধকার—বাটলার—কিম্বা তার পাখি !

থার্ড ক্লাশ ডেকে

২৯

ছোট পাখি, পৃথিবীতে আছ তুমি এই ভেবে এক দিন আমি
তোমার এ জানালায় দেখা দেব—হয়তো বনের জ্যোৎস্না এসে
শালের নরম শাখা মনে করে তোমার শরীরে গিয়ে মেশে

তখনও সবুজ ভূমি—মখমল—বৈতরণী নদী থেকে আমি
তবুও ব্যথার গন্ধ আনি নাই ; বেদনার চেয়ে ঢের দামি
ভালোবাসা ; তা-ই নয় ? এক দিন পৃথিবীতে এসে ভালোবেসে
সে-সব জেনেছি আমি—আমিও জ্যোৎস্নার মত মৃদু ঢেউয়ে ভেসে
যেন এক নক্ষত্রের স্বর্গ থেকে আসিব ঘুঘুর মত নামি

তোমার এ জানালায় ; সে দিন মরণ যাবে মন থেকে মুছে
যেন কেউ মরে না ক'—হাতে হাত ধ'রে আছি—যেন ভালোবাসা
জ্যোৎস্না আর নক্ষত্রের থেকে এই শান্তি পায়—শান্তি, স্বপ্ন, আশা
আমরা বেদনা শুধু বার করি, মাটির ভিতর থেকে খুঁচে
কেন খুঁড়ি ? খুঁচি, আহা ? যখন শিরিষ শাল জ্যোৎস্না আর তুমি
বলিতেছ, শান্তি আছে—স্বপ্ন আছে—কেন দেখি মৃত্যু মরুভূমি !

৩০

হাড়ের চিরুনি দিয়ে তোমার মাথার থেকে খুলে
সব চুল টেনে দিও হৃদয়ের 'পরে
ডেকে নিও সব ঘুম চোখের ভিতরে
শিয়রে—পায়ের থেকে কাঠি রেখো তুলে

মোমের মতন ফেনা গলিতেছে তখন সাগরে
বালির মতন খ'সে সবুজ জলের তলে খুঁজে
তোমারে দেখিব আমি আছ চোখ বুজে
তখন সাতটি তারা আকাশের 'পরে।

৩১

কখনও আলোর থেকে—বেশি আমি বিকালের অন্ধকার থেকে
যে সব 'ড্রিমে'রে ডেকে করিয়াছি খেলা
আমার হৃদয় থেকে ম'রে যায় তারা এই বেলা
চিকন চুলের মাথা আমার বুকের 'পরে রেখে
আলো—অন্ধকার—আর চাই না ক' আছে
বাদুড়ের মত ডানা উড়ে যাক ডানার পিছনে
বনের ভিতর থেকে অন্য এক বনে
তাহাদের স্বপনের অবসর আছে

৩২

অনেক ঘুমের মাঝে যখন শরীর ছেড়ে হৃদয় চলিয়া যায় ভেসে
বসন্তের পরিচ্ছন্ন রাতে এক সমুদ্রের ধারের বিদেশে
আমি স্বপ্ন দেখিলাম সুস্থ এক মানুষের মত,—
কে যেন যেতেছে মরে—হৃদয়, কোথায় তারে দেখেছ বল ত' !
বুকের উপরে ভিজে কাপড়ের মত তার মুখখানা—শাদা—
সিন্ধুর ফেনার থেকে কারা তারে করেছে আলাদা।
সমুদ্রের 'গাল' তবু তাহার মাথার চারি পাশে
ভেসে চলিতেছে যেন সাগরের মতন বাতাসে।
তবুও মরার মুখে যেন ঢের মাছির মতন
কাদের হাতের কাদা নষ্ট ক'রে দিল তার স্তন
মাটির ভিতরে কারা রেখে গেল তারে
শাদা গোলাপের গন্ধ ভাসিতেছে যেখানে আঁধারে
একখানা চেনা মুখ নাই তার শরীরের পাশে
কেউ নাই—মোমের মতন শাদা শরীরের রোম ভালোবাসে

যেইখানে স্বপ্ন তবু নক্ষত্রের মত মনে হয়
সেইখানে কারে ম'রে যেতে তুমি দেখেছ, হৃদয় !

৩৩

সে এক সন্তান লয়ে কোথায় বহিয়া গেছ তুমি আজ, মাতা
সন্তান আমার নয়, তবু তুমি এক দিকে নিয়ে আছ তারে
আমারও তাহার কথা মনে পড়ে এক বার—তুমি জান না তা
যখনই তোমার কথা ভাবি আমি নক্ষত্রের নিয়মে আঁধারে
কোঁকড়া নরম চুল মনে পড়ে তোমার সে চুলের মতন
তাহার মায়ের মাই ঠোঁটে নিয়ে চোখে ঘুম জ'মে ওঠে তার
চিতার ছানার মত হঠাৎ চাঁদের তরে কাঁদে তার মন
তোমার মায়ের গলা ভ'রে ওঠে আদরের সোহাগে আবার

এই সব জানি আমি : অন্ধকারে এই বসন্তের রাতে
এই সব ভাবি আমি ;—যেমন ভেবেছি আমি শীতের বাতাসে
হেমন্তের সন্ধ্যায় ;—অথবা যখন আমি গিয়েছি ঘুমাতে
অথবা আবার জেগে যখন এ জীবনের সব মনে আসে।

৩৪

জমি উপড়ায়ে ফেলে অন্ধকারে চ'লে গেছে চাষা
ঘাসের মাটির গন্ধ চারিদিকে—বীজের আঘ্রাণ
আমাদের হৃদয়ে আজ অঙ্কুরের জেগেছে পিপাসা
এই সুস্থ মাঠে শুয়ে হব আমি হেমন্তের ধান
এক দিন

আমি সব ছেড়ে দিয়ে এই স্তব্ধ জঙ্গলের পাশে
হাড়ের মতন শাদা চাঁদের মুখের দিকে চেয়ে
দুলে দুলে স্বপ্ন শুধু দেখে যাব শীতের বাতাসে
এই সুস্থ্ মাঠে এসে ধানের মতন প্রাণ পেয়ে
এক দিন

শরীর উঠিবে ভ'রে এই মেঠো ইঁদুরের ঘ্রাণে
পেঁচার পাখার গন্ধে—পালকের—রোমের বাতাসে
আমি আর যাব না ক' কোনও এলডোরেডোর পানে
হেমন্তের ধান হয়ে রব স্তব্ধ জঙ্গলের পাশে
এক দিন

এলডোরেডো : আক্ষরিক অর্থে, স্প্যানিশ আমেরিকার এক কিংবদন্তীর রাজ্য বা নগর, সোনাদানা হিরেজহরতে বোঝাই ; গল্পটা ষোড়শ শতকের অভিযাত্রীদের এই স্বপ্নের দেশের সন্ধানে টেনে নিয়েছিল। শব্দটার অর্থ স্পেনীয় ভাষায় 'সোনায় মোড়া (কোনো জিনিস)' আর এখন কথার লবজে শব্দটার মানে দাঁড়িয়ে গেছে 'সবপেয়েছির দেশ', সব বাস্তব সার্থকতার দেশ।

৩৫

এক দিন ঘুম ভেঙে গিয়েছিল—চাঁদে
কারা যেন ভিড় ক'রে কাঁদে
চাঁদ থেকে চাঁদে
বুনো হাঁস নয়
কেন কাঁদে ?
কেন এই ভয় ?
শরবন অন্ধকার ঘাসের পিছনে
হাত—নখ—স্টিল—শান্ত, স্থির
কোনও হাঁস দেখে নি ক' তাহা

তবুও হয়েছে অধীর
গুলি তারা দেখে না ক’
প্রাণ তারা বোঝে না ক’
তবু চমকায়
কী দেখিছে, হায়
দেখে শুধু প্রাণ চ’লে যায়
প্রাণ চ’লে যায় !

৩৬

ভালোবাসা এক দিন আসে শুধু—মাঠের বিবর্ণ মৃদু খড়
এক দিন ভালো লাগে—তখন জীবন কারু সমারোহ নয়
তখন মৃত্যুর কথা আগুনের পাশে ব’সে ভাবি পরস্পর
নতুন মৃত্যুর রূপ—উজ্জ্বলতা—অন্ধকার—ক্লেশ—গ্লানি—ভয়—
আজ তা নতুন মৃত্যু নয়।

যেই ধান ছিঁড়ে যায় আজ রাতে—ডানা ভাঙে যে ফড়িং—পাখি
তাহারা নিকটতর ; পৃথিবীর বিধবারা ব্যথা পেয়ে এদের কুড়ায়
ভালোবাসে—গল্প বলে
আবার নতুন নীড়ে—পৃথিবীর জননীরা নতুন জোনাকি
কৌটোয় ভ’রে রেখে খেলা করে, (হায়,) যায়—ভুলে যায় !

৩৭

আজ এই অন্ধকারে কোন কথা ভাবিতেছে পৃথিবীর সকল নেশন
কোন ব্যথা তাহাদের ? ব্যথা না কি ? অপচয় জীবনেরে অসম্ভ্রম না কি ?
জীবনের অসম্ভ্রম ;—জীবন কী ? অন্ধকার মাঠে এসে জেনেছে তা মন

আমাদের মাঠে এই ; এইখানে ডিম পাড়ে নীড় বাঁদে তাই যে জোনাকি
এখানে রয়েছে শান্তি জেনেছে সে ; মানুষের ঢের আগে কীট পাখি ঘাস
জানে তাহা ; নদীর এ পাড়ে এই উঁচু উঁচু শালের ভিতর থেকে পাখি
অনেক নীরব পাখি জেগে আছে—এই শান্ত রাত্রি ভ'রে দেখিতেছে নক্ষত্র আকাশ
হেলিওট্রোপের মত পৃথিবী ছড়ায়ে আছে মৃদু হয়ে—এই ছবি ঘ্রাণ
ইহারে জীবন বলে, জানিতেছি ; মানুষের মতলব—রক্ত—সর্বনাশ
তবু কেন জীবনেরে মোচড়ায় ? নিজে মরে—কেন মারে নেশনের প্রাণ
পৃথিবী কি শান্ত নয় ? মানুষের ব্যতিরেকে রয় না কি নরম সুন্দর
নরম গভীর, আহা, রয় তারা,—রয় তারা ; স্নিগ্ধ হয় চোখ চুল কান

আমার আঙুল রোম— এ জীবন ; জ্ঞান নয়, জ্ঞান নয়—করেছি যে ভর
শান্তির উপরে আমি ;—রেখেছি আমার মাথা ঘাস ছায়া শিশিরের 'পর।

হেলিওট্রোপ : দক্ষিণ আমেরিকার হেলিয়োট্রোপিয়াম জাতের এক রকম গুল্ম, যা, প্রকার ভেদে, সূর্যের দিকে বা সূর্যের বিপরীতে মুখ ফিরিয়ে বেড়ে উঠতে ভালোবাসে ; ছোটো ছোটো সুগন্ধি ও নীলাভ-লালচে রঙের অজস্র ফুল ফোটায়। সেই থেকে হেলিয়োট্রোপ রংটা হয়েছে হাল্কা বা মাঝারি বা উজ্জ্বল বেগুনি থেকে মাঝারি বা গাঢ় লালচে-নীল যে কোনও রং।

৩৮

১.
এইখানে
চারিদিক থেকে
সমুদ্র আসছে
কোথায় যে এই সমুদ্র সব ছিল !
তারা সব মাঝসমুদ্রে ছিল
পৃথিবীর আর কোথাও তাদের পাওয়া যাবে না।

২.

এইখানে অসংখ্য সমুদ্র সিংহের মত কেশর তুলে
বাতাসে বাতাসে হাউ-হাউ ক'রে ঘুরছে ;
প্রাণ কেঁপে ওঠে ;
কোন গোপন গুহার থেকে হুঙ্কার তুলে বেরিয়ে আসছে তারা
এই সিংহীদের সুন্দর ভীষণ মুখ
এই দুপুরের রোদে
কী বিজন !
তাদের হুঙ্কার
কী নিস্তব্ধ !

৩.
এই অজস্র সমুদ্র
এক জন একাকী মানুষ শুধু
তুমি।

৪.
জীবন এখানে গভীর বিপদে ভরা
যে-দিন হঠাৎ জানালায় তোমাকে দেখেছিলাম
প্রথম
বিপদের থেকে বিপদের পথে এক মুহূর্তে
মাঝসমুদ্রের ভিতরে চ'লে এসেছিলাম না কি !

৫.
সেই থেকে মধ্যসমুদ্রের বিস্ময় আমাকে পেয়ে বসেছে
দূর থেকে দূরে—আরও দূরে
কোনও মাঝসাগরে
হে আমার হৃদয় !

৬.
যেখানে অসংখ্য সমুদ্র সিংহের মত কেশর তুলে
বাতাসে বাতাসে হাউ-হাউ ক'রে ঘুরছে ;
প্রাণ কেঁপে ওঠে ;
কোন গোপন গুহার থেকে হুঙ্কার তুলে বেরিয়ে এসেছে তারা
এই সিংহীদের সুন্দর ভীষণ মুখ
এই দুপুরের রোদে
কী বিজন !
তাদের হুঙ্কার
কী নিস্তব্ধ !

৩৯

এই এক পৃথিবী
যেখানে লোক ঘুরে ফিরে টাকার কথা বলে
আবার সেই পেটের ব্যবস্থার কথা
এক-এক জন লোককে দামি মনে হয়
সে খুব বেশি ইনকম-ট্যাক্স দিতে পারছে ব'লে
সে খুব ডাল, মাংস, মশলা, মদ, দুধ বা মধু
তার টেবিলে ছড়িয়ে রাখতে পারে ব'লে
এই সব শক্তিকে আমরা স্বীকার করি
মেয়েমানুষরাও এই সব পুরুষের জীবনের ব্যবস্থাকে ভালোবাসে
এবং তাদের দিয়ে সন্তান সৃষ্টি করে
তা না হলে
পৃথিবী এত দিনে ভ্যাগাবন্ডে ভ'রে যেত
মানুষের পোশাক পরিচ্ছদ হ্যাট কোট মোটর ডিনার ও প্রাসাদের উপকরণ
এইগুলোই শুধু
মেয়েমানুষের হৃদয়ে প্রেমেরও সঞ্চার করে

তার শরীরকে সৃষ্টির পাত্র ক'রে তোলে
তার সন্তানেরা ঘুরে ফিরে সেই টাকার কথা বলে তাই
চাকরির কথা, মাইনের কথা, ইনক্রিমেন্ট, রয়্যালটি, কমিশন ও ইন্টারেস্টের কথা
চাল ডাল দুধ বাড়িভাড়ার কথা
একটা টাকাও বেশি পেয়ে খানিকটা খাঁটি আনন্দের কথা
একটা টাকাও কম পেয়ে খানিকটা খাঁটি বিষণ্নতার কথা
এই সব আন্তরিকতা নিয়ে
এই পৃথিবী
Bonafide

৪০

নিরাশ হোয়ো না
জীবন তোমার সিদ্ধআর্থের মত হ'ল না
কিম্বা সলোমনের মত হ'ল না
কিম্বা ওমরের মত হ'ল না
এই ভেবে হতাশ হবার মত কিছু নেই
আমি জানি
আজকের ভোরের এই রোদ—সবুজ ঘাস—শিশির
সিদ্ধার্থের মোক্ষের চেয়ে যশের চেয়ে আমার কাছে ঢের দামি।

সলোমনের হারেম এখন মৃত
কিন্তু তুমি উনিশ শো উনত্রিশের মেয়েমানুষ বেঁচে রয়েছ
আরও অনেক দিন থাকবে
অনেক বিস্ময়ের রোমহর্ষ জাগিয়ে
ওমরের কবিতা আজ ডি-লুক্স এডিশনের জাদুঘরের ভিতর চলে গেছে
ওমরের হাড় জিওলজির স্তরের ভিতর

কিন্তু আমার কবিতা এখনও
পাবলিশারের স্পেকুলেশনের জিনিস মাত্র নয়
আমার হৃদয়ের নিত্যনতুন চমক—আবেগ—আবিষ্কার
আমি বেঁচে রয়েছি
তুমি বেঁচে রয়েছ
জিওলজি আমাদের ঢের পিছে
আমার কবিতার ডি-লুক্স এডিশন যখন বেরুবে
তখন আমার হাড় জিওলজির প্রয়োজনীয় স্তরের ভিতর চ'লে গেছে
আমি সিদ্ধার্থের মত হয়ে গেছি
সলোমনের মত হয়ে গেছি
ওমরের মত হয়ে গেছি
এই সব নাম শুধু ;—নাম—নাম—নাম
আজকের ভোরের একটা চড়ুইয়ের কাছেও তার
ঘাস রোদ শিশিরের দাম
কি এ-সবের চেয়ে বেশি না ?
চড়ুই প্রতি মুহূর্তেই রোদের থেকে রোদে লাফাচ্ছে
পচা হাড় প'চে যাচ্ছে শুধু !

সলোমন : শব্দটার হিব্রু অর্থ শান্তির মানুষ। হিব্রুদের রাজা (খ্রি. পূ. ৯৭২-৩২)। পিতা ডেভিড। তাঁর রাজত্বের ভালো দিকগুলো : ব্যবসাবাণিজ্যের রমরমা, শান্তি, স্থাপত্যশিল্পের প্রভূত উন্নতি (যথা, জেরুজালেমের মন্দির) ; খারাপ দিকগুলো : দারুণ খরচাপাতি করে জাঁকজমকের বাতিক, প্রজাদের ঘাড় ভেঙে কর আদায়, উপজাতীয়দের বিদ্রোহ। বাইবেলের অনেকগুলি বইয়ের জনক বলা হয় তাঁকে : সলোমনের গীত, পুরোহিতদর্পণ, নীতিবাক্য, জ্ঞানী উপদেশাবলি, ইত্যাদি। সলোমনের ভক্তিগীতি বলে চালু যেসব গান, সেগুলিকে অবশ্য ভেজাল বলেছেন কেউ কেউ। কিংবদন্তী বলে, খুবই জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি ছিলেন তিনি, বিয়েও করেছিলেন অনেকগুলি, হারেম বানিয়ে ফেলেছিলেন একটা।

ওমর : ওমর খয়্যাম (খ্রি. ১০৫০-১১২৩)। পারস্যদেশীয় কবি এবং গাণিতিক। ইসলামীয় দিনপঞ্জী বানিয়ে তুলতে তাঁর জ্যোতির্বিদ্যা খুব কাজে লেগেছিল, ঠিক কথা ; কিন্তু তাঁর রুবাই তাঁকে বিখ্যাত করে রেখেছে, এবং তার জন্যই তাঁকে আমরা মনে রাখি প্রধানত। তাঁর পাঁচ শো-র বেশি চৌপদী বা রুবাই ঈশ্বরে অবিশ্বাস, বেদনাবিধুরতা ও সুরা-সাকি-সঙ্গীতের জন্য কামনা-বাসনা-লিপ্সায় এমন শারীরিকতাময় হয়ে আছে যে, তাঁর উচ্চমার্গের জ্ঞানগম্যির কথাটা আর আমাদের মনে পড়ে না সচরাচর।

৪১

দুপুর গড়িয়ে গেল—ফাল্গুনের অপরাহ্ন বেলা
এল ক্রমে—মাঠ বেয়ে বহু দূর গেলাম একেলা ;
তার পর যেখানে মাঠের পাশে নিস্তব্ধ বিজন
মানুষ ঘুমিয়ে আছে কয়েকটি—চারিদিকে জাম বাঁশ বন
সে শ্মশানে দেখলাম কিছু ক্ষণ রৌদ্রের খেলা।

কোথাও পাখিও নেই—প্রাণীও নেই—কোথাও কিছুই নেই—নেই ;
তেরো শো আঠারো সালে অঘ্রানে—দুপুর-রাতে সেই
তোমাকে এখানে রেখে গেছলুম ;—তুমি
আজও এ মাটির পটভূমি।
তোমার শাশ্বত ধর্ম এই !
(শাশ্বত মানবীধর্ম এই !)

৪২

এখানে মানুষগুলো কথা আর বলে না ক' ; কোনও দিন বলবে না কথা ;
সারা দিন জল শুধু ছলছল ক'রে চলে—শ্মশানের কাঠনীরবতা
জাম কাঁঠালের হাওয়া শালিক শুকনি কাক ভেঙে ফেলে এক-এক বার ;
ঘুমন্তেরা কী যেন বলতে চায়—বলি বলি বলি ক'রে বলে না ক' আর ;
বাচাল মালতী ছিল, কথকঠাকুরও ছিল—আরও ঢের সনির্বন্ধতা
(মানুষের কথা ভুলে সারা দিন যেন মহাসাগরের কথা।)
এখানে ঘুমিয়ে আজ—সারা দিন যেন মহাসাগরের কথা।

৪৩

'ঘুমিয়ে রয়েছ তুমি ? চেয়ে দেখ এক বার—বেশি ক্ষণ নয়—
কয়েক মুহূর্ত শুধু তোমার সময়

নিতে চাই ;
সমাধির নীচে তুমি শুয়ে আছ—তোমাকে জানাই ;
যত দিন পৃথিবীতে ছিলে তুমি—উপেক্ষা করেছি আমি—দিয়েছি আঘাত ;
জানাতে এসেছি সেই ভুল আজ ;—' অন্তহীন ভূমিকার রাত
পৃথিবীর মানুষের রাত্রি তবু ; আমরণ ভালোবেসে তারে
ভারে কেটে গেছি আমি—মেয়েটি কেটেছে ক্ষুরধারে ;
আলো ভালো জেনে তবু নিস্তব্ধ শাশ্বত অন্ধকারে।

৪৪

এখন গাছের পাতা যেতেছে হলুদ হ'য়ে—এখন মাঠের পাতা হ'য়ে যায় বাদামি-খায়েরি ;
এখন ধানের রং হ'য়ে যায় গেরুয়ার মত ;
ঐ যে মাঠের কাছে
কারা সব পড়ে আছে
সময় তাদের কাছে এক দিন ছিল অনুগত।

আজকের কথা নয়—ত্রিশ বছর কেটে গেছে এই পৃথিবীর পথে—
অপরূপ মেয়েটিকে মনে হ'ত যেন সখা সুবলের মত,
দাণ্ডাগুলি কপাটির মোহে মুগ্ধ ছিলাম—সৌন্দর্যে প্রেমে নয় ;
তবু সে ছায়ার মত ফিরত আমার সাথে—এখনও ছায়ারই পরিচয় :
আজীবন ভুলে গিয়ে নিজের ছায়ার কথা ক্বচিৎ মনে হয়।

৪৫

খড়কুটো উড়ে যায় বিকেলের চকিত বাতাসে,
ধীরে ধীরে রোদ নিভে আসে ;

পাড়াগাঁর বালি ধুলো উড়ে যায় গোরুর গাড়ির পথে—চাকার আঘাতে ;
কার কী-বা এসে যায় তাতে।

এক জন চুপ ক’রে শুয়ে আছে দশ হাত দূরে ঐ মাটির ভেতর ;
এখনও জ্বলছে ছাই শরীরের ’পর ;
আর এক জন সেই ভোর থেকে আমগাছে ঝুলছেই—বিকেলের গরম বাতাসে ;
ছায়া তার দোল খায় ঘাসে।
ছ’ সাত বছর আগে এক দিন তবু এরা আকাঙ্ক্ষায় বেঁধেছিল ঘর ;
করেছিল পৃথিবীর নিরন্তরতায় নির্ভর।

৪৬

তোমাকে দিয়েছি ব্যথা এক দিন,—
সে-দিন বুঝি নি আমি—আজ তবু বুঝি ;
তোমার এ শ্মশানের অজস্র অদ্ভুত মঠ খুঁজে
এখানে এসেছি আমি,—
অন্ধ শূন্যের থেকে এক দিন তোমার গালের কালো তিল
জন্মে আজ অনন্ত অন্ধ শূন্যে কী গভীর নির্ভরশীল !

৪৭

বিকেল নেভার আগে আজ মনে হয় :
প্রেম কত স্বাভাবিক, তবুও বিচ্ছেদে ক্ষয় করলাম তোমার হৃদয় ;
আমি তা বুঝি নি আগে—তবু আজ আমি
বুঝেছি সমস্ত কিছু তোমার এ সমাধির পাশে চুপে থেমে।

সমাধির নীচে শুয়ে তুমি
মানুষকে হতবাক ক’রে দিয়ে মুখপাত্রীর পটভূমি

অনন্ত—অনন্ত কাল,—যদিও কোথাও আলো পাখি নেই, একটিও পাতা
গায় না ক'—নড়ে না ক' সমাধির নীচে মহানায়িকার মাথা।

৪৮

'মৃত্যুর নদীর পারে চ'লে গেছ তুমি কবে—কোনও কথা জেনে যাও নি ক',
শীত হয়ে গেছে কবে তোমার চিতার লাল ছাই।
কত দিন পরে আজ বৈশাখের ধুলো ঘাসে বিকেলে হৃদয়
শান্তির সমীপবর্তী হতেছে ক্রমেই—মনে হয়।
তোমাকে দিয়েছি আমি ব্যথা তিলে তিলে ;
তুমিও যে ব্যথা দিয়েছিলে
না জেনে এগিয়ে গেছ আজ তুমি—হয়তো জানলে
সমাধির নীচে ঘুম ভাঙবে তোমার।'
ব'লে অবিকার মনে বুঝলাম নারীও অবিকার।

৪৯

দরজায় কে দিল আঘাত :
তাই কি ভেঙেছে ঘুম ?—কোথাও তো কেউ নেই
নেমে গিয়ে উঠানের সমস্ত পউষ রাত
এলাম অনেক ক্ষণ ঘুরে ;
কেউ নেই,—
একটি রাতের প্রজাপতি শুধু পাক খেয়ে দরজায় পড়ে ভেঙেচুরে ;
তবু সে পতঙ্গ নয়—সে যেন এসেছে ফিরে এক দিন যে চ'লে গেছিল ঢের দূরে ;
ভাবতে না ভাবতেই প্রান্তরের অন্ধকারে আবার কোথায় পোকা চ'লে গেল উড়ে।

৫০

আকাশে নক্ষত্র আছে—ঢের আছে—তবু দূর প্রান্তরের পারে
ঐ কুঁড়েঘরে
যেই বাতি জ্বলে

সমস্ত নক্ষত্র মুছে ফেলে দিয়ে সে-ই যেন একা কথা বলে
          বিনাশের বুদ্ধি চারিদিকে
যে রকম অবিনাশ—তেমনি আশার মত রয়েছে সে টিকে।

৫১

এখানে ঘাসের 'পরে শুয়ে আছি—বিস্তীর্ণ প্রান্তর, যেন নেই পারাপার ;
আকাশের মত এই বিস্তীর্ণতার
বুকে শুয়ে মনে হয় : জীবনের স্রোত
আমারও হৃদয় থেকে কোনও দিন মুছবে না আর,—
যদিও ক্লান্তি আসে—যদিও মৃত্যুর অন্ধকার
ঘিরে ফেলে এক দিন ; যেই শূন্য নিরীশ্বর থেকে চ'লে আসে
এ সবুজ ঘাসগুলো বারবার পৃথিবীর ঘাসে
সে প্রান্তর, তোমাকে আমাকে ভালোবাসে।

৫২

এইখানে প্রান্তরের পরে বসে আছি ;
চেয়ে আছি রাত্রির পানে—ঐ নক্ষত্রের পানে ;
স্টিমারের সার্চ-লাইট আলো ফেলে পথের সন্ধানে
চ'লে যায় আরও দূর পথে।
আমারও হৃদয়ে আজ অন্বেষণ জেগে ওঠে—
     যেন কোন ব্যাপৃত জগতে
দক্ষিণ সমুদ্র থেকে ব্যথা বুকে ক'রে ফিরে এসে
বাংলার জাম ঝাউ হিজলের বনে উঁচু গাছে
লুপ্ত কোরালকে খুঁজে কোরাল-পাখিনী আজও আছে।

৫৩

এইখানে মাঝরাতে সাগরের পারে
আমার হৃদয় যেন সব চেয়ে শেষ দ্বীপ স্পর্শ করে গিয়ে ;
পেছনের চেনা চিহ্ন মূল্যের দরকার গিয়েছে ফুরিয়ে।
সমস্ত সাগর যেন শাদা এক পাখির মতন
ঘরে ফিরে ঘুমুচ্ছে ;—আর-এক সমুদ্র তবু মানুষের মন
কপাট খোলার শব্দ (সে সিন্ধুর) শোনা যায় দূর থেকে দূরে।

৫৪

শীতের বিকেল বেলা এইখানে কোনও শব্দ নেই।
সব সুর গিয়েছে ফুরিয়ে
এইখানে সমুদ্রের তীরে
আমার হৃদয় যেন সব চেয়ে দূর দ্বীপ স্পর্শ করে গিয়ে।

মনে হয়, কারা যেন কপাট খুলছে দূরে—আরও ঢের দূরে
যত দূরে যাও
আরও দূরে যেতে হবে—ধূসর কপাট সেই সব
আরও দূরে লুকোবে কোথাও।

৫৫

সমুদ্রের পারে বসে বিকেল বেলায়
সে এক মুহূর্ত আসে—সব শব্দ হ'য়ে যায় গভীর নীরব ;
কপাট খুলছে কারা আকাশ-রেখার পারে যেন ;
সেই সব কপাটের নির্জনতা কখনও করে না অনুভব

সমুদ্রকে ;—খুলে যায়—খুলে গিয়ে তারা
চোখের পাতার মত চুপে রুদ্ধ হয়।
তারপর পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখি
বিকল ঘড়ির মত ঘুরছে সময়।

৫৬

সমুদ্রের পারে এই—
মনে হল সব চেয়ে দূর দ্বীপ ; যেন আসন্নতা
গ্রীস ট্রয় রোম কাঞ্চী কুরুবর্ষ কোনও দিন বানায় নি যাকে
সেই এক প্রাসাদের সনাতন ব্যথা

আকাশরেখার পারে ফিকে নীল হ’য়ে
দেখা দেয় যেন ;
অবন্তী বিদিশা চীন বেবিলন মিশর কখনও
এ প্রাসাদ ভাঙে নাই কেন।

৫৭

তখন বিকেল গাঢ় হয় ;
নিঃশব্দ অগ্নির মত তখন আকাশ যেন নীল পিলসুজে।
আলো কেউ পায় নি কখনও সূর্যের আলো খুঁজে ;
(মনে হয়)—জন্ম যেন কখনও নেয় নি অন্ধকার ;
সে এক মৃতার সাথে মুখোমুখি বসেছে হৃদয়।

সেই নারী কলকাতা দার্জিলিং লক্ষ্ণৌ নৈনির ?
নদীর পারের ঘাসে ব’সে আছে স্থির ;

সেই নদী পৃথিবীর পথে আর নেই ;
আমি তবু তার তীরে গিয়ে দাঁড়াতেই
বিনুনির গন্ধ এল জ্যোৎস্না চৌধুরানীর।

৫৮

এখন গভীর রাতে আঁধারে বৃষ্টির গান শুনি।
এই ম্লান পৃথিবীতে এক দিন তুমিও তো ছিলে।
টেবিলে অনেক বই—বইয়ের পাহাড় মনে হবে।
এখন মোমের বাতি আস্তে জ্বাললে
ঘাস ধুলো বৃষ্টি আর কাঁঠালিচাঁপার টুনটুনি
আর হোয়েল্ডারলিন হাতে দেখব কি ব'সে আছ তুমি !

হোয়েল্ডারলিন : ফ্রীডরিশ হোয়েল্ডারলিন (খ্রি. ১৭৭০-১৮৪৩)। জার্মান কবি। ধর্মতত্ত্বটা পড়েছিলেন মন দিয়ে, কিন্তু যাজক হতে যাননি। ফ্রাঙ্কফুর্টে মাস্টারি করতে করতে নিয়োগকর্তা-মশাইয়ের ধর্মপত্নী সুসেট গনটার্ড-এর সঙ্গে পারস্পরিক প্রেমে পড়ে যান ; (সুসেট তাঁর কাব্যের দিয়োতিমা নাম্নী নারী) ; সুসেট গনটার্ড-এর পতিদেবতা দ্বারা ন্যায্য কারণে বিতাড়িত হন ; প্রথমে সুইজারল্যান্ড ও পরে বোর্দো-তে গিয়ে চাকরিতে লাগেন আবার। শরীরে-মনে অসুস্থ হয়ে পড়েন, খ্রি. ১৮০২-তে দেশে ফিরে আসেন ; বছর চারেকের মধ্যে উন্মাদ হয়ে যান পুরোপুরি, মৃত্যু পর্যন্ত সেই উন্মত্ততা আর কাটেনি।

জার্মান রোমান্টিক কাব্যের পুরোভাগে থেকেছেন কবিজীবনের শুরু থেকেই ; এক দিকে প্রাচীন গ্রিসের সার্থকতা-সফলতার দিকে আমর্ম ঝুঁকে থেকেছেন, আবার অন্য দিকে গ্যেটে-র 'ভের্থের' তাঁকে ঝুঁটি ধরে নাড়িয়েছে। লিখেছেন ধ্রুপদী শৈলীতে ও ছন্দে, আবার লিখেছেন মুক্ত ছন্দেও। ঈশ্বর ও প্রকৃতিকে এক ঠাঁই করে দেখেছেন ; অতীতের গ্রিস যে আর ফিরে আসবে না ভেবে মর্মাহত হয়েছেন ; মৃত্যুর অন্ধকার ও মানবজীবনের চিরন্তন হতাশা ও বেদনা-বোধের ছায়ায় নিজের কবিতাকে আলিপ্ত দেখতে ভালোবেসেছেন।

৫৯

এই নিম্ন পৃথিবীতে এক দিন তুমিও তো ছিলে।
টেবিলে এখনও বই—অনেক অপূর্ব চিন্তা—কথা।
আঁধারে মোমের বাতি এখন জ্বালালে

রাশি-রাশি চুলের কলঙ্কে যেন কার
দেখা যাবে হাড়ের চিরুনি
টানছে ব্যাকুল ভাবে—তেরো শো তিরিশে
যেমন টানত এক নিবিড় রমণী !

৬০

সে কোন মহিলাদের দেখি স্বপ্নে—চারিদিকে অন্ধকার ঘর ;
রুপালি গরিমা কাঁপে জ্বলে যেন হিরে তরকার—ঘুমের ভিতর ;
যত দূর চোখ যায় যেন কার মুখের ছবির মত—নদী ;
যেন কার মুখের ছায়ার মত স্তব্ধ অরণ্যেরা ;
রাত যেন লেবুর ফুলের মত নক্ষত্রের গন্ধ দিয়ে ঘেরা ;
শান্ত সব ; তবুও শান্তির কথা যেন অবান্তর :
কবেকার জীবনের এই সব লীন প্রতিচ্ছবির ভেতর।

৬১

বাইরের ডাকে আমি আজ আর কিছুতেই দেব না ক' ধরা ;
            র'য়ে যাব ঘরের ভিতরে।
এই ঘরে কারা আছে ?—কেউ আজ নেই ;
অনেক গভীর রাতে চাঁদ এলে বিছানার 'পরে
মনে হয় প'ড়ে গেছি জ্যোৎস্নার খপ্পরে।

এ বিছানা কথা কয়—সে যেন বাতাস, কৃষ্ণচূড়া ;
লক্ষ্মীপেঁচা, আমমুকুলের গন্ধ, ভাঁড়ের রগড়
জাগিয়ে উন্মুখ নিবিড় ক'রে রেখেছে এ ঘর।

কোথায় বাঘের চোখে পিঙ্গল-লোহিত
কঠিনতা খেলা করে ; মানুষ কোথায় হিতাহিত
ভুলে মানবত্বের মানে ফুরিয়ে ফেলছে অন্ধকারে ;
—এই দূর পৃথিবীর সে-সব হতাশা
এইখানে ডুবে যায় ; জ্যোৎস্নার আলোয়
কৃষ্ণচূড়ার ছায়া বিছানায় নড়েচড়ে ;—
যেন শাদা কালো সাগরের ওপারের ভাষা
এ পারকে জানিয়ে যাচ্ছে সেই মৃত মেয়েটির ভালোবাসা।

ধূসর পাণ্ডুলিপি

‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র। কলকাতা ১৯৩৬
‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ প্রথম সংস্করণের মুদ্রণ-বিবরণপত্র।

উৎসর্গ

বুদ্ধদেব বসুকে

ভূমিকা

আমার প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৪ সালে। কিন্তু সে বইখানা অনেকদিন হয় আমার নিজের চোখের আড়ালেও হারিয়ে গেছে : আমার মনে হয় সে তার প্রাপ্য মূল্যই পেয়েছে।

১৩৩৬ সালে আর একখানা কবিতার বই বার করবার আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল। কিন্তু নিজ মনে কবিতা লিখে এবং কয়েকটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করে সে ইচ্ছাকে আমি শিশুর মতো ঘুম পড়িয়ে রেখেছিলাম। শিশুকে অসময়ে এবং বারবার ঘুম পাড়িয়ে রাখতে জননীর যেরকম কষ্ট হয় সেইরকম কেমন একটা উদ্বেগ—খুব স্পষ্টও নয়, খুব নিরুত্তেজও নয়—এই ক-বছর ধরে বোধ করে এসেছি আমি।

আজ ন-বছর পরে আমার দ্বিতীয় কবিতার বই বার হল। এর নাম ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ এর পরিচয় দিচ্ছে। এই বইয়ের সব কবিতাই ১৩৩২ থেকে ১৩৩৬ সালের মধ্যে রচিত হয়েছে। ১৩৩২ সালে লেখা কবিতা, ১৩৩৬ সালে লেখা কবিতা—প্রায় এগারো বছর আগের, প্রায় সাত বছর আগের রচনা সব আজ ১৩৪৩ সালে এই বইয়ের ভিতর ধরা দিল। আজ যেসব মাসিক পত্রিকা আর নেই—প্রগতি, ধূপছায়া, কল্লোল—এই বইয়ের প্রায় সমস্ত কবিতাই সেইসব মাসিকে প্রকাশিত হয়েছিল একদিন।

সেই সময়কার অনেক অপ্রকাশিত কবিতাও আমার কাছে রয়েছে—যদিও ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’র অনেক কবিতার চেয়েই তাদের দাবি একটুও কম নয়—তবুও সম্প্রতি আমার কাছে তারা ধূসরতর হয়ে বেঁচে রইল।

আশ্বিন ১৩৪৩ জীবনানন্দ দাশ

নির্জন স্বাক্ষর

তুমি তা জান না কিছু, না জানিলে—
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে !
যখন ঝরিয়া যাব হেমন্তের ঝড়ে,
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে ?
অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার !
তোমার এ জীবনের ধার
ক্ষয়ে যাবে সেদিন সকল ?
আমার বুকের 'পরে সেই রাতে জমেছে যে শিশিরের জল,
তুমিও কি চেয়েছিলে শুধু তাই !—
শুধু তার স্বাদ
তোমারে কি শান্তি দেবে !
আমি ঝরে যাব, তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধরে সেইদিন পৃথিবীর 'পরে—
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য ক'রে !

রয়েছি সবুজ মাঠে—ঘাসে—
আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে-আকাশে ;
জীবনের রঙ তবু ফলানো কি হয়
এইসব ছুঁয়ে ছেনে !—সে এক বিস্ময়
পৃথিবীতে নাই তাহা—আকাশেও নাই তার স্থল—
চেনে নাই তারে অই সমুদ্রের জল !
রাতে রাতে হেঁটে হেঁটে নক্ষত্রের সনে
তারে আমি পাই নাই ; কোনো এক মানুষীর মনে !

কোনো এক মানুষের তরে
যে জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে !—
নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোনো এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে !

একবার কথা ক'য়ে দেশ আর দিকের দেবতা
বোবা হয়ে পড়ে থাকে—ভুলে যায় কথা !
যে-আগুন উঠেছিল তাদের চোখের তলে জ্ব'লে
নিভে যায়—ডুবে যায়—তারা যায় স্খ'লে—
নতুন আকাঙ্ক্ষা আসে—চলে আসে নতুন সময়—
পুরানো সে নক্ষত্রের দিন শেষ হয়,
নতুনেরা আসিতেছে ব'লে !—
আমার বুকের থেকে তবুও কি পড়িয়াছে স্খলে
কোনো এক মানুষীর তরে
যেই প্রেম জ্বালায়েছি পুরোহিত হয়ে তার বুকের উপরে !

আমি সেই পুরোহিত—সেই পুরোহিত !—
যে নক্ষত্র মরে যায়, তাহার বুকের শীত
লাগিতেছে আমার শরীরে—
যেই তারা জেগে আছে, তার দিকে ফিরে
তুমি আছো জেগে—
যে আকাশ জ্বলিতেছে, তার মতো মনের আবেগে
জেগে আছো—
জানিয়াছ তুমি এক নিশ্চয়তা—হয়েছ নিশ্চয় !
হয়ে যায় আকাশের তলে কত আলো—কত আগুনের ক্ষয় ;
কতবার বর্তমান হয়ে গেছে ব্যথিত অতীত—
তবুও তোমার বুকে লাগে নাই শীত

যে নক্ষত্র ঝরে যায় তার !
যে পৃথিবী জেগে আছে, তার ঘাস—আকাশ তোমার !
জীবনের স্বাদ লয়ে জেগে আছো—তবুও মৃত্যুর ব্যথা দিতে
পার তুমি ;
তোমার আকাশে তুমি উষ্ণ হয়ে আছো, তবু—
বাহিরের আকাশের শীতে
নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়,
নক্ষত্রের মতন হৃদয়
পড়িতেছে ঝ'রে—
ক্লান্ত হয়ে—শিশিরের মতো শব্দ ক'রে !
জাননাকো তুমি তার স্বাদ,
তোমারে নিতেছে ডেকে জীবন অবাধ,
জীবন অগাধ !

হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন—
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে ?—অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার !
তোমার আকাশ—আলো—জীবনের ধার
ক্ষয়ে যাবে সেদিন সকল ?
আমার বুকের 'পরে সেই রাতে জমেছে যে শিশিরের জল
তুমিও কি চেয়েছিলে শুধু তাই ! শুধু তার স্বাদ
তোমারে কি শান্তি দেবে !
আমি চলে যাবো—তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধরে সেই দিন পৃথিবীর 'পরে ;—
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য ক'রে !

মাঠের গল্প

মেঠো চাঁদ

মেঠো চাঁদ রয়েছে তাকায়ে
আমার মুখের দিকে—ডাইনে আর বাঁয়ে
পোড়ো জমি—খড়্-নাড়া—মাঠের ফাটল,
শিশিরের জল !
মেঠো চাঁদ—কাস্তের মতো বাঁকা, চোখা—
চেয়ে আছে —এমনই সে তাকায়েছে কত রাত—নাই লেখাজোখা।
মেঠো চাঁদ বলে :
'আকাশের তলে
ক্ষেতে-ক্ষেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে, ফসল কাটার
সময় আসিয়া গেছে—চলে গেছে কবে !—
শস্য ফলিয়া গেছে—তুমি কেন তবে
রয়েছ দাঁড়ায়ে
একা একা !—ডাইনে আর বাঁয়ে
খড়্-নাড়া—পোড়ো জমি—মাঠের ফাটল,—
শিশিরের জল !'
আমি তারে বলি :
'ফসল গিয়েছে ঢের ফলি,
শস্য গিয়েছে ঝরে কত—
বুড়ো হয়ে গেছে তুমি এই বুড়ি পৃথিবীর মতো !
ক্ষেতে ক্ষেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে কতবার, কতবার ফসল কাটার
সময় আসিয়া গেছে—চলে গেছে কবে !—
শস্য ফলিয়া গেছে—তুমি কেন তবে

রয়েছ দাঁড়ায়ে
একা একা !—ডাইনে আর বাঁয়ে
পোড়ো জমি—খড়া-নাড়া—মাঠের ফাটল,—
শিশিরের জল !’

পেঁচা

প্রথম ফসল গেছে ঘরে,
হেমন্তের মাঠে মাঠে ঝরে
শুধু শিশিরের জল ;
অঘ্রানের নদীটির শ্বাসে
হিম হয়ে আসে
বাঁশপাতা—মরা ঘাস—আকাশের তারা !
বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা !
ধানক্ষেতে—মাঠে
জমিছে ধোঁয়াটে
ধারালো কুয়াশা !
ঘরে গেছে চাষা ;
ঝিমায়েছে এ পৃথিবী—
তবু পাই টের
কার যেন দুটো চোখে নাই এ ঘুমের
কোনো সাধ !
হলুদ পাতার ভিড়ে ব’সে,
শিশিরে পালক ঘ’ষে-ঘ’ষে
পাখার ছায়ায় শাখা ঢেকে,
ঘুম আর ঘুমন্তের ছবি দেখে-দেখে
মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে
জাগে একা অঘ্রানের রাতে

সেই পাখি ;—
আজ মনে পড়ে
সেদিনও এমনই গেছে ঘরে
প্রথম ফসল ;
মাঠে মাঠে ঝরে এই শিশিরের সুর—
কার্তিক কি অঘ্রানের রাত্রির দুপুর !—
হলুদ পাতার ভিড়ে ব'সে,
শিশিরে পালক ঘষে-ঘষে
পাখার ছায়ায় শাখা ঢেকে,
ঘুম আর ঘুমন্তের ছবি দেখে দেখে
মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে
জেগেছিল অঘ্রানের রাতে
এই পাখি !
নদীটির শ্বাসে
সে রাতেও হিম হয়ে আসে
বাঁশপাতা—মরা ঘাস—আকাশের তারা,
বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা !
ধানক্ষেতে—মাঠে
জমিছে ধোঁয়াটে
ধারালো কুয়াশা !
ঘরে গেছে চাষা ;
ঝিমায়েছে এ পৃথিবী,
তবু আমি পেয়েছি যে টের
কার যেন দুটো চোখে নাই এ ঘুমের
কোনো সাধ !

শেষবার তার সাথে যখন হয়েছে দেখা মাঠের উপরে—
বলিলাম : 'একদিন এমন সময়
আবার আসিয়ো তুমি, আসিবার ইচ্ছা যদি হয় !—
পঁচিশ বছর পরে।'
এই বলে ফিরে আমি আসিলাম ঘরে ;
তারপর, কতবার চাঁদ আর তারা,
মাঠে মাঠে মরে গেল, ইঁদুর-পেঁচারা
জ্যোৎস্নায় ধানক্ষেত খুঁজে
এল-গেল !—চোখ বুজে
কতবার ডানে আর বাঁয়ে
পড়িল ঘুমায়ে
কত-কেউ !—রহিলাম জেগে
আমি একা—নক্ষত্র যে বেগে
ছুটিছে আকাশে,
তার চেয়ে আগে চলে আসে
যদিও সময়—
পঁচিশ বছর তবু কই শেষ হয় !—

তারপর—একদিন
আবার হলদে তৃণ
ভরে আছে মাঠে—
পাতায়, শুকনো ডাঁটে
ভাসিছে কুয়াশা
দিকে-দিকে, চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে—পথের উপর
পাখির ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা—কড়্‌কড়্‌ !

শসাফুল—দু-একটা নষ্ট শাদা শসা—
মাকড়ের ছেঁড়া জাল, শুকনো মাকড়সা
লতায়-পাতায় ;
ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাতে পথ চেনা যায় ;
দেখা যায় কয়েকটা তারা
হিম আকাশের গায়—ইঁদুর-পেঁচারা
ঘুরে যায় মাঠে মাঠে, ক্ষুদ খেয়ে ওদের পিপাসা আজও মেটে,
পঁচিশ বছর তবু গেছে কবে কেটে !

কার্তিক মাঠের চাঁদ

জেগে ওঠে হৃদয়ে আবেগ,—
পাহাড়ের মতো ওই মেঘ
সঙ্গে লয়ে আসে
মাঝরাতে কিংবা শেষরাতের আকাশে
যখন তোমারে !—
মৃত সে পৃথিবী এক আজ রাতে ছেড়ে দিল যারে !
ছেঁড়া ছেঁড়া শাদা মেঘ ভয় পেয়ে গেছে সব চ'লে
তরাসে ছেলের মতো—আকাশে নক্ষত্র গেছে জ্ব'লে
অনেক সময়—
তারপর তুমি এলে, মাঠের শিয়রে—চাঁদ—
পৃথিবীতে আজ আর যা হবার নয়,
একদিন হয়েছে যা—তারপর হাতছাড়া হয়ে
হারায়ে ফুরায়ে গেছে—আজও তুমি তার স্বাদ লয়ে
আর-একবার তবু দাঁড়ায়েছ এসে !
নিড়োনো হয়েছে মাঠ পৃথিবীর চার দিকে,
শস্যের ক্ষেত চেষে-চেষে

গেছে চাষা চ'লে ;
তাদের মাটির গল্প—তাদের মাঠের গল্প সব শেষ হলে
অনেক তবুও থাকে বাকি—
তুমি জান—এ-পৃথিবী আজ জানে তা কি !

সহজ

আমার এগান
কোনোদিন শুনিবে না তুমি এসে,—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে,—
তবুও হৃদয়ে গান আসে !
ডাকিবার ভাষা
তবুও ভুলি না আমি—
তবু ভালোবাসা
জেগে থাকে প্রাণে !
পৃথিবীর কানে
নক্ষত্রের কানে
তবু গাই গান !
কোনোদিন শুনিবে না তুমি তাহা, জানি আমি—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে,—
তবুও হৃদয়ে গান আসে !

তুমি জল, তুমি ঢেউ, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন
তোমার দেহের বেগ—তোমার সহজ মন
ভেসে যায় সাগরের জলের আবেগে !

কোন্ ঢেউ তার বুকে গিয়েছিল লেগে
কোন্ অন্ধকারে
জানে না সে !—কোন্ ঢেউ তারে
অন্ধকারে খুঁজিয়ে কেবল
জানে না সে !—রাত্রির সিন্ধুর জল,
রাত্রির সিন্ধুর ঢেউ
তুমি এক ! তোমারে কে ভালোবাসে !—তোমারে কি কেউ
বুকে করে রাখে !
জলের আবেগে তুমি চলে যাও—
জলের উচ্ছ্বাসে পিছে ধু ধু জল তোমারে যে ডাকে !

তুমি শুধু এক দিন—এক রজনীর !—
মানুষের—মানুষীর ভিড়
তোমারে ডাকিয়া লয় দূরে—কত দূরে !
কোন্ সমুদ্রের পারে—বনে—মাঠে—কিংবা যে-আকাশ জুড়ে
উল্কার আলেয়া শুধু ভাসে !—
কিম্বা যে আকাশে
কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
জেগে ওঠে—ডুবে যায়—তোমার প্রাণের সাধ
তাহাদের তরে !
যেখানে গাছের শাখা নড়ে
শীত রাতে—মড়ার হাতের শাদা হাড়ের মতন !—
যেইখানে বন
আদিম রাত্রির ঘ্রাণ
বুকে লয়ে অন্ধকারে গাহিতেছে গান !—
তুমি সেইখানে !
নিঃসঙ্গ বুকের গানে

নিশীথের বাতাসের মতো
একদিন এসেছিলে—
দিয়েছিলে এক রাত্রি দিতে পারে যত !

কয়েকটি লাইন

কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী—
আমি বহে আনি ;
একদিন শুনেছ যেসুর—
ফুরায়েছে,—পুরানো তা—কোনো এক নতুন-কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি, আমার মতন
আর নাই কেউ !
সৃষ্টির সিন্ধুর বুকে আমি এক ঢেউ
আজিকার ; শেষ মুহূর্তের
আমি এক—সকলের পায়ের শব্দের
সুর গেছে অন্ধকারে থেমে ;
তারপর আসিয়াছি নেমে
আমি ;
আমার পায়ের শব্দ শোনো—
নতুন এ, আর সব হারানো—পুরোনো।
উৎসবের কথা আমি কহিনাকো,
পড়ি নাকো দুর্দশার গান,
যে কবির প্রাণ
উৎসাহে উঠেছে শুধু ভরে—
সেই কবি—সেও যাবে সরে ;
যে কবি পেয়েছে শুধু যন্ত্রণার বিষ
শুধু জেনেছে বিষাদ,
মাটি আর রক্তের কর্কশ স্বাদ,

যে বুঝেছে, প্রলাপের ঘোরে
যে বকেছে,—সেও যাবে সরে ;
একে একে সবই
ডুবে যাবে—উৎসবের কবি,
তবু বলিতে কি পারো
যাতনা পারে না কেউ আরো ?
যেইদিন তুমি যাবে চ'লে
পৃথিবী গাবে কি গান তোমার বইয়ের পাতা খুলে ?
কিম্বা যদি গায়—পৃথিবী যাবে কি তবু ভুলে
একদিন যেই ব্যথা ছিল সত্য তার ?
আনন্দের আবর্তনে আজিকে আবার
সেদিনের পুরানো আঘাত
ভুলিবে সে ? ব্যথা যারা সয়ে গেছে রাত্রি-দিন
তাহাদের আর্ত ডান হাত
ঘুম ভেঙে জানাবে নিষেধ ;
সব ক্লেশ আনন্দের ভেদ
ভুল মনে হবে ;
সৃষ্টির বুকের 'পরে ব্যথা লেগে রবে,
শয়তানের সুন্দর কপালে
পাপের ছাপের মতো সেই দিনও !—
মাঝরাতে মোম যারা জ্বালে,
রোগা পায়ে করে পাইচারি,
দেয়ালে যাদের ছায়া পড়ে সারি-সারি
সৃষ্টির দেয়ালে—
আহ্লাদ কি পায় নাই তারা কোনোকালে ?
যেই উড়ো উৎসাহের উৎসবের রব
ভেসে আসে—তাই শুনে জাগে নি উৎসব ?

তবে কেন বিহ্বলের গান
গায় তারা !—বলে কেন, আমাদের প্রাণ
পথের আহত
মাছিদের মতো !

উৎসবের কথা আমি কহি নাকো,
পড়িনাকো ব্যর্থতার গান ;
শুনি শুধু সৃষ্টির আহ্বান—
তাই আসি,
নানা কাজ তার
আমরা মিটায়ে যাই—
জাগিবার কাল আছে—দরকার আছে ঘুমাবার ;
এই সচ্ছলতা
আমাদের ; আকাশ কহিছে কোন্ কথা
নক্ষত্রের কানে ?—
আনন্দের ? দুর্দশার ?—পড়ি নাকো।—সৃষ্টির আহ্বানে
আসিয়াছি।
সময়সিন্ধুর মতো
তুমিও আমার মতো সমুদ্রের পানে, জানি, রয়েছ তাকায়ে,
ঢেউয়ের হুঁচোট লাগে গায়ে,—
ঘুম ভেঙে যায় বার-বার
তোমার—আমার !
জানি না তো কোন্ কথা কও তুমি ফেনার কাপড়ে বুক ঢেকে,
ওপারের থেকে ;
সমুদ্রের কানে :
কোন্ কথা কই আমি এই পারে—সে কি কিছু জানে ?
আমিও তোমার মতো রাতের সিন্ধুর দিকে রয়েছি তাকায়ে,

ঢেউয়ের হুঁচোট লাগে গায়ে
ঘুম ভেঙে যায় বার বার
তোমার আমার।

কোথাও রয়েছ, জানি, তোমারে তবুও আমি ফেলেছি হারায়ে ;
পথ চলি—ঢেউ ভেজে পায় ;
রাতের বাতাস ভেসে আসে,
আকাশে আকাশে
নক্ষত্রের পরে
এই হাওয়া যেন হা হা করে !
হু হু করে ওঠে অন্ধকার !
কোন্ রাত্রি—আঁধারের ’পার
আজ সে খুঁজিছে !
কত রাত ঝরে গেছে—নীচে—তারও নীচে
কোন্ রাত—কোন্ অন্ধকার
একবার এসেছিল,—আসিবে না আর।

তুমি এই রাতের বাতাস,
বাতাসের সিন্ধু—ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর !
অন্ধকার—নিঃসাড়তার
মাঝখানে
তুমি আনো প্রাণে
সমুদ্রের ভাষা,
রুধিরে পিপাসা,
যেতেছ জাগায়ে,

ছেঁড়া দেহে—ব্যথিত মনের ঘায়ে
ঝরিতেছ জলের মতন,—
রাতের বাতাস তুমি—বাতাসের সিন্ধু—ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর !

গান গায় যেখানে সাগর তার জলের উল্লাসে,
সমুদ্রের হাওয়া ভেসে আসে
যেখানে সমস্ত রাত ভ'রে,
নক্ষত্রের আলো পড়ে ঝ'রে
যেইখানে,
পৃথিবীর কানে
শস্য গায় গান,
সোনার মতন ধান
ফ'লে ওঠে যেইখানে—
একদিন—হয়তো—কে জানে
তুমি আর আমি
ঠাণ্ডা ফেনা ঝিনুকের মতো চুপে থামি
সেইখানে রব প'ড়ে !—
যেখানে সমস্ত রাত্রি নক্ষত্রের আলো পড়ে ঝরে,
সমুদ্রের হাওয়া ভেসে আসে,
গান গায় সিন্ধু তার জলের উল্লাসে।

ঘুমাতে চাও কি তুমি ?
অন্ধকারে ঘুমাতে কি চাই ?—
ঢেউয়ের গানের শব্দ
সেখানে ফেনার গন্ধ নাই ?

কেহ নাই—আঙুলের হাতের পরশ
সেইখানে নাই আর—
রূপ যেই স্বপ্ন আনে, স্বপ্নে বুকে জাগায় যে-রস
সেইখানে নাই তাহা কিছু ;
ঢেউয়ের গানের শব্দ
যেখানে ফেনার গন্ধ নাই—
ঘুমাতে চাও কি তুমি ?
সেই অন্ধকারে আমি ঘুমাতে কি চাই !
তোমারে পাব কি আমি কোনোদিন ?—নক্ষত্রের তলে
অনেক চলার পথ—সমুদ্রের জলে
গানের অনেক সুর—গানের অনেক সুর বাজে—
ফুরাবে এ-সব, তবু—তুমি যেই কাজে
ব্যস্ত আজ—ফুরাবে না, জানি ;
একদিন তবু তুমি তোমার আঁচলখানি
টেনে লবে ; যেটুকু করার ছিল সেইদিন হয়ে গেছে শেষ,
আমার এ সমুদ্রের দেশ
হয়তো হয়েছে স্তব্ধ সেই দিন,—আমার এ নক্ষত্রের রাত
হয়তো সরিয়া গেছে—তবু তুমি আসিবে হঠাৎ ;
গানের অনেক সুর—গানের অনেক সুর সমুদ্রের জলে,
অনেক চলার পথ নক্ষত্রের তলে !

আমার নিকট থেকে,
তোমারে নিয়েছে কেটে কখন সময় !
চাঁদ জেগে রয়
তারা ভরা আকাশের তলে,
জীবন সবুজ হয়ে ফলে,
শিশিরের শব্দে গান গায়

অন্ধকার, আবেগ জানায়
রাতের বাতাস !
মাটি ধুলো কাজ করে —মাঠে মাঠে ঘাস
নিবিড়—গভীর হয়ে ফলে !
তারা ভরা আকাশের তলে
চাঁদ তার আকাঙ্ক্ষার স্থল খুঁজে লয় —
আমার নিকট থেকে তোমারে নিয়েছে কেটে যদিও সময়।
একদিন দিয়েছিলে যেই ভালোবাসা,
ভুলে গেছ আজ তার ভাষা !
জানি আমি, তাই
আমিও ভুলিয়া যেতে চাই
একদিন পেয়েছি যে ভালোবাসা
তার স্মৃতি—আর তার ভাষা ;
পৃথিবীতে যত ক্লান্তি আছে,
একবার কাছে এসে আসিতে চায় না আর কাছে
যে-মুহূর্ত ;—
একবার হয়ে গেছে, তাই যাহা গিয়েছে ফুরায়ে
একবার হেঁটেছে যে, তাই যার পায়ে
চলিবার শক্তি আর নাই ;
সবচেয়ে শীত,—তৃপ্ত তাই।

কেন আমি গান গাই ?
কেন এই ভাষা
বলি আমি !—এমন পিপাসা
বার বার কেন জাগে !
প'ড়ে আছে যতটা সময়
এমনি তো হয়।

অনেক আকাশ

গানের সুরের মতো বিকালের দিকের বাতাসে
পৃথিবীর পথ ছেড়ে—সন্ধ্যার মেঘের রঙ খুঁজে
হৃদয় ভাসিয়া যায়—সেখানে সে কারে ভালোবাসে !—
পাখির মতন কেঁপে—ডানা মেলে—হিম চোখ বুজে
অধীর পাতার মতো পৃথিবীর মাঠের সবুজে
উড়ে-উড়ে ঘর ছেড়ে কত দিকে গিয়েছে সে ভেসে—
নীড়ের মতন বুকে একবার তার মুখ গুঁজে
ঘুমাতে চেয়েছে, তবু—ব্যথা পেয়ে গেছে ফেঁসে—
তখন ভোরের রোদে আকাশে মেঘের ঠোঁট উঠেছিল হেসে !

আলোর চুমায় এই পৃথিবীর হৃদয়ের জ্বর
কমে যায় ; তাই নীল আকাশের স্বাদ—সচ্ছলতা—
পূর্ণ করে দিয়ে যায় পৃথিবীর ক্ষুধিত গহ্বর ;
মানুষের অন্তরের অবসাদ—মৃত্যুর জড়তা
সমুদ্র ভাঙিয়া যায় —নক্ষত্রের সাথে কয় কথা
যখন নক্ষত্র তবু আকাশের অন্ধকার রাতে—
তখন হৃদয়ে জাগে নতুন যে এক অধীরতা,
তাই লয়ে সেই উষ্ণ আকাশেরে চাই যে জড়াতে
গোধূলির মেঘে মেঘ, নক্ষত্রের মতো রব নক্ষত্রের সাথে !

আমারে দিয়েছ তুমি হৃদয়ের যে এক ক্ষমতা
ওগো শক্তি—তার বেগে পৃথিবীর পিপাসার ভার
বাধা পায়, জেনে লয় নক্ষত্রের মতন স্বচ্ছতা !

আমারে করেছ তুমি অসহিষ্ণু—ব্যর্থ—চমৎকার !
জীবনের পারে থেকে যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার,
কবর খুলেছে মুখ বার বার যার ইশারায়,
বীণার তারের মতো পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষার তার
তাহার আঘাত পেয়ে কেঁপে কেঁপে ছিঁড়ে শুধু যায় !
একাকী মেঘের মতো ভেসেছে সে—বৈকালের আলোয়—সন্ধ্যায় !

সে এসে পাখির মতো স্থির হয়ে বাঁধে নাই নীড়,—
তাহার পাখায় শুধু লেগে আছে তীর—অস্থিরতা !
অধীর অন্তর তারে করিয়াছে অস্থির-অধীর !
তাহারই হৃদয় তারে দিয়েছে ব্যাধের মতো ব্যথা !
একবার তাই নীল আকাশের আলোর গাঢ়তা
তাহারে করেছে মুগ্ধ—অন্ধকার নক্ষত্র আবার
তাহারে নিয়েছে ডেকে—জেনেছে সে এই চঞ্চলতা
জীবনের ; উড়ে উড়ে দেখেছে সে মরণের পার
এই উদ্বেলতা লয়ে নিশীথের সমুদ্রের মতো চমৎকার !

গোধূলির আলো লয়ে দুপুরে সে করিয়াছে খেলা,
স্বপ্ন দিয়ে দুই চোখ একা একা রেখেছে সে ঢাকি ;
আকাশে আঁধার কেটে গিয়েছে যখন ভোরবেলা
সবাই এসেছে পথে, আসে নাই তবু সেই পাখি !—
নদীর কিনারে দূরে ডানা মেলে উড়েছে একাকী,
ছায়ার উপরে তার নিজের পাখার ছায়া ফেলে
সাজায়েছে স্বপনের ’পরে তার হৃদয়ের ফাঁকি !
সূর্যের আলোর পরে নক্ষত্রের মতো আলো জ্বেলে
সন্ধ্যার আঁধার দিয়ে দিন তার ফেলেছে সে মুছে অবহেলে !

কেউ তারে দেখে নাই ; মানুষের পথ ছেড়ে দূরে
হাড়ের মতন শাখা ছায়ার মতন পাতা লয়ে
যেইখানে পৃথিবীর মানুষের মতো ক্ষুব্ধ হয়ে
কথা কয়, আকাঙ্ক্ষার আলোড়নে চলিতেছে বয়ে
হেমন্তের নদী, ঢেউ ক্ষুধিতের মতো এক সুরে
হতাশ প্রাণের মতো অন্ধকারে ফেলিছে নিশ্বাস—
তাহাদের মতো হয়ে তাহাদের সাথে গেছি রয়ে ;
দূরে প’ড়ে পৃথিবীর ধুলা-মাটি-নদী-মাঠ-ঘাস—
পৃথিবীর সিন্ধু দূরে—আরো দূরে পৃথিবীর মেঘের আকাশ !

এখানে দেখেছি আমি জাগিয়াছ হে তুমি ক্ষমতা,
সুন্দর মুখের চেয়ে তুমি আরো ভীষণ, সুন্দর !
ঝড়ের হাওয়ার চেয়ে আরো শক্তি আরো ভীষণতা
আমারে দিয়েছে ভয় ! এইখানে পাহাড়ের ’পর
তুমি এসে বসিয়াছ—এইখানে অশান্ত সাগর
তোমারে এসেছে ডেকে—হে ক্ষমতা, তোমার বেদনা
পাহাড়ের বনে বনে তুলিতেছে উত্তরের ঝড়
আকাশের চোখে-মুখে তুলিতেছে বিদ্যুতের ফণা
তোমার স্ফুলিঙ্গ আমি, ওগো শক্তি—উল্লাসের মতন যন্ত্রণা !

আমার সকল ইচ্ছা প্রার্থনার ভাষার মতন
প্রেমিকের হৃদয়ের গানের মতন কেঁপে উঠে
তোমারে প্রাণের কাছে একদিন পেয়েছে কখন !
সন্ধ্যার আলোর মতো পশ্চিম মেঘের বুকে ফুটে,
আঁধার রাতের মতো তারার আলোর দিকে ছুটে,
সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো ঝড়ের হাওয়ার কোলে জেগে
সব আকাঙ্ক্ষার বাঁধ একবার গেছে তার টুটে !

বিদ্যুতের পিছে পিছে ছুটে গেছি বিদ্যুতের বেগে !
নক্ষত্রের মতো আমি আকাশের নক্ষত্রের বুকে গেছি লেগে !

যে মুহূর্ত চলে গেছে—জীবনের যেই দিনগুলি
ফুরায়ে গিয়েছে সব, একবার আসে তারা ফিরে ;
তোমার পায়ের চাপে তাদের করেছ তুমি ধূলি !
তোমার আঘাত দিয়ে তাদের গিয়েছ তুমি ছিঁড়ে !
হে ক্ষমতা, মনের ব্যথার মতো তাদের শরীরে
নিমেষে নিমেষে তুমি কতবার উঠেছিলে জেগে !
তারা সব চ'লে গেছে ;—ভুতুড়ে পাতার মতো ভিড়ে
উত্তর-হাওয়ার মতো তুমি আজও রহিয়াছ লেগে !
যে সময় চলে গেছে তাও কাঁপে ক্ষমতার বিস্ময়ে—আবেগে !

তুমি কাজ করে যাও, ওগো শক্তি, তোমার মতন !
আমারে তোমার হাতে একাকী দিয়েছি আমি ছেড়ে ;
বেদনা-উল্লাসে তাই সমুদ্রের মতো ভরে মন !—
তাই কৌতূহল—তাই ক্ষুধা এসে হৃদয়েরে ঘেরে,
জোনাকির পথ ধরে তাই আকাশের নক্ষত্রেরে
দেখিতে চেয়েছি আমি, নিরাশার কোলে বসে একা
চেয়েছি আশারে আমি, বাঁধনের হাতে হেরে হেরে
চাহিয়াছি আকাশের মতো এক অগাধের দেখা !—
ভোরের মেঘের ঢেউয়ে মুছে দিয়ে রাতের মেঘের কালো রেখা !

আমি প্রণয়িনী, তুমি হে অধীর, আমার প্রণয়ী !
আমার সকল প্রেম উঠেছে চোখের জলে ভেসে !—
প্রতিধ্বনির মতো হে ধ্বনি, তোমার কথা কহি
কেঁপে উঠে—হৃদয়ের সে যে কত আবেগে আবেশে !

সব ছেড়ে দিয়ে আমি তোমারে একাকী ভালোবেসে
তোমার ছায়ার মতো ফিরিয়াছি তোমার পিছনে !
তবুও হারায়ে গেছ, হঠাৎ কখন কাছে এসে
প্রেমিকের মতো তুমি মিশেছ আমার মনে মনে
বিদ্যুৎ জ্বালায়ে গেছ, আগুন নিভায়ে গেছ হঠাৎ গোপনে !

কেন তুমি আস যাও ?—হে অস্থির, হবে নাকি ধীর !
কোনোদিন ?—রৌদ্রের মতন তুমি সাগরের 'পরে
একবার—দুইবার জ্বলে উঠে হতেছ অস্থির !—
তারপর, চলে যাও কোন্ দূরে পশ্চিমে—উত্তরে—
সেখানে মেঘের মুখে চুমো খাও ঘুমের ভিতরে,
ইন্দ্রধনুকের মতো তুমি সেইখানে উঠিতেছ জ্বলে,
চাঁদের আলোর মতো একবার রাত্রির সাগরে
খেলা কর—জ্যোৎস্না চলে যায়, তবু তুমি যাও চলে
তার আগে ; যা বলেছ একবার, যাবে নাকি আবার তা বলে !

যা পেয়েছি একবার, পাব নাকি আবার তা খুঁজে !
যেই রাত্রি যেই দিন একবার কয়ে গেল কথা
আমি চোখ বুজিবার আগে তারা গেল চোখ বুজে,
ক্ষীণ হয়ে নিভে গেল সলিতার আলোর স্পষ্টতা !
ব্যথার বুকের 'পরে আর এক ব্যথা-বিহ্বলতা
নেমে এল—উল্লাস ফুরায়ে গেল নতুন উৎসবে ;
আলো-অন্ধকার দিয়ে বুনিতেছি শুধু এই ব্যথা,
দুলিতেছি এই ব্যথা-উল্লাসের সিন্ধুর বিপ্লবে !
সব শেষ হবে—তবু আলোড়ন—তা কি শেষ হবে !

সকল যেতেছে চলে—সব যায় নিভে—মুছে—ভেসে—

যে সুর থেমেছে তার স্মৃতি তবু বুকে জেগে রয় !
যে নদী হারায়ে যায় অন্ধকারে—রাতে—নিরুদ্দেশে,
তাহার চঞ্চল জল স্তব্ধ হয়ে কাঁপায় হৃদয় !
যে মুখ মিলায়ে যায় আবার ফিরিতে তারে হয়
গোপনে চোখের 'পরে—ব্যথিতের স্বপ্নের মতন !
ঘুমন্তের এই অশ্রু—কোন্ পীড়া—সে কোন্ বিস্ময়
জানায়ে দিতেছে এসে !—রাত্রি-দিন আমাদের মন
বর্তমান অতীতের গুহা ধরে একা একা ফিরিছে এমন !

আমরা মেঘের মতো হঠাৎ চাঁদের বুকে এসে
অনেক গভীর রাতে—একবার পৃথিবীর পানে
চেয়ে দেখি, আবার মেঘের মতো চুপে-চুপে ভেসে
চলে যাই এক ক্ষীণ বাতাসের দুর্বল আহ্বানে
কোন্ দিকে পথ বেয়ে !—আমাদের কেউ কি তা জানে।
ফ্যাকাশে মেঘের মতো চাঁদের আকাশ পিছে রেখে
চলে যাই ; কোন্ এক রুগ্ন হাত আমাদের টানে ?
পাখির মায়ের মতো আমাদের নিতেছে সে ডেকে
আরো আকাশের দিকে—অন্ধকারে, অন্য কারো আকাশের থেকে !

একদিন বুজিবে কি চারি দিকে রাত্রির গহ্বর !—
নিবন্ত বাতির বুকে চুপে চুপে যেমন আঁধার
চলে আসে, ভালোবেসে—নুয়ে তার চোখের উপর
চুমো খায়, তারপর তারে কোলে টেনে লয় তার—
মাথার সকল স্বপ্ন, হৃদয়ের সকল সঞ্চার
একদিন সেই শূন্য সেই শীত-নদীর উপরে
ফুরাবে কি ?—দুলে দুলে অন্ধকারে তবুও আবার
আমার রক্তের ক্ষুধা নদীর ঢেউয়ের মতো স্বরে

গান গাবে, আকাশ উঠিবে কেঁপে আবার সে সংগীতের ঝড়ে !

পৃথিবীর—আকাশের পুরানো কে আত্মার মতন
জেগে আছি ; বাতাসের সাথে সাথে আমি চলি ভেসে,
পাহাড়ে হাওয়ার মতো ফিরিতেছে একা একা মন,
সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো দুপুরের সমুদ্রের শেষে
চলিতেছে ; কোন্ এক দূর দেশ—কোন্ নিরুদ্দেশে
জন্ম তার হয়েছিল—সেইখানে উঠেছে সে বেড়ে ;
দেহের ছায়ার মতো আমার মনের সাথে মেশে
কোন্ স্বপ্ন !—এ আকাশ ছেড়ে দিয়ে কোন্ আকাশেরে
খুঁজে ফিরি !—গুহার হাওয়ার মতো বন্দী হয়ে মন তব ফেরে !

গাছের শাখার জালে এলোমেলো আঁধারের মতো
হৃদয় খুঁজিছে পথ, ভেসে ভেসে—সে যে কারে চায় !
হিমের হাওয়ার হাত তার হাড় করিছে আহত,—
সেও কি শাখার মতো—পাতার মতন ঝরে যায় !
বনের বুকের গান তার মতো শব্দ করে গায় !
হৃদয়ের সুর তার সে যে কবে ফেলেছে হারায়ে !
অন্তরের আকাঙ্ক্ষারে—স্বপনেরে বিদায় জানায়
জীবন-মৃত্যুর মাঝে চোখ বুজে একাকী দাঁড়ায়ে ;
ঢেউয়ের ফেনার মতো ক্লান্ত হয়ে মিশিবে কি সে-ঢেউয়ের গায়ে !

হয়তো সে মিশে গেছে—তারে খুঁজে পাবে নাকো কেউ !
কেন যে সে এসেছিল পৃথিবীর কেহ কি তা জানে !
শীতের নদীর বুকে অস্থির হয়েছে যেই ঢেউ
শুনেছে সে উষ্ণ গান সমুদ্রের জলের আহ্বানে !
বিদ্যুতের মতো অল্প আয়ু তবু ছিল তার প্রাণে,

যে ঝড় ফুরায়ে যায় তাহার মতন বেগ লয়ে
যে প্রেম হয়েছে ক্ষুব্ধ সেই ব্যর্থ প্রেমিকের গানে
মিলায়েছে গান তার, তারপর চলে গেছে বয়ে।
সন্ধ্যার মেঘের রঙ কখন গিয়েছে তার অন্ধকার হয়ে !

তবুও নক্ষত্র এক জেগে আছে, সে যে তারে ডাকে !
পৃথিবী চায় নি যারে, মানুষ করেছে যারে ভয়
অনেক গভীর রাতে তারায় তারায় মুখ ঢাকে
তবুও সে !—কোনো এক নক্ষত্রের চোখের বিস্ময়
তাহার মানুষ-চোখে ছবি দেখে একা জেগে রয় !
মানুষীর মতো ? কিংবা আকাশের তারাটির মতো—
সেই দূর-প্রণয়িনী আমাদের পৃথিবীর নয় !
তার দৃষ্টি-তাড়নায় আমারে করেছে যে ব্যাহত—
ঘুমন্ত বাঘের বুকে বিষের বাণের মতো বিষম সে ক্ষত !

আলো আর অন্ধকারে তার ব্যথা-বিহ্বলতা লেগে,
তাহার বুকের রক্তে পৃথিবী হতেছে শুধু লাল !—
মেঘের চিলের মতো—দুরন্ত চিতার মতো বেগে
ছুটে যাই—পিছে ছুটে আসিতেছে বৈকাল-সকাল
পৃথিবীর—যেন কোন্ মায়াবীর নষ্ট ইন্দ্রজাল
কাঁদিতেছে ছিঁড়ে গিয়ে ! কেঁপে কেঁপে পড়িতেছে ঝ'রে !
আরো কাছে আসিয়াছি তবু আজ—আরো কাছে কাল
আসিব তবুও আমি—দিন-রাত্রি রয় পিছে পড়ে,—
তারপর একদিন কুয়াশার মতো সব বাধা যাবে সরে !

সিন্ধুর ঢেউয়ের তলে অন্ধকার রাতের মতন
হৃদয় উঠিতে আছে কোলাহলে কেঁপে বারবার !

কোথায় রয়েছে আলো জেনেছে তা,—বুঝেছে তা মন—
চারি দিকে ঘিরে তারে রহিয়াছে যদিও আঁধার !
একদিন এই গুহা ব্যথা পেয়ে আহত হিয়ার
বাঁধন খুলিয়া দেবে !—অধীর ঢেউয়ের মতো ছুটে
সেদিন সে খুঁজে লবে অই দূর নক্ষত্রের পার !
সমুদ্রের অন্ধকারে গহ্বরের ঘুম থেকে উঠে
দেখিবে জীবন তার খুলে গেছে পাখির ডিমের মতো ফুটে !

পরস্পর

মনে পড়ে গেল এক রূপকথা ঢের আগেকার,
কহিলাম—শোনো তবে—
শুনিতে লাগিল সবে,
শুনিল কুমার ;
কহিলাম, দেখেছি সে চোখ বুজে আছে,
ঘুমোনো সে এক মেয়ে—নিঃসাড় পুরীতে এক পাহাড়ের কাছে ;
সেইখানে আর নাই কেহ,—
এক ঘরে পালঙ্কের 'পরে শুধু একখানা দেহ
পড়ে আছে—পৃথিবীর পথে পথে রূপ খুঁজে খুঁজে
তারপর—তারে আমি দেখেছি গো—সেও চোখ বুজে
পড়ে ছিল—মসৃণ হাড়ের মতো শাদা হাতদুটি
বুকের উপরে তার রয়েছিল উঠি !
আসিবে না গতি যেন কোনোদিন তাহার দু-পায়ে,
পাথরের মতো শাদা গায়ে
এর যেন কোনোদিন ছিল না হৃদয়—
কিম্বা ছিল—আমার জন্য তা নয় !

আমি গিয়ে তাই তারে পারিনি জাগাতে,
পাষাণের মতো হাত পাষাণের হাতে
রয়েছে আড়ষ্ট হয়ে লেগে ;
তবুও, হয়তো তবু উঠিবে সে জেগে
তুমি যদি হাত দুটি ধরো গিয়ে তার !—
ফুরালাম রূপকথা, শুনিল কুমার।
তারপর, কহিল কুমার,
আমিও দেখেছি তারে—বসন্তসেনার
মতো সেইজন নয়,—কিম্বা হবে তাই—
ঘুমন্ত দেশের সেও বসন্তসেনাই !
মনে পড়ে, শোনো, মনে পড়ে
নবমী ঝরিয়া গেছে নদীর শিয়রে—
(পদ্মা—ভাগীরথী—মেঘ্না—কোন্ নদী যে সে—
সে সব জানি কি আমি !—হয়তো বা তোমাদের দেশে
সেই নদী আজ আর নাই,
আমি তবু তার পাড়ে আজও তো দাঁড়াই !)
সেদিন তারার আলো—আর নিবু-নিবু জ্যোৎস্নায়
পথ দেখে, যেইখানে নদী ভেসে যায়
কান দিয়ে তার শব্দ শুনে,
দাঁড়ায়েছিলাম গিয়ে মাঘরাতে, কিংবা ফাল্‌গুনে।
দেশ ছেড়ে শীত যায় চলে
সে সময়, প্রথম দখিনে এসে পড়িতেছে বলে
রাতারাতি ঘুম ফেঁসে যায়,
আমারও চোখের ঘুম খসেছিল হায়—
বসন্তের দেশে
জীবনের—যৌবনের !—আমি জেগে,—ঘুমন্ত শুয়ে সে !
জমানো ফেনার মতো দেখা গেল তারে

নদীর কিনারে !
হাতির দাঁতের গড়া মূর্তির মতন
শুয়ে আছে—শুয়ে আছে—শাদা হাতে ধব্‌ধবে স্তন
রেখেছে সে ঢেকে !
বাকিটুকু—থাক্—আহা, একজনে দেখে শুধু—দেখে না অনেকে
এই ছবি !
দিনের আলোয় তার মুছে যায় সবই !—
আজও তবু খুঁজি
কোথায় ঘুমন্ত তুমি চোখ আছ বুজি !

কুমারের শেষ হলে পরে—
আর-এক দেশের এক রূপকথা বলিল আর-একজন,
কহিল সে, উত্তর-সাগরে
আর নাই কেউ !—
জ্যোৎস্না আর সাগরের ঢেউ
উঁচুনিচু পাথরের 'পরে
হাতে হাত ধ'রে
সেইখানে ; কখন জেগেছে তারা—তারপর ঘুমাল কখন !
ফেনার মতন তারা ঠাণ্ডা—শাদা—
আর তারা ঢেউয়ের মতন
জড়ায়ে জড়ায়ে যায় সাগরের জলে !
ঢেউয়ের মতন তারা ঢলে !
সেই জলমেয়েদের স্তন
ঠাণ্ডা, শাদা, বরফের কুঁচির মতন !
তাহাদের মুখ চোখ ভিজে,—
ফেনার শেমিজে
তাহাদের শরীর পিছল !

কাচের গুঁড়ির মতো শিশিরের জল
চাঁদের বুকের থেকে ঝরে
উত্তর সাগরে !
পায়ে-চলা পথ ছেড়ে ভাসে তারা সাগরের গায়ে—
কাঁকরের রক্ত কই তাহাদের পায়ে !
রূপার মতন চুল তাহাদের ঝিক্‌মিক্‌ করে
উত্তর সাগরে !
বরফের কুঁচির মতন
সেই জলমেয়েদের স্তন !
মুখ বুক ভিজে,
ফেনার শেমিজে
শরীর পিছল !
কাচের গুঁড়ির মতো শিশিরের জল
চাঁদের বুকের থেকে ঝরে
উত্তর সাগরে !
উত্তর সাগরে !

সবাই থামিলে পরে মনে হল—একদিন আমি যাব চলে
কল্পনার গল্প সব বলে ;
তারপর, শীত-হেমন্তের শেষে বসন্তের দিন
আবার তো এসে যাবে ;
এক কবি,—তন্ময়, শৌখিন,
আবার তো জন্ম নেবে আমাদের দেশে !
আমরা সাধিয়া গেছি যার কথা—পরীর মতন এক ঘুমোনো মেয়ে সে
হীরের ছুরির মতো গায়ে
আরো ধার লবে সে শানায়ে !
সেইদিনও তার কাছে হয়তো রবে না আর কেউ—

মেঘের মতন চুল—তার সে চুলের ঢেউ
এমনি পড়িয়া রবে পালঙ্কের ’পর—
ধূপের ধোঁয়ার মতো ধলা সেই পুরীর ভিতর।
চার পাশে তার
রাজ—যুবরাজ—জেতা—যোদ্ধাদের হাড়
গড়েছে পাহাড় !
এ রূপকথার এই রূপসীর ছবি
তুমিও দেখিবে এসে,
তুমিও দেখিবে এসে কবি !
পাথরের হাতে তার রাখিবে তো হাত—
শরীরে ননীর ছিরি—ছুঁয়ে দেখো—চোখা ছুরি—ধারালো হাতির দাঁত !
হাড়েরই কাঠামো শুধু—তার মাঝে কোনোদিন হৃদয় মমতা
ছিল কই !—তবু, সে কি জেগে যাবে ? কবে সে কি কথা
তোমার রক্তের তাপ পেয়ে ?—
আমার কথার এই মেয়ে, এই মেয়ে !
কে যেন উঠিল ব’লে, তোমরা তো বলো রূপকথা—
তেপান্তরে গল্প সব, ওর কিছু আছে নিশ্চয়তা !
হয়তো অমনি হবে,—দেখি নিকো তাহা ;
কিন্তু, শোনো—স্বপ্ন নয়—আমাদেরই দেশে কবে, আহা !—
যেখানে মায়াবী নাই—জাদু নাই কোনো—
এ দেশের—গাল নয়, গল্প নয়, দু-একটা শাদা কথা শোনো !
সেও এক রোদে লাল দিন,
রোদে লাল,—সব্‌জীর গানে-গানে সহজ স্বাধীন
একদিন, সেই একদিন !
ঘুম ভেঙে গিয়েছিল চোখে,
ছেঁড়া করবীর মতো মেঘের আলোকে
চেয়ে দেখি রূপসী কে পড়ে আছে খাটের উপরে !

মায়াবীর ঘরে
ঘুমন্ত কন্যার কথা শুনেছি অনেক আমি, দেখিলাম তবু চেয়ে চেয়ে
এ ঘুমোনো মেয়ে
পৃথিবীর—মানুষের দেশের মতন ;
রূপ ঝরে যায়—তবু করে যারা সৌন্দর্যের মিছা আয়োজন—
যে যৌবন ছিঁড়ে ফেঁড়ে যায়,
যারা ভয় পায়
আয়নায় তার ছবি দেখে !—
শরীরের ঘুণ রাখে ঢেকে,
ব্যর্থতা লুকায়ে রাখে বুকে,
দিন যায় যাহাদের অসাধে, অসুখে !—
দেখিতেছিলাম সেই সুন্দরীর মুখ,
চোখে ঠোঁটে অসুবিধা—ভিতরে অসুখ !
কে যেন নিতেছে তারে খেয়ে !—
এ ঘুমানো মেয়ে
পৃথিবীর—ফোঁপ্‌রার মতো ক'রে এরে লয় শুষে
দেবতা গন্ধর্ব নাগ পশু ও মানুষে !...
সবাই উঠিল বলে—ঠিক—ঠিক—ঠিক !
আবার বলিল সেই সৌন্দর্যতান্ত্রিক,
আমায় বলেছে সে কি শোনো,—
আর একজন এই,—
পরী নয়, মানুষও সে হয়নি এখনও—
বলেছে সে কাল সাঁঝরাতে
আবার তোমার সাথে
দেখা হবে ?—আসিবে তো ?—তুমি আসিবে তো !
দেখা যদি পেত !
নিকটে বসায়ে

কালো খোঁপা ফেলিত খসায়ে—
কী কথা বলিতে গিয়ে থেমে যেত শেষে
ফিক্ করে হেসে !
তবু, আরো কথা
বলিতে আসিত,—তবু, সব প্রগল্‌ভতা
থেমে যেত !
খোঁপা বেঁধে,—ফের খোঁপা ফেলিত খসায়ে,—
সরে যেত, দেয়ালের গায়ে
রহিত দাঁড়ায়ে !
রাত ঢের—বাড়িবে আরো কি
এই রাত !—বেড়ে যায়, তবু চোখোচোখি
হয় নাই দেখা
আমাদের দুজনার !—দুইজন,—একা !—
বারবার চোখ তবু কেন ওর ভরে আসে জলে !
কেন বা এমন করে বলে,
কাল সাঁঝরাতে
আবার তোমার সাথে
দেখা হবে ?—আসিবে তো ?—তুমি আসিবে তো।—
আমি না কাঁদিতে কাঁদে... দেখা যদি পেত !...
দেখা দিয়ে বলিলাম, 'কে গো তুমি ?'—বলিল সে, 'তোমার বকুল,
মনে আছে ?'—'এগুলো কী ? বাসি চাঁপাফুল ?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে' ;—'ভালোবাসো ?'—হাসি পেল,—হাসি !
'ফুলগুলো বাসি নয়, আমি শুধু বাসি !'
আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে ফেলে
নিবানো মাটির বাতি জ্বেলে
চলে এল কাছে—
জটার মতন খোঁপা অন্ধকারে খসিয়া গিয়াছে—

আজও এত চুল !
চেয়ে দেখি,—দুটো হাত, ক-খানা আঙুল
একবার চুপে তুলে ধরি ;
চোখদুটো চুন-চুন—মুখ খড়ি-খড়ি !
থুত্‌নিতে হাত দিয়ে তবু চেয়ে দেখি—
সব বাসি, সব বাসি—একেবারে মেকি !

বোধ

আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন্ এক বোধ কাজ করে !
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয় !
আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে ;
সব কাজ তুচ্ছ হয়, পণ্ড মনে হয়,
সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয় !

সহজ লোকের মতো কে চলিতে পারে !
কে থামিতে পারে এই আলোয় আঁধারে
সহজ লোকের মতো ! তাদের মতন ভাষা কথা
কে বলিতে পারে আর !—কোনো নিশ্চয়তা
কে জানিতে পারে আর ?—শরীরের স্বাদ
কে বুঝিতে চায় আর ?—প্রাণের আহ্লাদ

সকল লোকের মতো কে পাবে আবার !
সকল লোকের মতো বীজ বুনে আর
স্বাদ কই !—ফসলের আকাঙ্ক্ষায় থেকে,
শরীরে মাটির গন্ধ মেখে,
শরীরে জলের গন্ধ মেখে,
উৎসাহে আলোর দিকে চেয়ে
চাষার মতন প্রাণ পেয়ে
কে আর রহিবে জেগে পৃথিবীর ’পরে ?
স্বপ্ন নয়, শান্তি নয়, কোন্ এক বোধ কাজ করে
মাথার ভিতরে !

পথে চ’লে পারে—পারাপারে
উপেক্ষা করিতে চাই তারে ;
মড়ার খুলির মতো ধ’রে
আছাড় মারিতে চাই, জীবন্ত মাথার মতো ঘোরে
তবু সে মাথার চারি পাশে !
তবু সে চোখের চারি পাশে !
তবু সে বুকের চারিপাশে !
আমি চলি, সাথে সাথে সেও চলে আসে !

আমি থামি—
সেও থেমে যায় ;

সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা ?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা ?

আমার পথেই শুধু বাধা ?
জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
সন্তানের মতো হয়ে—
সন্তানের জন্ম দিতে দিতে
যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়,
কিম্বা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়
যাহাদের ; কিম্বা যারা পৃথিবীর বীজক্ষেতে আসিতেছে চলে
জন্ম দেবে—জন্ম দেবে বলে ;
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় না কি ?—তাহাদের মন
আমার মনের মতো না কি ?—
—তবু কেন এমন একাকী ?
তবু আমি এমন একাকী !

হাতে তুলে দেখি নি কি চাষার লাঙল ?
বাল্‌টিতে টানিনি কি জল ?
কাস্তে হাতে কতবার যাইনি কি মাঠে ?
মেছোদের মতো আমি কত নদী ঘাটে
ঘুরিয়াছি ;
পুকুরের পানা শ্যালা—আঁশটে গায়ের ঘ্রাণ গায়ে
গিয়েছে জড়ায়ে ;

লেখা যাবে

—এই সব স্বাদ ;
—এসব পেয়েছি আমি,—বাতাসের মতন অবাধ
বয়েছে জীবন,
নক্ষত্রের তলে শুয়ে ঘুমায়েছে মন
একদিন ;
এইসব সাধ
জানিয়াছি একদিন—অবাধ—অগাধ ;
চলে গেছি ইহাদের ছেড়ে—
ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে ;

আমারে সে ভালোবাসিয়াছে,
আসিয়াছে কাছে,
উপেক্ষা সে করেছে আমারে,
ঘৃণা করে চলে গেছে—যখন ডেকেছি বারেবারে
ভালোবেসে তারে ;
তবুও সাধনা ছিল একদিন—এই ভালোবাসা ;
আমি তার উপেক্ষার ভাষা
আমি তার ঘৃণার আক্রোশ
অবহেলা করে গেছি ; যে নক্ষত্র—নক্ষত্রের দোষ
আমার প্রেমের পথে বারবার দিয়ে গেছে বাধা
আমি তা ভুলিয়া গেছি ;
তবু এই ভালোবাসা—ধুলো আর কাদা— ।

মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে।
আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চলে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে :
সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয় !
অবসাদ নাই তার ? নাই তার শান্তির সময় ?
কোনোদিন ঘুমাবে না ? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবে না কি ? পাবে না আহ্লাদ
মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন !
মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন !
শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন !
এই বোধ—শুধু এই স্বাদ
পায় সে কি অগাধ—অগাধ !
পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ
চায় না সে ?—করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের মুখ ?
দেখিবে সে মানুষীর মুখ ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ ?
চোখে কালো শিরার অসুখ,
কানে যেই বধিরতা আছে,
যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
—সেই সব।

অবসরের গান

শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে ;
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার—চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ,
তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান,
দেহের স্বাদের কথা কয়—
বিকালের আলো এসে (হয়তো বা) নষ্ট করে দেবে তার সাধের সময় !
চারি দিকে এখন সকাল—
রোদের নরম রঙ শিশুর গালের মতো লাল !
মাঠের ঘাসের ’পরে শৈশবের ঘ্রাণ—
পাড়াগাঁর পথে ক্ষান্ত উৎসবের পড়েছে আহ্বান !

চারি দিকে নুয়ে পড়ে ফলেছে ফসল,
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা-ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল !
প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে থেকে আসিতেছে ভেসে
পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে !
শরীর এলায়ে আসে এইখানে ফলন্ত ধানের মতো ক’রে,
যেই রোদ একবার এসে শুধু চলে যায় তাহার ঠোঁটের চুমো ধ’রে
আহ্লাদের অবসাদে ভরে আসে আমার শরীর,
চারি দিকে ছায়া—রোদ—ক্ষুদ—কুঁড়া—কার্তিকের ভিড় ;
চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান,
পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি-ধান ভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ !
আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এপারে
বিয়োবার দেরি নাই—রূপ ঝরে পড়ে তার—
শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে !

আজও তবু ফুরায়নি বৎসরের নতুন বয়স,
মাঠে মাঠে ঝরে পড়ে কাঁচা রোদ—ভাঁড়ারের রস !

মাছির গানের মতো অনেক অলস শব্দ হয়
সকালবেলার রৌদ্রে ; কুঁড়েমির আজিকে সময়।

গাছের ছায়ার তলে মদ লয়ে কোন্ ভাঁড় বেঁধেছিল ছড়া !
তার সব কবিতার শেষ পাতা হবে আজ পড়া ;
ভুলে গিয়ে রাজ্য—জয়—সাম্রাজ্যের কথা
অনেক মাটির তলে যেই মদ ঢাকা ছিল তুলে লব তার শীতলতা ;
ডেকে লব আইবুড় পাড়াগাঁর মেয়েদের সব—
মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে—
শুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব।

হাতে হাত ধরে ধরে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে ঘুরে
কার্তিকের মিঠা রোদে আমাদের মুখ যাবে পুড়ে ;

ফলন্ত ধানের গন্ধে—রঙে তার—স্বাদে তার ভরে যাবে আমাদের সকলের দেহ ;
রাগ কেহ করিবে না—আমাদের দেখে হিংসা করিবে না কেহ।
আমাদের অবসর বেশি নয়—ভালোবাসা আহ্লাদের অলস সময়
আমাদের সকলের আগে শেষ হয়
দূরের নদীর মতো সুর তুলে অন্য এক ঘ্রাণ—অবসাদ—
আমাদের ডেকে লয়—তুলে লয় আমাদের ক্লান্ত মাথা—অবসন্ন হাত।

তখন শস্যের গন্ধ ফুরায়ে গিয়েছে ক্ষেতে—রোদ গেছে পড়ে,
এসেছে বিকেলবেলা তার শান্ত শাদা পথ ধরে ;
তখন গিয়েছে থেমে অই কুঁড়ে গেঁয়োদের মাঠের রগড় ;

হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার শাদা মরা শেফালীর বিছানার ’পর ;
মদের ফোঁটার শেষ হয়ে গেছে এ মাঠের মাটির ভিতর !
তখন সবুজ ঘাস হয়ে গেছে শাদা সব, হয়ে গেছে আকাশ ধবল,
চলে গেছে পাড়াগাঁর আইবুড় মেয়েদের দল !

২

পুরোনো পেঁচারা সব কোটরের থেকে
এসেছে বাহির হয়ে অন্ধকার দেখে
মাঠের মুখের ’পরে ;
সবুজ ধানের নীচে—মাটির ভিতরে
ইঁদুরেরা চলে গেছে—আঁটির ভিতর থেকে চলে গেছে চাষা ;
শস্যের ক্ষেতের পাশে আজ রাতে আমাদের জেগেছে পিপাসা !

ফলন্ত মাঠের ’পরে আমরা খুঁজি না আজ মরণের স্থান,
প্রেম আর পিপাসার গান
আমার গাহিয়া যাই পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন !
ফসল—ধানের ফলে যাহাদের মন
ভরে উঠে উপেক্ষা করিয়া গেছে সাম্রাজ্যেরে, অবহেলা করে গেছে
পৃথিবীর সব সিংহাসন—
আমাদের পাড়াগাঁর সেই সব ভাঁড়—
যুবরাজ রাজাদের হাড়ে আজ তাহাদের হাড়
মিশে গেছে অন্ধকারে অনেক মাটির নীচে পৃথিবীর তলে !
কোটালের মতো তারা নিশ্বাসের জলে
ফুরায় নি তাদের সময় ;
পৃথিবীর পুরোহিতদের মতো তারা করে নাই ভয় !
প্রণয়ীর মতো তারা ছেঁড়েনি হৃদয়
ছড়া বেঁধে শহরের মেয়েদের নামে !—

চাষাদের মতো তারা ক্লান্ত হয়ে কপালের ঘামে
কাটায় নি—কাটায় নি কাল !
অনেক মাটির নীচে তাদের কপাল
কোনো এক সম্রাটের সাথে
মিশিয়া রয়েছে আজ অন্ধকার রাতে !
যোদ্ধা—জয়ী—বিজয়ীর পাঁচ ফুট জমিনের কাছে—
পাশাপাশি—
জিতিয়া রয়েছে আজ তাদের খুলির অট্টহাসি !

অনেক রাতের আগে এসে তারা চলে গেছে—তাদের দিনের আলো হয়েছে আঁধারে
সেই সব গেঁয়ো কবি—পাড়াগাঁর ভাঁড়—
আজ এই অন্ধকারে আসিবে কি আর ?
তাদের ফলন্ত দেহ শুষে লয়ে জন্মিয়াছে আজ এই ক্ষেতের ফসল ;
অনেক দিনের গন্ধে ভরা ঐ ইঁদুরেরা জানে তাহা—জানে তাহা
নরম রাতের হাতে ঝরা এই শিশিরের জল !
সে সব পেঁচারা আজ বিকালের নিশ্চলতা দেখে
তাহাদের নাম ধরে যায় ডেকে ডেকে।
মাটির নীচের থেকে তারা
মৃতের মাথার স্বপ্নে নড়ে উঠে জানায় কি অদ্ভুত ইশারা !

আঁধারের মশা আর নক্ষত্র তা জানে—
আমরাও আসিয়াছি ফসলের মাঠের আহ্বানে।
সূর্যের আলোর দিন ছেড়ে দিয়ে, পৃথিবীর যশ পিছে ফেলে
শহর—বন্দর—বস্তি—কারখানা দেশলাইয়ে জ্বেলে
আসিয়াছি নেমে এই ক্ষেতে ;
শরীরের অবসাদ—হৃদয়ের জ্বর ভুলে যেতে।

শীতল চাঁদের মতো শিশিরের ভিজা পথ ধরে
আমরা চলিতে চাই, তারপর যেতে চাই মরে
দিনের আলোয় লাল আগুনের মুখে পুড়ে মাছির মতন ;
অগাধ ধানের রসে আমাদের মন
আমরা ভরিতে চাই গেঁয়ো কবি—পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন !

—জমি উপড়ায়ে ফেলে চলে গেছে চাষা
নতুন লাঙল তার পড়ে আছে—পুরানো পিপাসা
জেগে আছে মাঠের উপরে ;
সময় হাঁকিয়া যায় পেঁচা অই আমাদের তরে !
হেমন্তের ধান ওঠে ফলে—
দুই পা ছড়ায়ে বস এইখানে পৃথিবীর কোলে।

আকাশের মেঠো পথে থেমে ভেসে চলে চাঁদ ;
অবসর আছে তার—অবোধের মতন আহ্লাদ
আমাদের শেষ হবে যখন সে চলে যাবে পশ্চিমের পানে—
এটুকু সময় তাই কেটে যাক রূপ আর কামনার গানে !

৩

ফুরোনো ক্ষেতের গন্ধে এইখানে ভরেছে ভাঁড়ার ;
পৃথিবীর পথে গিয়ে কাজ নাই—কোনো কৃষকের মতো দরকার নাই
দূরে মাঠে গিয়ে আর !
রোধ—অবরোধ—ক্লেশ—কোলাহল শুনিবার নাহিকো সময়—
জানিতে চাই না আর সম্রাট সেজেছে ভাঁড় কোন্‌খানে—
কোথায় নতুন করে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হয় !
আমার চোখের পাশে আনিও না সৈন্যদের মশালের আগুনের রঙ
দামামা থামায়ে ফেল—পেঁচার পাখার মতো অন্ধকারে ডুবে যাক

রাজ্য আর সাম্রাজ্যের সঙ !

এখানে নাহিকো কাজ,—উৎসাহের ব্যথা নাই, উদ্যমের নাহিকো ভাবনা ;
এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার অনেক উত্তেজনা।
অলস মাছির শব্দে ভরে থাকে সকালের বিষণ্ন সময়,
পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয় !
সকল পড়ন্ত রোদ চারিদিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেক দিন—
জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালোবেসে।

এখানে চকিত হতে হবে নাকো—ত্রস্ত হয়ে পড়িবার নাহিকো সময় ;
উদ্যমের ব্যথা নাই—এইখানে নাই আর উৎসাহের ভয় !
এইখানে কাজ এসে জমেনাকো হাতে,
মাথায় চিন্তার ব্যথা হয় না জমাতে !
এখানে সৌন্দর্য এসে ধরিবে না হাত আর—
রাখিবে না চোখ আর নয়নের ’পর ;
ভালোবাসা আসিবে না—
জীবন্ত কৃমির কাজ এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার ভিতর !

অলস মাছির শব্দে ভরে থাকে সকালের বিষণ্ন সময়,
পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয় ;
সকল পড়ন্ত রোদ চারি দিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে,
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেক দিন জেগে থেকে ঘুমাবার
সাধ ভালোবেসে !

ক্যাম্পে

এখানে বনের কাছে ক্যাম্প্ আমি ফেলিয়াছি ;
সারারাত দখিনা বাতাসে
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনি—
কাহারে সে ডাকে !

কোথাও হরিণ আজ হতেছে শিকার ;
বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে,
আমিও তাদের ঘ্রাণ পাই যেন,
এইখানে বিছানায় শুয়ে শুয়ে
ঘুম আর আসে নাকো
বসন্তের রাতে।

চারি পাশে বনের বিস্ময়,
চৈত্রের বাতাস,
জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন !
ঘাইমৃগী সারারাত ডাকে ;
কোথাও অনেক বনে—যেইখানে জ্যোৎস্না আর নাই
পুরুষহরিণ সব শুনিতেছে শব্দ তার ;
তাহারা পেতেছে টের,
আসিতেছে তার দিকে।
আজ এই বিস্ময়ের রাতে
তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে ;
তাহাদের হৃদয়ের বোন

বনের আড়াল থেকে তাহাদের ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়—
পিপাসার সান্ত্বনায়—আঘ্রাণে—আস্বাদে !
কোথাও বাঘের পাড়া বনে আজ নাই আর যেন !
মৃগদের বুকে আজ কোনো স্পষ্ট ভয় নাই,
সন্দেহের আবছায়া নাই কিছু ;
কেবল পিপাসা আছে,
রোমহর্ষ আছে।
মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময় !
লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম স্বপ্ন স্ফুট হয়ে উঠিতেছে সব দিকে
আজ এই বসন্তের রাতে ;
এইখানে আমার নক্‌টার্ন্—।

একে একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে,
সকল জলের শব্দ পিছে ফেলে অন্য এক আশ্বাসের খোঁজে
দাঁতের-নখের কথা ভুলে গিয়ে তাদের বোনের কাছে অই
সুন্দরী গাছের নীচে—জ্যোৎস্নায় !—
মানুষ যেমন করে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে
হরিণেরা আসিতেছে।
—তাদের পেতেছি আমি টের
অনেক পায়ের শব্দ শোনা যায়,
ঘাইমৃগী ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়।
ঘুমাতে পারি না আর ;
শুয়ে শুয়ে থেকে
বন্দুকের শব্দ শুনি ;
তারপর বন্দুকের শব্দ শুনি।
চাঁদের আলোয় ঘাইহরিণী আবার ডাকে ;
এইখানে পড়ে থেকে একা একা

আমার হৃদয়ে এক অবসাদ জমে ওঠে
বন্দুকের শব্দ শুনে শুনে
হরিণীর ডাক শুনে শুনে।
কাল মৃগী আসিবে ফিরিয়া ;
সকালে—আলোয় তারে দেখা যাবে—
পাশে তার মৃত সব প্রেমিকেরা পড়ে আছে।
মানুষেরা শিখায়ে দিয়েছে তারে এইসব।

আমার খাবার ডিশে হরিণের মাংসের ঘ্রাণ আমি পাব,
...মাংস খাওয়া হল তবু শেষ ?
...কেন শেষ হবে ?
কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে
তাদের মতন নই আমিও কি ?
কোনো এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
আমারেও ডাকেনি কি কেউ এসে জ্যোৎস্নায়—দখিনা বাতাসে
অই ঘাইহরিণীর মতো ?

আমার হৃদয়—এক পুরুষহরিণ—
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়—চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমারে কি চায় নাই ধরা দিতে ?
আমার বুকের প্রেম ঐ মৃত মৃগদের মতো
যখন ধুলায় রক্তে মিশে গেছে
এই হরিণীর মতো তুমি বেঁচেছিলে নাকি
জীবনের বিস্ময়ের রাতে
কোনো এক বসন্তের রাতে ?

তুমিও কাহার কাছে শিখেছিলে !
মৃত পশুদের মতো আমাদের মাংস লয়ে আমরাও পড়ে থাকি ;
বিয়োগের—বিয়োগের—মরণের মুখে এসে পড়ে সব
ঐ মৃত মৃগদের মতো— ।
প্রেমের সাহস-সাধ-স্বপ্ন লয়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই ;
পাই না কি ?

দোনলার শব্দ শুনি।
ঘাইমৃগী ডেকে যায়,
আমার হৃদয়ে ঘুম আসে নাকো
একা একা শুয়ে থেকে ;
বন্দুকের শব্দ তবু চুপে চুপে ভুলে যেতে হয়।
ক্যাম্পের বিছানায় রাত তার অন্য এক কথা বলে ;
যাহাদের দোনলার মুখে আজ হরিণেরা মরে যায়
হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এল যাহাদের ডিশে
তাহারাও তোমার মতন —
ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে থেকে শুকাতেছে তাদেরও হৃদয়
কথা ভেবে—কথা ভেবে—ভেবে।

এই ব্যথা, এই প্রেম সব দিকে রয়ে গেছে—
কোথাও ফড়িঙে-কীটে, মানুষের বুকের ভিতরে,
আমাদের সবের জীবনে।
বসন্তের জ্যোৎস্নায় অই মৃত মৃগদের মতো
আমরা সবাই।

জীবন

চারি দিকে বেজে ওঠে অন্ধকার সমুদ্রের স্বর—
নতুন রাত্রির সাথে পৃথিবীর বিবাহের গান !
ফসল উঠিছে ফলে—রসে-রসে ভরিছে শিকড় ;
লক্ষ নক্ষত্রের সাথে কথা কয় পৃথিবীর প্রাণ !
সে কোন্ প্রথম ভোরে পৃথিবীতে ছিল যে সন্তান
অঙ্কুরের মতো আজ জেগেছে সে জীবনের বেগে !
আমার দেহের গন্ধে পাই তার শরীরের ঘ্রাণ—
সিন্ধুর ফেনার গন্ধ আমার শরীরে আছে লেগে !
পৃথিবী রয়েছে জেগে চক্ষু মেলে—তার সাথে সেও আছে জেগে !

২

নক্ষত্রের আলো জ্বেলে পরিষ্কার আকাশের 'পর
কখন এসেছে রাত্রি !—পশ্চিমের সাগরের জলে
তার শব্দ ; উত্তর সমুদ্র তার, দক্ষিণ সাগর
তাহার পায়ের শব্দে—তাহার পায়ের কোলাহলে
ভরে ওঠে ; এসেছে সে আকাশের নক্ষত্রের তলে
প্রথম যে এসেছিল, তারই মতো —তাহার মতন
চোখ তার,—তাহার মতন চুল,— বুকের আঁচলে
প্রথম মেয়ের মতো—পৃথিবীর নদী মাঠ বন
আবার পেয়েছে তারে—সমুদ্রের পারে রাত্রি এসেছে এখন !

৩

সে এসেছে—আকাশের শেষ আলো পশ্চিমের মেঘে
সন্ধ্যার গহ্বর খুঁজে পালায়েছে !—রক্তে রক্তে লাল

হয়ে গেছে বুক তার—আহত চিতার মতো বেগে
পালায়ে গিয়েছে রোদ—সরে গেছে আলোর বৈকাল !
চলে গেছে জীবনের ‘আজ’ এক—আর এক ‘কাল’
আসিত না যদি আর আলো লয়ে—রৌদ্র সঙ্গে লয়ে !
এই রাত্রি—নক্ষত্র সমুদ্র লয়ে এমন বিশাল
আকাশের বুক থেকে পড়িত না যদি আর ক্ষ’য়ে—
রয়ে যেত—যে গান শুনিনি আর তাহার স্মৃতির মতো হয়ে !

৪

যে পাতা সবুজ ছিল, তবুও হলুদ হতে হয়—
শীতের হাড়ের হাত আজও তারে যায় নাই ছুঁয়ে—
যে মুখ যুবার ছিল, তবু যার হয়ে যায় ক্ষয়,
হেমন্ত রাতের আগে ঝরে যায়—পড়ে যায় নুয়ে ;—
পৃথিবীর এই ব্যথা বিহ্বলতা অন্ধকারে ধুয়ে
পূর্ব সাগরের ঢেউয়ে—জলে জলে, পশ্চিম সাগরে
তোমার বিনুনি খুলে—হেঁট হয়ে—পা তোমার থুয়ে—
তোমার নক্ষত্র জ্বেলে—তোমার জলের স্বরে স্বরে
রয়ে যেতে যদি তুমি আকাশের নীচে—নীল পৃথিবীর ’পরে !

৫

ভোরের সূর্যের আলো পৃথিবীর গুহায় যেমন
মেঘের মতন চুল—অন্ধকার চোখের আস্বাদ
একবার পেতে চায়—যে জন রয় না—যেই জন
চলে যায়, তারে পেতে আমাদের বুকে যেই সাধ—
যে ভালোবেসেছে শুধু, হয়ে গেছে হৃদয় অবাধ
বাতাসের মতো যার—তাহার বুকের গান শুনে

মনে যেই ইচ্ছা জাগে—কোনোদিন দেখে নাই চাঁদ
যেই রাত্রি—নেমে আসে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রেরে গুনে
যেই রাত্রি, আমি তার চোখে চোখ, চুলে তার চুল নেব বুনে !

৬

তুমি রয়ে যাবে, তবু, অপেক্ষায় রয় না সময়
কোনোদিন ; কোনোদিন রবে না সে পথ থেকে সরে !
সকলেই পথ চলে—সকলেই ক্লান্ত তবু হয়—
তবুও দুজন কই বসে থাকে হাতে হাত ধরে !
তবুও দুজন কই কে কাহারে রাখে কোলে করে !
মুখে রক্ত ওঠে—তবু কমে কই বুকের সাহস !
যেতে হবে—কে এসে চুলের ঝুঁটি টেনে লয় জোরে !
শরীরের আগে কবে ঝরে যায় হৃদয়ের রস !—
তবু, চলে—মৃত্যুর ঠোঁটের মতো দেহ যার হয়নি অবশ !

৭

হলদে পাতার মতো আমাদের পথে ওড়াউড়ি !—
কবরের থেকে শুধু আকাঙ্ক্ষার ভূত লয়ে খেলা !—
আমরাও ছায়া হয়ে, ভূত হয়ে করি ঘোরাঘুরি !
—মনের নদীর পার নেমে আসে তাই সন্ধ্যাবেলা
সন্ধ্যার অনেক আগে !—দুপুরেই হয়েছি একেলা !
আমরাও চরি-ফিরি কবরের ভূতের মতন !
বিকালবেলার আগে ভেঙে গেছে বিকালের মেলা—
শরীর রয়েছে, তবু মরে গেছে আমাদের মন !
হেমন্ত আসে নি মাঠে—হলুদ পাতায় ভরে হৃদয়ের বন !

৮

শীত রাত ঢের দূরে—অস্থি তবু কেঁপে ওঠে শীতে !
শাদা হাতদুটো শাদা হাড় হয়ে মৃত্যুর খবর
একবার মনে আনে—চোখ বুজে তবু কি ভুলিতে
পারি এই দিনগুলো !—আমাদের রক্তের ভিতর
বরফের মতো শীত—আগুনের মতো তবু জ্বর !
যেই গতি—সেই শক্তি পৃথিবীর অন্তরে পঞ্জরে ;—
সবুজ ফলায়ে যায় পৃথিবীর বুকের উপর—
তেমনি স্ফুলিঙ্গ এক আমাদের বুকে কাজ করে !
শস্যের কীটের আগে আমাদের হৃদয়ের শস্য তবু মরে !

৯

যতদিন রয়ে যাই এই শক্তি রয়ে যায় সাথে—
বিকালের দিকে যেই ঝড় আসে তাহার মতন !
যে ফসল নষ্ট হবে তারই ক্ষেত উড়াতে ফুরাতে
আমাদের বুকে এসে এই শক্তি করে আয়োজন !
নতুন বীজের গন্ধে ভরে দেয় আমাদের মন
এই শক্তি—একদিন হয়তো বা ফলিবে ফসল !—
এরই জোরে একদিন হয়তো বা হৃদয়ের বন
আহ্লাদে ফেলিবে ভরে অলক্ষিত আকাশের তল !
দুরন্ত চিতার মতো গতি তার—বিদ্যুতের মতো সে চঞ্চল !

১০

অঙ্গারের মতো তেজ কাজ করে অন্তরের তলে—
যখন আকাঙ্ক্ষা এক বাতাসের মতো বয়ে আসে,
এই শক্তি আগুনের মতো তার জিভ তুলে জ্বলে !
ভস্মের মতন তাই হয়ে যায় হৃদয় ফ্যাকাশে !

জীবন ধোঁয়ার মতো, জীবন ছায়ার মতো ভাসে ;
যে অঙ্গার জ্বলে-জ্বলে নিভে যাবে, হয়ে যাবে ছাই—
সাপের মতন বিষ লয়ে সেই আগুনের ফাঁসে
জীবন পুড়িয়া যায়—আমরাও ঝরে পুড়ে যাই !
আকাশে নক্ষত্র হয়ে জ্বলিবার মতো শক্তি—তবু শক্তি চাই !

১১

জান তুমি ?—শিখেছ কি আমাদের ব্যর্থতার কথা ?—
হে ক্ষমতা, বুকে তুমি কাজ করো তোমার মতন !—
তুমি আছো—রবে তুমি,—এর বেশি কোনো নিশ্চয়তা
তুমি এসে দিয়েছ কি ?—ওগো মন, মানুষের মন—
হে ক্ষমতা বিদ্যুতের মতো তুমি সুন্দর—ভীষণ !
মেঘের ঘোড়ার 'পরে আকাশের শিকারীর মতো ;—
সিন্ধুর সাপের মতো লক্ষ ঢেউয়ে তোল আলোড়ন !
চমৎকৃত কর—শরীরেরে তুমি করেছ আহত !—
যতই জেগেছ—দেহ আমাদের ছিঁড়ে যেতে চেয়েছে যে তত !

১২

তবু তুমি শীত রাতে আড়ষ্ট সাপের মতো শুয়ে
হৃদয়ের অন্ধকারে পড়ে থাক—কুণ্ডলী পাকায়ে !—
অপেক্ষায় বসে থাকি,—স্ফুলিঙ্গের মতো যাবে ছুঁয়ে
কে তোমারে !—ব্যাধের পায়ের পাড়া দিয়ে যাবে গায়ে
কে তোমারে !—কোন্ অশ্রু, কোন্ পীড়া হতাশার ঘায়ে
কখন জাগিয়া ওঠো —স্থির হয়ে বসে আছি তাই।
শীত-রাত বাড়ে আরো—নক্ষত্রেরা যেতেছে হারায়ে—
ছাইয়ে যে আগুন ছিল সেই সবও হয়ে যায় ছাই !

তবুও আরেকবার সব ভস্মে অন্তরের আগুন ধরাই !

১৩

অশান্ত হাওয়ার বুকে তবু আমি বনের মতন
জীবনেরে ছেড়ে দিছি !—পাতা আর পল্লবের মতো
জীবন উঠেছে বেজে শব্দে—স্বরে ; যতবার মন
ছিঁড়ে গেছে,হয়েছে দেহের মতো হৃদয় আহত
যতবার—উড়ে গেছে শাখা, পাতা পড়ে গেছে যত—
পৃথিবীর বন হয়ে—ঝড়ের গতির মতো হয়ে,
বিদ্যুতের মতো হয়ে আকাশের মেঘে ইতস্তত ;
একবার মৃত্যু লয়ে—একবার জীবনেরে লয়ে
ঘূর্ণির মতন বয়ে যে বাতাস ছেঁড়ে—তার মতো গেছি বয়ে !

১৪

কোথায় রয়েছে আলো-আঁধারের বীণার আস্বাদ !
ছিন্ন রুগ্ন ঘুমন্তের চোখে এক সুস্থ স্বপ্ন হয়ে
জীবন দিয়েছে দেখা ;—আকাশের মতন অবাধ
পরিচ্ছন্ন পৃথিবীতে, সিন্ধুর হাওয়ার মতো বয়ে
জীবন দিয়েছে দেখা—জেগে উঠে সেই ইচ্ছা লয়ে
আড়ষ্ট তারার মতো চমকায়ে গেছি শীতে-মেঘে !
ঘুমায়ে যা দেখি নাই, জেগে উঠে তার ব্যথা সয়ে
নির্জন হতেছে ঢেউ হৃদয়ের রক্তের আবেগে !
—যে আলো নিভিয়া গেছে তাহার ধোঁয়ার মতো প্রাণ আছে জেগে।

১৫

নক্ষত্র জেনেছে কবে অই অর্থ শৃঙ্খলার ভাষা !

বীণার তারের মতো উঠিতেছে বাজিয়া আকাশে
তাদের গতির ছন্দ—অবিরত শক্তির পিপাসা
তাহাদের, তবু সব তৃপ্ত হয়ে পূর্ণ হয়ে আসে !
আমাদের কাজ চলে ইশারায়—আভাসে আভাসে !
আরম্ভ হয় না কিছু—সমস্তের তবু শেষ হয়—
কীট যে ব্যর্থতা জানে পৃথিবীর ধুলো মাটি ঘাসে
তারও বড়ো ব্যর্থতার সাথে রোজ হয় পরিচয় !
যা হয়েছে শেষ হয়—শেষ হয় কোনোদিন যা হবার নয় !

১৬

সমস্ত পৃথিবী ভরে হেমন্তের সন্ধ্যার বাতাস
দোলা দিয়ে গেল কবে !—বাসি পাতা ভূতের মতন
উড়ে আসে !—কাশের রোগীর মতো পৃথিবীর শ্বাস—
যক্ষ্মার রোগীর মতো ধুঁকে মরে মানুষের মন !—
জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ !
মরণ—সে ভালো এই অন্ধকার সমুদ্রের পাশে !
বাঁচিয়া থাকিতে যারা হিঁচড়ায়—করে প্রাণপণ—
এই নক্ষত্রের তলে একবার তারা যদি আসে—
রাত্রিরে দেখিয়া যায় একবার সমুদ্রের পারের আকাশে !—

১৭

মৃত্যুরেও তবে তারা হয়তো ফেলিবে বেসে ভালো !
সব সাধ জেনেছে যে সেও চায় এই নিশ্চয়তা !
সকল মাটির গন্ধ আর সব নক্ষত্রের আলো
যে পেয়েছে—সকল মানুষ আর দেবতার কথা
যে জেনেছে—আর এক ক্ষুধা তবু—এক বিহ্বলতা

তাহারও জানিতে হয় ! এইমতো অন্ধকারে এসে !—
জেগে জেগে যা জেনেছ—জেনেছ তা—জেগে জেনেছ তা—
নতুন জানিবে কিছু হয়তো বা ঘুমের চোখে সে !
সব ভালোবাসা যার বোঝা হল—দেখুক সে মৃত্যু ভালোবেসে !

১৮

কিম্বা এই জীবনেরে একবার ভালোবেসে দেখি !—
পৃথিবীর পথে নয়—এইখানে—এইখানে বসে
মানুষ চেয়েছে কিবা ? পেয়েছে কি ?—কিছু পেয়েছে কি !
হয়তো পায় নি কিছু,—যা পেয়েছে, তাও গেছে খসে
অবহেলা করে করে কিম্বা তার নক্ষত্রের দোষে—
ধ্যানের সময় আসে তারপর—স্বপ্নের সময় !
শরীর ছিঁড়িয়া গেছে—হৃদয় পড়িয়া গেছে ধসে !—
অন্ধকার কথা কয়—আকাশের তারা কথা কয়
তারপর, সব গতি থেমে যায়—মুছে যায় শক্তির বিস্ময় !

১৯

কেউ আর ডাকিবে না—এইখানে এই নিশ্চয়তা !
তোমার দু-চোখ কেউ দেখে থাকে যদি পৃথিবীতে,
কেউ যদি শুনে থাকে কবে তুমি কী কয়েছ কথা,
তোমার সহিত কেউ থেকে থাকে যদি সেই শীতে—
সেই পৃথিবীর শীতে—আসিবে কি তোমারে চিনিতে
এইখানে সে আবার !—উঠানে পাতার ভিড়ে বসে,
কিম্বা ঘরে—হয়তো দেয়ালে আলো জ্বেলে দিতে দিতে,—
যখন হঠাৎ নিভে যাবে তার হাতের আলো সে—
অসুস্থ পাতার মতো দুলে তার মন থেকে পড়ে যাবে খসে !

২০

কিম্বা কেউ কোনোদিন দেখে নাই—চেনে নি আমারে !
সকালবেলার আলো ছিল যার সন্ধ্যার মতন—
চকিত ভূতের মতো নদী আর পাহাড়ের ধারে
ইশারায় ভূত ডেকে জীবনের সব আয়োজন
আরম্ভ সে করেছিল !—কোনোদিন কোনো লোকজন
তার কাছে আসে নাই—আকাঙ্ক্ষার কবরের 'পরে
পুবের হাওয়ার মতো এসেছে সে হঠাৎ কখন !—
বীজ বুনে গেছে চাষা—সে বাতাস বীজ নষ্ট করে !
ঘুমের চোখের 'পরে নেমে আসে অশ্রু আর অনিদ্রার স্বরে !

২১

যেমন বৃষ্টির পরে ছেঁড়া ছেঁড়া কালো মেঘ এসে
আবার আকাশ ঢাকে—মাঠে-মাঠে অধীর বাতাস
ফোঁপায় শিশুর মতো,—একবার চাঁদ ওঠে ভেসে—
দূরে—কাছে দেখা যায় পৃথিবীর ধান ক্ষেত ঘাস,
আবার সন্ধ্যার রঙে ভরে ওঠে সকল আকাশ—
মড়ার চোখের রঙে সকল পৃথিবী থাকে ভরে !—
যে মরে যেতেছে তার হৃদয়ের সব শেষ শ্বাস
সকল আকাশ আর পৃথিবীর থেকে পড়ে ঝ'রে !—
জীবনে চলেছি আমি সে পৃথিবী আকাশের পথ ধ'রে ধ'রে !

২২

রাত্রির ফুলের মতো—ঘুমন্তের হৃদয়ের মতো
অন্তর ঘুমায়ে গেছে—ঘুমায়েছে মৃত্যুর মতন !—

সারাদিন বুকে ক্ষুধা লয়ে চিতা হয়েছে আহত—
তারপর, অন্ধকার গুহা এই—ছায়াভরা বন
পেয়েছে সে !—অশান্ত হাওয়ার মতো মানুষের মন
বুজে গেছে—রাত্রি আর নক্ষত্রের মাঝখানে এসে !—
মৃত্যুর শান্তির স্বাদ এইখানে দিতেছে জীবন—
জীবনেরে এইখানে একবার দেখি ভালোবেসে !
শুনে দেখি—কোন্ কথা কয় রাত্রি, কোন্ কথা নক্ষত্র বলে সে !

২৩

পৃথিবীর অন্ধকার অধীর বাতাসে গেছে ভরে—
শস্য ফলে গেছে মাঠে—কেটে নিয়ে চলে গেছে চাষা ;
নদীর পারের বন মানুষের মতো শব্দ করে
নির্জন ঢেউয়ের কানে মানুষের মনের পিপাসা—
মৃত্যুর মতন তার জীবনের বেদনার ভাষা—
আবার জানায়ে যায় !—কবরের ভূতের মতন
পৃথিবীর বুকে রোজ লেগে থাকে যে আশা-হতাশা—
বাতাসে ভাসিতেছিল ঢেউ তুলে সেই আলোড়ন।
মড়ার কবর ছেড়ে পৃথিবীর দিকে তাই ছুটে গেল মন !

২৪

হলুদ পাতার মতো—আলেয়ার বাষ্পের মতন,
ক্ষীণ বিদ্যুতের মতো ছেঁড়া মেঘ আকাশের ধারে,
আলোর মাছির মতো—রুগ্নের স্বপ্নের মতো মন
একবার ছিল ঐ পৃথিবীর সমুদ্রে পাহাড়ে—
ঢেউ ভেঙে ঝরে যায়,—মরে যায়—কে ফেরাতে পারে !
তবুও ইশারা করে ফাল্গুন-রাতের গন্ধে বয়ে

মৃত্যুরেও তার সেই কবরের গহ্বরে আঁধারে
জীবন ডাকিতে আসে—হয় নাই—গিয়েছে যা হয়ে,
মৃত্যুরেও ডাকো তুমি সেই ব্যথা-আকাঙ্ক্ষার অস্থিরতা লয়ে !

২৫

মৃত্যুরে বন্ধুর মতো ডেকেছি তো—প্রিয়ার মতন !
চকিত শিশুর মতো তার কোলে লুকায়েছি মুখ ;
রোগীর জ্বরের মতো পৃথিবীর পথের জীবন ;
অসুস্থ চোখের 'পরে অনিদ্রার মতন অসুখ ;
তাই আমি প্রিয়তম—প্রিয়া বলে জড়ায়েছি বুক—
ছায়ার মতন আমি হয়েছি তোমার পাশে গিয়া !—
যে-ধূপ নিভিয়া যায় তার ধোঁয়া আঁধারে মিশুক—
যে ধোঁয়া মিলায়ে যায় তারে তুমি বুকে তুলে নিয়া
ঘুমানো গন্ধের মতো স্বপ্ন হয়ে তার ঠোঁটে চুমো দিয়ো, প্রিয়া !

২৬

মৃত্যুরে ডেকেছি আমি প্রিয়ের অনেক নাম ধরে।
যে বালক কোনোদিন জানে নাই গহ্বরের ভয়,
পুবের হাওয়ার মতো ভূত হয়ে মন তার ঘোরে !—
নদীর ধারে সে ভূত একদিন দেখেছে নিশ্চয় !
পায়ের তলের পাতা—পাপড়ির মতো মনে হয়
জীবনেরে—খসে ক্ষয়ে গিয়েছে যে, তাহার মতন
জীবন পড়িয়া থাকে—তার বিছানায় খেদ—ক্ষয়—
পাহাড় নদীর পারে হাওয়া হয়ে ভূত হয়ে মন
চকিত পাতার শব্দে বাতাসের বুকে তারে করে অন্বেষণ।

২৭

জীবন, আমার চোখে মুখ তুমি দেখেছ তোমার—
একটি পাতার মতো অন্ধকারে পাতা-ঝরা গাছে—
একটি বোঁটার মতো যে ফুল ঝরিয়া গেছে তার—
একাকী তারার মতো, সব তারা আকাশের কাছে
যখন মুছিয়া গেছে—পৃথিবীতে আলো আসিয়াছে—
যে ভালোবেসেছে, তার হৃদয়ের ব্যথার মতন—
কাল যাহা থাকিবে না—আজই যাহা স্মৃতি হয়ে আছে—
দিন-রাত্রি—আমাদের পৃথিবীর জীবন তেমন।
সন্ধ্যার মেঘের মতো মুহূর্তের রঙ লয়ে মুহূর্তে নূতন !

২৮

আশঙ্কা ইচ্ছার পিছে বিদ্যুতের মতো কেঁপে ওঠে !
বীণার তারের মতো কেঁপে কেঁপে ছিঁড়ে যায় প্রাণ !
অসংখ্য পাতার মতো লুটে তারা পথে পথে ছোটে—
যখন ঝড়ের মতো জীবনের এসেছে আহ্বান !
অধীর ঢেউয়ের মতো—অশান্ত হাওয়ার মতো গান
কোন্‌দিকে ভেসে যায় !—উড়ে যায়—কয় কোন্ কথা !—
ভোরের আলোয় আজ শিশিরের বুকে যেই ঘ্রাণ,
রহিবে না কাল তার কোনো স্বাদ—কোনো নিশ্চয়তা !
পাণ্ডুর পাতার রঙ গালে, তবু রক্তে তার রবে অসুস্থতা !

২৯

যেখানে আসেনি চাষা কোনোদিন কাস্তে হাতে লয়ে,
জীবনের বীজ কেউ বোনে নাই যেইখানে এসে,
নিরাশার মতো ফেঁপে চোখ বুজে পলাতক হয়ে

প্রেমেরে মৃত্যুর চোখে সেইখানে দেখিয়াছি শেষে !
তোমার চোখের 'পরে তাহার মুখেরে ভালোবেসে
এখানে এসেছি আমি—আর একবার কেঁপে উঠে
অনেক ইচ্ছার বেগে—শান্তির মতন অবশেষে
সব ঢেউ ভেঙে নিয়ে ফেনার ফুলের মতো ফুটে,
ঘুমাব বালির 'পরে—জীবনের দিকে আর যাব নাকো ছুটে !

৩০

নির্জন রাত্রির মতো শিশিরের গুহার ভিতরে—
পৃথিবীর ভিতরের গহ্বরের মতন নিঃসাড়
রবো আমি—অনেক গতির পর—আকাঙ্ক্ষার পরে
যেমন থামিতে হয়, বুজে যেতে হয় একবার—
পৃথিবীর পারে থেকে কবরের মৃত্যুর ওপার
যেমন নিস্তব্ধ শান্ত নিমীলিত শূন্য মনে হয়—
তেমন আস্বাদ এক কিম্বা সেই স্বাদহীনতার
সাথে একবার হবে মুখোমুখি সব পরিচয় !
শীতের নদীর বুকে মৃত জোনাকির মুখ তবু সব নয় !

৩১

আবার পিপাসা সব ভূত হয়ে পৃথিবীর মাঠে—
অথবা গ্রহের 'পরে—ছায়া হয়ে, ভূত হয়ে ভাসে !—
যেমন শীতের রাতে দেখা যায় জ্যোৎস্না ধোঁয়াটে,
ফ্যাকাশে পাতার 'পরে দাঁড়ায়েছে উঠানের ঘাসে—
যেমন হঠাৎ দুটো কালো পাখা চাঁদের আকাশে
অনেক গভীর রাতে চমকের মতো মনে হয় ;
কার পাখা ?—কোন্ পাখি ? পাখি সে কি ! অথচ সে আসে !—
তখন অনেক রাতে কবরের মুখ কথা কয় !—

ঘুমন্ত তখন ঘুমে, জাগিতে হতেছে যার সে জাগিয়া রয় !

৩২

বনের পাতার মতো কুয়াশায় হলুদ না হতে,
হেমন্ত আসার আগে হিম হয়ে পড়ে গেছি ঝরে !—
তোমার বুকের ’পরে মুখ আমি চেয়েছি লুকোতে ;
তোমার দুইটি চোখ প্রিয়ার চোখের মতো করে
দেখিতে চেয়েছি, মৃত্যু, পথ থেকে ঢের দূরে সরে
প্রেমের মতন হয়ে !—তুমি হবে শান্তির মতন !—
তারপর সরে যাব, তারপর তুমি যাবে মরে—
অধীর বাতাস লয়ে কাঁপুক না পৃথিবীর বন !—
মৃত্যুর মতন তবু বুজে যাক—ঘুমাক মৃত্যুর মতো মন !

৩৩

নির্জন পাতার মতো, আলেয়ার বাষ্পের মতন,
ক্ষীণ বিদ্যুতের মতো ছেঁড়া মেঘে আকাশের ধারে,
আলোর মাছির মতো—রুগ্নের স্বপ্নের মতো মন
একবার ছিল ঐ পৃথিবীর সমুদ্রে পাহাড়ে—
ঢেউ ভেঙে ঝরে যায়—মরে যায়,—কে ফেরাতে পারে !
তবুও ইশারা ক’রে ফাল্গুনরাতের গন্ধে বয়ে
মৃত্যুরেও তার সেই কবরের গহ্বরে আঁধারে
জীবন ডাকিতে আসে—হয় নাই—গিয়েছে যা হয়ে—
মৃত্যুরেও ডাকো তুমি সেই স্মৃতি-আকাঙ্ক্ষার অস্থিরতা লয়ে !

৩৪

পৃথিবীর অন্ধকার অধীর বাতাসে গেছে ভ’রে—

শস্য ফলে গেছে মাঠে—কেটে নিয়ে চলে গেছে চাষা ;
নদীর পারের বন মানুষের মতো শব্দ করে
নির্জন ঢেউয়ের কানে মানুষের মনের পিপাসা—
মৃত্যুর মতন তার জীবনের বেদনার ভাষা—
আবার জানায়ে যায়—কবরের ভূতের মতন
পৃথিবীর বুকে রোজ লেগে থাকে যে আশা-হতাশা—
বাতাসে ভাসিতেছিল ঢেউ তুলে সেই আলোড়ন !—
মড়ার কবর ছেড়ে পৃথিবীর দিকে তাই ছুটে গেল মন !

১৩৩৩

তোমার শরীর—
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার—তারপর—মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্‌দিকে জানি নি তা—হয়েছে মলিন
চক্ষু এই—ছিঁড়ে গেছি—ফেঁড়ে গেছি—পৃথিবীর পথে হেঁটে হেঁটে
কত দিন-রাত্রি গেছে কেটে !
কত দেহ এল, গেল, হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে
দিয়েছি ফিরায়ে সব—সমুদ্রের জলে দেহ ধুয়ে
নক্ষত্রের তলে
বসে আছি—সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া
তুমি কি আসিবে কাছে প্রিয়া !
তোমার শরীর—
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার ;—তারপর,—মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্‌দিকে—ফলে গেছে কতবার, ঝরে গেছে তৃণ !

*

আমারে চাও না তুমি আজ আর, জানি ;
তোমার শরীর ছানি
মিটায় পিপাসা
কে সে আজ !—তোমার রক্তের ভালোবাসা
দিয়েছ কাহারে !
কে বা সেই !—আমি এই সমুদ্রের পারে
বসে আছি একা আজ—ঐ দূর নক্ষত্রের কাছে
আজ আর প্রশ্ন নাই—মাঝরাতে ঘুম লেগে আছে
চক্ষে তার—এলোমেলো রয়েছে আকাশ !
উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা !—তারই তলে পৃথিবীর ঘাস
ফলে ওঠে—পৃথিবীর তৃণ
ঝরে পড়ে—পৃথিবীর রাত্রি আর দিন
কেটে যায় !
উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা—তারই তলে হায় !

*

জানি আমি—আমি যাব চলে
তোমার অনেক আগে ;
তারপর, সমুদ্র গাহিবে গান বহুদিন—
আকাশে আকাশে যাবে জ্বলে
নক্ষত্র অনেক রাত আরো,
নক্ষত্র অনেক রাত আরো !—
(যদিও তোমারও
রাত্রি আর দিন শেষ হবে
একদিন কবে !)
আমি চলে যাব, তবু, সমুদ্রের ভাষা
রয়ে যাবে—তোমার পিপাসা
ফুরাবে না—পৃথিবীর ধুলো মাটি তৃণ

রহিবে তোমার তরে—রাত্রি আর দিন
রয়ে যাবে ; রয়ে যাবে তোমার শরীর,
আর এই পৃথিবীর মানুষের ভিড়।

*

আমারে খুঁজিয়াছিলে তুমি একদিন—
কখন হারায়ে যাই—এই ভয়ে নয়ন মলিন
করেছিলে তুমি !—
জানি আমি ; তবু, এই পৃথিবীর ফসলের ভূমি
আকাশের তারার মতন
ফলিয়া ওঠে না রোজ—দেহ ঝরে—ঝ'রে যায় মন
তার আগে !
এই বর্তমান—তার দু পায়ের দাগে
মুছে যায় পৃথিবীর 'পর
একদিন হয়েছে যা—তার রেখা, ধুলার অক্ষর !
আমারে হারায়ে আজ চোখ ম্লান করিবে না তুমি—
জানি আমি ; পৃথিবীর ফসলের ভূমি
আকাশের তারার মতন
ফলিয়া ওঠে না রোজ—
দেহ ঝরে, তার আগে আমাদের ঝরে যায় মন !

*

আমার পায়ের তলে ঝরে যায় তৃণ—
তার আগে এই রাত্রি-দিন
পড়িতেছে ঝরে
এই রাত্রি, এই দিন রেখেছিলে ভরে
তোমার পায়ের শব্দে, শুনেছি তা আমি !
কখন গিয়েছে তবু থামি
সেই শব্দ !—গেছ তুমি চলে

সেই দিন—সেই রাত্রি ফুরায়েছে বলে !
আমার পায়ের তলে ঝরে নাই তৃণ—
তবু সেই রাত্রি আর দিন
পড়ে গেল ঝ'রে !—
সেই রাত্রি—সেই দিন—তোমার পায়ের শব্দে রেখেছিলে ভরে !

*

জানি আমি, খুঁজিবে না আজিকে আমারে
তুমি আর ; নক্ষত্রের পারে
যদি আমি চলে যাই,
পৃথিবীর ধুলো মাটি কাঁকরে হারাই
যদি আমি—
আমারে খুঁজিতে তবু আসিবে না আজ ;
তোমার পায়ের শব্দ গেল কবে থামি
আমার এ নক্ষত্রের তলে !—
জানি তবু, নদীর জলের মতো পা তোমার চলে—
তোমার শরীর আজ ঝরে
রাত্রির ঢেউয়ের মতো কোনো এক ঢেউয়ের উপরে !
যদি আজ পৃথিবীর ধুলো মাটি কাঁকরে হারাই,
যদি আমি চলে যাই
নক্ষত্রের পারে—
জানি আমি, তুমি আর আসিবে না খুঁজিতে আমারে !

*

তুমি যদি রহিতে দাঁড়ায়ে !
নক্ষত্র সরিয়া যায়, তবু যদি তোমার দু পায়ে
হারায়ে ফেলিতে পথ-চলার পিপাসা !—
একবার ভালোবেসে—যদি ভালোবাসিতে চাহিতে তুমি সেই ভালোবাসা।
আমার এখানে এসে যেতে যদি থামি !—

কিন্তু তুমি চলে গেছ, তবু কেন আমি
রয়েছি দাঁড়ায়ে !
নক্ষত্র সরিয়া যায়—তবু কেন আমার এ-পায়ে
হারায়ে ফেলেছি পথ-চলার পিপাসা !
একবার ভালোবেসে কেন আমি ভালোবাসি সেই ভালোবাসা !

*

চলিতে চাহিয়াছিলে তুমি একদিন
আমার এ পথে—কারণ, তখন তুমি ছিলে বন্ধুহীন।
জানি আমি, আমার নিকটে তুমি এসেছিলে তাই।
তারপর, কখন খুঁজিয়া পেলে কারে তুমি !—তাই আস নাই
আমার এখানে তুমি আর !
একদিন কত কথা বলেছিলে, তবু বলিবার
সেইদিনও ছিল না তো কিছু—তবু সেইদিন
আমার এ পথে তুমি এসেছিলে—বলেছিলে কত কথা,—
কারণ, তখন তুমি ছিলে বন্ধুহীন ;
আমার নিকটে তুমি এসেছিলে তাই ;
তারপর, কখন খুঁজিয়া পেলে কারে তুমি—তাই আস নাই !

*

তোমার দু চোখ দিয়ে একদিন কতবার চেয়েছ আমারে।
আলো-অন্ধকারে
তোমার পায়ের শব্দ কতবার শুনিয়াছি আমি !
নিকটে নিকটে আমি ছিলাম তোমার তবু সেইদিন—
আজ রাত্রে আসিয়াছি নামি
এই দূর সমুদ্রের জলে !
যে নক্ষত্র দেখ নাই কোনোদিন, দাঁড়ায়েছি আজ তার তলে !
সারাদিন হাঁটিয়াছি আমি পায়ে পায়ে
বালকের মতো এক—তারপর, গিয়েছি হারায়ে

সমুদ্রের জলে,
নক্ষত্রের তলে !
রাত্রে, অন্ধকারে !
—তোমার পায়ের শব্দ শুনিব না তবু আজ—জানি আমি,
আজ তবু আসিবে না খুঁজিতে আমারে !

*

তোমার শরীর—
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার—তারপর, মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন।
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্‌দিকে জানি নি তা—হয়েছে মলিন
চক্ষু এই—ছিঁড়ে গেছি—ফেঁড়ে গেছি—পৃথিবীর পথে হেঁটে হেঁটে
কত দিন-রাত্রি গেছে কেটে !
কত দেহ এল, গেল—হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে
দিয়েছি ফিরায়ে সব—সমুদ্রের জলে দেহ ধুয়ে
নক্ষত্রের তলে
বসে আছি—সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া
তুমি কি আসিবে কাছে প্রিয়া !

প্রেম

আমরা ঘুমায়ে থাকি পৃথিবীর গহ্বরের মতো—
পাহাড় নদীর পারে অন্ধকারে হয়েছে আহত
একা-হরিণের মতো আমাদের হৃদয় যখন !
জীবনের রোমাঞ্চের শেষ হলে ক্লান্তির মতন
পাণ্ডুর পাতার মতো শিশিরে শিশিরে ইতস্তত
আমরা ঘুমায়ে থাকি !—ছুটি লয়ে চলে যায় মন !—
পায়ের পথের মতো ঘুমন্তেরা পড়ে আছে কত—
তাদের চোখের ঘুম ভেঙে যাবে আবার কখন !—

জীবনের জ্বর ছেড়ে শান্ত হয়ে রয়েছে হৃদয়—
অনেক জাগার পর এইমতো ঘুমাইতে হয়।

অনেক জেনেছে বলে আর কিছু হয় না জানিতে ;
অনেক মেনেছে বলে আর কিছু হয় না মানিতে ;
দিন-রাত্রি-গ্রহ-তারা-পৃথিবী-আকাশ ধরে ধরে
অনেক উড়েছে যারা অধীর পাখির মতো করে—
পৃথিবীর বুক থেকে তাহাদের ডাকিয়া আনিতে
পুরুষ পাখির মতো—প্রবল হাওয়ার মতো জোরে
মৃত্যুও উড়িয়া যায় !—অসাড় হতেছে পাতা শীতে,
হৃদয়ে কুয়াশা আসে—জীবন যেতেছে তাই ঝরে !—
পাখির মতন উড়ে পায় নি যা পৃথিবীর কোলে—
মৃত্যুর চোখের 'পরে চুমো দেয় তাই পাবে বলে !

কারণ, সাম্রাজ্য—রাজা—সিংহাসন—জয়—
মৃত্যুর মতন নয়—মৃত্যুর শান্তির মতো নয় !
কারণ, অনেক অশ্রু—রক্তের মতন অশ্রু ঢেলে
আমরা রাখিতে আছি জীবনের এই আলো জ্বেলে !
তবুও নক্ষত্র নিজে নক্ষত্রের মতো জেগে রয় !—
তাহার মতন আলো হৃদয়ের অন্ধকারে পেলে
মানুষের মতো নয়—নক্ষত্রের মতো হতে হয় !
মানুষের মতো হয়ে মানুষের মতো চোখ মেলে
মানুষের মতো পায়ে চলিতেছি যতদিন—তাই,
ক্লান্তির পরে ঘুম, মৃত্যুর মতন শান্তি চাই !

কারণ, যোদ্ধার মতো—আর সেনাপতির মতন
জীবন যদিও চলে—কোলাহল ক'রে চলে মন

যদিও সিন্ধুর মতো দল বেঁধে জীবনের সাথে,
সবুজ বনের মতো উত্তরের বাতাসের হাতে
যদিও বীণার মতো বেজে ওঠে হৃদয়ের বন
একবার—দুইবার—জীবনের অধীর আঘাতে—
তবু প্রেম—তবু তারে ছিঁড়ে-ফেঁড়ে গিয়েছে কখন !
তেমন ছিঁড়িতে পারে প্রেম শুধু !—অঘ্রানের রাতে
হাওয়া এসে যেমন পাতার বুক চলে গেছে ছিঁড়ে !
পাতার মতন করে ছিঁড়ে গেছে যেমন পাখিরে !

তবু পাতা—তবুও পাখির মতো ব্যথা বুকে লয়ে,
বনের শাখার মতো—শাখার পাখির মতো হয়ে
হিমের হাওয়ার হাতে আকাশের নক্ষত্রের তলে
বিদীর্ণ শাখার শব্দে—অসুস্থ ডানার কোলাহলে,
ঝড়ের হাওয়ার শেষে ক্ষীণ বাতাসের মতো বয়ে,
আগুন জ্বালিয়া গেলে অঙ্গারের মতো তবু জ্বলে
আমাদের এ জীবন !—জীবনের বিহ্বলতা সয়ে
আমাদের দিন চলে—আমাদের রাত্রি তবু চলে ;
তার ছিঁড়ে গেছে—তবু তাহারে বীণার মতো করে
বাজাই, যে প্রেম চলিয়া গেছে তারই হাত ধরে !

কারণ, সূর্যের চেয়ে, আকাশের নক্ষত্রের থেকে
প্রেমের প্রাণের শক্তি বেশি ; তাই রাখিয়াছে ঢেকে
পাখির মায়ের মতো প্রেম এসে আমাদের বুক !
সুস্থ করে দিয়ে গেছে আমাদের রক্তের অসুখ !—
পাখির শিশুর মতো যখন প্রেমেরে ডেকে ডেকে
রাতের গুহার বুকে ভালোবেসে লুকায়েছি মুখ—
ভোরের আলোর মতো চোখের তারায় তারে দেখে !—

প্রেম কি আসে নি তবু ?—তবে তার ইশারা আসুক !
প্রেম কি চলিয়া যায় প্রাণেরে জলের ঢেউয়ে ছিঁড়ে !
ঢেউয়ের মতন তবু তার খোঁজে প্রাণ আসে ফিরে !

যতদিন বেঁচে আছি আলেয়ার মতো আলো নিয়ে—
তুমি চলে আস প্রেম—তুমি চলে আস কাছে প্রিয়ে !
নক্ষত্রের বেশি তুমি—নক্ষত্রের আকাশের মতো !
আমরা ফুরায়ে যাই—প্রেম, তুমি হও না আহত !
বিদ্যুতের মতো মোরা মেঘের গুহার পথ দিয়ে
চলে আসি—চলে যাই—আকাশের পারে ইতস্তত !—
ভেঙে যাই—নিভে যাই—আমরা চলিতে গিয়ে গিয়ে !
আকাশের মতো তুমি—আকাশে নক্ষত্র আছে যত—
তাদের সকল আলো একদিন নিভে গেলে পরে,
তুমিও কি ডুবে যাবে, ওগো প্রেম, পশ্চিম সাগরে !
জীবনের মুখে চেয়ে সেইদিনও রবে জেগে, জানি !
জীবনের বুকে এসে মৃত্যু যদি উড়ায় উড়ানি—
ঘুমন্ত ফুলের মতো নিবন্ত বাতির মতো ঢেলে
মৃত্যু যদি জীবনেরে রেখে যায়—তুমি তারে জ্বেলে
চোখের তারার 'পরে তুলে লবে সেই আলোখানি !
সময় ভাসিয়া যাবে—দেবতা মরিবে অবহেলে—
তবুও দিনের মেঘ আঁধার রাত্রির মেঘ ছানি
চুমো খাবে !—মানুষের সব ক্ষুধা আর শক্তি লয়ে
পূর্বের সমুদ্র অই পশ্চিম সাগরে যাবে বয়ে !

সকল ক্ষুধার আগে তোমার ক্ষুধায় ভরে মন !
সকল শক্তির আগে প্রেম তুমি, তোমার আসন
সকল স্থলের 'পরে, সকল জলের 'পরে আছে !

যেইখানে কিছু নাই সেখানেও ছায়া পড়িয়াছে
হে প্রেম, তোমার !—যেইখানে শব্দ নাই তুমি আলোড়ন
তুলিয়াছ !—অঙ্কুরের মতো তুমি—যাহা ঝরিয়াছে
আবার ফুটাও তারে !—তুমি ঢেউ—হাওয়ার মতন !
আগুনের মতো তুমি আসিয়াছ অন্তরের কাছে !
আশার ঠোঁটের মতো নিরাশার ভিজে চোখ চুমি
আমার বুকের 'পরে মুখ রেখে ঘুমায়েছ তুমি !

জীবন হয়েছে এক প্রার্থনার গানের মতন
তুমি আছো বলে প্রেম, গানের ছন্দের মতো মন
আলো আর অন্ধকারে দুলে ওঠে তুমি আছো বলে !
হৃদয় গন্ধের মতো—হৃদয় ধূপের মতো জ্বলে
ধোঁয়ার চামর তুলে তোমারে যে করিছে ব্যজন !
ওগো প্রেম, বাতাসের মতো যেইদিকে যাও চলে
আমারে উড়ায়ে লও আগুনের মতন তখন !
আমি শেষ হব শুধু, ওগো প্রেম, তুমি শেষ হলে !
তুমি যদি বেঁচে থাক—জেগে রবো আমি এই পৃথিবীর 'পর—
যদিও বুকের 'পরে রবে মৃত্যু—মৃত্যুর কবর !

তবুও, সিন্ধুর জল—সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো বয়ে
তুমি চলে যাও প্রেম—একবার বর্তমান হয়ে—
তারপর, আমাদের ফেলে যাও পিছনে—অতীতে—
স্মৃতির হাড়ের মাঠে,—কার্তিকের শীতে !
অগ্রসর হয়ে তুমি চলিতেছ ভবিষ্যৎ লয়ে—
আজও যাবে দেখ নাই তাহারে তোমার চুমো দিতে
চলে যাও !—দেহের ছায়ার মতো তুমি যাও রয়ে—
আমরা ধরেছি ছায়া—প্রেমেরে তো পারিনি ধরিতে !

ধ্বনি চলে গেছে দূরে—প্রতিধ্বনি পিছে পড়ে আছে —
আমরা এসেছি সব—আমরা এসেছি তার কাছে !

এক দিন—এক রাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা !
এক রাত—এক দিন করেছি মৃত্যুরে অবহেলা
এক দিন—এক রাত—তারপর প্রেম গেছে চলে—
সবাই চলিয়া যায়—সকলের যেতে হয় বলে
তাহারও ফুরাল রাত !—তাড়াতাড়ি পড়ে গেল বেলা
প্রেমেরও যে !—এক রাত আর এক দিন সাঙ্গ হলে
পশ্চিমের মেঘে আলো এক দিন হয়েছে সোনেলা !
আকাশে পুবের মেঘে রামধনু গিয়েছিল জ্বলে
এক দিন—রয় না কিছুই তবু—সব শেষ হয়—
সময়ের আগে তাই কেটে গেল প্রেমের সময় ;

একদিন—এক রাত প্রেমেরে পেয়েছি তবু কাছে !—
আকাশ চলেছে—তার আগে আগে প্রেম চলিয়াছে !
সকলের ঘুম আছে—ঘুমের মতন মৃত্যু বুকে
সকলের ; নক্ষত্রও ঝরে যায় মনের অসুখে—
প্রেমের পায়ের শব্দ তবুও আকাশে বেঁচে আছে !
সকল ভুলের মাঝে যায় নাই কেউ ভুলে-চুকে
হে প্রেম তোমারে !—মৃতেরা আবার জাগিয়াছে !—
যে ব্যথা মুছিতে এসে পৃথিবীর মানুষের মুখে
আরও ব্যথা—বিহ্বলতা তুমি এসে দিয়ে গেলে তারে—
ওগো প্রেম, সেইসব ভুলে গিয়ে কে ঘুমাতে পারে !

পিপাসার গান

কোনো এক অন্ধকারে আমি
যখন যাই চলে—আরবার আসিব কি নামি
অনেক পিপাসা লয়ে এ মাটির তীরে
তোমাদের ভিড়ে !
কে আমারে ব্যথা দেছে—কে বা ভালোবাসে—
সব ভুলে, শুধু মোর দেহের তালাসে
শুধু মোর স্নায়ু শিরা রক্তের তরে
এ মাটির 'পরে
আসিব কি নেমে !
পথে পথে—থেমে—থেমে—থেমে
খুঁজিব কি তারে—
এখানের আলোয় আঁধারে
যেইজন বেঁধেছিল বাসা !
মাটির শরীরে তার ছিল যে পিপাসা,
আর যেই ব্যথা ছিল—যেই ঠোঁট, চুল,
যেই চোখ, যেই হাত, আর যে আঙুল
রক্ত আর মাংসের স্পর্শসুখভরা—
যেই দেহ একদিন পৃথিবীর ঘ্রাণের পসরা
পেয়েছিল—আর তার ধানী সুরা করেছিল পান,
একদিন শুনেছে যে জল আর ফসলের গান,
দেখেছে যে ঐ নীল আকাশের ছবি
মানুষ-নারীর মুখ—পুরুষ—স্ত্রীর দেহ সবই
যার হাত ছুঁয়ে আজও উষ্ণ হয়ে আছে—
ফিরিয়া আসিবে যে কি তাহাদের কাছে !
প্রণয়ীর মতো ভালোবেসে
খুঁজিবে কি এসে

একখানা দেহ শুধু !—
হারায়ে গিয়েছে কবে কঙ্কালে কাঁকরে
এ মাটির ’পরে !

*

অন্ধকারে সাগরের জল
ছেনেছে আমার দেহ, হয়েছে শীতল
চোখ—ঠোঁট—নাসিকা—আঙুল
তাহার ছোঁয়াচে ; ভিজে গেছে চুল
শাদা-শাদা ফেনাফুলে ;
কত বার দূর উপকূলে
তারাভরা আকাশের তলে
বালকের মতো এক—সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া
জেনেছি দেহের স্বাদ—গেছে বুক—মুখ পরশিয়া
রাঙা রোদ—নারীর মতন
এ দেহ পেয়েছে যেন তাহার চুম্বন
ফসলের ক্ষেতে !
প্রথম প্রণয়ী সে যে, কার্তিকের ভোরবেলা দূরে যেতে যেতে
থেমে গেছে সে আমার তরে !
চোখ দুটো ফের ঘুমে ভরে
যেন তার চুমো খেয়ে !
এ দেহ—অলস মেয়ে
পুরুষের সোহাগে অবশ !—
চুমে লয় রৌদ্রের রস
হেমন্ত বৈকালে
উড়ো পাখপাখালীর পালে
উঠানের ; পেতে থাকে কান—

শোনে ঝরা শিশিরের গান
অঘ্রানের মাঝরাতে ;
হিম হাওয়া যেন শাদা কঙ্কালের হাতে
এ দেহেরে এসে ধরে—
ব্যথা দেয় ! নারীর অধরে—
চুলে—চোখে—জুঁয়ের নিশ্বাসে
ঝুম্‌কো-লতার মতো তার দেহ-ফাঁসে
ভরা ফসলের মতো পড়ে ছিঁড়ে
এই দেহ—ব্যথা পায় ফিরে !...
তবু এই শস্যক্ষেতে পিপাসার ভাষা
ফুরাবে না—কে বা সেই চাষা,—
কাস্তে হাতে—কঠিন, কামুক—
আমাদের সবটুকু ব্যথাভরা সুখ
উচ্ছেদ করিবে এসে একা !
কে বা সেই !—জানি না তো—হয় নাই দেখা
আজও তার সনে ;
আজ শুধু দেহ—আর দেহের পীড়নে
সাধ মোর—চোখে ঠোঁটে চুলে
শুধু পীড়া, শুধু পীড়া !—মুকুলে মুকুলে
শুধু কীট, আঘাত, দংশন—
চায় আজ মন !

*

নক্ষত্রের পানে যেতে যেতে
পথ ভুলে বারবার পৃথিবীর ক্ষেতে
জন্মিতেছি আমি এক সবুজ ফসল !—
অন্ধকারে শিশিরের জল
কানে কানে গাহিয়াছে গান—

ঢালিয়াছে শীতল আঘ্রাণ ;
মোর দেহ ছেনে গেছে অলস—আঢুল
কুমারী আঙুল
কুয়াশার ; ঘ্রাণ আর পরশের সাধ
জাগায়েছে—কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
ঢালিয়াছে আলো—
প্রণয়ীর ঠোঁটের ধারালো
চুম্বনের মতো !
রেখে গেছে ক্ষত
সব্‌জির সবুজ রুধিরে !
শস্যের মতো মোর এ শরীর ছিঁড়ে
বারবার হয়েছে আহত
আগুনের মতো
দুপুরের রাঙা রোদ !
আমি তবু ব্যথা দেই—
ব্যথা পাই ফিরে !—
তবু চাই সবুজ শরীরে
এ ব্যথার সুখ !
লাল আলো—রৌদ্রের চুমুক,
অন্ধকার—কুয়াশার ছুরি
মোরে যেন কেটে লয়, যেন গুঁড়ি গুঁড়ি
ধুলো মোরে ধীরে লয় শুষে !—
মাঠে মাঠে—আড়ষ্ট পউষে
ফসলের গন্ধ বুকে ক'রে
বারবার পড়ি যেন ঝ'রে !

*

আবার পাব কি আমি ফিরে

এই দেহ!—এ মাটির নিঃসাড় শিশিরে
রক্তের তাপ ঢেলে আমি
আসিব কি নামি !
হেমন্তের রৌদ্রের মতন
ফসলের স্তন
আঙুলে নিঙাড়ি
এক ক্ষেত ছাড়ি
অন্য ক্ষেতে
চলিব কি ভেসে
এ সবুজ দেশে
আর এক বার !
শুনিব কি গান
ঢেউদের !—জলের আঘ্রাণ
লব বুকে তুলে
আমি পথ ভুলে
আসিব কি এ পথে আবার !
ধুলো-বিছানার
কীটেদের মতো
হব কি আহত
ঘাসের আঘাতে !
বেদনার সাথে
সুখ পাব !
লতার মতন মোর চুল,
আমার আঙুল
পাপড়ির মতো—
হবে কি বিক্ষত
তোমার আঙুলে—চুলে !

লাগিবে কি ফুলে
ফুলের আঘাত !
আরবার
আমার এ পিপাসার ধার
তোমাদের জাগাবে পিপাসা !
ক্ষুধিতের ভাষা
বুকে করে করে
ফলিব কি !—পড়িব কি ঝরে
পৃথিবীর শস্যের ক্ষেতে
আর একবার আমি—
নক্ষত্রের পানে যেতে যেতে।

পাখিরা

ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে—
বসন্তের রাতে
বিছানায় শুয়ে আছি ;
—এখন সে কত রাত !
অই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর,
স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।
তারপর চলে যায় কোথায় আকাশে ?
তাদের ডানার ঘ্রাণ চারি দিকে ভাসে।

শরীরে এসেছে স্বাদ বসন্তের রাতে,

চোখ আর চায় না ঘুমাতে ;
জানালার থেকে অই নক্ষত্রের আলো নেমে আসে,
সাগরের জলের বাতাসে
আমার হৃদয় সুস্থ হয় ;
সবাই ঘুমায়ে আছে সব দিকে—
সমুদ্রের এই ধারে কাহাদের নোঙরের হয়েছে সময় ?

সাগরের অই পারে—আরো দূর পারে
কোনো এক মেরুর পাহাড়ে
এই সব পাখি ছিল ;
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে দলে সমুদ্রের 'পর
নেমেছিল তারা তারপর—
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে !
বাদামি—সোনালি—শাদা—ফুট্‌ফুট্‌ ডানার ভিতরে
রবারের বলের মতন ছোটো বুকে
তাদের জীবন ছিল—
যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ লক্ষ মাইল ধরে সমুদ্রের মুখে
তেমন অতল সত্য হয়ে !

কোথাও জীবন আছে—জীবনের স্বাদ রহিয়াছে,
কোথাও নদীর জল রয়ে গেছে—সাগরের তিতা ফেনা নয়,
খেলার বলের মতো তাদের হৃদয়
এই জানিয়াছে—
কোথাও রয়েছে পড়ে শীত পিছে, আশ্বাসের কাছে
তারা আসিয়াছে।

তারপর চলে যায় কোন্‌ এক ক্ষেতে

তাহার প্রিয়ের সাথে আকাশের পথে যেতে যেতে
সে কি কথা কয় ?
তাদের প্রথম ডিম জন্মিবার এসেছে সময় !

অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ মাটির ঘ্রাণ,
ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান,
আর সেই নীড়,
এই স্বাদ—গভীর—গভীর।

আজ এই বসন্তের রাতে
ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে ;
অই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর
স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।

শকুন

মাঠ থেকে মাঠে মাঠে—সমস্ত দুপুর ভরে এশিয়ার আকাশে আকাশে
শকুনেরা চরিতেছে ; মানুষ দেখেছে হাট ঘাঁটি বস্তি—নিস্তব্ধ প্রান্তর
শকুনের; যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে

আরেক আকাশ যেন—সেইখানে শকুনেরা একবার নামে পরস্পর
কঠিন মেঘের থেকে—যেন দূর আলো ছেড়ে ধূম্র ক্লান্ত দিক্‌হস্তিগণ
পড়ে গেছে—পড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিয়ার ক্ষেত মাঠ প্রান্তরের ’পরে

এইসব ত্যক্ত পাখি কয়েক মুহূর্ত শুধু—আবার করিছে আরোহণ
আঁধার বিশাল ডানা পাম্‌ গাছে,—পাহাড়ের শিঙে শিঙে সমুদ্রের পারে ;

একবার পৃথিবীর শোভা দেখে—বোম্বায়ের সাগরের জাহাজ কখন

বন্দরের অন্ধকারে ভিড় করে, দেখে তাই—একবার স্নিগ্ধ মালাবারে
উড়ে যায়—কোন্ এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন
পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গিয়ে চলে যায় যেন কোন্ মৃত্যুর ওপারে ;

যেন কোন্ বৈতরণী অথবা এ জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ন লেগুন
কেঁদে ওঠে... চেয়ে দেখে কখন গভীর নীলে মিশে গেছে সেই সব হূন।

মৃত্যুর আগে

আমার হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার ; কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
তারা সব ; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল
জোনাকিতে ভরে গেছে ; যে মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে
চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে ;

আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত রাত্রিটিরে ভালো,
খড়ের চালের ’পরে শুনিয়াছি মুগ্ধ রাতে ডানার সঞ্চার ;
পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ—অন্ধকারে আবার সে কোথায় হারালো !
বুঝেছি শীতের রাতে অপরূপ—মাঠে মাঠে ডানা ভাসাবার
গভীর আহ্লাদে ভরা ; অশথের ডালে ডালে ডাকিয়াছে বক ;
আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এই সব নিভৃত কুহক ;

আমার দেখেছি যারা বুনো হাঁস শিকারীর গুলির আঘাত
এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভিতরে,

আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের ’পরে হাত,
সন্ধ্যার কাকের মতো আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে ;
শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে-ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস ;

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুল্‌বুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু বেলা
নির্জন মাছের চোখে—পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে ;

মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নীচে চড়ুয়ের ডিম যেন শক্ত হয়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বারবার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে ;
বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে ;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে ;

আমরা দেখেছি যারা নিবিড় বটের নীচে লাল লাল ফল
পড়ে আছে ; নির্জন মাঠের ভিড় মুখ দেখে নদীর ভিতরে ;
যত নীল আকাশেরা রয়ে গেছে খুঁজে ফেরে আরও নীল আকাশের তল ;
পথে-পথে দেখিয়াছি মৃদু চোখ ছায়া ফেলে পৃথিবীর ’পরে ;
আমরা দেখেছি যারা শুপুরির সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ,
প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ ;

আমরা বুঝেছি যারা বহু দিন মাস ঋতু শেষ হলে পর

পৃথিবীর সেই কন্যা কাছে এসে অন্ধকারে নদীদের কথা
কয়ে গেছে—আমরা বুঝেছি যারা পথ ঘাট মাঠের ভিতর
আরো এক আলো আছে : দেহে তার বিকালবেলার ধূসরতা ;
চোখের-দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে আছে স্থির ;
পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর ;

আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর ? জানি না কি আহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ—একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল—সোনা ছিল যাহা
নিরুত্তর শান্তি পায়—যেন কোন্ মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।
কী বুঝিতে চাই আর ? রৌদ্র নিভে গেলে পাখিপাখালীর ডাক
শুনি নি কি ? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখি নি কি উড়ে গেছে কাক !

স্বপ্নের হাতে

পৃথিবীর বাধা—এই দেহের ব্যাঘাতে
হৃদয়ে বেদনা জমে—স্বপনের হাতে
আমি তাই
আমারে তুলিয়া দিতে চাই !
যেই সব ছায়া এসে পড়ে
দিনের—রাতের ঢেউয়ে—তাহাদের তরে
জেগে আছে আমার জীবন ;
সব ছেড়ে আমাদের মন
ধরা দিত যদি এই স্বপনের হাতে !
পৃথিবীর রাত আর দিনের আঘাতে
বেদনা পেত না তবে কেউ আর—
থাকিত না হৃদয়ের জরা—
সবাই স্বপ্নের হাতে দিত যদি ধরা !...

আকাশ ছায়ার ঢেউয়ে ঢেকে
সারাদিন—সারারাত্রি অপেক্ষায় থেকে,
পৃথিবীর যত ব্যথা—বিরোধ, বাস্তব
হৃদয় ভুলিয়া যায় সব !
চাহিয়াছে অন্তর যে ভাষা,
যেই ইচ্ছা, যেই ভালোবাসা
খুঁজিয়াছে পৃথিবীর পারে পারে গিয়া—
স্বপ্নে তাহা সত্য হয়ে উঠেছে ফলিয়া !
মরমের যত তৃষ্ণা আছে—
তারই খোঁজে ছায়া আর স্বপনের কাছে
তোমরা চলিয়া আস—
তোমরা চলিয়া আস সব !
ভুলে যাও পৃথিবীর ওই ব্যথা—ব্যাঘাত—বাস্তব !...
সকল সময়
স্বপ্ন—শুধু স্বপ্ন জন্ম লয়
যাদের অন্তরে—
পরস্পরে যারা হাত ধরে
নিরালা ঢেউয়ের পাশে পাশে—
গোধূলির অস্পষ্ট আকাশে
যাহাদের আকাঙ্ক্ষার জন্ম—মৃত্যু—সব—
পৃথিবীর দিন আর রাত্রির রব
শোনে না তাহারা !
সন্ধ্যার নদীর জল, পাথরে জলের ধারা
আয়নার মতো
জাগিয়া উঠিছে ইতস্তত
তাহাদের তরে।
তাদের অন্তরে
স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন জন্ম লয়
সকল সময় !...

পৃথিবীর দেয়ালের ’পরে
আঁকাবাঁকা অসংখ্য অক্ষরে
একবার লিখিয়াছি অন্তরের কথা—
সে সব ব্যর্থতা
আলো আর অন্ধকারে গিয়াছে মুছিয়া !
দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে দিয়ে
ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া
হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার নদী
ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায়—ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায় যদি—
তবে ঐ পৃথিবীর দেয়ালের ’পরে
লিখিতে যেয়ো না তুমি অস্পষ্ট অক্ষরে
অন্তরের কথা !—
আলো আর অন্ধকারে মুছে যায় সে সব ব্যর্থতা !...
পৃথিবীর অই অধীরতা
থেমে যায়, আমাদের হৃদয়ের ব্যথা
দূরের ধুলোর পথ ছেড়ে
স্বপ্নেরে—ধ্যানেরে
কাছে ডেকে লয় !
উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যায়,
মানুষেরও আয়ু শেষ হয় !
পৃথিবীর পুরানো সে পথ
মুছে ফেলে রেখা তার—
কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ
চিরদিন রয় !
সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব—
নক্ষত্রেরও আয়ু শেষ হয় !

কবিতা

ঝরা পালক
১৯২৭

‘ঝরা পালক’ প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র। কলকাতা ১৯২৭
‘ঝরা পালক’ প্রথম সংস্করণের মুদ্রণ-বিবরণপত্র

উৎসর্গ

কল্যাণীয়াসু

ভূমিকা

ঝরা পালকের কতকগুলি কবিতা প্রবাসী, বঙ্গবাণী, কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, বিজলী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বাকিগুলি নূতন।

কলিকাতা,
১০ই আশ্বিন ১৩৩৪।   শ্রী জীবনানন্দ দাশ।

আমি কবি—সেই কবি—

আমি কবি—সেই কবি—
আকাশে কাতর আঁখি তুলি হেরি ঝরা পালকের ছবি !
আন্‌মনা আমি চেয়ে থাকি দূর হিঙুল-মেঘের পানে !
মৌন নীলের ইশারায় কোন্ কামনা জাগিছে প্রাণে !
বুকের বাদল উথলি উঠিছে কোন্ কাজরীর গানে !
দাদুরী-কাঁদানো শাঙন-দরিয়া হৃদয়ে উঠিছে দ্রবি !

স্বপন-সুরার ঘোরে
আখের ভুলিয়া আপনারে আমি রেখেছি দিওয়ানা ক'রে !
জনম ভরিয়া সে কোন্ হেঁয়ালি হল না আমার সাধা,—
পায়-পায় নাচে জিঞ্জির হায়,—পথে-পথে ধায় ধাঁধা !
—নিমেষে পাসরি এই বসুধার নিয়তি-মানার বাধা
সারাটি জীবন খেয়ালের খোশে পেয়ালা রেখেছি ভ'রে !

ভুঁয়ের চাঁপাটি চুমি
শিশুর মতন,—শিরীষের বুকে নীরবে পড়ি গো নুমি !
ঝাউয়ের কাননে মিঠা মাঠে-মাঠে মটর-ক্ষেতের শেষে
তোতার মতন চকিতে কখন আমি আসিয়াছি ভেসে !
—ভাটিয়াল সুর সাঁঝের আঁধারে দরিয়ার পারে মেশে,—
বালুর ফরাশে ঢালু নদীটির জলে ধোঁয়া ওঠে ধূমি !

বিজন তারার সাঁঝে
আমার প্রিয়ার গজল-গানের রেওয়াজ বুঝি বা বাজে !
প'ড়ে আছে হেথা ছিন্ন নীবার, পাখির নষ্ট নীড় !

হেথায় বেদনা মা-হারা শিশুর, শুধু বিধবার ভিড় !
কোন্ যেন এক সুদূর আকাশ গোধূলিলোকের তীর
কাজের বেলায় ডাকিছে আমারে, ডাকে অকাজের মাঝে !

নীলিমা

রৌদ্র ঝিল্‌মিল্,
উষার আকাশ, মধ্যনিশীথের নীল,
অপার ঐশ্বর্যবেশে দেখা তুমি দাও বারে-বারে
নিঃসহায় নগরীর কারাগার-প্রাচীরের পারে !
—উদ্বেলিছে হেথা গাঢ় ধূম্রের কুণ্ডলী,
উগ্র চুল্লিবহ্নি হেথা অনিবার উঠিতেছে জ্বলি,
আরক্ত কঙ্করগুলো মরুভূর তপ্তশ্বাস মাখা,
মরীচিকা-ঢাকা !
অগণন যাত্রিকের প্রাণ
খুঁজে মরে অনিবার,—পায় নাকো পথের সন্ধান ;
চরণে জড়ায়ে গেছে শাসনের কঠিন শৃঙ্খল,—
হে নীলিমা নিষ্পলক, লক্ষ বিধি-বিধানের এই কারাতল
তোমার ও-মায়াদণ্ডে ভেঙেছ মায়াবী।
জনতার কোলাহলে একা ব'সে ভাবি।
কোন্ দূর জাদুপুর-রহস্যের ইন্দ্রজাল মাখি
বাস্তবের রক্ততটে আসিলে একাকী !
স্ফটিক আলোকে তব বিথারিয়া নীলাম্বরখানা
মৌন স্বপ্ন-ময়ূরের ডানা !
চোখে মোর মুছে যায় ব্যাধবিদ্ধা ধরণীর রুধির-লিপিকা
জ্বলে ওঠে অন্তহারা আকাশের গৌরী দীপশিখা !
বসুধার অশ্রু-পাংশু আতপ্ত সৈকত,

ছিন্নবাস, নগ্নশির ভিক্ষুদল, নিষ্করুণ এই রাজপথ,
লক্ষ কোটি মুমূর্ষুর এই কারাগার,
এই ধূলি,—ধূম্রগর্ভ বিস্তৃত আঁধার
ডুবে যায় নীলিমায়,—স্বপ্নায়ত মুগ্ধ আঁখিপাতে,
—শঙ্খশুভ্র মেঘপুঞ্জে, শুক্লাকাশে, নক্ষত্রের রাতে ;
ভেঙে যায় কীটপ্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক,
তোমার চকিত স্পর্শে, হে অতন্দ্র দূর কল্পলোক !

নব নবীনের লাগি

—নব নবীনের লাগি
প্রদীপ ধরিয়া আঁধারের বুকে আমরা রয়েছি জাগি !
ব্যর্থ পঙ্গু খর্ব প্রাণের বিকল শাসন ভেঙে,
নব আকাঙ্ক্ষা আশার স্বপনে হৃদয় মোদের রেঙে,
দেবতার দ্বারে নবীন বিধান—নতুন ভিক্ষা মেগে
দাঁড়ায়েছি মোরা তরুণ প্রাণের অরুণের অনুরাগী !

ঝড়ের বাতাস চাই।
—চারি দিক ঘিরে শীতের কুহেলি, শ্মশানপথের ছাই,
ছড়ায়ে রয়েছে পাহাড়প্রমাণ মৃতের অস্থি খুলি,
কে সাজাবে ঘর-দেউলের পর কঙ্কাল তুলি তুলি ?
সূর্যচন্দ্র নিভায়ে কে নেবে জরার চোখের ঠুলি !
—মরার ধরায় জ্যান্ত কখনও মাগিতে যাবে কি ঠাঁই !

—ঘুমায়ে কে আছে ঘরে !

মৃতশিশু-বুকে কল্যাণী পুরকামিনী কি আজ মরে !
কে আছে বসিয়া হতাশ উদাস অলস অন্যমনা ?
দোদুল আকাশে দুলিয়া উঠিছে রাঙা অশনির ফণা,
বাজে বাদলের রঙ্গমল্লী, ঝঞ্ঝার ঝঞ্ঝনা !
ফিরিছে বালক ঘর-পলাতক ঝরা পালকের ঝড়ে !

আমরা অশ্বারোহী !—
যাযাবর যুবা, বন্দিনীদের ব্যথা মোরা বুকে বহি,
মানবের মাঝে যে দেবতা আছে আমরা তাহারে বরি,
মোদের প্রাণের পূজার দেউলে তাহার প্রতিমা গড়ি,
চুয়া-চন্দন-গন্ধ বিলায়ে আমরা ঝরিয়া পড়ি,
সুবাস ছড়াই উশীরের মতো,—ধূপের মতন দহি !

গাহি মানবের জয় !
—কোটি-কোটি বুকে কোটি ভগবান আঁখি মেলে জেগে রয় !
সবার প্রাণের অশ্রু-বেদনা মোদের বক্ষে লাগে,
কোটি বুকে কোটি দেউটি জ্বলিছে,—কোটি কোটি শিখা জাগে,
প্রদীপ নিভায়ে মানবদেবের দেউল যাহারা ভাঙে,
আমরা তাদের শস্ত্র, শাসন, আসন করিব ক্ষয় !
—জয় মানবের জয় !

কিশোরের প্রতি

যৌবনের সুরাপাত্র গরল-মদির
ঢালো নি অধরে তব, ধরা-মোহিনীর
ঊর্ধ্বফণা মায়া-ভুজঙ্গিনী
আসে নি তোমার কাম্য উরসের পথটুকু চিনি,

চুমিয়া-চুমিয়া তব হৃদয়ের মধু
বিষবহ্নি ঢালে নিকো বাসনার বধূ
অন্তরের পানপাত্রে তব ;
অম্লান আনন্দ তব, আপ্লুত উৎসব,
অশ্রুহীন হাসি,
কামনার পিছে ঘুরে সাজো নি উদাসী।
ধবল কাশের দলে, আশ্বিনের গগনের তলে
তোর তরে রে কিশোর, মৃগতৃষ্ণা কভু নাহি জ্বলে !
নয়নে ফোটে না তব মিথ্যা মরূদ্যান।
অপরূপ রূপ-পরীস্থান
দিগন্তের আগে
তোমার নির্মেঘ চক্ষে কভু নাহি জাগে !
আকাশকুসুমবীথি দিয়া
মাল্য তুমি আনো না রচিয়া,
উধাও হও না তুমি আলেয়ার পিছে
ছলাময় গগনের নীচে !
—রূপ-পিপাসায় জ্বলি মৃত্যুর পাথারে
স্পন্দহীন প্রেতপুরদ্বারে
করো নিকো করাঘাত তুমি
সুধার সন্ধানে লক্ষ বিষপাত্র চুমি
সাজো নিকো নীলকণ্ঠ ব্যাকুল বাউল !
অধরে নাহিকো তৃষ্ণা, চক্ষে নাহি ভুল,
রক্তে তব অলক্ত যে পরে নাই আজও রানী,
রুধির নিঙাড়ি তব আজও দেবী মাগে নাই রক্তিম চন্দন !
কারাগার নাহি তব, নাহিক বন্ধন ;
দীঘল পতাকা, বর্শা তন্দ্রাহারা প্রহরীর লও নি তুলিয়া,
—সুকুমার কিশোরের হিয়া !

—জীবনসৈকতে তব দুলে যায় লীলায়িত লঘুনৃত্য নদী,
বক্ষে তব নাচেনিকো যৌবনের দুরন্ত জলধি ;
শূল-তোলা শম্ভুর মতন
আস্ফালিয়া উঠে নাই মন
মিথ্যা বাধাবিধানের ধ্বংসের উল্লাসে !
তোমার আকাশে
দ্বাদশ সূর্যের বহ্নি ওঠে নিকো জ্বলি
কক্ষচ্যুত উল্কাসম পড়ে নিকো স্খলি,
কুজ্‌ঝটিকা-আবর্তের মাঝে
অনির্বাণ স্ফুলিঙ্গের সাজে !
সব বিঘ্ন সকল আগল
ভাঙিয়া জাগো নি তুমি স্পন্দন-পাগল
অনাগত স্বপ্নের সন্ধানে
দুরন্ত দুরাশা তুমি জাগাও নি প্রাণে !
নিঃস্ব দুটি অঞ্জলির আকিঞ্চন মাগি
সাজো নিকো দিক্‌ভোলা দিওয়ানা বৈরাগী !
পথে পথে ভিক্ষা মেগে কাম্য কল্পতরু
বাজাও নি শ্মশান-ডমরু !
জ্যোৎস্নাময়ী নিশি তব, জীবনের অমানিশা ঘোর
চক্ষে তব জাগে নি কিশোর !
আঁধারের নির্বিকল্প রূপ,
স্পন্দহীন বেদনার কূপ
রুদ্ধ তব বুকে ;
তোমার সম্মুখে
ধরিত্রী জাগিছে ফুল্ল সুন্দরীর বেশে ;
নিত্য বেলাশেষে
যেই পুষ্প ঝরে,

যে বিরহ জাগে চরাচরে
গোধূলির অবসানে শ্লোকম্লান সাঁঝে,
তাহার বেদনা তব বক্ষে নাহি বাজে ;
আকাঙ্ক্ষার অগ্নি দিয়া জ্বাল নাই চিতা,
ব্যথার সংহিতা
গাহ নাই তুমি !
দরিয়ার তীর ছাড়ি দেহ নাই দাব-মরুভূমি
জ্বলন্ত নিষ্ঠুর !
নগরীর ক্ষুব্ধ বক্ষে জাগে যেই মৃত্যুপ্রেতপুর,
ডাকিনীর রুক্ষ অট্টহাসি
ছন্দ তার মর্মে তব ওঠে না প্রকাশি !
সভ্যতার বীভৎস ভৈরবী
মলিন করে নি তব মানসের ছবি,
ফেনিল করে নি তব নভোনীল, প্রভাতের আলো,
এ উদ্‌ভ্রান্ত যুবকের বক্ষে তার রশ্মি আজ ঢালো, বন্ধু, ঢালো।

মরীচিকার পিছে—

ধূম্র তপ্ত আঁধির কুয়াশা তরবারি দিয়ে চিরে
সুন্দর দূর মরীচিকাতটে ছলনামায়ার তীরে
ছুটে যায় দুটি আঁখি।
—কত দূর হায় বাকি !
উধাও অশ্ব বল্গাবিহীন অগাধ মরুভূ ঘিরে,
পথে-পথে তার বাধা জ'মে যায়,—তবু সে আসে না ফিরে !

দূরে,—দূরে,—আরো দূরে,—আরো দূরে,
অসীম মরুর পারাবার-পারে আকাশ-সীমানা জুড়ে

ভাসিয়াছে মরুতৃষা !
—হিয়া হারায়েছে দিশা !
কে যেন ডাকিছে আকুল অলস উদাস বাঁশির সুরে
কোন্ দিগন্তে নির্জন কোন্ মৌন মায়াবী-পুরে !

কোন্-এক সুনীল দরিয়া সেথায় উথলিছে অনিবার !
—কান পেতে একা শুনেছে সে তার অপরূপ ঝঙ্কার,
ছোটে অঞ্জলী পেতে,
তৃষার নেশায় মেতে,
ঊষর ধূসর মরুর মাঝারে এমন খেয়াল কার !
খুলিয়া দিয়াছে মাতাল ঝর্ণা না জানি কে দিলদার !

কে যেন রেখেছে সবুজ ঘাসের কোমল গালিচা পাতি !
যত খুন যত খারাবীর ঘোরে পরান আছিল মাতি,
নিমেষে গিয়েছে ভেঙে
স্বপন-আবেশে রেঙে
আঁখিদুটি তার জৌলস্-রাঙা হ'য়ে গেছে রাতারাতি !
কোন যেন এক জিন্-সর্দার সেজেছে তাহার সাথী।

কোন্ যেন পরী চেয়ে আছে দুটি চঞ্চল চোখ তুলে !
পাগলা হাওয়ায় অনিবার তার ওড়না যেতেছে দুলে !
গেঁথে গোলাপের মালা
তাকায়ে রয়েছে বালা,
বিলায়ে দিয়েছে রাঙা নার্গিস্ কালো পশমিনা চুলে।
বসেছে বালিকা খর্জুরছায়ে নীল দরিয়ার কূলে।

ছুটিছে ক্লিষ্ট ক্লান্ত অশ্ব কশাঘাত-জর্জর,

চারি দিকে তার বালুর পাথার—মরুর হাওয়ার ঝড় ;
নাহি শ্রান্তির লেশ,
সুদূর নিরুদ্দেশ—
অসীম কুহক পাতিয়া রেখেছে তাহার বুকের পর !
পথের তালাসে পাগল সোয়ার হারায়ে ফেলেছে ঘর !

আঁখির পলকে পাহাড়ের পারে কোথা সে ছুটিয়া যায় !
চকিত আকাশ পায় না তাহার নাগাল খুঁজিয়া হায় !
ঝড়ের বাতাস মিছে
ছুটিছে তাহার পিছে !
মরুভূর প্রেত চমকিয়া তার চক্ষের পানে চায়—
সুরার তালাসে চুমুক দিল কে গরলের পেয়ালায় !

জীবন-মরণ দুয়ারে আমার

সরাইখানার গোলমাল আসে কানে,
ঘরের সার্সি বাজে তাহাদের গানে,
পর্দা যে উড়ে যায়
তাদের হাসির ঝড়ের আঘাতে হায় !
—মদের পাত্র গিয়েছে কবে যে ভেঙে !
আজও মন ওঠে রেঙে
দিলদারদের দরাজ গলার রবে,
সরায়ের উৎসবে !
কোন্ কিশোরীর চুড়ির মতন হায়
পেয়ালা তাদের থেকে-থেকে বেজে যায়
বেহুঁশ হাওয়ার বুকে !

সারা জনমের শুষে-নেওয়া খুন নেচে ওঠে মোর মুখে !
পাণ্ডুর দুটি ঠোঁটে
ডালিম ফুলের রক্তিম আভা চকিতে আবার ফোটে !
মনের ফলকে জ্বলিছে তাদের হাসিভরা লাল গাল,
ভুলে গেছে তারা এই জীবনের যত কিছু জঞ্জাল !
আখেরের ভয় ভুলে
দিলওয়ার প্রাণ খুলে
জীবন-রবারে টানিছে ক্ষিপ্ত ছড়ি !
অদূরে আকাশে মধুমালতীর পাপড়ি পড়িছে ঝরি,—
নিভিছে দিনের আলো ;
—জীবন-মরণ দুয়ারে আমার, কারে যে বাসিব ভালো
একা একা তাই ভাবিয়া মরিছে মন !
পূর্ণ হয় নি পিপাসী প্রাণের একটি আকিঞ্চন,
খুলি নি একটি দল,—
যৌবন শতদলে মোর হায় ফোটে নাই পরিমল !
উৎসব-লোভী অলি
আসে নি হেথায়—
কীটের আঘাতে শুকায়ে গিয়েছে কবে কামনার কলি !
—সারাটি জীবন বাতায়নখানি খুলে
তাকায়ে দেখেছি নগরী-মরুতে ক্যারাভেন্ যায় দুলে
আশা-নিরাশার বালু-পারাবার বেয়ে,
সুদূর মরূদ্যানের পানেতে চেয়ে !
সুখ-দুঃখের দোদুল ঢেউয়ের তালে
নেচেছে তাহারা,—মায়াবীর জাদুজালে
মাতিয়া গিয়েছে খেয়ালী মেজাজ খুলি,
মৃগতৃষ্ণার মদের নেশায় ভুলি !
মস্তানা সেজে ভেঙে গেছে ঘরদোর,

লোহার শিকের আড়ালে জীবন লুটায়ে কেঁদেছে মোর !
কারার ধুলায় লুণ্ঠিত হ'য়ে বান্দার মতো হায়
কেঁদেছে বুকের বেদুইন মোর দুরাশার পিপাসায় !
জীবনপথের তাতার দস্যুগুলি
হুল্লোড় তুলি উড়ায়ে গিয়েছে ধূলি
মোর গবাক্ষে কবে !
কণ্ঠ-বাজের আওয়াজ তাদের বেজেছে স্তব্ধ নভে !
আতুর নিদ্রা চকিতে গিয়েছে ভেঙে,
সারাটি নিশীথ খুন-রোশনাই প্রদীপে মনটি রেঙে
একাকী রয়েছি বসি,
নিরালা গগনে কখন নিভেছে শশী
পাই নি যে তাহা টের !
—দূর দিগন্তে চ'লে গেছে কোথা খুশরোজী মুসাফের !
কোন্ সুদূরের তুরাণী-প্রিয়ার তরে
বুকের ডাকাত আজিও আমার জিঞ্জিরে কেঁদে মরে !
দীর্ঘ দিবস ব'য়ে গেছে যারা হাসি-অশ্রুর বোঝা
চাঁদের আলোকে ভেঙেছে তাদের 'রোজা' ;
আমার গগনে 'ঈদরাত' কভু দেয় নি যে হায় দেখা,
পরানে কখনও জাগে নি 'রোজা'র ঠেকা !
কী যে মিঠা এই সুখের দুখের ফেনিল জীবনখানা !
এই যে নিষেধ, এই যে বিধান—আইন-কানুন, এই যে শাসন মানা,
ঘরদোর ভাঙা তুমুল প্রলয়ধ্বনি
নিত্য গগনে এই যে উঠিছে রণি
যুবানবীনের নটনর্তন তালে,
ভাঙনের গান এই যে বাজিছে দেশে দেশে কালে কালে,
এই যে তৃষ্ণা-দৈন্য-দুরাশা-জয়-সংগ্রাম-ভুল
সফেন সুরার ঝাঁঝের মতন করে দেয় মজ্‌গুল

দিওয়ানা প্রাণের নেশা !
ভগবান,—ভগবান,—তুমি যুগ-যুগ থেকে ধ'রেছ শুঁড়ির পেশা !
—লাখো জীবনের শূন্য পেয়ালা ভরি দিয়া বারবার
জীবন-পান্থশালার দেয়ালে তুলিতেছে ঝঙ্কার—
মাতালের চীৎকার !
অনাদি কালের থেকে ;
মরণশিয়রে মাথা পেতে তার দস্তুর যাই দেখে !
হেরিলাম দূরে বালুকার পরে রূপার তাবিজ প্রায়
জীবনের নদী কলরোলে ব'য়ে যায় !
কোটি শুঁড় দিয়ে দুখের মরুভূ নিতেছে তাহারে শুষে,
ছলা-মরীচিকা জ্বলিতেছে তার প্রাণের খেয়াল-খুশে !
মরণ-সাহারা আসি
নিতে চায় তারে গ্রাসি !—
তবু সে হয় না হারা
ব্যথার রুধিরধারা
জীবনমদের পাত্র জুড়িয়া তার
যুগ যুগ ধরি অপরূপ সুরা গড়িছে মশলাদার !

বেদিয়া

চুলিচালা সব ফেলেছে সে ভেঙে, পিঞ্জরহারা পাখি !
পিছুডাকে কভু আসে না ফিরিয়া কে তারে আনিবে ডাকি ?
উদাস উধাও হাওয়ার মতন চকিতে যায় সে উড়ে,
গলাটি তাহার সেধেছে অবাধ নদী-ঝর্ণার সুরে ;
নয় সে বান্দা রংমহলের, মোতিমহলের বাঁদী,
ঝোড়ো হাওয়া সে যে, গৃহপ্রাঙ্গণে কে তারে রাখিবে বাঁধি !
কোন্ সুদূরের বেনামী পথের নিশানা নেছে সে চিনে,

ব্যর্থ ব্যথিত প্রান্তর তার চরণচিহ্ন বিনে !
যুগযুগান্ত কত কান্তার তার পানে আছে চেয়ে,
কবে সে আসিবে ঊষর ধূসর বালুকা-পথটি বেয়ে
তারই প্রতীক্ষা মেগে ব'সে আছে ব্যাকুল বিজন মরু !
দিকে দিকে কত নদী-নির্ঝর কত গিরিচূড়া-তরু
ঐ বাঞ্ছিত বন্ধুর তরে আসন রেখেছে পেতে
কালো মৃত্তিকা ঝরা কুসুমের বন্দনা-মালা গেঁথে
ছড়ায়ে পড়িছে দিক্‌দিগন্তে ক্ষ্যাপা পথিকের লাগি !
বাবলা বনের মৃদুল গন্ধে বন্ধুর দেখা মাগি
লুটায়ে রয়েছে কোথা সীমান্তে শরৎ উষার শ্বাস !
ঘুঘু-হরিয়াল-ডাহুক-শালিখ-গাঙচিল-বুনোহাঁস
নিবিড় কাননে তটিনীর কূলে ডেকে যায় ফিরে ফিরে
বহু পুরাতন পরিচিত সেই সঙ্গী আসিল কি রে !
তারই লাগি ভায় ইন্দ্রধনুক নিবিড় মেঘের কূলে,
তারই লাগি আসে জোনাকি নামিয়া গিরিকন্দরমূলে।
ঝিনুক-নুড়ির অঞ্জলি ল'য়ে কলরব ক'রে ছুটে
নাচিয়া আসিছে অগাধ সিন্ধু তারই দুটি করপুটে।
তারই লাগি কোথা বালুপথে দেখা দেয় হীরকের কোণা,
তাহারই লাগিয়া উজানী নদীর ঢেউয়ে ভেসে আসে সোনা !
চকিতে পরশপাথর কুড়ায়ে বালকের মতো হেসে
ছুঁড়ে ফেলে দেয় উদাসী বেদিয়া কোন্ সে নিরুদ্দেশে !
যত্ন করিয়া পালক কুড়ায়, কানে গোঁজে বনফুল,
চাহে না রতন-মণিমঞ্জুষা হীরে-মাণিকের দুল্,
—তার চেয়ে ভালো অমল উষার কনক-রোদের সিঁথি,
তার চেয়ে ভালো আলো-ঝল্‌মল্ শীতল শিশিরবীথি,
তার চেয়ে ভালো সুদূর গিরির গোধূলি-রঙিন জটা,
তার চেয়ে ভালো বেদিয়া বালার ক্ষিপ্র হাসির ছটা !

কী ভাষা বলে সে, কী বাণী জানায়, কিসের বারতা বহে !
মনে হয় যেন তারই তরে তবু দুটি কান পেতে রহে
আকাশ-বাতাস-আলোক-আঁধার মৌন স্বপ্নভরে,
মনে হয় যেন নিখিল বিশ্ব কোল পেতে তার তরে !

নাবিক

কবে তব হৃদয়ের নদী
বরি নিল অসম্বৃত সুনীল জলধি !
সাগর-শকুন্ত-সম উল্লাসের রবে
দূর সিন্ধু-ঝটিকার নভে
বাজিয়া উঠিল তব দুরন্ত যৌবন !
পৃথ্বীর বেলায় বসি কেঁদে মরে আমাদের শৃঙ্খলিত মন !
কারাগার-মর্মরের তলে
নিরাশ্রয় বন্দীদের খেদ-কোলাহলে
ভরে যায় বসুধার আহত আকাশ !
অবনত শিরে মোরা ফিরিতেছি ঘৃণা বিধিবিধানের দাস !
—সহস্রের অঙ্গুলিতর্জন
নিত্য সহিতেছি মোরা—বারিধির বিপ্লব-গর্জন
বরিয়া লয়েছ তুমি, তারে তুমি বাসিয়াছ ভালো ;
তোমার পঞ্জরতলে টগ্‌বগ্ করে খুন—দুরন্ত, ঝাঁঝালো !—
তাই তুমি পদাঘাতে ভেঙে গেলে অচেতন বসুধার দ্বার,
অবগুণ্ঠিতার
হিমকৃষ্ণ অঙুলির কঙ্কাল-পরশ
পরিহরি গেলে তুমি—মৃত্তিকার মদ্যহীন রস

তুহিন নির্বিষ নিঃস্ব পানপাত্রখানা
চকিতে চূর্ণিয়া গেলে—সীমাহারা আকাশের নীল শামিয়ানা
বাড়ব-আরক্ত স্ফীত বারিধির তট,
তরঙ্গের তুঙ্গ গিরি, দুর্গম সঙ্কট
তোমারে ডাকিয়া নিল মায়াবীর রাঙা মুখ তুলি !
নিমেষে ফেলিয়া গেলে ধরণীর শূন্য ভিক্ষাঝুলি !
প্রিয়ার পাণ্ডুর আঁখি অশ্রু-কুহেলিকা-মাখা গেলে তুমি ভুলি !
ভুলে গেলে ভীরু হৃদয়ের ভিক্ষা, আতুরের লজ্জা অবসাদ,—
অগাধের সাধ
তোমারে সাজায়ে দেছে ঘরছাড়া ক্ষ্যাপা সিন্দবাদ !
মণিময় তোরণের তীরে
মৃত্তিকার প্রমোদ-মন্দিরে
নৃত্য-গীত-হাসি-অশ্রু-উৎসবের ফাঁদে !
হে দুরন্ত দুর্নিবার—প্রাণ তব কাঁদে !
ছেড়ে গেলে মর্মন্তুদ মর্মর বেষ্টন,
সমুদ্রের যৌবন-গর্জন
তোমারে ক্ষ্যাপায়ে দেছে, ওহে বীর-শের !
টাইফুন্-ডঙ্কার হর্ষে ভুলে গেছ অতীত-আখের
হে জলধি-পাখি !
পক্ষে তব নাচিতেছে লক্ষ্যহারা দামিনী-বৈশাখী !
ললাটে জ্বলিছে তব উদয়াস্ত আকাশের রত্নচূড় ময়ূখের টিপ,
কোন্ দূর দারুচিনি লবঙ্গের সুবাসিত দ্বীপ
করিতেছে বিভ্রান্ত তোমারে !
বিচিত্র বিহঙ্গ কোন্ মণিময় তোরণের দ্বারে
সহর্ষ নয়ন মেলি হেরিয়াছ কবে !
কোথা দূরে মায়াবনে পরীদল মেতেছে উৎসবে—
স্তম্ভিত নয়নে

নীল বাতায়নে
তাকায়েছ তুমি !
অতিদূর আকাশের সন্ধ্যারাগ-প্রতিবিম্বে প্রস্ফুটিত সমুদ্রের
আচম্বিত ইন্দ্রজাল চুমি
সাজিয়াছ বিচিত্র মায়াবী !
সৃজনের জাদুঘর-রহস্যের চাবি
আনিয়াছ কবে উন্মোচিয়া
হে জল-বেদিয়া !
অলক্ষ্য বন্দর পানে ছুটিতেছ তুমি নিশিদিন
সিন্ধু বেদুইন !
নাহি গৃহ,—নাহি পান্থশালা—
লক্ষ-লক্ষ ঊর্মি-নাগবালা
তোমারে নিতেছে ডেকে রহস্যপাতালে—
বারুণী যেথায় তার মণিদীপ জ্বালে !
প্রবাল-পালঙ্ক-পাশে মীননারী ঢুলায় চামর !
সেই দুরাশার মোহে ভুলে গেছ পিছু-ডাকা স্বর
ভুলেছ নোঙর !
কোন্ দূর কুহকের কূল
লক্ষ্য করি ছুটিতেছে নাবিকের হৃদয়-মাস্তুল
কে বা তাহা জানে !
অচিন আকাশ তারে কোন্ কথা কয় কানে-কানে !

বনের চাতক—মনের চাতক

বনের চাতক বাঁধল বাসা মেঘের কিনারায়—
মনে চাতক হারিয়ে গেল দূরের দুরাশায় !
ফুঁপিয়ে ওঠে কাতর আকাশ সেই হতাশার ক্ষোভে—

সে কোন্ বোঁটের ফুলের ঠোঁটের মিঠা মদের লোভে
বনের চাতক—মনের চাতক কাঁদছে অবেলায় !

পুবের হাওয়ায় হাপর জ্বলে, আগুনদানা ফাটে !
কোন্ ডাকিনীর বুকের চিতায় পচিম আকাশ টাটে !
বাদল-বৌয়ের চুমার মৌয়ের সোয়াদ চেয়ে চেয়ে
বনের চাতক—মনের চাতক চলছে আকাশ বেয়ে,
ঘাটের ভরা কলসী ও-কার কাঁদছে মাঠে-মাঠে !

ওরে চাতক, বনের চাতক, আয় রে নেমে ধীরে
নিঝুম ছায়া-বৌরা যেথা ঘুমায় দীঘি ঘিরে,
'দে জল !' ব'লে ফোঁপাস কেন ? মাটির কোলে জল
খবর-খোঁজা সোজা চোখের সোহাগে ছল্‌ছল্ !
মজিস নে রে আকাশ-মরুর মরীচিকার তীরে !

বনের চাতক, হতাশ উদাস পাখায় দিয়ে পাড়ি
কোথায় গেলি ঘরের কোণের কানাকানি ছাড়ি ?
ননীর কলস আছে রে তার কাঁচা বুকের কাছে,
আতার ক্ষীরের মতো সোহাগ সেথায় ঘিরে আছে !
আয় রে ফিরে দানোয়-পাওয়া,—আয় রে তাড়াতাড়ি।
বনের চাতক, মনের চাতক আসে না আর ফিরে,
কপোত-ব্যথা বাজায় মেঘের শকুনপাখা ঘিরে !
সে কোন্ ছুঁড়ির চুড়ি আকাশ-শুঁড়িখানায় বাজে !
চিনিমাখা ছায়ায় ঢাকা চুনীর ঠোঁটের মাঝে
লুকিয়ে আছে সে-কোন্ মধু মৌমাছিদের ভিড়ে !

সাগর-বলাকা

ওরে কিশোর, বেঘোর ঘুমের বেহুঁশ হাওয়া ঠেলে
পাতলা পাখা দিলি রে তোর দূর-দুরাশায় মেলে !
ফেনার বৌয়ের নোন্‌তা মৌয়ের—মদের গেলাস লুটে,
ভোর-সাগরের শরাবখানায়—মুসল্লাতে জুটে
হিমের ঘুণে বেড়াস খুনের আগুনদানা জ্বেলে !

ওরে কিশোর, অস্তরাগের মেঘের চুমায় রেঙে
নীল নহরের স্বপন দেখে চৈতি চাঁদে জেগে,
ছুটছ তুমি চ্ছল চ্ছল জলের কোলাহলের সাথে কই !
উছলে ওঠে বুকে তোমার আল্‌তো ফেনা-সই !
ঢেউয়ের ছিটার মিঠা আঙুল যাচ্ছে ঠোঁটে লেগে !

রে মুসাফের, পাতাল-প্রেতপুরের মরীচিকা
সাগরজলের তলে বুঝি জ্বালিয়ে দেছে শিখা !
তাই কি গেলে ভেঙে হেথার বালিয়াড়ির বাড়ি !
দিচ্ছ যাযাবরের মতো সাগর-মরু পাড়ি,—
ডাইনে তোমার ডাইনীমায়া, পিছের আকাশ ফিকা !

বাসা তোমার সাত সাগরের ঘূর্ণী হাওয়ার বুকে !
ফুটছে ভাষা কেউটে-ঢেউয়ের ফেনার ফণা ঠুকে !
প্রয়াণ তোমার প্রবালদ্বীপে, পলার মালা গলে
বরুণরানী ফিরছে যেথা, মুক্তা-প্রদীপ জ্বলে !
যেথায় মৌন মীনকুমারীর শঙ্খ ওঠে ফুঁকে।

যেইখানে মূক মায়াবিনীর কাঁকন শুধু বাজে
সাঁজসকালে, ঢেউয়ের তালে, মাঝসাগরের মাঝে !

যায় না জাহাজ যেথায়—নাবিক পায় না নাগাল যার,
লঘু উদাস পাখায় ভেসে আঁখির তলে তার
ঘুরছে অবুঝ, সে কোন্ সবুজ স্বপন-খোঁজার কাজে !
ওরে কিশোর,—দূর-সোহাগী ঘর-বিরাগী সুখ !
—টুকটুকে কোন্ মেঘের পারে ফুট্‌ফুটে কার মুখ
ডাকছে তোদের ডাগর কাঁচা চোখের কাছে তার !
—শাদা শকুনপাখায় যে তাই তুলছে হাহাকার
ফাঁপা ঢেউয়ের চাপা কাঁদন—ফাঁপর-ফাটা বুক !

চলছি উধাও

চলছি উধাও, বল্গাহারা—ঝড়ের বেগে ছুটি !
শিকল কে সে বাঁধছে পায়ে !
কোন্ সে ডাকাত ধরছে চেপে টুঁটি !
—আঁধার আলোর সাগরশেষে
প্রেতের মতো আসছে ভেসে !
আমার দেহের ছায়ার মতো, জড়িয়ে আছে মনের সনে,
যেদিন আমি জেগেছিলাম, সেও জেগেছে আমার মনে !
আমার মনের অন্ধকারে
ত্রিশূলমূলে, দেউলদ্বারে
কাটিয়েছে যে দুরন্ত কাল ব্যর্থ-পূজার পুষ্প ঢেলে !
স্বপন তাহার সফল হবে আমায় পেলে,—আমায় পেলে !
রাত্রি-দিবার জোয়ারস্রোতে
নোঙর ছেঁড়া হৃদয় হতে
জেগেছে সে হালের নাবিক,—
চোখের ধাঁধায়, ঝড়ের ঝাঁঝে,—
মনের মাঝে,—মনের মাঝে !

আমার চুমোর অন্বেষণে
প্রিয়ার মতো আমার মনে
অঙ্কহারা কাল ঘুরেছে কাতর দুটি নয়ন তুলে,
চোখের পাতা ভিজিয়ে তাহার আমার অশ্রুপাথার-কূলে !
ভিজে মাঠের অন্ধকারে কেঁদেছে মোর সাথে
হাতটি রেখে হাতে !
দেখি নি তার মুখখানি তো,—
পাই নি তারে টের,
জানি নি হায় আমার বুকে আশেক,—অসীমের
জেগে আছে জনমভোরের সূতিকাগার থেকে !
কত নতুন শরাবশালায় নাবনু একে-একে !
সরাইখানার দিলপিয়ালায় মাতি
কাটিয়ে দিলাম কত খুশির রাতি !
জীবন-বীণার তারে তারে আগুন-ছড়ি টানি
গুঞ্জরিয়া এল গেল কত গানের রানী,—
নাসপাতি-গাল গালে রাখি কানে কানে করলে কানাকানি
শরাব-নেশায় রাঙিয়ে দিল আঁখি !
—ফুলের ফাগে বেহুঁশ হোলি নাকি !
হঠাৎ কখন স্বপন-ফানুস কোথায় গেল উড়ে !
—জীবন-মরু-মরীচিকার পিছে ঘুরে-ঘুরে
ঘায়েল হয়ে ফিরল আমার বুকের কেরাভেন—
আকাশ-চরা শ্যেন !
মরুঝড়ের হাহাকারে মৃগতৃষার লাগি
প্রাণ যে তাহার রইল তবু জাগি
ইবলিশেরই সঙ্গে তাহার লড়াই হল সুরু !
দরাজ বুকে দিল্ যে উড়ু-উড়ু !
—ধূসর ধুধু দিগন্তরে হারিয়ে-যাওয়া নার্গিসেরই শোভা

থরে-থরে উঠল ফুটে রঙিন—মনোলোভা !
অলীক আশার,—দূর-দুরাশার দুয়ার ভাঙার তরে
যৌবন মোর উঠল নেচে রক্তমুঠি,—ঝড়ের ঝুঁটির পরে !
পিছে ফেলে টিকে থাকার ফাটক-কারাগার,
ভেঙে শিকল,—ধ্বসিয়ে ফাঁড়ির দ্বার
চলল সে যে ছুটে !
শৃঙ্খল কে বাঁধল তাহার পায়ে,—
চুলের ঝুঁটি ধরল কে তার মুঠে !
বর্শা আমার উঠল ক্ষেপে খুনে,
হুম্‌কি আমার উঠল বুকে রুখে !
দুশমন কে পথের সুমুখে !
—কোথায় কে বা !
এ কোন্ মায়া !
মোহ এমন কার !
বুকে আমার বাঘের মতো গর্জাল হুঙ্কার !
মনের মাঝের পিছুডাকা উঠল বুঝি হেঁকে—
সে কোন্ সুদূর তারার আলোর থেকে
মাথার পরের খাঁ খাঁ মেঘের পাথারপুরী ছেড়ে
নেমে এল রাত্রিদিবার যাত্রাপথে কে রে !
কী তৃষা তার !...
কী নিবেদন !...
মাগছে কিসের ভিখ !...
উদ্যত পথিক
হঠাৎ কেন যাচ্ছে থেমে—
আজকে হঠাৎ থামতে কেন হয় !
—এই বিজয়ী কার কাছে আজ মাগছে পরাজয় !
পথ-আলেয়ার খেয়ায় ধোঁয়ায় ধ্রুবতারার মতন কাহার আঁখি

আজকে নিল ডাকি
হালভাঙা এই ভূতের জাহাজটারে !
মড়ার খুলি—পাহাড় প্রমাণ হাড়ে
বুকে তাহার জ'মে গেছে কত শ্মশান-বোঝা !
আক্রোশে হা ছুটছিল সে একরোখা,—একসোজা
চুম্বকেরই ধ্বংসগিরির পানে,
নোঙরহারা মাস্তুলেরই টানে !
প্রেতের দলে ঘুরেছিল প্রেমের আসন পাতি,
জানে কি সে বুকের মাঝে আছে তাহার সাথী !
জানে কি সে ভোরের আকাশ, লক্ষ তারার আলো
তাহার মনের দুয়ার-পথেই নিরিখ হারালো !
জানে নি সে তাহার ঠোঁটের একটি চুমোর তরে
কোন্ দিওয়ানার সারেং কাঁদে
          নয়নে নীর ঝরে !
কপোত-ব্যথা ফাটে রে কার অপার গগন ভেদি !
তাহার বুকের সীমার মাঝেই কাঁদছে কয়েদী
          কোন্ সে অসীম আসি !
লক্ষ সাকীর প্রিয় তাহার বুকের পাশাপাশি
          প্রেমের খবর পুছে
কবের থেকে কাঁদতে আছে—
          'পেয়ালা দে রে মুঝে !'

একদিন খুঁজেছিনু যারে—

একদিন খুঁজেছিনু যারে
বকের পাখার ভিড়ে বাদলের গোধূলি-আঁধারে,
মালতীলতার বনে, কদমের তলে,
নিঝুম ঘুমের ঘাটে —কেয়াফুল,—শেফালির দলে !

—যাহারে খুঁজিয়াছিনু মাঠে-মাঠে শরতের ভোরে
হেমন্তের হিম ঘাসে যাহারে খুঁজিয়াছিনু ঝর ঝর
কামিনীর ব্যথার শিয়রে,
যার লাগি ছুটে গেছি নির্দয় মসুদ্ চীনা তাতারের দলে !
আর্ত কোলাহলে
তুলিয়াছি দিকে দিকে বাধা বিঘ্ন ভয়—
আজ মনে হয়
পৃথিবীর সাঁজদীপে তার হাতে কোনোদিন জ্বলে নাই শিখা !
—শুধু শেষ নিশীথের ছায়া-কুহেলিকা,
শুধু মেরু-আকাশের নীহারিকা, তারা
দিয়ে যায় যেন সেই পলাতকা চকিতার সাড়া !
মাঠে ঘাটে কিশোরীর কাঁকনের রাগিণীতে তার সুর
শোনে নাই কেউ,
গাগরীর কোলে তার উথলিয়া ওঠে নাই আমাদের
গাঙিনীর ঢেউ !
নামে নাই সাবধানী পাড়াগাঁর বাঁকা পথে চুপে চুপে
ঘোমটার ঘুমটুকু চুমি !
মনে হয় শুধু আমি, আর শুধু তুমি
আর ঐ আকাশের পউষ-নীরবতা
রাত্রির নির্জনযাত্রী তারকার কানে কানে কত কাল
কহিয়াছি আধো-আধো কথা।
—আজ বুঝি ভুলে গেছ প্রিয়া !
পাতাঝরা আঁধারের মুসাফের-হিয়া
একদিন ছিল তব গোধূলির সহচর, ভুলে গেছ তুমি !
এ মাটির ছলনার সুরাপাত্র অনিবার চুমি
আজ মোর বুকে বাজে শুধু খেদ, শুধু অবসাদ !
মহুয়ার, ধুতুরার স্বাদ

জীবনের পেয়ালায় ফোঁটা ফোঁটা ধরি
দুরন্ত শোণিতে মোর বারবার নিয়েছে যে ভরি !
মসজেদ-সরাই-শরাব
ফুরায় না তৃষা মোর, জুড়ায় না কলেজার তাপ !
দিকে দিকে ভাদরের ভিজা মাঠ —আলেয়ার শিখা !
পদে-পদে নাচে ফণা,
পথে পথে কালো যবনিকা !
কাতর ক্রন্দন,—
কামনার কবর-বন্ধন !
কাফনের অভিযান,—অঙ্গার-সমাধি !
মৃত্যুর সুমেরু সিন্ধু অন্ধকারে বারবার উঠিতেছে কাঁদি !
মর্‌মর্‌ কেঁদে ওঠে ঝরাপাতাভরা ভোররাতের পবন—
আধো আঁধারের দেশে
বারবার আসে ভেসে
কার সুর !—
কোন্‌ সুদূরের তরে হৃদয়ের প্রেতপুরে ডাকিনীর মতো
মোর কেঁদে মরে মন !

আলেয়া

প্রান্তরের পারে তব তিমিরের খেয়া
নীরবে যেতেছে দুলে নিদালি আলেয়া !
—হেথা, গৃহবাতায়নে নিভে গেছে প্রদীপের শিখা,
ঘোমটায় আঁখি ঘেরি রাত্রি-কুমারিকা
চুপে-চুপে চলিতেছে বনপথ ধরি !
আকাশের বুকে বুকে কাহাদের মেঘের গাগরী
ডুবে যায় ধীরে ধীরে আঁধার সাগরে !

ঢুলু-ঢুলু তারকার নয়নের পরে
নিশি নেমে আসে গাঢ়—স্বপন সঙ্কুল !
শেহালায় ঢাকা শ্যাম বালুকার কূল
বনমরালীর সাথে ঘুমায়েছে কবে !
বেণুবনশাখে কোন্ পেচকের রবে
চমকিছে নিরালা যামিনী !
পাতাল-নিলয় ছাড়ি কে নাগ কামিনী
আঁকাবাঁকা গিরিপথে চলিয়াছে চিত্রা অভিসারিকার প্রায় !
শ্মশান শয্যায়
নেভ-নেভ কোন্ চিতা-স্ফুলিঙ্গেরে ঘিরে
ক্ষুধিত আঁধার আসি জমিতেছে ধীরে !
নিদ্রার দেউলমূলে চোখ দুটি মুদে
স্বপ্নের বুদ্‌বুদে
বিলসিছে যবে ক্লান্ত ঘুমন্তের দল—
হে অনল—উন্মুখ, চঞ্চল
উন্নমিত আঁখিদুটি মেলি
সন্তরি চলিছ তুমি রাত্রির কুহেলি
কোন্ দূর কামনার পানে !
ঝলমল দিবা অবসানে
বধির আঁধারে
কান্তারের দ্বারে
এ কি তব মৌন নিবেদন !
—দিক্‌ভ্রান্ত—দরদী,—উন্মন !
পল্লীপসারিনী যবে পুণ্যরত্ন হেঁকে গেছে চলে
তোমার পিঙ্গল আঁখি ওঠে নি তো জ্বলে
আকাঙ্ক্ষার উলঙ্গ উল্লাসে !
—জনতায়,—নগরীর তোরণের পাশে,

অন্তঃপুরিকার বুকে,—মণিসৌধ সোপানের তীরে,
মরকত-ইন্দ্রনীল-অয়স্কান্ত খনির তিমিরে
যাও নি তো কভু তুমি পাথেয়-সন্ধানে !
ভাঙা-হাটে—ভিজা মাঠে—মরণের পানে
শীত প্রেতপুরে
একা একা মরিতেছ ঘুরে
না জানি কী পিপাসার ক্ষোভে !
আমাদের ব্যর্থতায়, আমাদের সকাতর কামনায় লোভে
মাগিতে আস নি তুমি নিমেষের ঠাঁই !
—অন্ধকার জলাভূমি—কঙ্কালের ছাই,
পল্লীকান্তারের ছায়া—তেপান্তর পথের বিস্ময়
নিশীথের দীর্ঘশ্বাসময়
করিয়াছে বিমনা তোমারে !
রাত্রি-পারাবারে
ফিরিতেছ বারম্বার একাকী বিচরি !
হেমন্তের হিম পথ ধরি,
পউষ-আকাশতলে দহি দহি দহি
—ছুটিতেছ বিহ্বল বিরহী
কত শত যুগজন্ম বহি !
কারে কবে বেসেছিলে ভালো
হে ফকির, আলেয়ার আলো !
কোন্ দূর অস্তমিত যৌবনের স্মৃতি বিমথিয়া
চিত্তে তব জাগিতেছে কবেকার প্রিয়া !
সে কোন্ রাত্রির হিমে হয়ে গেছে হারা !
নিয়েছে ভুলায়ে তারে মায়াবী ও নিশিমরু,
আঁধার সাহারা !
আজও তব লোহিত কপোলে

চুম্বন-শোণিমা তার উঠিতেছে জ্ব'লে
অনল-ব্যথায় !
—চ'লে যায়—মিলনের লগ্ন চ'লে যায় !
দিকে দিকে ধূমবাহু যায় তব ছুটি
অন্ধকারে লুটি-লুটি-লুটি !
ছলাময় আকাশের নীচে
লক্ষ প্রেতবধূদের পিছে
ছুটিয়া চলিছে তব প্রেম-পিপাসার
অগ্নি অভিসার !
বহ্নি-ফেনা নিঙাড়িয়া পাত্র ভরি ভরি,
অনন্ত অঙ্গার দিয়া হৃদয়ের পাণ্ডুলিপি গড়ি,
উষার বাতাস ভুলি, পলাতকা রাত্রির পিছনে
যুগ-যুগ ছুটিতেছ কার অন্বেষণে !

অস্তচাঁদে

ভালোবাসিয়াছি আমি অস্তচাঁদ, ক্লান্ত শেষপ্রহরের শশী !
—অঘোর ঘুমের ঘোরে ঢলে যবে কালো নদী—ঢেউয়ের কলসী,
নিঝ্‌ঝুম বিছানার পরে
মেঘ-বৌর খোঁপাখসা জ্যোৎস্নাফুল চুপে চুপে ঝরে,—
চেয়ে থাকি চোখ তুলে—যেন মোর পলাতকা প্রিয়া
মেঘের ঘোমটা তুলে প্রেত-চাঁদে সচকিতে ওঠে শিহরিয়া !
সে যেন দেখেছে মোরে জন্মে-জন্মে ফিরে ফিরে ফিরে
মাঠে ঘাটে একা একা—বুনোহাঁস—জোনাকির ভিড়ে !
দুশ্চর দেউলে কোন্—কোন্ যক্ষ প্রাসাদের তটে,
দূর উর—ব্যাবিলোন—মিশরের মরুভূ-সঙ্কটে,
কোথা পিরামিডতলে,—ঈসিসের বেদিকার মূলে,
কেউটের মতো নীলা যেইখানে ফণা তুলে উঠিয়াছে ফুলে,

কোন্ মন ভুলানিয়া পথচাওয়া দুলালীর সনে
আমারে দেখেছে জ্যোৎস্না—চোর চোখে—অলস নয়নে !

আমারে দেখেছে সে যে আসীরীয় সম্রাটের বেশে
প্রাসাদ-অলিন্দে যবে মহিমায় দাঁড়ায়েছি এসে—
হাতে তার হাত, প্রায়ে হাতিয়ার রাখি
কুমারীর পানে আমি তুলিয়াছি আনন্দের আরক্তিম আঁখি !
ভোরগেলাসের সুরা—তহুরা, ক’রেছি মোরা চুপে চুপে পান,
চকোরজুড়ির মতো কুহরিয়া গাহিয়াছি চাঁদিনীর গান !
পেয়ালায়-পায়েলায় সেই নিশি হয় নি উতলা,
নীল নিচোলের কোলে নাচে নাই আকাশের তলা !
নটীরা ঘুমায়েছিল পুরে পুরে, ঘুমে রাজবধূ,—
চুরি করে পিয়েছিনু ক্রীতদাসী বালিকার যৌবনের মধু !
সম্রাজ্ঞীর নির্দয় আঁখির দর্প বিদ্রূপ ভুলিয়া
কৃষ্ণাতিথি-চাঁদিনীর তলে আমি ষোড়শীর উরু পরশিয়া
লভেছিনু উল্লাস—উতরোল !—আজ পড়ে মনে
সাধ-বিষাদের খেদ কত জন্মজন্মান্তের, রাতের নির্জনে !

আমি ছিনু ‘ক্রবেদুর্’ কোন্ দূর ‘প্রভেনস্’-প্রান্তরে !
—দেউলিয়া পায়দল্—অগোচর মনচোর-মানিনীর তরে
সারেঙের সুর মোর এমনি উদাস রাত্রে উঠিত ঝঙ্কারি !
আঙুরলতায় ঘেরা ঘুমঘোর ঘরখানা ছাড়ি
ঘুঘুর পাখনা মেলি মোর পানে আসিল পিয়ারা ;
মেঘের ময়ূরপানে জেগেছিল এলোমেলো তারা !
—‘অলিভ’ পাতার ফাঁকে চুনচোখে চেয়েছিল চাঁদ,
মিলননিশার শেষে—বৃশ্চিক,—গোক্ষুরাফণা,—বিষের বিস্বাদ !
স্পেইনের ‘সিয়েরা’য় ছিনু আমি দস্যু—অশ্বারোহী—

নির্মম-কৃতান্ত-কাল—তবু কী যে কাতর,—বিরহী !
কোন্ রাজনন্দিনীর ঠোঁটে আমি এঁকেছিনু বর্বর চুম্বন !
অন্দরে পশিয়াছিনু অবেলার ঝড়ের মতন !
তখন রতনশেজে গিয়েছিল নিভে মধুরাতি,
নীল জানালার পাশে—ভাঙা হাটে—চাঁদের বেসাতি !
চুপে চুপে মুখে কার পড়েছিনু ঝুঁকে !
ব্যাধের মতন আমি টেনেছিনু বুকে
কোন্ ভীরু কপোতীর উড়ু-উড়ু ডানা !
—কালো মেঘে কেঁদেছিল অস্তচাঁদ—আলোর মোহানা!

বাংলার মাঠে ঘাটে ফিরেছিনু বেণু হাতে একা,
গঙ্গার তীরে কবে কার সাথে হয়েছিল দেখা !
'ফুলটি ফুটিলে চাঁদিনী উঠিলে' এমনই রূপালি রাতে
কদমতলায় দাঁড়াতাম গিয়ে বাঁশের বাঁশিটি হাতে !
অপরাজিতার ঝাড়ে—নদীপারে কিশোরী লুকায়ে বুঝি !—
মদনমোহন নয়ন আমার পেয়েছিল তারে খুঁজি !
তারই লাগি বেঁধেছিনু বাঁকা চুলে ময়ূরপাখার চূড়া,
তাহারই লাগিয়া শুঁড়ি সেজেছিনু—ঢেলে দিয়েছিনু সুরা !
তাহারই নধর অধর নিঙাড়ি উথলিল বুকে মধু,
জোনাকির সাথে ভেসে শেষরাতে দাঁড়াতাম দোরে বঁধু !
মনে পড়ে কি তা !—চাঁদ জানে যাহা, জানে যা কৃষ্ণাতিথির শশী,
বুকের আগুনে খুন চড়ে—মুখ চুন হয়ে যায় একেলা বসি !

ছায়া-প্রিয়া

দুপুর রাতে ও কার আওয়াজ !
গান কে গাহে, গান না !

কপোত বধূ ঘুমিয়ে আছে
নিঝুম ঝিঁঝিঁর বুকের কাছে ;
অস্তচাঁদের আলোর তলে
এ কার তবে কান্না !
গান কে গাহে, গান না !

সার্সি ঘরের উঠছে বেজে,
উঠছে কেঁপে পর্দা !
বাতাস আজি ঘুমিয়ে আছে
জল-ডাহুকের বুকের কাছে ;
এ কোন্ বাঁশি সার্সি বাজায়
এ কোন হাওয়া ফর্দা !
দেয় কাঁপিয়ে পর্দা !

নূপুর কাহার বাজল রে ঐ !
কাঁকন কাহার কাঁদল !
পুরের বধূ ঘুমিয়ে আছে
দুধের শিশুর বুকের কাছে ;
ঘরে আমার ছায়া-প্রিয়া
মায়ার মিলন ফাঁদল !
কাঁকন যে তার কাঁদল !

খস্‌খসাল শাড়ি কাহার !
উস্‌খুসাল চুল গো !
পুরের বধূ ঘুমিয়ে আছে
দুধের শিশুর বুকের কাছে ;
জুল্‌পি কাহার উঠল দুলে !

—দুলল কাহার দুল গো !
উস্‌খুসাল চুল গো !

আজকে রাতে কে ঐ এল
কালের সাগর সাঁত্‌রি !
জীবনভোরের সঙ্গিনী সেই,—
মাঠে-ঘাটে আজকে সে নেই !
কোন্ তিয়াষায় এল রে হায়
মরণপারের যাত্রী !
—কালের সাগর সাঁত্‌রি !

কাঁদছে পাখি পউষনিশির
তেপান্তরের বক্ষে !
ওর বিধবা বুকের মাঝে
যেন গো কার কাঁদন বাজে !
ঘুম নাহি আজ চাঁদের চোখে,
নিদ্ নাহি মোর চক্ষে !
তেপান্তরের বক্ষে !

এল আমার ছায়া-প্রিয়া,
কিশোরবেলার সই গো !
পুরের বধূ ঘুমিয়ে আছে
দুধের শিশুর বুকের কাছে ;
মনের মধু,—মনোরমা—
কই গো সে মোর—কই গো !
কিশোরবেলার সই গো !

ও কার আওয়াজ হাওয়ায় বাজে !
        গান কে গাহে, গান না !
কপোতবধূ ঘুমিয়ে আছে
বনের ছায়ায়,—মাঠের কাছে ;
অস্তচাঁদের আলোর তলে
        এ কার তবে কান্না !
        গান কে গাহে,—গান না !

ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল

ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল,—
ডালিম ফুলের মতো ঠোঁট যার, রাঙা আপেলের মতো লাল যার গাল,
চুল যার শাঙনের মেঘ, আর আঁখি গোধূলির মতো গোলাপী রঙিন,
আমি দেখিয়াছি তারে ঘুমপথে,—স্বপ্নে—কত দিন !
মোর জানালার পাশে তারে দেখিয়াছি রাতের দুপুরে—
তখন শকুনবধূ যেতেছিল শ্মশানের পানে উড়ে উড়ে !
মেঘের বুরুজ ভেঙে অস্তচাঁদ দিয়েছিল উঁকি,
সে কোন্ বালিকা একা অন্তঃপুরে এল অধোমুখী !
পাথারের পারে মোর প্রাসাদের আঙিনার 'পরে
দাঁড়াল সে—বাসররাত্রির বধূ—মোর তরে, যেন মোর তরে !
তখন নিভিয়া গেছে মণিদীপ,—চাঁদ শুধু খেলে লুকোচুরি,—
ঘুমের শিয়রে শুধু ফুটিতেছে-ঝরিতেছে ফুলঝুরি, স্বপনের কুঁড়ি !
অলস আঢুল হাওয়া জানালায় থেকে থেকে ফুঁপায় উদাসী !
কাতর নয়ন কার হাহাকারে চাঁদিনীতে জাগে গো উপাসী !
কিঙ্খাবে-গালিচা-খাটে রাজবধূ-ঝিয়ারীর বেশে
কভু সে দেয় নি দেখা—মোর তোরণের তলে দাঁড়াল সে এসে !
দাঁড়াল সে হেঁটমুখে—চোখ তার ভ'রে গেছে নীল অশ্রুজলে !

মীনকুমারীর মতো কোন্ দূর সিন্ধুর অতলে
ঘুরেছে সে মোর লাগি !—উড়েছে সে অসীমের সীমা !
অশ্রুর অঙ্গারে তার নিটোল ননীর গাল, নরম লালিমা
জ্ব'লে গেছে—নগ্ন হাত, নাই শাঁখা, হারায়েছে রুলি,
এলোমোলো কালো চুলে খ'সে গেছে খোঁপা তার,—বেণী গেছে খুলি !
সাপিনীর মতো বাঁকা আঙুলে ফুটেছে তার কঙ্কালের রূপ,
ভেঙেছে নাকের ডাঁশা, হিম স্তন, হিম রোমকূপ !
আমি দেখিয়াছি তারে, ক্ষুধিত প্রেতের মতো চুমিয়াছি আমি
তারই পেয়ালায় হায় !—পৃথিবীর উষা ছেড়ে আসিয়াছি নামি
কান্তারে ;—ঘুমের ভিড়ে বাঁধিয়াছি দেউলিয়া বাউলের ঘর,
আমি দেখিয়াছি ছায়া, শুনিয়াছি একাকিনী কুহকীর স্বর !
বুকে মোর, কোলে মোর—কঙ্কালের কাঁকালের চুমা !
—গঙ্গার তরঙ্গ কানে গায়,—'ঘুমা—ঘুমা !'
ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল—
ডালিম ফুলের মতো ঠোঁট যার, রাঙা আপেলের মতো লাল যার গাল,
চুল যার শাঙনের মেঘ, আর আঁখি গোধূলির মতো গোলাপী রঙিন ;
আমি দেখিয়াছি তারে ঘুমপথে, স্বপ্নে —কতদিন !

কবি

ভ্রমরীর মতো চুপে সৃজনের ছায়াধূপে ঘুরে মরে মন
আমি নিদালির আঁখি, নেশাখোর চোখের স্বপন !
নিরালায় সুর সাধি, বাঁধি মোর মানসীর বেণী,
মানুষ দেখে নি মোরে কোনোদিন, আমারে চেনেনি !
কোনো ভিড় কোনোদিন দাঁড়ায় নি মোর চারিপাশে,—
শুধায়নি কেহ কভু—'আসে কি রে,—সে কি আসে—আসে !'
আসে নি সে ভরাহাটে খেয়াঘাটে—পৃথিবীর পসরার মাঝে,

পাটনী দেখে নি তারে কোনোদিন—মাঝি তারে ডাকে নিকো সাঁঝে।
পারাপার করে নি সে মণিরত্ন-বেসাতির সিন্ধুর সীমানা,—
চেনা-চেনা মুখ সবই—সে যে শুধু সুদূর—অজানা !

করবীকুঁড়ির পানে চোখ তার সারাদিন চেয়ে আছে চুপে,
রূপ সাগরের মাঝে কোন্ দূর গোধূলির সে যে আছে ডুবে !
সে যেন ঘাসের বুকে, ঝিলমিল শিশিরের জলে ;
খুঁজে তারে পাওয়া যাবে এলোমেলো বেদিয়ার দলে,
বাবলার ফুলে ফুলে ওড়ে তার প্রজাপতি-পাখা,
ননির আঙুলে তার কেঁপে ওঠে কচি নোনাশাখা !
হেমন্তের হিম মাঠে, আকাশের আবছায়া ফুঁড়ে
বকবধূটির মতো কুয়াশায় শাদা ডানা যায় তার উড়ে !
হয়তো শুনেছ তারে—তার সুর, দুপুর আকাশে
ঝরাপাতা ভরা মরা দরিয়ার পাশে
বেজেছে ঘুঘুর মুখে, জল-ডাহুকীর বুকে পউষনিশায়
হলুদ পাতার ভিড়ে শিরশিরে পুবালি হাওয়ায় !

হয়তো দেখেছ তারে ভূতুড়ে দীপের চোখে মাঝরাতে দেয়ালের পরে
নিভে-যাওয়া প্রদীপের ধূসর ধোঁয়ায় তার সুর যেন ঝরে !
শুক্লা একাদশী রাতে বিধবার বিছানায় যেই জ্যোৎস্না ভাসে
তারই বুকে চুপে চুপে কবি আসে—সুর তার আসে !
উস্‌খুস্ এলো চুলে ভ'রে আছে কিশোরীর নগ্ন মুখখানি,—
তারই পাশে সুর ভাসে—অলখিতে উড়ে যায় কবির উড়ানি !

বালুঘড়িটির বুকে ঝিরি ঝিরি ঝিরি ঝিরি গান যবে বাজে
রাতবিরেতের মাঠে হাঁটে সে যে আলসে, অকাজে !
ঘুমকুমারীর মুখে চুমো খায় যখন আকাশ,

যখন ঘুমায়ে থাকে টুনটুনি, মধুমাছি, ঘাস,
হাওয়ার কাতর শ্বাস থেমে যায় আমলকী ঝাড়ে,
বাঁকা চাঁদ ডুবে যায় বাদলের মেঘের আঁধারে,
তেঁতুলের শাখে শাখে বাদুড়ের কালো ডানা ভাসে,
মনের হরিণী তার ঘুরে মরে হাহাকারে বনের বাতাসে !

জোনাকির মতো সে যে দূরে দূরে যায় উড়ে উড়ে—
আপনার মুখ দেখে ফেরে সে যে নদীর মুকুরে !
জ্ব'লে ওঠে আলেয়ার মতো তার লাল আঁখিখানি।
আঁধারে ভাসায় খেয়া সে কোন্ পাষাণী !

জানে না তো কী যে চায়—কবে হায় কী গেছে হারায়ে।
চোখ বুজে খোঁজে একা—হাতড়ায় আঙুল বাড়ায়ে
কারে আহা !—কাঁদে হা হা পুবের বাতাস,
শ্মশানশবের বুকে জাগে এক পিপাসার শ্বাস !
তারই লাগি মুখ তোলে কোন্ মৃতা—হিম চিতা জ্বেলে দেয় শিখা,
তার মাঝে যায় দহি বিরহীর ছায়াপুত্তলিকা !

সিন্ধু

বুকে তব সুরপরী বিরহবিধুর
        গেয়ে যায়, হে জলধি, মায়ার মুকুর !
কোন্ দূর আকাশের ময়ূর-নীলিমা
        তোমারে উতলা করে ! বালুচরসীমা
উল্লঙ্ঘি তুলিছ তাই শিরোপা তোমার,—
        উচ্ছৃঙ্খল অট্টহাসি—তরঙ্গের বাঁকা তলোয়ার !
গলে মৃগতৃষ্ণাবিষ, মারীর আগল

তোমার সুরার স্পর্শে আশেক-পাগল !
উদ্যত ঊর্মির বুকে অরূপের ছবি
নিত্যকাল বহিছ হে মরমিয়া কবি
হে দুন্দুভি দুর্জয়ের, দুরন্ত, অগাধ !
পেয়েছি শক্তির তৃপ্তি, বিজয়ের স্বাদ
তোমার উলঙ্গনীল তরঙ্গের গানে !
কালে কালে দেশে দেশে মানুষ সন্তানে
তুমি শিখায়েছ বন্ধু দুর্মদ-দুরাশা !
আমাদের বুকে তুমি জাগালে পিপাসা
দুশ্চর তটের লাগি—সুদূরের তরে।
রহস্যের মায়াসৌধ বক্ষের উপরে
ধরেছ দুস্তরকাল ;—তুচ্ছ অভিলাষ,
দুদিনের আশা, শান্তি, আকাঙ্ক্ষা, উল্লাস,
পলকের দৈন্য-জ্বালা-জয়-পরাজয়,
ত্রাস-ব্যথা-হাসি-অশ্রু-তপস্যা-সঞ্চয়—
পিনাকশিখায় তব হল ছারখার।
ইচ্ছার বাড়বকুণ্ডে, উগ্র পিপাসার
ধু ধু ধু ধু বেদীতটে আপনারে দিতেছ আহুতি।
মোর ক্ষুধা-দেবতারে তুমি কর স্তুতি !
নিত্য নব বাসনার হলাহলে রাঙি
'পারীয়া'র প্রাণ লয়ে আছি মোরা জাগি
বসুধার বাঞ্ছাকূপে, উঞ্ছের অঙ্গনে !
নিমেষের খেদ-হর্ষ-বিষাদের সনে
বীভৎস খঞ্জের মতো করি মাতামাতি !
চুরমার হয়ে যায় বেলোয়ারি বাতি !
ক্ষুরধার আকাঙ্ক্ষার অগ্নি দিয়া চিতা
গড়ি তবু বারবার—বারবার ধুতুরার তিতা

নিঃস্ব নীল ওষ্ঠ তুলি নিতেছি চুমিয়া।
মোর বক্ষকপোতের কপোতিনী প্রিয়া
কোথা কবে উড়ে গেছে—পড়ে আছে আহা
নষ্ট নীড়, ঝরা পাতা, পুবালির হাহা !
কাঁদে বুকে মরা নদী,—শীতের কুয়াশা !
ওহে সিন্ধু, আসিয়াছি আমি সর্বনাশা
ভুখারী ভিখারী একা, আসন্ন-বিবশ !
—চাহিনা পলার মালা, শুক্তির কলস,
মুক্তাতোরণের তট মীনকুমারীর,
চাহি না নিতল নীড় বারুণীরানীর।
মোর ক্ষুধা উগ্র আরও, অলঙ্ঘ্য অপার !
একদিন কুকুরের মতো হাহাকার
তুলেছিনু ফোঁটা ফোঁটা রুধিরের লাগি !
একদিন মুখখানা উঠেছিল রাঙি
ক্লেদবসাপিণ্ড চুমি রিক্ত-বাসনার !
মোরে ঘিরে কেঁদেছিল কুহেলি আঁধার,—
শ্মশানফেরুর পাল,—শিশিরের নিশা,
আলেয়ার ভিজা মাঠে ভুলেছিনু দিশা !
আমার হৃদয়পীঠে মোর ভগবান
বেদনার পিরামিড পাহাড়প্রমাণ
গেঁথে গেছে গরলের পাত্র চুমুকিয়া ;
রুদ্র তরবার তব উঠুক নাচিয়া
উচ্ছিষ্টের কলেজায়, অশিব-স্বপনে,
হে জলধি, শব্দভেদী উগ্র আস্ফালনে !
—পূজাথালা হাতে ল'য়ে আসিয়াছে কত পান্থ, কত পথবালা
সহর্ষে সমুদ্রতীরে ; বুকে যার বিষমাখা শায়কের জ্বালা
সে শুধু এসেছে বন্ধু চুপে-চুপে একা।

অন্ধকারে একবার দুজনার দেখা !
বৈশাখের বেলাতটে, সমুদ্রের স্বর,—
অনন্ত, অভঙ্গ, উষ্ণ, আনন্দসুন্দর !
তারপর, দূর পথে অভিযান বাহি
চলে যাব জীবনের জয়গান গাহি।

দেশবন্ধু

বাংলার অঙ্গনেতে বাজায়েছ নটেশের রঙ্গমল্লী গাঁথা
অশান্ত সন্তান ওগো,—বিপ্লবিনী পদ্মা ছিল তব নদী মাতা।
কালবৈশাখীর দোলা অনিবার দুলাইত রক্তপুঞ্জ তব
উত্তাল ঊর্মির তালে—বক্ষে তব লক্ষ কোটি পন্নগ-উৎসব
উদ্যত ফণার নৃত্যে আস্ফালিত ধূর্জটির কণ্ঠ-নাগ জিনি,
ত্র্যম্বক-পিনাকে তব শঙ্কাকুল ছিল সদা শত্রু অক্ষৌহিণী।
স্পর্শে তব পুরোহিত, ক্লেদে প্রাণ নিমেষেতে উঠিত সঞ্চারি,
এসেছিলে বিষ্ণুচক্র মর্মন্তুদ—ক্লৈব্যের সংহারী।
ভেঙেছিলে বাঙালির সর্বনাশী সুষুপ্তির ঘোর,
ভেঙেছিলে ধুলিশ্লিষ্ট শঙ্কিতের শৃঙ্খলের ডোর,
ভেঙেছিলে বিলাসের সুরাভাণ্ড তীব্র দর্পে, বৈরাগের রাগে,
দাঁড়ালে সন্ন্যাসী যবে প্রাচীমঞ্চে—পৃথ্বী-পুরোভাগে।
নবীন শাক্যের বেশে, কটাক্ষেতে কাম্য পরিহরি
ভাসিয়া চলিলে তুমি ভারতের ভাবগঙ্গোত্তরী
আর্ত অস্পৃশ্যের তরে, পৃথিবীর পঞ্চমার লাগি ;
বাদলের মন্দ্র সম মন্ত্র তব দিকে দিকে তুলিলে বৈরাগী।
এনেছিলে সঙ্গে করি অবিশ্রাম প্লাবনের দুন্দুভিনিনাদ,
শান্তিপ্রিয় মুমূর্ষুর শ্মশানেতে এনেছিলে আহব-সংবাদ,
গাণ্ডীবের টঙ্কারেতে মুহুর্মুহু বলেছিলে, 'আছি, আমি আছি !

কল্পশেষে ভারতের কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছি নব সব্যসাচী।’
ছিলে তুমি দধীচির অস্থিময় বাসবের দম্ভোলির সম,
অলঙ্ঘ্য, অজেয়, ওগো লোকোত্তর, পুরুষোত্তম।
ছিলে তুমি রুদ্রের ডম্বরুরূপে, বৈষ্ণবের গুপীযন্ত্র মাঝে,
অহিংসার তপোবনে তুমি ছিলে চক্রবর্তী ক্ষত্রিয়ের সাজে—
অক্ষয় কবচধারী শালপ্রাংশু রক্ষকের বেশে।
ফেরুকুল-সঙ্কুলিত উঞ্ছবৃত্তি ভিক্ষুকের দেশে
ছিলে তুমি সিংহশিশু, যোজনান্ত বিহরি একাকী
স্তব্ধ শিলাসন্ধিতলে ঘন ঘন গর্জনের প্রতিধ্বনি মাখি।
ছিলে তুমি নীরবতা-নিষ্পেষিত নির্জীবের নিদ্রিত শিয়রে
উন্মত্ত ঝটিকাসম, বহ্নিমান বিপ্লবের ঘোরে ;
শক্তিশেল অপঘাতে দেশবক্ষে রোমাঞ্চিত বেদনার ধ্বনি
ঘুচাতে আসিয়াছিলে মৃত্যুঞ্জয়ী বিশল্যকরণী।
ছিলে তুমি ভারতের অমাময় স্পন্দহীন বিহ্বল শ্মশানে
শবসাধকের বেশে—সঞ্জীবনী অমৃত সন্ধানে।
রণনে রঞ্জনে তব হে বাউল, মন্ত্রমুগ্ধ ভারত, ভারতী ;
কলাবিৎ সম হায় তুমি শুধু দগ্ধ হলে দেশ-অধিপতি।
বিধিবশে দূরাগত বন্ধু আজ, ভেঙে গেছে বসুধা-নির্মোক,
অন্ধকার দিবাভাগে বাজে তাই কাজরীর শ্লোক।
মল্লারে কাঁদিছে আজ বিমানের বৃন্তহারা মেঘছত্রীদল,
গিরিতটে, ভূমিগর্ভ ছায়াচ্ছন্ন—উচ্ছ্বাসউচ্ছল।
যৌবনের জলরঙ্গ এসেছিল ঘনস্বনে দরিয়ার দেশে,
তৃষ্ণাপাংশু অধরেতে এসেছিল ভোগবতী ধারার আশ্লেষে।
অর্চনার হোমকুণ্ডে হবি সম প্রাণবিন্দু বারংবার ঢালি,
বামদেবতার পদে অকাতরে দিয়ে গেল মেধ্য হিয়া ডালি।
গৌরকান্তি শঙ্করের অম্বিকার বেদীতলে একা
চুপে চুপে রেখে এল পুঞ্জীভূত রক্তস্রোত-রেখা।

বিবেকানন্দ

জয়, তরুণের জয় !
জয় পুরোহিত আহিতাগ্নিক, জয়, জয় চিন্ময় !
স্পর্শে তোমার নিশা টুটেছিল, উষা উঠেছিল জেগে
পূর্ব তোরণে, বাংলা-আকাশে, অরুণ-রঙিন মেঘে ;
আলোকে তোমার ভারত, এশিয়া—জগৎ গেছিল রেঙে।

হে যুবক মুসাফের,
স্থবিরের বুকে ধ্বনিলে শঙ্খ জাগরণপর্বের !
জিঞ্জির-বাঁধা ভীত চকিতেরে অভয় দানিলে আসি,
সুপ্তের বুকে বাজালে তোমার বিষাণ হে সন্ন্যাসী,
রুক্ষের বুকে বাজালে তোমার কালীয় দমন বাঁশি !

আসিলে সব্যসাচী,
কোদণ্ডে তব নব উল্লাসে নাচিয়া উঠিল প্রাচী !
টঙ্কারে তব দিকে দিকে শুধু রণিয়া উঠিল জয়,
ডঙ্কা তোমার উঠিল বাজিয়া মাভৈঃ মন্ত্রময় ;
শঙ্কাহরণ ওহে সৈনিক, নাহিকো তোমার ক্ষয় !

তৃতীয় নয়ন তব
ম্লান বাসনার মনসিজ নাশি জ্বালাইত উৎসব !
কলুষ-পাতকে, ধূর্জটি, তব পিনাক উঠিত রুখে,
হানিতে আঘাত দিবানিশি তুমি ক্লেদ-কামনার বুকে,
অসুর-আলয়ে শিব-সন্ন্যাসী বেড়াতে শঙ্খ ফুঁকে !

কৃষ্ণচক্র সম
ক্লৈব্যের হৃদে এসেছিলে তুমি ওগো পুরুষোত্তম,
এসেছিলে তুমি ভিখারীর দেশে ভিখারীর ধন মাগি
নেমেছিলে তুমি বাউলের দলে, হে তরুণ বৈরাগী !
মর্মে তোমার বাজিত বেদনা আর্ত জীবের লাগি।
হে প্রেমিক মহাজন,
তোমার পানেতে তাকাইল কোটি দরিদ্রনারায়ণ ;
অনাথের বেশে ভগবান এসে তোমার তোরণতলে
বারবার যবে কেঁদে কেঁদে গেল কাতর আঁখির জলে,
অর্পিলে তব প্রীতি-উপায়ন প্রাণের কুসুমদলে।

কোথা পাপী ? তাপী কোথা ?
—ওগো ধ্যানী তুমি পতিতপাবন, যজ্ঞে সাজিলে হোতা !
শিব-সুন্দর-সত্যের লাগি শুরু করে দিলে হোম,
কোটি পঞ্চমা আতুরের তরে কাঁপায়ে তুলিলে ব্যোম,
মন্ত্রে তোমার বাজিল বিপুল শান্তি স্বস্তি ওঁ !

সোনার মুকুট ভেঙে
ললাট তোমার কাঁটার মুকুটে রাখিলে সাধক রেঙে !
স্বার্থ-লালসা পাসরি ধরিলে আত্মাহুতির ডালি,
যজ্ঞের যূপে বুকের রুধির অনিবার দিলে ঢালি,
বিভাতি তোমার তাই তো অটুট রহিল অংশুমালী !

দরিয়ার দেশে নদী !
—বোধিসত্ত্বের আলয়ে তুমি গো নবীন শ্যামল বোধি !
হিংসার রণে আসিলে পথিক প্রেম-খঞ্জর হাতে,

আসিলে করুণা প্রদীপ হস্তে হিংসার অমারাতে,
ব্যাধি-মন্বন্তরে এলে তুমি সুধা জলধির সংঘাতে !

মহামারী-ক্রন্দন
ঘুচাইলে তুমি শীতল পরশে, ওগো সুকোমল-চন্দন !
বজ্রকঠোর, কুসুমমৃদুল, আসিলে লোকোত্তর ;
হানিলে কুলিশ কখনও,—ঢালিলে নির্মল নির্ঝর,
নাশিলে পাতক, পাতকীরে তুমি অর্পিলে নির্ভর।

চক্র-গদার সাথে
এনেছিলে তুমি শঙ্খ পদ্ম, হে ঋষি, তোমার হাতে ;
এনেছিলে তুমি ঝড় বিদ্যুৎ, পেয়েছিলে তুমি সাম,
এনেছিলে তুমি রণ-বিপ্লব—শান্তি-কুসুমদাম ;
মাভৈঃ শঙ্খে জাগিছে তোমার নরনারায়ণ-নাম !

জয়, তরুণের জয় !
আত্মাহুতির রক্ত কখনও আঁধারে হয় না লয় !
তাপসের হাড় বজ্রের মতো বেজে ওঠে বারবার !
নাহি রে মরণে বিনাশ, শ্মশানে নাহি তার সংহার,
দেশে দেশে তার বীণা বাজে—বাজে কালে কালে ঝঙ্কার !

হিন্দু-মুসলমান

মহামৈত্রীর বরদ-তীর্থে—পুণ্য ভারতপুরে
পূজার ঘণ্টা মিশিছে হরষে নমাজের সুরে-সুরে !
আহ্নিক হেথা সুরু হয়ে যায় আজান বেলার মাঝে,
মুয়াজ্জেনের উদাস ধ্বনিটি গগনে গগনে বাজে ;
জপে ঈদগাতে তসবী ফকির, পূজারী মন্ত্র পড়ে,

সন্ধ্যা-উষায় বেদবাণী যায় মিশে কোরানের স্বরে ;
সন্ন্যাসী আর পীর
মিলে গেছে হেথা—মিশে গেছে হেথা মসজিদ, মন্দির !

কে বলে হিন্দু বসিয়া রয়েছে একাকী ভারত জাঁকি ?
—মুসলমানের হস্তে হিন্দু বেঁধেছে মিলন-রাখী ;
আরব মিশর তাতার তুর্কী ইরানের চেয়ে মোরা
ওগো ভারতের মোসলেমদল, তোমাদের বুক-জোড়া !
ইন্দ্রপ্রস্থ ভেঙেছি আমরা, আর্যাবর্ত ভাঙি
গড়েছি নিখিল নতুন ভারত নতুন স্বপনে রাঙি !
—নবীন প্রাণের সাড়া
আকাশে তুলিয়া ছুটিছে মুক্ত যুক্তবেণীর ধারা !

রুমের চেয়েও ভারত তোমার আপন, তোমার প্রাণ !
—হেথায় তোমার ধর্ম অর্থ, হেথায় তোমার ত্রাণ ;
হেথায় তোমার আশান ভাই গো, হেথায় তোমার আশা ;
যুগ যুগ ধরি এই ধূলিতলে বাঁধিয়াছ তুমি বাসা,
গড়িয়াছ ভাষা কল্লে-কল্লে দরিয়ার তীরে বসি,
চক্ষে তোমার ভারতের আলো—ভারতের রবি, শশী,
হে ভাই মুসলমান
তোমাদের তরে কোল পেতে আছে ভারতের ভগবান !

এ ভারতভূমি নহেকো তোমার, নহেকো আমার একা,
হেথায় পড়েছে হিন্দুর ছাপ—মুসলমানের রেখা ;
—হিন্দু মনীষা জেগেছে এখানে আদিম উষার ক্ষণে,
ইন্দ্রদ্যুম্নে উজ্জয়িনীতে মথুরা বৃন্দাবনে !
পাটলীপুত্র শ্রাবস্তী কাশী কোশল তক্ষশীলা

অজন্তা আর নালন্দা তার রচিছে কীর্তিলীলা !
—ভারতী কমলাসীনা
কালের বুকেতে বাজায় তাহার নব প্রতিভার বীণা !
এই ভারতের তখ্‌তে চড়িয়া শাহানশাহার দল
স্বপ্নের মণিপ্রদীপে গিয়েছে উজলি আকাশতল !
—গিয়েছে তাহারা কল্পলোকের মুক্তার মালা গাঁথি,
পরশে তাদের জেগেছে আরব-উপন্যাসের রাতি !
জেগেছে নবীন মোগল-দিল্লী—লাহোর,—ফতেহ্‌পুর,
যমুনাজলের পুরানো বাঁশিতে বেজেছে নবীন সুর !
নতুন প্রেমের রাগে
তাজমহলের তরুণিমা আজও উষার অরুণে জাগে !

জেগেছে হেথায় আকবরী আইন—কালের নিকষ কোলে
বারবার যার উজল সোনার পরশ উঠিছে জ্বলে।
সেলিম, শাজাহাঁ—চোখের জলেতে এক্‌শা করিয়া তারা
গড়েছে মিনার মহলা স্তম্ভ কবর ও শাহ্‌দারা !
—ছড়ায়ে রয়েছে মোগল ভারত—কোটি-সমাধির স্তূপ
তাকায়ে রয়েছে তন্দ্রাবিহীন—অপলক, অপরূপ !
—যেন মায়াবীর তুড়ি
স্বপনের ঘোরে স্তব্ধ করিয়া রেখেছে কনকপুরী !

মোতিমহলের অযুত রাত্রি, লক্ষ দীপের ভাতি
আজিও বুকের মেহেরাবে যেন জ্বালায়ে যেতেছে বাতি !
—আজিও অযুত বেগম-বাঁদীর শষ্পশয্যা ঘিরে
অতীত রাতের চঞ্চল চোখ চকিতে যেতেছে ফিরে !
দিকে দিকে আজও বেজে ওঠে কোন্ গজল-ইলাহী গান !
পথহারা কোন্ ফকিরের তানে কেঁদে ওঠে সারা প্রাণ !

—নিখিল ভারতময়
মুসলমানের স্বপন-প্রেমের গরিমা জাগিয়া রয় !

এসেছিল যারা ঊষর ধূসর মরুগিরিপথ বেয়ে,
একদা যাদের শিবিরে-সৈন্যে ভারত গেছিল ছেয়ে,
আজিকে তাহারা পড়শি মোদের, মোদের বহিন-ভাই ;
—আমাদের বুকে বক্ষ তাদের, আমাদের কোলে ঠাঁই।
'কাফের' 'যবন' টুটিয়া গিয়াছে, ছুটিয়া গিয়াছে ঘৃণা,
মোস্‌লেম্‌ বিনা ভারত বিফল, বিফল হিন্দু বিনা ;
—মহামৈত্রীর গান
বাজিছে আকাশে নব ভারতের গরিমায় গরীয়ান !

নিখিল আমার ভাই

নিখিল আমার ভাই
—কীটের বুকেতে যেই ব্যথা জাগে আমি সে বেদনা পাই ;
যে প্রাণ গুমরি কাঁদিছে নিরালা শুনি যেন তার ধ্বনি,
কোন ফণী যেন আকাশ বাতাসে তোলে বিষ গরজনি !
কী যেন যাতনা মাটির বুকেতে অনিবার ওঠে রণি,
আমার শস্য-স্বর্ণপসরা নিমেষে হয় যে ছাই !
—সবার বুকের বেদনা আমার, নিখিল আমার ভাই।

আকাশ হতেছে কালো
কাহাদের যেন ছায়াপাতে হায়, নিভে যায় রাঙা আলো !
বাতায়নে মোর ভেসে আসে যেন কাদের তপ্ত-শ্বাস,
অন্তরে মোর জড়ায়ে কাদের বেদনার নাগপাশ,
বক্ষে আমার জাগিছে কাদের নিরাশা, গ্লানিমা, ত্রাস,

—মনে মনে আমি কাহাদের হায় বেসেছিনু এত ভালো।
তাদের ব্যথার কুহেলি-পাথারে আকাশ হতেছে কালো।

লভিয়াছে বুঝি ঠাঁই
আমার চোখের অশ্রুপুঞ্জে নিখিলের বোন-ভাই !
আমার গানেতে জাগিছে তাদের বেদনা-পীড়ার দান,
আমার প্রাণেতে জাগিছে তাদের নিপীড়িত ভগবান,
আমার হৃদয় যূপেতে তাহারা করিছে রক্তস্নান,
আমার মনের চিতানলে জ্ব'লে লুটায়ে যেতেছে ছাই !
আমার চোখের অশ্রুপুঞ্জে লভিয়াছে তারা ঠাঁই।

পতিতা

আগার তাহার বিভীষিকাভরা, জীবন মরণময় !
সমাজের বুকে অভিশাপ সে যে—সে যে ব্যাধি, সে যে ক্ষয় ;
প্রেমের পসরা ভেঙে ফেলে দিয়ে ছলনার কারাগার
রচিয়াছে সে যে, দিনের আলোয় রুদ্ধ ক'রেছে দ্বার !
সূর্যকিরণ চকিতে নিভায়ে সাজিয়াছে নিশাচর,
কালনাগিনীর ফণার মতন নাচে সে বুকের পর !
চক্ষে তাহার কালকূট ঝরে, বিষপঙ্কিল শ্বাস,
সারাটি জীবন মরীচিকা তার—প্রহসন-পরিহাস !
ছোঁয়াচে তাহার ম্লান হ'য়ে যায় শশীতারকার শিখা,
আলোকের পারে নেমে আসে তার আঁধারের যবনিকা !
সে যে মন্বন্তর, মৃত্যুর দূত, অপঘাত, মহামারী,—
মানুষ তবু সে, তার চেয়ে বড়ো, সে যে নারী, সে যে নারী !

ডাহুকী

মালঞ্চে পুষ্পিতা লতা অবনতমুখী—
নিদাঘের রৌদ্রতাপে একা সে ডাহুকী
বিজন তরুর শাখে ডাকে ধীরে ধীরে
বনচ্ছায়া-অন্তরালে তরল তিমিরে !
—আকাশে মন্থর মেঘ, নিরালা দুপুর !
—নিস্তব্ধ পল্লীর পথে কুহকের সুর
বাজিয়া উঠিছে আজ ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে !
সে কোন্ পিপাসা কোন্ ব্যথা তার মনে !
হারায়েছে প্রিয়ারে কি ?—অসীম আকাশে
ঘুরেছে অনন্ত কাল মরীচিকা-আশে ?
বাঞ্ছিত দেয় নি দেখা নিমেষের তরে !—
কবে কোন্ রুক্ষ কালবৈশাখীর ঝড়ে
ভেঙে গেছে নীড়, গেছে নিরুদ্দেশে ভাসি !
—নিঝুম বনের তটে বিমনা উদাসী
গেয়ে যায় ; সুপ্ত পল্লীতটিনীর তীরে
ডাহুকীর প্রতিধ্বনি-ব্যথা যায় ফিরে !
—পল্লবে নিস্তব্ধ পিক, নীরব পাপিয়া,
গাহে একা নিদ্রাহারা বিরহিণী হিয়া !
আকাশে গোধূলি এল—দিক্ হল ম্লান,
ফুরায় না তবু হায় হুতাশীর গান !
—স্তিমিত পল্লীর তটে কাঁদে বারবার,
কোন্ যেন সুনিভৃত রহস্যের দ্বার
উন্মুক্ত হল না আর কোন্ সে গোপন
নিল না হৃদয়ে তুলি তার নিবেদন !

শ্মশান

কুহেলির হিমশয্যা অপসারি ধীরে
রূপময়ী তন্বী মাধবীরে
ধরণী বরিয়া লয় বারে-বারে-বারে !
—আমাদের অশ্রুর পাথারে
ফুটে ওঠে সচকিতে উৎসবের হাসি,—
অপরূপ বিলাসের বাঁশি !
ভগ্ন প্রতিমারে মোরা জীবনের বেদীতটে আরবার গড়ি,
ফেনাময় সুরাপাত্র ধরি
ভুলে যাই বিষের আস্বাদ !
মোহময় যৌবনের সাধ
আতপ্ত করিয়া তোলে স্ববিরের তুহিন অধর !
চিরমৃত্যুচর
হে মৌন শ্মশান,
ধূম-অবগুণ্ঠনের অন্ধকারে আবরি বয়ান
হেরিতেছ কিসের স্বপন !
ক্ষণে ক্ষণে রক্তবহ্নি করি নির্বাপন
স্তব্ধ করি রাখিতেছ বিরহীর ক্রন্দনের ধ্বনি !
তব মুখপানে চেয়ে কবে বৈতরণী
হ'য়ে গেছে কলহীন !
বক্ষে তব হিম হয়ে আছে কত উগ্রশিখা চিতা
হে অনাদি পিতা !
ভস্মগর্ভে, মরণের অকূল শিয়রে
জন্মযুগ দিতেছ প্রহরা—
কবে বসুন্ধরা

মৃত্যুগাঢ় মদিরার শেষ পাত্রখানি
তুলে দেবে হস্তে তব, কবে লবে টানি
কঙ্কাল অঙ্গুলি তুলি শ্যামা ধরণীরে
শ্মশান-তিমিরে,
লোলুপ নয়ন মেলি হেরিবে তাহার
বিবসনা শোভা
দিব্য মনোলোভা !
কোটি-কোটি চিতা-ফণা দিয়া
রূপসীর অঙ্গ আলিঙ্গিয়া
শুষে নেবে সৌন্দর্যের তামরস-মধু !
এ বসুধা-বধূ
আপনারে ডারি দেবে উরসে তোমার
ধ্বক্-ধ্বক্—দারুণ তৃষ্ণার
রসনা মেলিয়া—
অপেক্ষায় জেগে আছে শ্মশানের হিয়া !
আলোকে-আঁধারে
অগণন চিতার দুয়ারে
যেতেছে সে ছুটে,
তৃপ্তিহীন তিক্ত বক্ষপুটে
আনিতেছে নব মৃত্যুপথিকেরে ডাকি,
তুলিতেছে রক্ত-ধূম্র আঁখি !
—নিরাশার দীর্ঘশ্বাস শুধু
বৈতরণীমরু ঘেরি জ্বলে যায় ধু ধু,
আসে না প্রেয়সী !
—নিদ্রাহীন শশী,
আকাশের অনাদি তারকা
রহিয়াছে জেগে তার সনে ;

শ্মশানের হিম বাতায়নে
শত-শত প্রেতবধূ দিয়ে যায় দেখা,—
তবু সে যে প’ড়ে আছে একা,
বিমনা-বিরহী !
বক্ষে তার কত লক্ষ সভ্যতার স্মৃতি গেছে দহি,
কত শৌর্য-সাম্রাজ্যের সীমা
প্রেম-পুণ্য-পূজার গরিমা
অকলঙ্ক সৌন্দর্যের বিভা
গৌরবের দিবা !
—তবু তার মেটে নাই তৃষা ;
বিচ্ছেদের নিশা
আজও তার হয় নাই শেষ !
অশ্রান্ত অঙ্গুলি সে যে করিছে নির্দেশ
অবনীর পক্কবিম্ব অধরের পর !
পাতাঝরা হেমন্তের স্বর
করে দেয় সচকিত তারে,
হিমানী-পাথারে
কুয়াশাপুরীর মৌন জালায়ন তুলে
চেয়ে থাকে আঁধারে অকূলে
সুদূরের পানে !
বৈতরণীখেয়াঘাটে মরণ-সন্ধানে
এল কি রে জাহ্নবীর শেষ ঊর্মিধারা !
অপার শ্মশান জুড়ি জ্বলে লক্ষ চিতাবহ্নি—কামনা-সাহারা !

মিশর

‘মমী’র দেহ বালুর তিমির জাদুর ঘরে লীন—
‘স্ফীঙ্কস’-দানবীর অরাল ঠোঁটের আলাপ আজি চুপ !
ঝাঁ-ঝাঁ মরুর ‘লু’য়ের ‘ফু’য়ে হচ্ছে বিলীন-ক্ষীণ
মিশর দেশের কাফ্‌ন পাহাড়—পিরামিডের স্তূপ !
নিভে গেছে ‘ঈশিশে’রই বেদীর থেকে ধূমা,
জুড়িয়ে গেছে লক্‌লকে সেই রক্তজিভার চুমা !
এদ্দিনেতে ফুরিয়ে গেছে কুমীরপূজার ঘটা,
দুলছে মরুশ্মশান-শিরে মহাকালের জটা !
ঘুমন্তদের কানে কানে কয় সে,—‘ঘুমা,—ঘুমা’ !

ঘুমিয়ে গেছে বালুর তলে ফ্যারাও,—ফ্যারাওছেলে—
তাদের বুকে যাচ্ছে আকাশ বর্শা ঠেলে ঠেলে !
হাওয়ার সেতার দেয় ফুঁপিয়ে ‘মেম্ননে’রই বুক,
ডুবে গেছে মিশররবি—বিরাট ‘বেলে’র ভুখ
জিহ্বা দিয়ে জঠর দিয়ে গেছে তোমায় জ্বেলে !

পিরামিডের পাশাপাশি লালচে বালুর কাছে
স্থবির মরণ-ঘুমের ঘোরে মিশর শুয়ে আছে !
সোনার কাঠি নেই কি তাহার ? জাগবে না কি আর !
মৃত্যু—সে কি শেষের কথা ?—শেষ কি শবাধার ?
সবাই কি গো ঢালাই হবে চিতার কালির ছাঁচে !

নীলার ঘোলা জলের দোলায় লাফায় কালো সাপ।
কুমীরগুলোর খুলির খিলান, করাত দাঁতের খাপ
ঊর্ধ্বমুখে রৌদ্র পোহায় ;—ঘুমপাড়ানির ঘুম
হানছে আঘাত—আকাশ বাতাস হচ্ছে যেন গুম্‌ !

ঘুমের থেকে উপচে পড়ে মৃতের মনস্তাপ !

নীলা, নীলা—ধুক্‌ধুকিয়ে মিশরকবর-পারে
রইলে জেগে বোবা বুকের বিকল হাহাকারে !
লাল আলেয়ায় খেয়া ভাসায় 'রামেসেসে'র দেশ !
অতীত অভিশাপের নিশা এলিয়ে এলোকেশ
নিভিয়ে দেছে দেউটি তোমার দেউল-কিনারে !

কলসী কোলে নীলনদেতে যেতেছে ঐ নারী,
ঐ পথেতে চলতে আছে নিগ্রো সারি সারি ;
ইয়াঙ্কি ঐ—ঐ য়ুরোপী,—চীনে-তাতার-মুর্‌
তোমার বুকের পাঁজর দ'লে টলতেছে হুড়্‌মুড়্‌,—
ফেনিয়ে তুলে খুন্‌খারাবী, খেলাপ, খবরদারী !

দিনের আলো ঝিমিয়ে গেল—আকাশে ঐ চাঁদ !
—চপল হাওয়ায় কাঁকন কাঁদায় নীলনদেরই বাঁধ !
মিশর-ছুঁড়ি গাইছে মিঠা শুঁড়িখানার সুরে
বালুর খাতে, প্রিয়ের সাথে—খেজুরবনে দূরে !
আফ্রিকা এই, এই যে মিশর—জাদুর এ যেন ফাঁদ !

'ওয়েসিসে'র ঠাণ্ডা ছায়ায় চৈতি চাঁদের তলে
মিশরবালার বাঁশির গলা কিসের কথা বলে !
চলছে বালুর চড়াই ভেঙে উটের পরে উট—
এই যে মিশর—আফ্রিকার এই কুহকপাখাপুট !
—কী এক মোহ এই হাওয়াতে—এই দরিয়ার জলে !

শীতল পিরামিডের মাথা,—'গীজে'র মুরতি

অঙ্কবিহীন যুগসমাধির মূক মমতা মথি
আবার যেন তাকায় অদূর উদয়গিরির পানে !
'মেম্ননে'র ঐ কণ্ঠ ভরে চারণ-বীণার গানে !
আবার জাগে ঝাণ্ডাঝালর—জ্যান্ত আলোর জ্যোতি !

পিরামিড

—বেলা বয়ে যায় !
গোধূলির মেঘ-সীমানায়
ধূম্র মৌন সাঁঝে
নিত্য নব দিবসের মৃত্যুঘণ্টা বাজে !
শতাব্দীর শবদেহে শ্মশানের ভস্মবহ্নি জ্বলে !
পান্থ ম্লান চিতার কবলে
একে একে ডুবে যায় দেশ, জাতি, সংসার, সমাজ,
কার লাগি হে সমাধি, তুমি একা বসে আছো আজ
কী এক বিক্ষুব্ধ প্রেতকায়ার মতন !
অতীতের শোভাযাত্রা কোথায় কখন
চকিতে মিলায়ে গেছে পাও নাই টের !
কোন্ দিবা-অবসানে গৌরবের লক্ষ মুসাফের
দেউটি নিভায়ে গেছে—চলে গেছে দেউল ত্যজিয়া,
চলে গেছে প্রিয়তম—চলে গেছে প্রিয়া !
যুগান্তের মণিময় গেহবাস ছাড়ি
চকিতে চলিয়া গেছে বাসনা-পসারী
কবে কোন্ বেলাশেষে হায়
দূর অস্তশেখরের গায় !
তোমারে যায় নি তারা শেষ অভিনন্দনের অর্ঘ্য সমর্পিয়া ;
সাঁজের নীহারনীল সমুদ্র মথিয়া
মরমে পশে নি তব তাহাদের বিদায়ের বাণী !

তোরণে আসে নি তব লক্ষ লক্ষ মরণ সন্ধানী
অশ্রু-ছলছল চোখে, পাণ্ডুর বদনে !
—কৃষ্ণ যবনিকা কবে ফেলে তারা গেল দূর দ্বারে বাতায়নে
জানো নাই তুমি !
জানে না তো মিশরের মূক মরুভূমি
তাদের সন্ধান !
হে নির্বাক পিরামিড, অতীতের স্তব্ধ প্রেত-প্রাণ
অবিচল স্মৃতির মন্দির !
আকাশের পানে চেয়ে আজও তুমি বসে আছো স্থির !
নিষ্পলক যুগ্মভুরু তুলে
চেয়ে আছো অনাগত উদধির কূলে
মেঘ রক্ত ময়ূখের পানে !
জ্বলিয়া যেতেছে নিত্য নিশি-অবসানে
নূতন ভাস্কর !
বেজে ওঠে অনাহত মেম্ননের স্বর
নবোদিত অরুণের সনে
কোন্ আশা-দুরাশার ক্ষণস্থায়ী অঙ্গুলি-তাড়নে !
—পিরামিড-পাষাণের মর্ম ঘেরি নেচে যায় দু'দণ্ডের রুধির-ফোয়ারা
কী এক প্রগল্ভ উষ্ণ উল্লাসের সাড়া !
থেমে যায় পান্থবীণা মুহূর্তে কখন !
শতাব্দীর বিরহীর মন
নিটল নিথর
সন্তরি ফিরিয়া মরে গগনের রক্ত-পীত সাগরের পর !
বালুকার স্ফীত পারাবারে
লোল মৃগতৃষ্ণিকার দ্বারে
মিশরের অপহৃত অন্তরের লাগি
মৌন ভিক্ষা মাগি !—

—খুলে যাবে কবে রুদ্ধ মায়ার দুয়ার !
মুখরিত প্রাণের সঞ্চার
ধ্বনিত হইবে কবে কলহীন নীলার বেলায়—
—বিচ্ছেদের নিশি জেগে আজও তাই বসে আছে পিরামিড হায় !
—কত আগন্তুক-কাল—অতিথি-সভ্যতা
তোমার দুয়ারে এসে কয়ে যায় অসম্বৃত অন্তরের কথা !
তুলে যায় উচ্ছৃঙ্খল রুদ্র কোলাহল !
—তুমি রহ নিরুত্তর—নির্বেদী—নিশ্চল !
মৌন, অন্যমনা !
—প্রিয়ার বক্ষের পরে বসি একা নীরবে করিছ তুমি
শবের সাধনা
হে প্রেমিক—স্বতন্ত্র স্বরাট্ !
—কবে সুপ্ত উৎসবের স্তব্ধ ভাঙা হাট
উঠিবে জাগিয়া !
সস্মিত নয়ন তুলি কবে তব প্রিয়া
আঁকিবে চুম্বন তব স্বেদকৃষ্ণ, পাণ্ডু, চূর্ণ ব্যথিত কপোলে !
মিশর-অলিন্দে কবে গরিমার দীপ যাবে জ্বলে !
বসে আছো অশ্রুহীন স্পন্দহীন তাই !
—ওলটিপালটি যুগযুগান্তের শ্মশানের ছাই
জাগিয়া রয়েছে তব প্রেত-আঁখি—প্রেমের প্রহরী !
—মোদের জীবনে যবে জাগে পাতা-ঝরা
হেমন্তের বিদায়-কুহেলি,
অরুন্তুদ আঁখিদুটি মেলি
গড়ি় মোরা স্মৃতির শ্মশান
দু-দিনের তরে শুধু—নবোৎফুল্লা মাধবীর গান
মোদের ভুলায়ে নেয় বিচিত্র আকাশে
নিমেষে চকিতে !

—অতীতের হিমগর্ভ কবরের পাশে
ভুলে যাই দুই ফোঁটা অশ্রু ঢেলে দিতে !

মরুবালু

হাড়ের মালা গলায় গেঁথে—অট্টহাসি হেসে
উল্লাসেতে টলছে তারা—জ্বলছে তারা খালি !
ঘুরছে তারা লাল মশানে কপাল-কবর চষে,
বুকের বোমাবারুদ দিয়ে আকাশটারে জ্বালি
পাঁয়জোরে কাল মহাকালের পাঁজর ফেঁড়ে ফেঁড়ে
মড়ার বুকে চাবুক মেরে ফিরছে মরুর বালি !

সর্বনাশের সঙ্গে তোরা দম্ভে খেলিস পাশা !
হেথায় কোন্-এক সৃষ্টিপ্রাতের সূত্রপাতের ভূমি,
—শিশুমানব গড়েছিল ঐ সাহারায় বাসা ;
—সেসব গেছে কবে ঘুমের চুমার ধোঁয়ায় ধূমি !
অটল আকাশ যাচ্ছে জরির ফিতার মতো ফেঁড়ে,
জবান তোদের জ্বলছে যমের চিতার গেলাস চুমি !
তোদের সনে 'ডাইনোসুরে'র লড়াই হল কত—
আলুথালু লুটিয়ে বালুর ডাইনী ছায়ার তলে
আজকে তারা ঘুমিয়ে আছে—চুল্লি শত শত
উঠল জ্বলে তাদের হাড়ে,—তাদের নাড়ের বলে ;
কাঁদছে খাঁ-খাঁ কাফন-ঢাকা বালুর চাকার নীচে
মুণ্ড তাদের—মড়ার কপাল ভৈরবেরই গলে !

তোদের বুকে জাগছে মৃগতৃষ্ণা—জাগে ঝড় !
নিস উড়িয়ে শিকার-সোয়ার ধোঁয়ার পিছে-পিছে—
মেঘে-মেঘে চড়াও—বাজের বুক চিরে চক্কর !

নাচতে আছিস আকাশখানার গোখরাফণার নীচে,
আরব মিশর চীন ভারতের হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হাপর খিঁচে খিঁচে !

তোদের ভাষা আস্ফালিছে শেখ সেনানীর বুকে !
—লাল সাহারার শেরের সোয়ার—বালুর ঘায়ে ঘেয়ো,
ধমক মেরে আঁধির বুকে ছুটছে রুখে রুখে !
—তোদের মতন নেইকো তাদের সোদর-সাথী কেহ,
নেইকো তাদের মোদের মতন পিছুডাকের মায়া,
নেইকো তাদের মোদের মতন আর্ত মোহ-স্নেহ।

দানোয়-পাওয়া আগুনদানা—দারুণ পথের মুখে !
ঘায়েল করি মেঘের বুরুজ বল্লমেরই ঘর,
উড়িয়ে হাজার 'কেরাভেন' ও তাম্বুশিবির-বুকে,
উজিয়ে মরীচিকার শিখা—কালফণা-জর্জর
—টলতে আছিস—দলতে আছিস,—জ্বলতে আছিস ধু ধু
সঙ্গে স্যাঙাত—মসুদ্ ডাকাত—তাতার যাযাবর !

গাড়তে যাবে যারা তোদের বুকের মাঝে বাসা
হাড্ডি তাদের ফোঁফরা হ'য়ে ঝুরবে বালুর মাঝে,
এইখানেতে নেইকো দরদ, নেইকো ভালোবাসা,
বর্শা লাফায়—উটের গলার ঘুণ্টি শুধু বাজে !
ফুরিয়ে গেছে আশা যাদের, জুড়িয়ে গেছে জ্বালা,
আয় রে বালুর 'কারবালা'তে, অন্ধকারের ঝাঁঝে !

চাঁদনীতে

বেবিলোন্ কোথা হারায়ে গিয়েছে—মিশর-'অসুর' কুয়াশাকালো ;

চাঁদ জেগে আছে আজও অপলক, মেঘের পালকে ঢালিছে আলো !
সে যে জানে কত পাথারের কথা, কত ভাঙা হাট মাঠের স্মৃতি !
কত যুগ কত যুগান্তরের সে ছিল জ্যোৎস্না, শুক্লা তিথি !
হয়তো সেদিনও আমাদেরই মতো পিলুবারোঁয়ার বাঁশিটি নিয়া
ঘাসের ফরাশে বসিত এমনি দূর পরদেশী প্রিয় ও প্রিয়া !
হয়তো তাহারা আমাদেরই মতো মধু-উৎসবে উঠিত মেতে
চাঁদের আলোয় চাঁদমারী জুড়ে, সবুজ চরায়, সব্‌জি-ক্ষেতে !
হয়তো তাহারা দুপুর-যামিনী বালুর জাজিমে সাগরতীরে
চাঁদের আলোয় দিগদিগন্তে চকোরের মতো চরিত ফিরে !
হয়তো তাহারা মদঘূর্ণনে নাচিত কাঞ্চীবাঁধন খুলে
এমনি কোন্‌-এক চাঁদের আলোয়—মরু-'ওয়েসিসে' তরুর মূলে !
বীর যুবাদল শত্রুর সনে বহুদিনব্যাপী রণের শেষে
এমনি কোন্‌-এক চাঁদিনীবেলায় দাঁড়াত নগরীতোরণে এসে !
কুমারীর ভিড় আসিত ছুটিয়া, প্রণয়ীর গ্রীবা জড়ায়ে নিয়া
হেঁটে যেত তারা জোড়ায়-জোড়ায় ছায়াবীথিকার পথটি দিয়া !
তাদের পায়ের আঙুলের ঘায়ে খড়ু-খড়ু পাতা উঠিত বাজি,
তাদের শিয়রে দুলিত জ্যোৎস্না-চাঁচর-চিকণ পত্ররাজি !
দখিনা উঠিত মর্মরি মধুবনানীর লতা-পল্লব ঘিরে
চপল মেয়েরা উঠিত হাসিয়া—'এল বল্লভ,—এল রে ফিরে !'
—তুমি ঢুলে যেতে, দশমীর চাঁদ তাহাদের শিরে সারাটি নিশি,
নয়নে তাদের দুলে যেতে তুমি—চাঁদিনী-শরাব, সুরার শিশি !
সেদিনও এমনই মেঘের আসরে জ্বলেছে পরীর বাসরবাতি,
হয়তো সেদিনও ফুটেছে মোতিয়া—ঝরেছে চন্দ্রমল্লীপাঁতি !
হয়তো সেদিনও নেশোখোর মাছি গুমরিয়া গেছে আঙুরবনে,
হয়তো সেদিনও আপেলের ফুল কেঁপেছে আঢুল হাওয়ার সনে !
হয়তো সেদিনও এলাচির বন আতরের শিশি দিয়েছে ঢেলে
হয়তো আলেয়া গেছে ভিজা মাঠে এমনই ভুতুড়ে প্রদীপ জ্বেলে !

হয়তো সেদিনও ডেকেছে পাপিয়া কাঁপিয়া-কাঁপিয়া ‘সরো’র শাখে,
হয়তো সেদিনও পাড়ার নাগরী ফিরেছে এমনি গাগরি কাঁখে !
হয়তো সেদিনও পানসী দুলায়ে গেছে মাঝি বাঁকা ঢেউটি বেয়ে
হয়তো সেদিনও মেঘের শকুনডানায় গেছিল আকাশ ছেয়ে !
হয়তো সেদিনও মাণিকজোড়ের মরা পাখিটির ঠিকানা মেগে
অসীম আকাশে ঘুরেছে পাখিনী ছট্‌ফট্‌ দুটি পাখার বেগে !
হয়তো সেদিনও খুর্‌ খুর্‌ ক’রে খরগোশছানা গিয়েছে ঘুরে
ঘন মেহগিনি-টার্পিন-তলে—বালির জর্দা-বিছানা ফুঁড়ে !
হয়তো সেদিনও জানালার নীল জাফরির পাশে একেলা বসি
মনের হরিণী হেরেছে তোমারে—বনের পারের ডাগর শশী !
শুক্লা একাদশীর নিশীতে মণিহর্ম্যের তোরণে গিয়া
পারাবত-দূত পাঠায়ে দিয়েছে প্রিয়ের তরেতে হয়তো প্রিয়া !
অলিভকুঞ্জে হা হা ক’রে হাওয়া কেঁদেছে কাতর যামিনী ভরি !
ঘাসের শাটিনে আলোর ঝালরে ‘মার্টিল্‌’ পাতা পড়েছে ‘ঝরি’ !
‘উইলো’র বন উঠেছে ফুঁপায়ে,—‘ইউ’তরুশাখা গিয়েছে ভেঙে,
তরুণীর দুধ-ধব্‌ধবে বুকে সাপিনীর দাঁত উঠেছে রেঙে !
কোন্‌ গ্রীস—কোন্‌ কার্থেজ, রোম, ‘ত্রুবেদুর’-যুগ কোন্‌,—
চাঁদের আলোয় স্মৃতির কবর-সফরে বেড়ায় মন !
জানি না তো কিছু—মনে হয় শুধু এমনই তুহিন চাঁদের নীচে
কত দিকে দিকে—কত কালে-কালে হয়ে গেছে কত কী যে !
কত যে শ্মশান—মশান কত যে—কত-যে কামনা-পিপাসা-আশা
অস্তচাঁদের আকাশে বেঁধেছে আরব-উপন্যাসের বাসা !

দক্ষিণা

প্রিয়ার গালেতে চুমা খেয়ে যায় চকিতে পিয়াল রেণু !—
এল দক্ষিণা—কাননের বীণা—বনানীপথের বেণু !
তাই মৃগী আজ মৃগের চোখেতে বুলায়ে নিতেছে আঁখি,

বনের কিনারে কপোত আজিকে নেয় কপোতীরে ডাকি !
ঘুঘুর পাখায় ঘুঙুর বাজায় আজিকে আকাশখানা,—
আজ দখিনার ফর্দা হাওয়ায় পর্দা মানে না মানা !
শিশিরশীর্ণা বালার কপোলে কুহেলির কালো জাল
উষ্ণ চুমোর আঘাতে হয়েছে ডালিমের মতো লাল !
দাড়িমের বীজ ফাটিয়া পড়িছে অধরের চারি পাশে
আজ মাধবীর প্রথম উষায়, দখিনা হাওয়ার শ্বাসে !
মদের পেয়ালা শুকায়ে গেছিল, উড়ে গিয়েছিল মাছি,
দখিনা-পরশে ভরা পেয়ালায় বুদ্‌বুদ্‌ ওঠে নাচি !
বেয়ালার সুরে বাজিয়া উঠিছে শিরা-উপশিরাগুলি !
শ্মশানের পথে করোটি হাসিছে,—হেসে খুন হল খুলি !
এস্রাজ বাজে আজ মলয়ের—চিতার রৌদ্রাতপ
সুরের সুঠামে নিভে যায় যেন, হেসে ওঠে যেন শব !
নিভে যায় রাঙা অঙ্গারমালা বৈতরণীর জলে,
সুর-জাহ্নবী ফুটে ওঠে আজ মলয়ের কোলাহলে !
আকাশ-নিথানে মধু-পরিণয়—মিলন-বাসর পাতি
হিমানীশীর্ণ বিধবা তারারা জ্বলে ওঠে রাতারাতি !
ফাগুয়ার রাগে—চাঁদের কপোল চকিতে হয়েছে রাঙা !
—হিমের ঘোমটা চিরে দেয় কে গো মরমস্নায়ুতে দাঙা !
লালসে কাহার আজ নীলিমার আনন রুধির-লাল—
নিখিলের গালে গাল পাতে কার কুঙ্কুম-ভাঙা গাল !
নারাঙ্গি-ফাটা অধর কাহার আকাশ বাতাসে ঝরে !
কাহার বাঁশিটি খুন উথলায়—পরান উদাস করে !
কাহার পানেতে ছুটেছে উধাও শিশু পিয়ালের শাখা !
ঠোঁটে ঠোঁট ডলে—পরাগ চোঁয়ায় অশোক ফুলের ঝাঁকা !
কাহার পরশে পলাশ বধূর আঁখির কেশরগুলি
মুদে-মুদে আসে—আর বার করে কুঁদে কুঁদে কোলাকুলি !

পাতার বাজারে বাজে হুল্লোড়—পায়েলার রুণ্ রুণ্,
কিশলয়দের ডাশা পেষে কে গো—চোখ করে ঘুমঘুম !
এসেছে দখিনা—ক্ষীরের মাঝারে লুকায়ে কোন্-এক-হীরের ছুরি !—
তার লাগি তবু ক্ষ্যাপা শাল-নিম, তমাল-বকুলে হুড়াহুড়ি !
আমের কুঁড়িতে বাউল বোলতা খুন্‌সুড়ি দিয়ে খসে যায়,
অঘ্রানে যার ঘ্রাণ পেয়েছিল, পেয়েছিল যারে 'পোষলা'য়,
সাতাশে মাঘের বাতাসে তাহার দর বেড়ে গেছে দশগুণ—
নিছক হাওয়ায় ঝরিয়া পড়িছে আজ মউলের কষগুণ !
ঠেলে ফেলে দিয়ে নীলমাছি আর প্রজাপতিদের ভিড়
দখিনার মুখে রসের বাগান বিকায়ে দিয়েছে ক্ষীর !
এসেছে নাগর—যামিনীর আজ জাগর রঙিন আঁখি,—
কুয়াশার দিনে কাঁচুলি বাঁধিয়া কুচ রেখেছিল ঢাকি—
আজিকে কাঞ্চী যেতেছে খুলিয়া, মদঘূর্ণনে হায় !
নিশীথের স্বেদসীধুধারা আজ ক্ষরিছে দক্ষিণায় !
রূপসী ধরণী বাসকসজ্জা, রূপালি চাঁদের তলে
বালুর ফরাশে রাঙা উল্লাসে ঢেউয়ের আগুন জ্বলে !
রোল উতরোল শোণিতে শিরায়—হোরীর হা রা রা চীৎকার—
মুখে মুখে মধু—সুধাসীধু শুধু, তিত্ কোথা আজ—তিত্ কার !
শীতের বাস্তুভিত ভেঙে আজ এল দক্ষিণা—মিষ্টি-মধু,
মদনের হুলে ঢুলে ঢুলে ঢুলে হুঁশহারা হল সৃষ্টি-বধূ !

যে কামনা নিয়ে

যে কামনা নিয়ে মধুমাছি ফেরে বুকে মোর সেই তৃষা !
খুঁজে মরি রূপ, ছায়াধূপ জুড়ি,
রঙের মাঝারে হেরি রঙডুরি !

পরাগের ঠোঁটে পরিমলগুঁড়ি,—
হারায়ে ফেলি গো দিশা !
আমি প্রজাপতি—মিঠা মাঠে-মাঠে সোঁদালে সর্ষেক্ষেতে ;
—রোদের সফরে খুঁজি নাকো ঘর,
বাঁধি নাকো বাসা—কাঁপি থরথর
অতসী ছুঁড়ির ঠোঁটের উপর
শুঁড়ির গেলাসে মেতে !

আমি দক্ষিণা—দুলালীর বীণা, পউষপরশহারা !
ফুল-আঙিয়ার আমি ঘুমভাঙা
পিয়াল চুমিয়া পিলাই গো রাঙা
পিয়ালার মধু, তুলি রাতজাগা
হোরীর হা রা রা-সাড়া !

আমি গো লালিমা—গোধূলির সীমা, বাতাসের 'লাল' ফুল।
দুই নিমেষের তরে আমি জ্বালি
নীল আকাশের গোলাপী দেয়ালী !
আমি খুশরোজী,—আমি গো খেয়ালী,
চঞ্চল, চুল্‌বুল্‌।

বুকে জ্বলে মোর বাসর দেউটি—মধুপরিণয়রাতি !
তুলিছে ধরণী বিধবা-নয়ন
—মনের মাঝারে মদনমোহন
মিলননদীর নিধুর কানন
রেখেছে রে মোর পাতি !

স্মৃতি

থমথমে রাত, আমার পাশে বসল অতিথি—
বললে, আমি অতীত ক্ষুধা—তোমার অতীত স্মৃতি !
—যে দিনগুলো সাঙ্গ হল ঝড়বাদলের জলে,
শুষে গেল মেরুর হিমে, মরুর অনলে,
ছায়ার মতো মিশেছিলাম আমি তাদের সনে ;
তারা কোথায় ?—বন্দী স্মৃতিই কাঁদছে তোমার মনে !
কাঁদছে তোমার মনের খাকে, চাপা ছাইয়ের তলে,
কাঁদছে তোমার স্যাঁত্সেঁতে শ্বাস—ভিজা চোখের জলে,
কাঁদছে তোমার মূক মমতার রিক্ত পাথার ব্যেপে,
তোমার বুকের খাড়ার কোপে,—খুনের বিষে ক্ষেপে !
আজকে রাতে কোন্ সে সুদূর ডাক দিয়েছে তারে,—
থাকবে না সে ত্রিশূলমূলে, শিবের দেউলদ্বারে !
মুক্তি আমি দিলেম তারে—উল্লাসেতে দুলে
স্মৃতি আমার পালিয়ে গেল বুকের কপাট খুলে
নবালোকে—নবীন উষার নহবতের মাঝে।
ঘুমিয়েছিলাম—দোরে আমার কার করাঘাত বাজে !
—আবার আমায় ডাকলে কেন স্বপনঘোরের থেকে !
অই লোকালোক-শৈলচূড়ায় চরণখানা রেখে
রয়েছিলাম মেঘের রাঙা মুখের পানে চেয়ে,
কোথার থেকে এলে তুমি হিম সরণি বেয়ে !
ঝিম্‌ঝিমে চোখ, জটা তোমার ভাসছে হাওয়ার ঝড়ে,
শ্মশানশিঙা বাজল তোমার প্রেতের গলার স্বরে !
আমার চোখের তারার সনে—তোমার আঁখির তারা
মিলে গেল, তোমার মাঝে আবার হলেম হারা !
—হারিয়ে গেলাম ত্রিশূলমূলে, শিবের দেউলদ্বারে ;
কাঁদছে স্মৃতি—কে দেবে গো—মুক্তি দেবে তারে !

সেদিন এ ধরণীর

সেদিন এ ধরণীর
সবুজ দ্বীপের ছায়া—উতরোল তরঙ্গের ভিড়
মোর চোখ জেগে জেগে ধীরে ধীরে হল অপহত—
কুয়াশায় ঝ'রে পড়া আতসের মতো !
দিকে দিকে ডুবে গেল কোলাহল,—
সহসা উজান জলে ভাঁটা গেল ভাসি !
অতি দূর আকাশের মুখখানা আসি
বুকে মোর তুলে গেল যেন হাহাকার !
সেই দিন মোর অভিসার
মৃত্তিকার শূন্য পেয়ালার ব্যথা একাকারে ভেঙে
বকের পাখার মতো শাদা লঘু মেঘে
ভেসেছিল আতুর, উদাসী !
বনের ছায়ার নীচে ভাসে কার ভিজে চোখ
কাঁদে কার বারোঁয়ার বাঁশি
সেদিন শুনিনি তাহা,—
ক্ষুধাতুর দুটি আঁখি তুলে
অতি দূর তারকার কামনায় তরী মোর দিয়েছিনু খুলে !
আমার এ শিরা-উপশিরা
চকিতে ছিঁড়িয়া গেল ধরণীর নাড়ীর বন্ধন—
শুনেছিনু কান পেতে জননীর স্থবির ক্রন্দন,
মোর তরে পিছুডাক মাটি-মা,—তোমার !
ডেকেছিল ভিজে ঘাস—হেমন্তের হিম মাস, জোনাকির ঝাড় !
আমারে ডাকিয়াছিল আলেয়ার লাল মাঠ—শ্মশানের খেয়াঘাট আসি !
কঙ্কালের রাশি,

দাউদাউ চিতা,—
কত পূর্বজাতকের পিতামহ-পিতা,
সর্বনাশ ব্যসন-বাসনা,
কত মৃত গোক্ষুরার ফণা,
কত তিথি, কত যে অতিথি,
কত শত যোনিচক্রস্মৃতি
করেছিল উতলা আমারে !
আধো আলো—আধেক আঁধারে
মোর সাথে মোর পিছে এল তারা ছুটে
মাটির বাঁটের চুমা শিহরি উঠিল মোর ঠোঁটে—রোমপুটে !
ধু ধু মাঠ,—ধানক্ষেত—কাশফুল— বুনোহাঁস—বালুকার চর
বকের ছানার মতো যেন মোর বুকের উপর
এলোমেলো ডানা মেলে মোর সাথে চলিল নাচিয়া !
—মাঝপথে থেমে গেল তারা সব,
শকুনের মতো শূন্যে পাখা বিথারিয়া
দূরে—দূরে—আরও দূরে—আরো দূরে চলিলাম উড়ে,
নিঃসহায় মানুষের শিশু একা, অনন্তের শুক্ল অন্তঃপুরে
অসীমের আঁচলের তলে !
স্ফীত সমুদ্রের মতো আনন্দের আর্ত কোলাহলে
উঠিলাম উথলিয়া দুরন্ত সৈকতে,
দূর ছায়াপথে !
পৃথিবীর প্রেতচোখ বুঝি
সহসা উঠিল ভাসি তারকা-দর্পণে মোর অপহৃত আননের
প্রতিবিম্ব খুঁজি !
ভ্রূণ-ভ্রষ্ট সন্তানের তরে
মাটি-মা ছুটিয়া এল বুকফাটা মিনতির ভরে,—
সঙ্গে নিয়ে বোবা শিশু—বৃদ্ধ মৃত পিতা

সূতিকা-আলয় আর শ্মশানের চিতা।
মোর পাশে দাঁড়াল সে গর্ভিণীর ক্ষোভে,
মোর দুটি শিশু আঁখি তারকার লোভে
কাঁদিয়া উঠিল তার পীনস্তন, জননীর প্রাণ।
জরায়ুর ডিম্বে তার জন্মিয়াছে সে ঈপ্সিত বাঞ্ছিত সন্তান
তার তরে কালে কালে পেতেছে সে শৈবালবিছানা, শালতমালের ছায়া।
এনেছে সে নব নব ঋতুরাগ—পউষনিশির শেষে ফাগুনের ফাগুয়ার মায়া !
তার তরে বৈতরণীতীরে সে যে ঢালিয়াছে গঙ্গার গাগরী,
মৃত্যুর অঙ্গার মথি স্তন তার বারবার ভিজা রসে উঠিয়াছে ভরি।
উঠিয়াছে দূর্বাধানে শোভি,
মানবের তরে সে যে এনেছে মানবী !
মশলা-দরাজ এই মাটিটার ঝাঁঝ যে রে—
কেন তবে দু দণ্ডের অশ্রু—অমানিশা
দূর আকাশের তরে বুকে তার তুলে যায় নেশাখোর মক্ষিকার তৃষা !
নয়ন মুদিনু ধীরে—শেষ আলো নিভে গেল পলাতকা নীলিমার পারে,
সদ্য প্রসূতির মতো অন্ধকার বসুন্ধরা আবরি আমারে।

ওগো দরদিয়া

—ওগো দরদিয়া,
তোমারে ভুলিবে সবে, যাবে সবে তোমারে ত্যজিয়া ;
ধরণীর পসরায় তোমারে পাবে না কেহ দিনান্তেও খুঁজে
কে জানে রহিবে কোথা নিশিভোরে নেশাখোর আঁখি তব বুজে !
—হয়তো সিন্ধুর পারে শ্বেতশঙ্খ ঝিনুকের পাশে
তোমার কঙ্কালখানা শুয়ে রবে নিদ্রাহারা উর্মির নিশ্বাসে !
চেয়ে রবে নিষ্পলক অতি দূর লহরীর পানে,
গীতিহারা প্রাণ তব হয়তো বা তৃপ্তি পাবে তরঙ্গের গানে !

হয়তো বনচ্ছায়া লতাগুল্ম পল্লবের তলে
ঘুমায়ে রহিবে তুমি নীল শষ্পে শিশিরের দলে ;
হয়তো বা প্রান্তরের পারে তুমি রবে শুয়ে প্রতিধ্বনিহারা—
তোমারে হেরিয়ে শুধু হিমানীর শীর্ণাকাশ— নীহারিকা—তারা,
তোমারে চিনিবে শুধু প্রেত জ্যোৎস্না—বধির জোনাকি !
তোমারে চিনিবে শুধু আঁধারের আলেয়ার আঁখি !
তোমারে চিনিবে শুধু আকাশের কালো মেঘ—মৌন—আলোহারা,
তোমারে চিনিয়া নেবে তমিস্রার তরঙ্গের ধারা !
কিংবা কেহ চিনিবে না, হয়তো বা জানিবে না কেহ
কোথায় লুটায়ে আছে হেমন্তের দিবাশেষে ঘুমন্তের দেহ !
—হয়েছিল পরিচয় ধরণীর পান্থশালে যাহাদের সনে,
তোমার বিষাদ-হর্ষ গেঁথেছিলে একদিন যাহাদের মনে,
যাহাদের বাতায়নে একদিন গিয়েছিলে পথিক-অতিথি,
তোমারে ভুলিবে তারা—ভুলে যাবে সব কথা, সবটুকু স্মৃতি !
নাম তব মুছে যাবে মুসাফের—অঙ্গারের পাণ্ডুলিপিখানি
নোনা ধরা দেয়ালের বুক থেকে খ'সে যাবে কখন না জানি !
তোমার পানের পাত্রে নিঃশেষে শুকায়ে যাবে শেষের তলানি,
দণ্ড দুই মাছিগুলো করে যাবে মিছে কানাকানি !
তারপর উড়ে যাবে দূরে দূরে জীবনের সুরার তল্লাসে,
মৃত এক অলি শুধু পড়ে রবে মাতালের বিছানার পাশে !
পেয়ালা উপুড় করে হয়তো বা রেখে যাবে কোনো একজন,
কোথা গেছে ইয়োসোফ্ জানে না সে, জানে না সে গিয়েছে কখন।
জানে না যে, অজানা সে, আরবার দাবি নিয়ে আসিবে না ফিরে—
জানে না যে চাপা পড়ে গেছে সে যে কবেকার কোথাকার ভিড়ে !
—জানিতে চাহে না কিছু—ঘাড় নিচু ক'রে কে বা রাখে আঁখি বুজে
অতীত স্মৃতির ধ্যানে, অন্ধকার গৃহকোণে একখানা শূন্য পাত্র খুঁজে !
—যৌবনের কোন্ এক নিশীথে সে কবে

তুমি যে আসিয়াছিলে বনরানী। জীবনের বাসন্তী-উৎসবে
তুমি যে ঢালিয়াছিলে ফাগরাগ—আপনার হাতে মোর সুরাপাত্রখানি
তুমি যে ভরিয়াছিলে—জুড়ায়েছে আজ তার ঝাঁঝ, গেছে ফুরায়ে তলানি !
তবু তুমি আসিলে না, বারেকের তরে দেখা দিলে নাকো হায় !
চুপে-চুপে কবে আমি বসুধার বুক থেকে নিয়েছি বিদায়—
তুমি তাহা জানিলে না—চলে গেছে মুসাফের,
কবে ফের দেখা হবে আহা
কে-বা জানে ! কবরের পরে তার পাতা ঝরে,—হাওয়া কাঁদে হা-হা !

কালি-কলম। ফাল্গুন ১৩৩৩

সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরই কথা হয়

চোখ দুটো ঘুমে ভরে
ঝরা ফসলের গান বুকে নিয়ে আজ ফিরে যাই ঘরে !
ফুরায়ে গিয়েছে যা ছিল গোপন—স্বপন ক'দিন রয় !
এসেছে গোধূলি গোলাপীবরন—এ তবু গোধূলি নয় !
সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরই কথা হয়,
আমাদের মুখ সারাটি রাত্রি মাটির বুকের পরে !

কেটেছে যে নিশি ঢের—
এত দিন তবু অন্ধকারের পাই নি তো কোনো টের !
দিনের বেলায় যাদের দেখি নি,—এসেছে তাহারা সাঁঝে ;
যাদের পাই নি পথের ধুলায়—ধোঁয়ায়—ভিড়ের মাঝে,—
শুনেছি স্বপন তাদের কলসী ছলকে, কাঁকন বাজে।
আকাশের নীচে—তারার আলোয় পেয়েছি যে তাহাদের !
চোখদুটো ছিল জেগে

কত দিন যেন সন্ধ্যা-ভোরের নট্‌কান্‌-রাঙা মেঘে।
কত দিন আমি ফিরেছি একেলা মেঘলা গাঁয়ের ক্ষেতে !
ছায়াধূপে চুপে ফিরিয়াছি প্রজাপতিটির মতো মেতে
কত দিন হায় !—কবে অবেলায় এলোমেলো পথে যেতে
ঘোর ভেঙে গেল, খেয়ালের খেলাঘরটি গেল যে ভেঙে !

দুটো চোখ ঘুমে ভরে
ঝরা ফসলের গান বুকে নিয়ে আজ ফিরে যাই ঘরে !
ফুরায়ে গিয়েছে যা ছিল গোপন—স্বপন ক'দিন রয় !
এসেছে গোধূলি গোলাপীবরন,—এ তবু গোধূলি নয় !
সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরই কথা হয়—
আমাদের মুখ সারাটি রাত্রি মাটির বুকের পরে !

মহাপৃথিবী
১৯৪৪

প্রেমেন্দ্র মিত্র
সঞ্জয় ভট্টাচার্য
প্রিয়বরেষু

ভূমিকা

'মহাপৃথিবী'র কবিতাগুলো ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৫-৪৮-এর ভিতর রচিত হয়েছিল। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বেরিয়েছে ১৩৪২ থেকে ১৩৫০-এ। 'বনলতা সেন' ও অন্য কয়েকটি কবিতা বার হয়েছিল 'বনলতা সেন' বইটিতে। বাকি সব কবিতা আজ প্রথম বইয়ের ভিতর স্থান পেল।

শ্রাবণ ১৩৫১ **জীবনানন্দ দাশ**

নিরালোক

একবার নক্ষত্রের দিকে চাই—একবার প্রান্তরের দিকে
আমি অনিমিখে।
ধানের ক্ষেতের গন্ধ মুছে গেছে কবে
জীবনের থেকে যেন ; প্রান্তরের মতন নীরবে
বিচ্ছিন্ন খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে ঘুম পায় তার ;
নক্ষত্রেরা বাতি জ্বেলে—জ্বেলে—জ্বেলে—'নিভে গেলে—নিভে গেলে ?'
বলে তারে জাগায় আবার ;
জাগায় আবার।
বিক্ষত খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে—বুকে নিয়ে ঘুম পায় তার,
ঘুম পায় তার।

অনেক নক্ষত্রে ভরে গেছে সন্ধ্যার আকাশ—এই রাতের আকাশ ;
এইখানে ফাল্গুনের ছায়া মাখা ঘাসে শুয়ে আছি ;
এখন মরণ ভালো,—শরীরে লাগিয়া রবে এই সব ঘাস ;
অনেক নক্ষত্র রবে চিরকাল যেন কাছাকাছি।

কে যেন উঠিল হেঁচে,—হামিদের মরখুটে কানা ঘোড়া বুঝি !
সারা দিন গাড়ি টানা হল ঢের,—ছুটি পেয়ে জ্যোৎস্নায় নিজ মনে খেয়ে যায় ঘাস ;
যেন কোনো ব্যথা নাই পৃথিবীতে,—আমি কেন তবে মৃত্যু খুঁজি ?
'কেন মৃত্যু খোঁজো তুমি ?'—চাপা ঠোঁটে বলে দূর কৌতুকী আকাশ।

ঝাউফলে ঘাস ভরে—এখানে ঝাউয়ের নীচে শুয়ে আছি ঘাসের উপরে ;
কাশ আর চোরকাঁটা ছেড়ে দিয়ে ফড়িং চলিয়া গেছে ঘরে।
সন্ধ্যার নক্ষত্র, তুমি বলো দেখি কোন্ পথে কোন্ ঘরে যাব !
কোথায় উদ্যম নাই, কোথায় আবেগ নাই,—চিন্তা স্বপ্ন ভুলে গিয়ে শান্তি আমি পাব ?

রাতের নক্ষত্র, তুমি বলো দেখি কোন্ পথে যাব ?

‘তোমারই নিজের ঘরে চলে যাও’—বলিল নক্ষত্র চুপে হেসে—
‘অথবা ঘাসের ’পরে শুয়ে থাকো আমার মুখের রূপ ঠায় ভালোবেসে ;
অথবা তাকায়ে দেখো গোরুর গাড়িটি ধীরে চলে যায় অন্ধকারে
সোনালি খড়ের বোঝা বুকে ;
পিছে তার সাপের খোলস, নালা, খলখল অন্ধকার—শান্তি তার রয়েছে সমুখে ;
চলে যায় চুপে-চুপে সোনালি খড়ের বোঝা বুকে—
যদিও মরেছে ঢের গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ,—তবু তার মৃত্যু নাই মুখে।’

সিন্ধুসারস

দু-এক মুহূর্ত শুধু রৌদ্রের সিন্ধুর কোলে তুমি আর আমি
হে সিন্ধুসারস,
মালাবার পাহাড়ের কোল ছেড়ে অতি দূর তরঙ্গের জানালায় নামি
নাচিতেছ টারান্‌টেলা—রহস্যের ; আমি এই সমুদ্রের পারে চুপে থামি
চেয়ে দেখি বরফের মতো শাদা ডানা-দুটি আকাশের গায়
ধবল ফেনার মতো নেচে উঠে পৃথিবীরে আনন্দ জানায়।

মুছে যায় পাহাড়ের শিঙে শিঙে গৃধিনীর অন্ধকার গান,
আবার ফুরায় রাত্রি, হতাশ্বাস ; আবার তোমার গান করিছে নির্মাণ
নতুন সমুদ্র এক, শাদা রৌদ্র, সবুজ ঘাসের মতো প্রাণ
পৃথিবীর ক্লান্ত বুকে ; আবার তোমার গান
শৈলের গহ্বর থেকে অন্ধকার তরঙ্গেরে করিছে আহ্বান।

জানো কি অনেক যুগ চলে গেছে ? মরে গেছে অনেক নৃপতি ?
অনেক সোনার ধান ঝরে গেছে জানো না কি ? অনেক গহন ক্ষতি

আমাদের ক্লান্ত করে দিয়ে গেছে—হারায়েছি আনন্দের গতি ;
ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই বর্তমান
হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের—বেদনার আমরা সন্তান ?

জানি পাখি, শাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান,
তুমি পিছে চাহো নাকো, তোমার অতীত নেই, স্মৃতি নেই,
বুকে নেই আকীর্ণ ধূসর
পাণ্ডুলিপি ; পৃথিবীর পাখিদের মতো নেই শীতরাতে
ব্যথা আর কুয়াশার ঘর।
যে রক্ত ঝরেছে তারে স্বপ্নে বেঁধে কল্পনার নিঃসঙ্গ প্রভাত
নেই তব ; নেই নিম্নভূমি—নেই আনন্দের অন্তরালে
প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত।

স্বপ্ন তুমি দেখ নি তো—পৃথিবীর সব পথ সব সিন্ধু ছেড়ে দিয়ে একা
বিপরীত দ্বীপে দূরে মায়াবীর আরশিতে হয় শুধু দেখা
রূপসীর সাথে এক ; সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মতো রেখা
প্রাণে তার—ম্লান চুল, চোখ তার হিজল বনের মতো কালো ;
একবার স্বপ্নে তারে দেখে ফেলে পৃথিবীর সব স্পষ্ট আলো

নিভে গেছে ; যেখানে সোনার মধু ফুরায়েছে, করে না বুনন
মাছি আর ; হলুদ পাতার গন্ধে ভরে ওঠে অবিচল শালিকের মন
মেঘের দুপুর ভাসে—সোনালি চিলের বুক হয় উন্মন
মেঘের দুপুরে, আহা, ধানসিড়ি নদীটির পাশে ;
সেখানে আকাশে কেউ নেই আর, নেই আর পৃথিবীর ঘাসে।

তুমি সেই নিস্তব্ধতা চেনো নাকো ; অথবা রক্তের পথে
পৃথিবীর ধূলির ভিতরে

জানো নাকো আজও কাঞ্চী বিদিশার মুখশ্রী মাছির মতো ঝরে ;
সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে ;
গভীর নিলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের—ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন
হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রাণ দিনের মতন।

এই সব জানোনাকো প্রবালপঞ্জর ঘিরে ডানার উল্লাসে ;
রৌদ্রে ঝিলমিল করে শাদা ডানা, শাদা ফেনা-শিশুদের পাশে
হেলিওট্রোপের মতো দুপুরের অসীম আকাশে !
ঝিকমিক করে রৌদ্রে বরফের মতো শাদা ডানা,
যদিও এ পৃথিবীর স্বপ্ন চিন্তা সব তার অচেনা অজানা।

চঞ্চল শরের নীড়ে কবে তুমি—জন্ম তুমি নিয়েছিলে কবে,
বিষণ্ন পৃথিবী ছেড়ে দলে দলে নেমেছিলে সবে
আরব সমুদ্রে, আর চীনের সাগরে—দূর ভারতের সিন্ধুর উৎসবে।
শীতার্ত এ পৃথিবীর আমরণ চেষ্টা ক্লান্তি বিহ্বলতা ছিঁড়ে
নেমেছিলে কবে নীল সমুদ্রের নীড়ে।

ধানের রসের গল্প পৃথিবীর—পৃথিবীর নরম অঘ্রান
পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই—আর তার প্রেমিকের ম্লান
নিঃসঙ্গ মুখের রূপ, বিশুষ্ক তৃণের মতো প্রাণ,
জানিবে না, কোনোদিন জানিবে না ; কলরব ক'রে উড়ে যায়
শত স্নিগ্ধ সূর্য ওরা শাশ্বত সূর্যের তীব্রতায়।

ফিরে এসো

ফিরে এসো সমুদ্রের ধারে,
ফিরে এসো প্রান্তরের পথে ;
যেইখানে ট্রেন এসে থামে

আম নিম ঝাউয়ের জগতে
ফিরে এসো ; একদিন নীল ডিম করেছ বুনন ;
আজও তারা শিশিরে নীরব ;
পাখির ঝর্না হয়ে কবে
আমারে করিবে অনুভব।

শ্রাবণরাত

শ্রাবণের গভীর অন্ধকার রাতে
ধীরে ধীরে ঘুম ভেঙে যায়
কোথায় দূরে বঙ্গোপসাগরের শব্দ শুনে ?

বর্ষণ অনেকক্ষণ হয় থেমে গেছে
যত দূর চোখ যায় কালো আকাশ
মাটির শেষ তরঙ্গকে কোলে করে চুপ করে রয়েছে যেন ;
নিস্তব্ধ হয়ে দূর উপসাগরের ধ্বনি শুনছে।

মনে হয়
কারা যেন বড়ো বড়ো কপাট খুলছে,
বন্ধ করে ফেলছে আবার ;
কোন্ দূর—নীরব—আকাশরেখার সীমানায়।

বালিশে মাথা রেখে যারা ঘুমিয়ে আছে
তারা ঘুমিয়ে থাকে ;
কাল ভোরে জাগবার জন্য।
যে সব ধূসর হাসি, গল্প, প্রেম, মুখরেখা
পৃথিবীর পাথরে কঙ্কালে অন্ধকারে মিশেছিল

ধীরে ধীরে জেগে ওঠে তারা ;
পৃথিবীর অবিচলিত পঞ্জর থেকে খসিয়ে আমাকে খুঁজে বার করে।

সমস্ত বঙ্গসাগরের উচ্ছ্বাস থেমে যায় যেন ;
মাইলের পর মাইল মৃত্তিকা নীরব হয়ে থাকে।
কে যেন বলে :
আমি যদি সেই সব কপাট স্পর্শ করতে পারতাম
তা হলে এই রকম গভীর নিস্তব্ধ রাতে স্পর্শ করতাম গিয়ে।—
আমার কাঁধের উপর ঝাপসা হাত রেখে ধীরে ধীরে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে।

চোখ তুলে আমি
দুই স্তর অন্ধকারের ভিতর ধূসর মেঘের মতো প্রবেশ করলাম :
সেই মুখের ভিতর প্রবেশ করলাম।

মুহূর্ত

আকাশে জ্যোৎস্না—বনের পথে চিতাবাঘের গায়ের ঘ্রাণ ;
হৃদয় আমার হরিণ যেন :
রাত্রির এই নীরবতার ভিতর কোন্ দিকে চলেছি !
রুপালি পাতার ছায়া আমার শরীরে,
কোথাও কোনো হরিণ নেই আর ;
যত দূর যাই কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
শেষ সোনালি হরিণ-শস্য কেটে নিয়েছে যেন ;
তারপর ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে
শত শত মৃগীদের চোখের ঘুমের অন্ধকারের ভিতর।

শহর

হৃদয়, অনেক বড়ো বড়ো শহর দেখেছ তুমি ;
সেই সব শহরের ইটপাথর,
কথা, কাজ, আশা, নিরাশার ভয়াবহ হৃত চক্ষু
আমার মনের বিস্বাদের ভিতর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।
কিন্তু তবুও শহরের বিপুল মেঘের কিনারে সূর্য উঠতে দেখেছি ;
বন্দরের নদীর ওপারে সূর্যকে দেখেছি।
মেঘের কমলারঙের ক্ষেতের ভিতর প্রণয়ী চাষার মতো
বোঝা রয়েছে তার ;
শহরের গ্যাসের আলো ও উঁচু-উঁচু মিনারের ওপরেও
দেখেছি—নক্ষত্রেরা—
অজস্র বুনো হাঁসের মতো কোন্ দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে উড়ে চলেছে।

শব

যেখানে রুপালি জ্যোৎস্না ভিজিতেছে শরের ভিতর,
যেখানে অনেক মশা বানায়েছে তাহাদের ঘর ;
সেখানে সোনালি মাছ খুঁটে খুঁটে খায়
সেই সব নীল মশা মৌন আকাঙ্ক্ষায় ;
নির্জন মাছের রঙে যেইখানে হয়ে আছে চুপ
পৃথিবীর একপাশে একাকী নদীর গাঢ় রূপ ;
কান্তারের একপাশে যে নদীর জল
বাবলা হোগলা কাশে শুয়ে শুয়ে দেখিছে কেবল
বিকেলের লাল মেঘ ; নক্ষত্রের রাতের আঁধারে
বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে
পৃথিবীর অন্য নদী ; কিন্তু এই নদী
রাঙা মেঘ—হলুদ-হলুদ জ্যোৎস্না ; চেয়ে দেখ যদি ;

অন্য সব আলো আর অন্ধকার এখানে ফুরালো ;
লাল নীল মাছ মেঘ—ম্লান নীল জ্যোৎস্নার আলো
এইখানে ; এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব
ভাসিতেছে চিরদিন : নীল লাল রুপালি নীরব।

স্বপ্ন

পাণ্ডুলিপি কাছে রেখে ধূসর দীপের কাছে আমি
নিস্তব্ধ ছিলাম ব'সে ;
শিশির পড়িতেছিল ধীরে-ধীরে খ'সে ;
নিমের শাখার থেকে একাকীতম কে পাখি নামি

উড়ে গেল কুয়াশায়,—কুয়াশার থেকে দূর কুয়াশায় আরো।
তাহারই পাখার হাওয়া প্রদীপ নিভায়ে গেল বুঝি ?
অন্ধকার হাতড়ায়ে ধীরে-ধীরে দেশলাই খুঁজি ;
যখন জ্বালিব আলো কার মুখ দেখা যাবে বলিতে কি পারো ?

কার মুখ ?—আমলকী শাখার পিছনে
শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ একদিন দেখেছিল তাহা ;
এ ধূসর পাণ্ডুলিপি একদিন দেখেছিল, আহা,
সে মুখ ধূসরতম আজ এই পৃথিবীর মনে।
তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে,
পৃথিবীর সব গল্প একদিন ফুরাবে যখন,
মানুষ রবে না আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন :
সেই মুখ আর আমি র'ব সেই স্বপ্নের ভিতরে।

বলিল অশ্বত্থ সেই

বলিল অশ্বত্থ ধীরে : 'কোন্ দিকে যাবে বলো—
তোমরা কোথায় যেতে চাও ?
এত দিন পাশাপাশি ছিলে, আহা, ছিলে কত কাছে :
ম্লান খোড়ো ঘরগুলো—আজও তো দাঁড়ায়ে তারা আছে ;
এই সব গৃহ মাঠ ছেড়ে দিয়ে কোন্ দিকে কোন পথে ফের
তোমরা যেতেছ চলে পাই নাকো টের !
বোঁচকা বেঁধেছ ঢের,—ভোলো নাই ভাঙা বাটি ফুটা ঘটিটাও ;
আবার কোথায় যেতে চাও ?

'পঞ্চাশ বছরও হায় হয় নিকো—এই তো সেদিন
তোমাদের পিতামহ, বাবা, খুড়ো, জেঠামহাশয়
—আজও, আহা, তাহাদের কথা মনে হয় !—
এখানে মাঠের পারে জমি কিনে খোড়ো ঘর তুলে
এই দেশে এই পথে এই সব ঘাস ধান নিম জামরুলে
জীবনের ক্লান্তি ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষার বেদনায় শুধেছিল ঋণ ;
দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে সব দেখেছি যে—মনে হয় যেন সেই দিন !

এখানে তোমরা তবু থাকিবে না ? যাবে চলে তবে কোন্ পথে ?
সেই পথে আরো শান্তি—আরো বুঝি সাধ ?
আরো বুঝি জীবনের গভীর আস্বাদ ?
তোমরা সেখানে গিয়ে তাই বুঝি বেঁধে রবে আকাঙ্ক্ষার ঘর !...
যেখানেই যাও চলে, হয় নাকো জীবনের কোনো রূপান্তর ;
এক ক্ষুধা এক স্বপ্ন এক ব্যথা বিচ্ছেদের কাহিনী ধূসর
ম্লান চুলে দেখা দেবে যেখানেই বাঁধো গিয়ে আকাঙ্ক্ষার ঘর !'
—বলিল অশ্বত্থ সেই ন'ড়ে ন'ড়ে অন্ধকারে মাথার উপর।

আট বছর আগের একদিন

শোনা গেল লাশকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে ;
কাল রাতে—ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হল তার সাধ।

বধূ শুয়ে ছিল পাশে—শিশুটিও ছিল ;
প্রেম ছিল, আশা ছিল—জ্যোৎস্নায়—তবু সে দেখিল
কোন্ ভূত ? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার ?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।

এই ঘুম চেয়েছিল বুঝি !
রক্তফেনা মাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার ;
কোনোদিন জাগিবে না আর।

'কোনোদিন জাগিবে না আর
জাগিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম—অবিরাম ভার
সহিবে না আর—'
এই কথা বলেছিল তারে
চাঁদ ডুবে চলে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে।

তবুও তো পেঁচা জাগে ;
গলিত স্থবির ব্যাঙ আরো দুই-মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারি দিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা ;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে।

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি ;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি।

ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন—যেন কোন্ বিকীর্ণ জীবন
অধিকার করে আছে ইহাদের মন ;
দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ
মরণের সাথে লড়িয়াছে ;
চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
একগাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা একা ;
যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয়নাকো দেখা
এই জেনে।

অশ্বত্থের শাখা
করেনি কি প্রতিবাদ ? জোনাকির ভিড় এসে
সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে
করে নি কি মাখামাখি ?
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা এসে
বলে নি কি : ‘বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনো জলে ভেসে ?
চমৎকার !—

ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার।'
জানায় নি পেঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার ?

জীবনের এই স্বাদ—সুপক্ব যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের—
তোমার অসহ্য বোধ হল ;
মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো
মর্গে—গুমোটে
থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে !

শোনো
তবু এ মৃতের গল্প ;—কোনো
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই ;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখে নি কোনো খাদ,
সময়ের উদ্বর্তনে উঠে এসে বধূ
মধু—আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে ;
হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই ;
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি ;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়

আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;
লাশকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই ;
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে এসে,
চোখ পালটায়ে কয় : 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনো জলে ভেসে ?
চমৎকার !
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার—'

হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজও চমৎকার ?
আমিও তোমার মতো বুড়ো হব—বুড়ি চাঁদটারে আমি
করে দেব কালীদহে বেনো জলে পার ;
আমরা দুজনে মিলে শূন্য করে চলে যাব জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।

শীত রাত

এই সব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে ;
বাইরে হয়তো শিশির ঝরছে, কিংবা পাতা,
কিংবা পেঁচার গান ; সেও শিশিরের মতো, হলুদ পাতার মতো।

শহর ও গ্রামের দূর মোহানায় সিংহের হুংকার শোনা যাচ্ছে—
সার্কাসের ব্যথিত সিংহের।

এদিকে কোকিল ডাকছে—পউষের মধ্য রাতে ;
কোনো একদিন বসন্ত আসবে ব'লে—?
কোনো একদিন বসন্ত ছিল, তারই পিপাসিত প্রচার ?
তুমি স্থবির কোকিল নও ? কত কোকিলকে স্থবির হয়ে যেতে দেখেছি,
তারা কিশোর নয়,
কিশোরী নয় আর ;
কোকিলের গান ব্যবহৃত হয়ে গেছে।
সিংহ হুংকার করে উঠছে ;
সার্কাসের ব্যথিত সিংহ,
স্থবির সিংহ এক—আফিমের সিংহ—অন্ধ—অন্ধকার।

চারদিককার আবছায়া-সমুদ্রের ভিতর জীবনকে স্মরণ করতে গিয়ে
মৃত মাছের পুচ্ছের শৈবালে, অন্ধকার জলে, কুয়াশার পঞ্জরে হারিয়ে যায় সব।
সিংহ অরণ্যকে পাবে না আর
পাবে না আর
পাবে না আর।
কোকিলের গান
বিবর্ণ এঞ্জিনের মতো খ'সে-খ'সে
চুম্বক পাহাড়ে নিস্তব্ধ।
হে পৃথিবী,
হে বিপাশামদির নাগপাশ,—তুমি
পাশ ফিরে শোও,
কোনোদিন কিছু খুঁজে পাবে না আর।

আদিম দেবতারা

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের সর্পিল পরিহাসে
তোমাকে দিল রূপ—
কী ভয়াবহ নির্জন রূপ তোমাকে দিল তারা ;
তোমার সংস্পর্শের মানুষদের রক্তে দিল মাছির মতো কামনা।

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের বঙ্কিম পরিহাসে
আমাকে দিল লিপি রচনা করবার আবেগ :
যেন আমিও আগুন বাতাস জল ;
যেন তোমাকেও সৃষ্টি করছি।

তোমার মুখের রূপ যেন রক্ত নয়, মাংস নয়, কামনা নয়,
নিশীথ দেবদারু দ্বীপ ;
কোনো দূর নির্জন নীলাভ দ্বীপ ;

স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে তবু
তুমি মাটির পৃথিবীতে হারিয়ে যাচ্ছ ;
আমি হারিয়ে যাচ্ছি সুদূর দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়ার ভিতর ;
আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের বঙ্কিম পরিহাসে
রূপের বীজ ছড়িয়ে চলে পৃথিবীতে,
ছড়িয়ে চলে স্বপ্নের বীজ।
অবাক হয়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি ?
রূপ কেন নির্জন দেবদারু দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনে না—
পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ ?
স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে

ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—
আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা হো হো করে হেসে উঠল :
‘ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে শুয়ারের মাংস হয়ে যায় ?’

হো হো করে হেসে উঠলাম আমি !—
চারদিককার অট্টহাসির ভিতর একটা বিরাট তিমির মৃতদেহ নিয়ে
অন্ধকার সমুদ্র স্ফীত হয়ে উঠল যেন :
পৃথিবীর সমস্ত রূপ অমেয় তিমির মৃতদেহের দুর্গন্ধের মতো,
যেখানেই যাই আমি সেইসব সমুদ্রের উল্কায়-উল্কায়
কেমন স্বাভাবিক, কী স্বাভাবিক !

স্থবির-যৌবন

তারপর একদিন উজ্জ্বল মৃত্যুর দূত এসে
কহিবে : তোমারে চাই—তোমারেই, নারী ;
এই সব সোনা রুপা মসলিন যুবাদের ছাড়ি
চলে যেতে হবে দূর আবিষ্কারে ভেসে।

বলিলাম ;—শুনিল সে : ‘তুমি তবু মৃত্যুর দূত নও—তুমি—’
‘নগর—বন্দর ঢের খুঁজিয়াছি আমি ;
তারপর তোমার এ জানালায় থামি
ধোঁয়া সব ;—তুমি যেন মরীচিকা—আমি মরুভূমি—’

শীতের বাতাস নাকে চলে গেল জানালার দিকে,
পড়িল আধেক শাল বুক থেকে খ’সে ;
সুন্দর জন্তুর মতো তার দেহকোষে
রক্ত শুধু ? দেহ শুধু ? শুধু হরিণীকে

বাঘের বিক্ষোভ নিয়ে নদীর কিনারে—নিম্নে—রাতে ?
তবে তুমি ফিরে যাও ধোঁয়ায় আবার ;
উজ্জ্বল মৃত্যুর দূত বিবর্ণ এবার—
বরং নারীকে ছেড়ে কঙ্কালের হাতে

তোমারে তুলিয়া লবে কুয়াশা-ঘোড়ায়।
তুমি এই পৃথিবীর অনাদি স্থবির ;—
সোনালি মাছের মতো তবু করে ভিড়
নীল শৈবালের নীচে জলের মায়ায়

প্রেম—স্বপ্ন—পৃথিবীর স্বপ্ন, প্রেম তোমার হৃদয়ে।
হে স্থবির, কী চাও বলো তো—
শাদা ডানা কোনো-এক সারসের মতো ?
হয়তো সে মাংস নয়—এই নারী ; তবু মৃত্যু পড়ে নাই আজও তার মোহে।

তাহার ধূসর ঘোড়া চরিতেছে নদীর কিনারে
কোনো-এক বিকেলের জাফরান দেশে।
কোকিল কুকুর জ্যোৎস্না ধুলো হয়ে গেছে কত ভেসে।
মরণের হাত ধ'রে স্বপ্ন ছাড়া কে বাঁচিতে পারে ?

আজকের এক মুহূর্ত

হে মৃত্যু,
তুমি আমাকে ছেড়ে চলছ বলে আমি খুব গভীর খুশি ?
কিন্তু আরো খানিকটা চেয়েছিলাম ;
চারি দিকে তুমি হাড়ের পাহাড় বানিয়ে রেখেছ ;—

যে ঘোড়ায় চ'ড়ে আমি
অতীত ঋষিদের সঙ্গে আকাশে নক্ষত্রে উড়ে যাব
এইখানে মৃতবৎসা, মাতাল, ভিখারি ও কুকুরদের ভিড়ে
কোথায় তাকে রেখে দিলে তুমি ?

এতদিন বসে পুরোনো বীজগণিতের শেষ পাতা শেষ করতে-না-করতেই
সমস্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেল ;
কোন্-এক গভীর নতুন বীজগণিত যেন
পরিহাসের চোখ নিয়ে অপেক্ষা করছে ;—
আবার মিথ্যা প্রমাণিত হবে বলে ?
সে-ই শেষ সত্য বলে ?
জীবন : ভারতের, চীনের, আফ্রিকার নদীপাহাড়ে বিচরণের মূঢ়
আনন্দ নয় আর
বরং নির্ভীক বীরদের রচিত পৃথিবীর ছিদ্রে ছিদ্রে
ইস্ক্রুপের মতো আটকে থাকবার শৌর্য ও আমোদ :
তারপর চুম্বক পাহাড়ে গিয়ে নিস্তব্ধ হবার মতো আস্বাদ ?

জীবন : নির্ভীক নারীদের সৌন্দর্যের আঘাতে
নিগ্রো সংগীতের বেদনার ধুলোরাশি ?
কিন্তু এ বেদনা আত্মিক, তাই ঝাপসা ;—একাকী : তাই কিছু নয় ;—
কিন্তু তিলে তিলে আটকে থাকবার বেদনা :
পৃথিবীর সমস্ত কুকুর ফুটপাথে বোধ করছে আজ।

যেন এতদিনের বীজগণিত কিছু নয়,
যেন নতুন বীজগণিত নিয়ে এসেছে আকাশ !

বাংলার পাড়াগাঁয়ে শীতের জ্যোৎস্নায় আমি কতবার দেখলাম

কত বালিকাকে নিয়ে গেল বাঘ—জঙ্গলের অন্ধকারে ;
কতবার হটেনটট-জুলু দম্পতির প্রেমের কথাবার্তার ভিতর
আফ্রিকার সিংহকে লাফিয়ে পড়তে দেখলাম ;

কিন্তু সেই সব মূঢ়তার দিন নেই আর সিংহদের ;
নীলিমার থেকে সমুদ্রের থেকে উঠে এসে
পরিস্ফুট রোদের ভিতর
উজ্জ্বল দেহ অদৃশ্য রাখে তারা ;
শাদা, হলদে, লাল, কালো মানুষদের
আর কোনো শেষ বক্তব্য আছে কি না জিজ্ঞাসা করে।

যে ঘোড়ায় চ'ড়ে আমরা অতীত ঋষিদের সঙ্গে আকাশে নক্ষত্রে উড়ে যাব
সেই সব শাদা শাদা ঘোড়ার ভিড়
যেন কোন্ জ্যোৎস্নার নদীকে ঘিরে
নিস্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে কোথাও ;

আমার হৃদয়ের ভিতর
সেই সুপক্ব রাত্রির গন্ধ পাই আমি।

ফুটপাথে

অনেক রাত হয়েছে—অনেক গভীর রাত হয়েছে ;
কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—
কয়েকটি আদিম সর্পিণী সহোদরার মতো এই-যে ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে
পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্তে এদের বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ অনুভব করে হাঁটছি আমি।
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে—কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস ;
কোন্ দূর সবুজ ঘাসের দেশ নদী জোনাকির কথা মনে পড়ে আমার—

তারা কোথায় ?
তারা কি হারিয়ে গেছে ?
পায়ের তলে লিকলিকে ট্রামের লাইন—মাথার ওপরে
অসংখ্য জটিল তারের জাল
শাসন করছে আমাকে।
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস ;
এই ঠাণ্ডা বাতাসের মুখে এই কলকাতার শহরে এই গভীর রাতে
কোনো নীল শিরার বাসাকে কাঁপতে দেখবে না তুমি ;
জলপাইয়ের পল্লবে ঘুম ভেঙে গেল বলে কোনো ঘুঘু তার
কোমল নীলাভ ভাঙা ঘুমের আস্বাদ তোমাকে জানাতে আসবে না।
হলুদ পেঁপের পাতাকে একটা আচমকা পাখি বলে ভুল হবে না তোমার,
সৃষ্টিকে গহন কুয়াশা বলে বুঝতে পেরে চোখ নিবিড় হয়ে উঠবে না তোমার !
পেঁচা তার ধূসর পাখা আমলকীর ডালে ঘষবে না এখানে,
আমলকীর শাখা থেকে নীল শিশির ঝরে পড়বে না,
তার সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকির মতো খসিয়ে আনবে না এখানে,
রাত্রিকে নীলাভতম করে তুলবে না !
সবুজ ঘাসের ভিতর অসংখ্য দেয়ালি পোকা মরে রয়েছে
দেখতে পাবে না তুমি এখানে,
পৃথিবীকে মৃত সবুজ সুন্দর কোমল একটি দেয়ালি পোকার মতো
মনে হবে না তোমার,
জীবনকে মৃত সবুজ সুন্দর শীতল একটি দেয়ালি পোকার মতো
মনে হবে না ;
পেঁচার সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকির মতো খসিয়ে আনবে না এখানে,
শিশিরে সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকির মতো খসিয়ে আনবে না,
সৃষ্টিকে গহন কুয়াশা বলে বুঝতে পেরে চোখ
নিবিড় হয়ে উঠবে না তোমার।

প্রার্থনা

আমাদের প্রভু বীক্ষণ দাও : মরি নাকি মোরা মহাপৃথিবীর তরে ?
পিরামিড যারা গড়েছিল একদিন—আর যারা ভাঙে-গড়ে ;—
মশাল যাহারা জ্বালায় যেমন জেঙ্গিস যদি হালে
দাঁড়ায় মদির ছায়ার মতন—যত অগণন মগজের কাঁচা মালে ;
যে সব ভ্রমণ শুরু হল শুধু মার্কোপোলোর কালে ;
আকাশের দিকে তাকায়ে মোরাও বুঝেছি যে সব জ্যোতি
দেশলাইকাঠি নয় শুধু আর—কালপুরুষের গতি ;
ডিনামাইট দিয়ে পর্বত কাটা না-হলে কী করে চলে—
আমাদের প্রভু বিরতি দিয়ো না ; লাখো লাখো যুগ রতিবিহারের ঘরে
মনোবীজ দাও : পিরামিড গড়ে—পিরামিড ভাঙে গড়ে।

ইহাদেরই কানে

একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে
অনেক কবিতা লিখে চলে গেল যুবকের দল ;
পৃথিবীর পথে পথে সুন্দরীরা মূর্খ সসম্মানে
শুনিল আধেক কথা ;—এই সব বধির নিশ্চল
সোনার পিত্তল মূর্তি : তবু, আহা, ইহাদেরই কানে
অনেক ঐশ্বর্য ঢেলে চলে গেল যুবকের দল ;
একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে।

সূর্যসাগরতীরে

সূর্যের আলো মেটায় খোরাক কার :

সেই কথা বোঝা ভার।
অনাদি যুগের অ্যামিবার থেকে আজিকে ওদের প্রাণ
গড়িয়া উঠিল কাফ্রির মতো সূর্যসাগরতীরে
কালো চামড়ার রহস্যময় ঠাসবুনুনিটি ঘিরে।

চারি দিকে স্থির-ধূম্র-নিবিড় পিরামিড যদি থাকে—
অনাদি যুগের অ্যামিবার থেকে আজিকে মানবপ্রাণ
সূর্যতাড়সে ভ্রূণকে যদিও করে ঢের ফলবান—
তবুও আমরা জননী বলিব কাকে ?
গড়িয়া উঠিল মানবের দল সূর্যসাগরতীরে
কালো আত্মার রহস্যময় ভুলের বুনুনি ঘিরে।

মনোবীজ

জামিরের ঘন বন অইখানে রচেছিল কারা ?
এইখানে লাগে নাই মানুষের হাত।
দিনের বেলায় যেই সমারূঢ় চিন্তার আঘাত
ইস্পাতের আশা গড়ে—সেই সব সমুজ্জ্বল বিবরণ ছাড়া

যেন আর নেই কিছু পৃথিবীতে : এই কথা ভেবে
যাহারা রয়েছে ঘুমে তুলোর বালিশে মাথা গুঁজে—
তাহারা মৃত্যুর পর জামিরের বনে জ্যোৎস্না পাবেনাকো খুঁজে ;
বধির ইস্পাত-খড়্গ তাহাদের কোলে তুলে নেবে।
সেই মুখ এখনও দিনের আলো নিয়ে করিতেছে খেলা :
যেন কোনো অসংগতি নেই—সব হালভাঙা জাহাজের মতো সমন্বয়
সাগরে অনেক রৌদ্র আছে ব'লে ;—পরিব্যস্ত বন্দরের মতো মনে হয়
যেন এই পৃথিবীকে ;—যেখানে অঙ্কুশ নেই তাকে অবহেলা
কবিরে সে আজও জানি ;—দিনশেষে বাদুড়ের-মতন-সঞ্চারে

তারে আমি পাব নাকো ;—এই রাতে পেয়ারার ছায়ার ভিতরে
তারে নয়—স্নিগ্ধ সব ধানগন্ধী পেঁচাদের প্রেম মনে পড়ে।
মৃত্যু এক শান্ত ক্ষেত—সেইখানে পাব নাকো তারে।
...
পৃথিবীর অলিগলি বেয়ে আমি কতদিন চলিলাম।
     ঘুমালাম অন্ধকারে যখন বালিশে :
নোনা ধরে নাকো যেই দেয়ালের
     ধূসর পালিশে
চন্দ্রমল্লিকার বন দেখিলাম
     রহিয়াছে জ্যোৎস্নায় মিশে।

যেই সব বালিহাঁস মরে গেছে পৃথিবীতে
     শিকারির গুলির আঘাতে :
বিবর্ণ গম্বুজে এসে জড়ো হয়
     আকাশের চেয়ে বড়ো রাতে ;
প্রেমের খাবার নিয়ে ডাকিলাম তারে আমি
     তবুও সে নামিল না হাতে।

পৃথিবীর বেদনার মতো ম্লান দাঁড়ালাম :
     হাতে মৃত সূর্যের শিখা ;
প্রেমের খাবার হাতে ডাকিলাম ;
     অঘ্রানের মাঠের মৃত্তিকা
হয়ে গেল ;
নাই জ্যোৎস্না—নাইকো মল্লিকা।
...
সেইসব পাখি আর ফুল :
পৃথিবীর সেইসব মধ্যস্থতা

আমার ও সৌন্দর্যের শরীরের সাথে
মমির মতনও আজ কোনোদিকে নেই আর ;
সেই সব শীর্ণ দীর্ঘ মোমবাতি ফুরায়েছে
আছে শুধু চিন্তার আভার ব্যবহার।
সন্ধ্যা না-আসিতে তাই
হৃদয় প্রবেশ করে প্যাগোডার ছায়ার ভিতরে
অনেক ধূসর বই নিয়ে।
চেয়ে দেখি কোনো এক আননের গভীর উদয় ;
সে আনন পৃথিবীর নয়।
দু চোখ নিমীল তার কিসের সন্ধানে ?
'সোনা—নারী—তিসি—আর ধানে'—
বলিল সে : 'কেবল মাটির জন্ম হয়।'
বলিলাম : 'তুমিও তো পৃথিবীর নারী,
কেমন কুৎসিত যেন,—প্যাগোডার অন্ধকার ছাড়ি
শাদা মেঘ-খরশান বাহিরে নদীর পারে দাঁড়াবে কি ?'

'শানিত নির্জন নদী'—বলিল সে—'তোমারই হৃদয়,
যদিও তা পৃথিবীর নারী—নদী নয় :
তোমারই চোখের স্বাদে ফুল আর পাতা
জাগে না কি ? তোমারই পায়ের নীচে মাথা
রাখে না কি ? বিশুষ্ক—ধূসর—
ক্রমে ক্রমে মৃত্তিকার কৃমিদের স্তর
যেন তারা ;—অপ্সরা—উর্বশী
তোমার আকৃষ্ট মেঘে ছিল না কি বসি ?
ডাইনির মাংসের মতন
আজ তার জঙ্ঘা আর স্তন ;
বাদুড়ের খাদ্যের মতন

একদিন হয়ে যাবে ;
যে সব মছিরা কালো মাংস খায়—তারে ছিঁড়ে খাবে।'

কান্তারের পথে যেন সৌন্দর্যের ভূতের মতন
তাহারে চকিত আমি করিলাম ;—রোমাঞ্চিত হয়ে তার মন
বলে গেল : 'তক্ষিত সৌন্দর্য সব পৃথিবীর
উপনীত জাহাজের মাস্তুলের সুদীর্ঘ শরীর
নিয়ে আসে একদিন, হে হৃদয়—একদিন
দার্শনিকও হিম হয়—প্রণয়ের সম্রাজ্ঞীরা হবে না মলিন ?'
কল্পনার অবিনাশ মহনীয় উদ্‌গীরণ থেকে
আসিল সে হৃদয়ের। হাতে হাত রেখে
বলিল সে। মনে হল পাণ্ডুলিপি মোমের পিছনে
রয়েছে সে। একদিন সমুদ্রের কালো আলোড়নে
উপনিষদেরও শাদা পাতাগুলো ক্রমে ডুবে যাবে ;
ল্যাম্পের আলো হাতে সেদিন দাঁড়াবে
অনেক মেধাবী মুখ স্বপনের বন্দরের তীরে,
যদিও পৃথিবী আজ সৌন্দর্যেরে ফেলিতেছে ছিঁড়ে।
...
প্রেম কি জাগায় সূর্যকে আজ ভোরে ?
হয়তো জ্বালায়ে গিয়েছে অনেক—অনেক বিগত কাল।
বায়ুর ঘোড়ার খুরে যে পরায় অগ্নির মতো নাল
জানে না সে কিছু—তবু তারে জেনে সূর্য আজিকে জ্বলে।
চীনের প্রাচীর ভেঙে যেতে যেতে—
চীনের প্রাচীর বলে :
অনেক নবীন সূর্য দেখেছি রাতকানা যেন নীল আকাশের তলে ;
পুরোনো শিশির আচার পাকায় আলাপী জিভের তরে
যা-কিছু নিভৃত—ধূসর—মেধাবী—তাহারে রক্ষা করে ;

পাথরের চেয়ে প্রাচীন ইচ্ছা মানুষের মনে গড়ে।
অথবা চীনের প্রাচীরের ভুল—চেনেনি নিজের হাল ;
কিংবা জ্বালায়ে গিয়েছে হয়তো অনেক বিগত কাল ;
অগ্নিঘোড়ার খুরে যে পরায় জলের মতন নাল
জানে না সে কিছু...তবু তারে জেনে সূর্য আজিকে জ্বলে—
ববিনে জড়ানো মিশরের মমি কালো বিড়ালকে বলে।

পরিচায়ক

মাঝে মাঝে মনে হয় এ জীবন হংসীর মতন—
হয়তো বা কোনো-এক কৃপণের ঘরে ;
প্রভাতে সোনার ডিম রেখে যায় খড়ের ভিতরে ;
পরিচিত বিস্ময়ের অনুভবে ক্রমে ক্রমে দৃঢ় হয় গৃহস্থের মন।
তাই সে হংসীরে আর চায়নাকো দুপুরে নদীর ঢালু জলে
নিজেকে বিম্বিত করে ; ক্রমে দূরে—দূরে
হয়তো বা মিশে যাবে অশিষ্ট মুকুরে :
ছবির বইয়ের দেশে চিরকাল—ক্রূর মায়াবীর জাদুবলে।

তবুও হংসীই আভা—হয়তো বা পতঞ্জলি জানে।
সোনায় নিটোল করা ডিম তার বিমর্ষ প্রসব।
দুপুরে সূর্যের পানে বজ্রের মতন কলরব
কণ্ঠে তুলে ভেসে যায় অমেয় জলের অভিযানে।
কেয়াফুলস্নিগ্ধ হাওয়া স্থির তুলাদণ্ড প্রদক্ষিণ
করে যায় ; লোকসমাগমহীন, হিম কান্তারের পার
করে নাকো ভীতি আর মরণের অর্থ প্রত্যাহার :
তবুও হংসীর পাখা তুষারের কোলাহলে আঁধারে উড্ডীন।
...
তবুও হংসীর প্রিয় অলোকসামান্য সুর, শূন্যতার থেকে আমি ফেঁসে

এইখানে প্রান্তরের অন্ধকারে দাঁড়ায়েছি এসে ;
মধ্যনিশীথের এই আসন্ন তারকাদের সঙ্গ ভালোবেসে।

মরখুটে ঘোড়া ওই ঘাস খায়, ঘাড়ে তার ঘারের উপরে
বিনবিনে ডাঁশগুলো শিশিরের মতো শব্দ করে।
এই স্থান,হ্রদ, আর বরফের মতো শাদা ঘোড়াদের তরে
ছিল তবু একদিন ? রবে তবু একদিন ? হে কালপুরুষ,
ধ্রুব, স্বাতী, শতভিষা,
উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহের মতো যারা তাহাদের দিশা
স্থির করে কর্ণধার ?—ভূতকে নিরস্ত করে প্রশান্ত সরিষা।

ভূপৃষ্ঠের অই দিকে—জানি আমি—আবার নতুন বেবিলন
উঠেছে অনেক দূর—শোনা যায় কর্নিশে সিংহের গর্জন।
হয়তো বা ধুলোসাৎ হয়ে গেছে এত রাতে ময়ূরবাহন।

এক দিকে বিকলাঙ্গ নদীটির থেকে পাঁচ-সাত ধনু দূরে
মানুষ এখনও নীল, আদিম সাপুড়ে :
রক্ত আর মৃত্যু ছাড়া কিছু পায়
নাকো তারা খনিজ, অমূল্য মাটি খুঁড়ে।

এই সব শেষ হয়ে যাবে তবু একদিন ; হয়তো বা ক্রান্ত ইতিহাস
শাণিত সাপের মতো অন্ধকারে নিজেকে করেছে প্রায় গ্রাস।
ক্রমে এক নিস্তব্ধতা : নীলাভ ঘাসের ফুলে সৃষ্টির বিন্যাস

আমাদের হৃদয়কে ক্রমেই নীরব হতে বলে।
সে টেবিল শেষরাতে দোভাষীর—মাঝরাতে রাষ্ট্রভাষাভাষীর দখলে
সেই সব বহুভাষা শিখে তবু তারকার সন্তপ্ত অনলে

হাতের আয়ুর রেখা আমাদের জ্বলে আজও ভৌতিক মুখের মতন ;
মাথার সকল চুল হয়ে যায় ধূসর—ধূসরতম শণ ;
লোষ্ট্র, আমি, জীব আর নক্ষত্রের অনাদি বিবর্ণ বিবরণ

বিদূষক বামনের মতো হেসে একবার চায় শুধু হৃদয় জুড়াতে।
ফুরফুরে আগুনের থান তবু কাঁচিছাঁটা জামার মতন মুক্ত হাতে
তাহার নগ্নতা ঘিরে জ্বলে যায়—সে কোথাও পারে না দাঁড়াতে।
...
নীলিমাকে যতদূর শান্ত নির্মল মনে হয়
হয়তো বা সে রকম নেই তার মহানুভবতা।
মানুষ বিশেষ কিছু চায় এই পৃথিবীতে এসে
অতীব গরিমাভরে বলে যায় কথা ;

যেন কোনো ইন্দ্রধনু পেয়ে গেলে খুশি হত মন।
পৃথিবীর ছোটো-বড়ো দিনের ভিতর দিয়ে অবিরাম চলে
অনেক মুহূর্ত আমি এ রকম মনোভাব করেছি পোষণ।

দেখেছি সেসব দিনে নরকের আগুনের মতো অহরহ রক্তপাত ;
সে আগুন নিভে গেলে সেরকম মহৎ আঁধার,
সে আঁধারে দুহিতারা গেয়ে যায় নীলিমার গান ;
উঠে আসে প্রভাতের গোধূলির রক্তচ্ছটা-রঞ্জিত ভাঁড়।

সে আলোকে অরণ্যের সিংহকে ফিকে মরুভূমি মনে হয় ;
মধ্যসমুদ্রের রোল—মনে হয়—দয়াপরবশ ;
এরাও মহৎ—তবু মানুষের মহাপ্রতিভার মতো নয়।

আজ এই শতাব্দীতে পুনরায় সেইসব ভাস্বর আগুন
কাজ করে যায় যদি মানুষ ও মনীষী ও বৈহাসিক নিয়ে—
সময়ের ইশারায় অগণন ছায়া-সৈনিকেরা
আগুনের দেয়ালকে প্রতিষ্ঠিত করে যদি উনুনের অতলে দাঁড়িয়ে,

দেয়ালের ’পরে যদি বানর, শেয়াল, শনি, শকুনের ছায়ার জীবন
জীবনকে টিটকারি দিয়ে যায় আগুনের রঙ আরো বিভাসিত হলে—
গর্ভাঙ্কে ও অঙ্কে কান কেটে কেটে নাটকের হয় তবু শ্রুতিবিশোধন।

বিভিন্ন কোরাস

এক

আমাদের হৃদয়ের নদীর উপর দিয়ে ধীরে
এখনও যেতেছে চ’লে কয়েকটি শাদা রাজহাঁস ;
সহধর্মিণীর সাথে ঢের দিন—আরো ঢের দিন
করেছি শান্তিতে বসবাস ;

দেখেছি সন্তানদের ময়দানে আলোর ভিতরে
স্বতই ছড়ায়ে আছে—যেমন শুনেছি টায়-টায় ;
অদ্ভুত ভিড়ের দিকে চেয়ে থেকে দেখে গেছি জনতার মাথা
গৃহদেবতাকে দেখে শৃঙ্গ শিলায়।

নগরীর পিতামহদের ছবি দেয়ালে টাঙায়ে—
টাঙায়েছি নগরীর পিতাদের ছবি :
পরিক্রমণে গিয়ে সর্বদাই আমাদের বড়ো নগরীতে
যাহাতে অমৃত হয় সে রকম অর্থ, বাচক্লবী,

প্রকাশে প্রয়াস পেয়ে গেছি মনে হয় ;
আমাদের নেয় যাহা নিয়ে গেছি তুলে ;
নটে গাছ মুড়ে গেছে বলে মনে হয়
আমাদের বক্তব্য ফুরুলে।

আবার সবুজ হয়ে জুয়ায়ে গিয়েছে
আমাদের সন্তানের—সন্তানের সন্তানের প্রয়োজনমতো।
এ রকম চক্রাকারে ঘুরে গিয়ে কাল
সহসা খিঁচড়ে উঠে খচ্চরের মতন ফলত

অন্য কোনো জ্যামিতিক রেখা হতে পারে ;
অন্য কোনো দার্শনিক মত-বিপ্লব ;
জেনে তবু মূর্খ আর রূপসীর ভয়াবহ সঙ্গম এড়ায়ে
স্থির হয়ে রবে নাকি সন্ততিরা, সন্ততির সন্ততিরা সব ?

যদি তারা টেঁসে যায় করাল কালের স্রোতে ধরা পড়ে গিয়ে,
যদি এই অন্ধকার প্রাসাদের ভগ্ন-অবশেষে
শেয়াল পেঁচার দিকে চেয়ে কেঁদে যায়—
তখন স্বপ্নই সত্য ; গিয়েছে বস্তুর থেকে ফেঁসে

জীবনের বাস্তবতা সে সময়।
মানুষের শেষ বংশ লোপ পেলে কে ফিরায়ে দেবে
জীবনের বাস্তবতা ?—এমন অদ্ভুত স্বপ্ন নিয়ে
মাঝে মাঝে গিয়েছি নাগাড় কথা ভেবে।

দুই

সময় কীটের মতো কুরে খায় আমাদের দেশ।
আমাদের সন্তানেরা একদিন জ্যেষ্ঠ হয়ে যাবে ;

স্বতসিদ্ধতায় গিয়ে জীবনের ভিতরে দাঁড়াবে ;
এ রকম ভাবনার কিছু অবলেশ
তাদের হৃদয়ে আছে হয়তো বা ;—মাঠে ময়দানে
কথা বলে জীবনের বিষ তারা ঝেড়ে ফেলে দিতে চায় আজ ;
অল্লায়ু হিমের দিন ততোধিক মিহিন কামিজে
কাটাতেছে যেন অগণন গিরেবাজ।

সমুদ্রের রৌদ্র থেকে আমাদের দেশে
নীলাভ ঢেউয়ের মতো দীপ্তি নেমে আসে মনে হয় ;
আমাদের পিতামহ পিতারাও প্রবাদের মতো জেনে গেছে ;
আমাদেরও ততদূর ভাববিনিময়

একদিন ছিল, তবু শোচনীয় কালের বিপাকে
হারায়ে ফেলেছি সেই সান্দ্র বিশ্বাস।
কারু সাথে অন্ধকার মাটিতে ঘুমায়ে,
কারু সাথে ভোরবেলা জেগে—বারো মাস

তাকেও স্মরণ ক'রে চিনে নিতে হয়
সে কি কাল ? সে জীবন ? জ্ঞাতিভ্রাতা ? গণিকা ? গৃহিণী ?
মানুষের বংশ এসে সময়ের কিনারে থেমেছে,
একদিন চেনা ছিল বলে আজ ইহাদের চিনি

অন্ধকার সংস্কার হাতড়ায়ে, মৃদুভাবে হেসে ;
তীর্থে তীর্থে বারবার পরীক্ষিত হয়ে পরিচয়
বিবর্ণ জ্ঞানের রাজ্যে কাগজের ডাঁইয়ে পড়ে আছে ;
আমাদের সন্ততিও আমাদের হৃদয়ের নয়।

আমরা মধ্যম পথে বিকেলের ছায়ায় রয়েছি
একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের আগে ;
আরেকটি পৃথিবীর দাবি
স্থির করে নিতে হলে লাগে

সকালের আকাশের মতন বয়স ;
সে সকাল কখনও আসে না ঘোর, স্বধর্মনিষ্ঠ রাত্রি বিনে।
পশ্চিমে অস্তের সূর্য ধূলিকণা, জীবাণুর উতরোল মহিমা রটায়ে
পৃথিবীকে রেখে যায় মানবের কাছে জনমানবের ঋণে।

তিন

সারাদিন ধানের বা কাস্তের শব্দ শোনা যায়।
ধীর পদবিক্ষেপে কৃষকেরা হাঁটে ?
তাদের ছায়ার মতো শরীরের ফুঁয়ে
শতাব্দীর ঘোর কাটে-কাটে।

মাঝে মাঝে দু-চারটে প্লেন চলে যায়।
একভিড় হরিয়াল পাখি
উড়ে গেলে মনে হয়, দুই পায়ে হেঁটে
কত দূর যেতে পারে মানুষ একাকী।

এ সব ধারণা তবু মনের লঘুতা।
আকাশে রক্তিম হয়ে গেছে ;
কামানের থেকে নয়, আজও এইখানে
প্রকৃতি রয়েছে।

রাত্রি তার অন্ধকার ঘুমাবার পথে

আবার কুড়ায়ে পায় এক পৃথিবীর মেয়ে, ছেলে ;
মানুষ ও মনীষীর রৌদ্রের দিন
হৃদয়বিহীনভাবে শূন্য হয়ে গেলে।

সেই রাত্রি এসে গেছে ; সন্ততিরা জড়ায়ে গিয়েছে
জ্ঞাতকুলশীল আর অজ্ঞাত ঋণে।
পারাবত-পক্ষধ্বনি সায়াহ্নের, সকালের নয়,
মাঝে এই বেহুলা ও কালরাত্রি বিনে।

চার

এখন অনেক দূরে ইতিহাস-স্বভাবের গতি চলে গেছে।
পশ্চিম সূর্যের দিকে শত্রু ও সুহৃদ তাকায়েছে।
কে তার পাগড়ি খুলে পুব দিকে ফসলের, সূর্যের তরে
অপেক্ষায় অন্ধকার রাত্রির ভিতরে
ডুবে যেতে চেয়েছিল বলে চলে গেছে।

আমরা সকলে তবু সময়ের একান্ত সৈকতে
নিজেদের অপরের সবায়ের জনমতামতে
অনেক ডোডোর ভিড়ে ডোডোদের মতো
নেই—তবু রয়ে গেছি স্বভাববশত।
এই ক্রান্তি জীবন বা মরণের বলে মনে হয়।

আকাশের ফিকে রঙ ভোরের, কি সন্ধ্যার আঁধার ?
এই দূরত্বয় সিন্ধু কি পার হবার ?
আমরা অনেক লোক মিলে তবু এখন একাকী ;
বংশ লুপ্ত করে দিয়ে শেষ অবশিষ্ট ডোডো পাখি
হতে গিয়ে পারাবত পক্ষধ্বনি শুনি,
না কি ডোডোমির অতল ক্রেংকার।

প্রেম অপ্রেমের কবিতা

নিরাশার খাতে ততোধিক লোক উৎসাহ বাঁচায়ে রেখেছে ;
অগ্নিপরীক্ষার মতো কেবলই সময় এসে দ'হে ফেলে দিতেছে সেসব।
তোমার মৃত্যুর পরে আগুনের একতিল বেশি অধিকার
সিংহ মেষ কন্যা মীন করেছে প্রত্যক্ষ অনুভব !
পৃথিবী ক্রমশ তার আগেকার ছবি
বদলায়ে ফেলে দিয়ে তবুও পৃথিবী হয়ে আছে ;
অপরিচিতের মতো সমাজ সংসার শত্রু সবই
পরিচিত বুনোনির মতো তবু হৃদয়ের কাছে
ক্রমশই মনে হয় নিজ সজীবতা নিয়ে চমৎকার ;
আবর্তিত হয়ে যায় দানবের মায়াবলে তবুও সে সব।
তোমার মৃত্যুর পরে মনিবের একতিল বেশি অধিকার
দীর্ঘ কালকেতু তুলে বাধা দিতে চেয়েছে রাসভ।
...
তোমার প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলে তুমি চলে গেলে কবে।
          সেই থেকে অন্য প্রকৃতির অনুভবে
মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিত হয়ে জেগে উঠেছে হৃদয়।
          না হলে নিরুৎসাহিত হতে হয়।
জীবনের, মরণের, হেমন্তের এ-রকম আশ্চর্য নিয়ম ;
ছায়া হয়ে গেছ বলে তোমাকে এমন অসম্ভ্রম।
...
শত্রুর অভাব নেই, বন্ধুও বিরল নয়—যদি কেউ চায় ;
সেই নারী ঢের দিন আগে এই জীবনের থেকে চলে গেছে।
ঢের দিন প্রকৃতি ও বইয়ের নিকট থেকে সদুত্তর চেয়ে
          হৃদয় ছায়ার সাথে চালাকি করেছে।
তারপর অনুভব করে গেছে রমণীর ছায়া বা শরীর

অথবা হৃদয়,—
বেড়ালের বিকশিত হাসির মতন রাঙা গোধূলির মেঘে ;
প্রকৃতির, প্রমাণের, জীবনের দ্বারস্থ দুঃখীর মতো নয়।
...
তোমার সংকল্প থেকে খ'সে গিয়ে ঢের দূরে চলে গেলে তুমি ;
হলেও বা হয়ে যেত এ জীবন ; দিনরাত্রির মতো মরুভূমি ;
তবুও হেমন্তকাল এসে পড়ে পৃথিবীতে, এমন স্তব্ধতা ;
জীবনেও নেইকো অন্যথা,
হেমন্তের সহোদর রয়ে গেছে, সব উত্তেজের প্রতি উদাসীন ;
সকলের কাছে থেকে সুস্থির মনের ভাবে নিয়ে আসে ঋণ,
কাউকে দেয় না কিছু, এমনই কঠিন ;
সরল সে নয়, তবু ভয়াবহভাবে শাদা, সাধারণ কথা
জনমানুষীর কাছে বলে যায়—এমনই নিয়ম সফলতা।

মনোকণিকা

ও. কে.

একটি বিপ্লবী তার সোনা-রুপো ভালোবেসেছিল ;
একটি বণিক আত্মহত্যা করেছিল পরবর্তী জীবনের লোভে ;
একটি প্রেমিক তার মহিলাকে ভালোবেসেছিল
তবুও মহিলা প্রীত হয়েছিল দশজন মূর্খের বিক্ষোভে।

বুকের উপরে হাত রেখে দিয়ে তারা
নিজেদের কাজ ক'রে গিয়েছিল সব।
অবশেষে তারা আজ মাটির ভিতরে
অপরের নিয়মে নীরব।

মাটির আহ্নিক গতি সে নিয়ম নয় ;
সূর্য তার স্বাভাবিক চোখে
সে নিয়ম নয়—কেউ নিয়মের ব্যতিক্রম নয় ;
সব দিক ও. কে.।

সাবলীল

আকাশে সূর্যের আলো থাকুক না—তবু—
দণ্ডাজ্ঞার ছায়া আছে চিরদিন মাথার উপরে।
আমরা দণ্ডিত হয়ে জীবনের শোভা দেখে যাই।
মহাপুরুষের উক্তি চারি দিকে কোলাহল করে।

মাঝে মাঝে পুরুষার্থ উত্তেজিত হলে—
(এ রকম উত্তেজিত হয় ;)
উপস্থাপয়িতার মতন
আমাদের চায়ের সময়,
এসে পড়ে আমাদের স্থির হতে বলে।
সকলেই স্নিগ্ধ হয়ে আত্মকর্মক্ষম ;
এক পৃথিবীর দ্বেষ হিংসা কেটে ফেলে
চেয়ে দেখে স্তূপাকারে কেটেছে রেশম।

এক পৃথিবীর মতো বর্ণময় রেশমের স্তূপ কেটে ফেলে
পুনরায় চেয়ে দেখে এসে গেছে অপরাহ্নকাল :
প্রতিটি রেশম থেকে সীতা তার অগ্নিপরীক্ষায়—
অথবা খ্রিস্টের রক্ত করবীফুলের মতো লাল।

মানুষ সর্বদা যদি

মানুষ সর্বদা যদি নরকের পথ বেছে নিত—
(স্বর্গে পৌঁছুবার লোভ সিদ্ধার্থও গিয়েছিল ভুলে,)
অথবা বিষম মদ স্বতই গেলাসে ঢেলে নিত,
পরচুলা এঁটে নিত স্বাভাবিক চুলে,
সর্বদা এ সব কাজ করে যেত যদি
যেমন সে প্রায়শই করে,
পরচুলা তবে কার সন্দেহের বস্তু হত, আহা,
অথবা মুখোশ খুলে খুশি হত, কে নিজের মুখের রগড়ে।

চার্বাক প্রভৃতি—

‘কেউ দূরে নেপথ্যের থেকে, মনে হয়,
মানুষের বৈশিষ্ট্যের উত্থান-পতন

একটি পাখির জন্ম—কীচকের জন্মমৃত্যু সব
বিচারসাপেক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।'
'তবু এই অনুভূতি আমাদের মর্তজীবনের
কিংবা মরণের কোনো মূলসূত্র নয়।
তবুও শৃঙ্খলা ভালোবাসি বলে হেঁয়ালি ঘনালে
মৃত্তিকার অন্ধ সত্যে অবিশ্বাস হয়।'

ব'লে গেল বায়ুলোকে নাগার্জুন, কৌটিল্য, কপিল,
চার্বাক প্রভৃতি নিরীশ্বর ;
অথবা তা এডিথ, মলিনা নাম্নী অগণন নার্সের ভাষা—
অবিরাম যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বায়ুর ভিতর।

সমুদ্রতীরে

পৃথিবীতে তামাশার সুর ক্রমে পরিচ্ছন্ন হয়ে
জন্ম নেবে একদিন। আমোদ গভীর হলে সব
বিভিন্ন মানুষ মিলে মিশে গিয়ে যে-কোনো আকাশে
মনে হবে পরস্পরের প্রিয়প্রতিষ্ঠ মানব।

এই সব বোধ হয় আজ এই ভোরের আলোর পথে এসে
জুহুর সমুদ্রপারে, অগণন ঘোড়া ও ঘেসেড়াদের ভিড়ে।
এদের স্বজন, বোন, বাপ-মা ও ভাই, ট্যাঁক, ধর্ম মরেছে ;
তবুও উচ্চস্বরে হেসে ওঠে অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে।

সুবিনয় মুস্তফী

সুবিনয় মুস্তফীর কথা মনে পড়ে এই হেমন্তের রাতে।
এক সাথে বেড়াল ও বেড়ালের-মুখে-ধরা ইঁদুর হাসাতে

এমন আশ্চর্য শক্তি ছিল ভূয়োদর্শী যুবার।
ইঁদুরকে খেতে খেতে শাদা বেড়ালের ব্যবহার,
অথবা টুকরো হতে হতে সেই ভারিক্কে ইঁদুর ;
বৈকুণ্ঠ ও নরকের থেকে তারা দুইজনে কতখানি দূর
ভুলে গিয়ে আধো আলো অন্ধকারে হেঁচকা মাটির পৃথিবীতে
আরো কিছুদিন বেঁচে কিছুটা আমেজ পেয়ে নিতে
কিছুটা সুবিধা করে দিতে যেত—মাটির দরের মতো রেটে ;
তবুও বেদম হেসে খিল ধ'রে যেত বলে বেড়ালের পেটে
ইঁদুর 'হুর্‌রে' ব'লে হেসে খুন হত সেই খিল কেটে কেটে।

অনুপম ত্রিবেদী

এখন শীতের রাতে অনুপম ত্রিবেদীর মুখ জেগে ওঠে।
যদিও সে নেই আজ পৃথিবীর বড়ো গোল পেটের ভিতরে
সশরীরে ; টেবিলের অন্ধকারে তবু এই শীতের স্তব্ধতা
এক পৃথিবীর মৃত জীবিতের ভিড়ে সেই স্মরণীয় মানুষের কথা
হৃদয়ে জাগায়ে যায় ; টেবিলে বইয়ের স্তূপ দেখে মনে হয়
যদিও প্লেটোর থেকে রবি ফ্রয়েড নিজ নিজ চিন্তার বিষয়
পরিশেষ করে দিয়ে শিশিরের বালাপোশে অপরূপ শীতে
এখন ঘুমায়ে আছে—তাহাদের ঘুম ভেঙে দিতে
নিজের কুলুপ এঁটে পৃথিবীতে—ওই পারে মৃত্যুর তালা
ত্রিবেদী কি খোলে নাই ? তান্ত্রিক উপাসনা মিস্টিক ইহুদী কাবালা
ইশার শবোত্থান—বোধিদ্রুমের জন্ম মরণের থেকে শুরু ক'রে
হেগেল ও মার্কস : তার ডান আর বাম কান ধ'রে
দুই দিকে টেনে নিয়ে যেতেছিল ; এমন সময়

দুপকেটে হাত রেখে ভ্রূকুটিল চোখে নিরাময়
জ্ঞানের চেয়েও তার ভালো লেগে গেল মাটি মানুষের প্রেম ;
প্রেমের চেয়েও ভালো মনে হল একটি টোটেম :
উটের ছবির মতো—একজন নারীর হৃদয়ে ;
মুখে চোখে আকৃতিতে মরীচিকা জয়ে
চলেছে সে ; জড়ায়েছে ঘিরের রঙের মতো শাড়ি ;
ভালো করে দেখে নিলে মনে হয় অতীব চতুর দক্ষিণরাঢ়ী
দিব্য মহিলা এক ; কোথায় যে আঁচলের খুট ;
কেবলই উত্তরপাড়া ব্যাণ্ডেল কাশীপুর বেহালা খুরুট
ঘুরে যায় স্টালিন, নেহেরু, ব্লক, অথবা রায়ের বোঝা বয়ে,
ত্রিপাদ ভূমির পরে আরো ভূমি আছে এই বলির হৃদয়ে ?
তা হলে তা প্রেম নয় ; ভেবে গেল ত্রিবেদীর হৃদয়ের জ্ঞান।
জড় ও অজড় ডায়ালেক্‌টিক্‌ মিলে আমাদের দুদিকের কান
টানে ব'লে বেঁচে থাকি—ত্রিবেদীকে বেশি জোরে দিয়েছিল টান।

রূপসী বাংলা
১৯৫৭

উৎসর্গ

—আবহমান বাংলা, বাঙালি

ভূমিকা

এই কাব্যগ্রন্থে যে কবিতাগুলি সংকলিত হল, তার সবগুলিই কবির জীবিতকালে অপ্রকাশিত ছিল ; তাঁর মৃত্যুর পরে কোনো কোনো কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

কবিতাগুলি প্রথম বারে যেমন লেখা হয়েছিল, ঠিক তেমনই পাণ্ডুলিপিবদ্ধ অবস্থায় রক্ষিত ছিল ; সম্পূর্ণ অপরিমার্জিত। পঁচিশ বছর আগে খুব পাশাপাশি সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল। এসব কবিতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল।

কবির কাছে 'এরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা স্বতন্ত্র সত্তার মতো নয় কেউ, অপরপক্ষে সার্বিক বোধে একশরীরী ; গ্রামবাংলার আলুলায়িত প্রতিবেশপ্রসূতির মধ্যে ব্যষ্টিগত হয়েও পরিপূরকের মতো পরস্পরনির্ভর...'।

৩১ জুলাই ১৯৫৭ **অশোকানন্দ দাশ**

১

সেইদিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি—এই নদী নক্ষত্রের তলে
সেদিনও দেখিবে স্বপ্ন—সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে !
আমি চলে যাব বলে চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে ? লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে ?
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে !

২

চারি দিকে শান্ত বাতি—ভিজে গন্ধ—মৃদু কলরব ;
খেয়ানৌকোগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে ;
পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল ;
এশিরিয়া ধুলো আজ—বেবিলন ছাই হয়ে আছে।

৩

তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাংলার পারে
রয়ে যাব ; দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে ;
দেখিব খয়েরি ডানা শালিকের সন্ধ্যায় হিম হয়ে আসে,
ধবল রোমের নীচে তাহার হলুদ ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে
নেচে চলে—একবার—দুইবার—তারপর হঠাৎ তাহারে
বনের হিজল গাছ ডাক দিয়ে নিয়ে যায় হৃদয়ের পাশে ;
দেখিব মেয়েলি হাত সকরুণ—শাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে

শঙ্খের মতো কাঁদে : সন্ধ্যায় দাঁড়াল সে পুকুরের ধারে,

খইরঙা হাঁসটিরে নিয়ে যাবে যেন কোন্ কাহিনীর দেশে—
'পরণ-কথা'র গন্ধ লেগে আছে যেন তার নরম শরীরে,
কল্‌মীদামের থেকে জন্মেছে সে যেন এই পুকুরের নীড়ে—
নীরবে পা ধোয় জলে একবার—তারপর দূরে নিরুদ্দেশে
চলে যায় কুয়াশায়—তবু জানি কোনোদিন পৃথিবীর ভিড়ে
হারাব না তারে আমি—সে যে আছে আমার এ বাংলার তীরে।

৪

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নীচে বসে আছে
ভোরের দয়েলপাখি—চারি দিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম—বট—কাঁঠালের—হিজলের—অশথের করে আছে চুপ ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে ;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল—বট—তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিল ; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

৫

যতদিন বেঁচে আছি আকাশ চলিয়া গেছে কোথায় আকাশে
অপরাজিতার মতো নীল হয়ে—আরো নীল—আরো নীল হয়ে
আমি যে দেখিতে চাই—সে আকাশ পাখনায় নিঙড়ায়ে লয়ে
কোথায় ভোরের বক মাছরাঙা উড়ে যায় আশ্বিনের মাসে,
আমি যে দেখিতে চাই—আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে
পৃথিবীর পথে ঘুরে বহু দিন অনেক বেদনা প্রাণে সয়ে
ধানসিড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাব বয়ে,
যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজও আসে,
যেইখানে কল্কাপেড়ে শাড়ি পরে কোনো এক সুন্দরীর শব
চন্দন চিতায় চড়ে—আমের শাখায় শুক ভুলে যায় কথা ;
যেইখানে সব চেয়ে বেশি রূপ—সব চেয়ে গাঢ় বিষণ্নতা ;
যেখানে শুকায় পদ্ম—বহু দিন বিশালাক্ষী যেখানে নীরব ;
যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার
কাঁকন বাজিত, আহা, কোনোদিন বাজিবে কি আর !

৬

একদিন জলসিড়ি নদীটির পারে এই বাংলার মাঠে
বিশীর্ণ বটের নীচে শুয়ে রব—পশমের মতো লাল ফল
ঝরিবে বিজন ঘাসে—বাঁকা চাঁদ জেগে রবে—নদীটির জল
বাঙালি মেয়ের মতো বিশালাক্ষী মন্দিরের ধূসর কপাটে
আঘাত করিয়া যাবে ভয়ে ভয়ে—তারপর যেই ভাঙা ঘাটে
রূপসীরা আজ আর আসে নাকো, পাট শুধু পচে অবিরল,
সেইখানে কলমীর দামে বেঁধে প্রেতিনীর মতন কেবল
কাঁদিবে সে সারা রাত—দেখিবে কখন কারা এসে আমকাঠে

সাজায়ে রেখেছে চিতা : বাংলার শ্রাবণের বিস্মিত আকাশ
চেয়ে রবে, ভিজে পেঁচা শান্ত স্নিগ্ধ চোখ মেলে কদমের বনে
শোনাবে লক্ষ্মীর গল্প—ভাসানের গান নদী শোনাবে নির্জনে ;
চারিদিকে বাংলার ধানী শাড়ি—শাদা শাঁখা—বাংলার ঘাস
আকন্দ বাসকলতা ঘেরা এক নীল মঠ—আপনার মনে
ভাঙিতেছে ধীরে ধীরে—চারি দিকে এই সব আশ্চর্য উচ্ছ্বাস—

৭

আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এই ঘাসে
বসে থাকি ; কামরাঙা-লাল মেঘ যেন মৃত মনিয়ার মতো
গঙ্গাসাগরের ঢেউয়ে ডুবে গেছে—আসিয়াছে শান্ত অনুগত
বাংলার নীল সন্ধ্যা—কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে :
আমার চোখের 'পরে আমার মুখের 'পরে চুল তার ভাসে ;
পৃথিবীর কোনো পথ এ কন্যারে দেখে নিকো—দেখি নাই অত
অজস্র চুলের চুমা হিজলে কাঁঠালে জামে ঝরে অবিরত,
জানি নাই এত স্নিগ্ধ গন্ধ ঝরে রূপসীর চুলের বিন্যাসে

পৃথিবীর কোনো পথে : নরম ধানের গন্ধ—কলমীর ঘ্রাণ,.
হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা-সরপুঁটিদের
মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চালধোয়া ভিজে হাত—শীত হাতখানা,
কিশোরের পায়ে-দলা মুথাঘাস—লাল লাল বটের ফলের
ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা—এরই মাঝে বাংলার প্রাণ :
আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি পাই টের।

৮

কোথাও দেখি নি, আহা, এমন বিজন ঘাস—প্রান্তরের পারে

নরম বিমর্ষ চোখে চেয়ে আছে—নীল বুকে আছে তাহাদের
গঙ্গাফড়িঙের নীড়, কাঁচপোকা, প্রজাপতি, শ্যামাপোকা ঢের,
হিজলের ক্লান্ত পাতা—বটের অজস্র ফল ঝরে বারে বারে
তাহাদের শ্যাম বুকে—পাড়াগাঁর কিশোরেরা যখন কান্তারে
বেতের নরম ফল, নাটাফল খেতে আসে, ধুন্দুল বীজের
খোঁজ করে ঘাসে ঘাসে—বক তাহা জানে নাকো, পায় নাকো টের
শালিক খঞ্জনা তাহা—লক্ষ লক্ষ ঘাস এই নদীর দুধারে

নরম কান্তারে এই পাড়াগাঁর বুকে শুয়ে সে কোন্ দিনের
কথা ভাবে ; তখন এ জলসিড়ি শুকায় নি, মজে নি আকাশ,
বল্লাল সেনের ঘোড়া—ঘোড়ার কেশর ঘেরা ঘুঙুর জিনের
শব্দ হত এই পথে—আরো আগে রাজপুত্র কত দিন রাশ
টেনে টেনে এই পথে—কী যেন খুঁজেছে, আহা, হয়েছে উদাস ;
আজ আর খোঁজাখুঁজি নাই কিছু—নাটাফলে মিটিতেছে আশ—

৯

হায় পাখি, একদিন কালীদহে ছিলে না কি—দহের বাতাসে
আষাঢ়ের দুপহরে কলরব কর নি কি এই বাংলায় !
আজ সারা দিন এই বাদলের কোলাহলে মেঘের ছায়ায়
চাঁদ সদাগর : তারা মধুকর ডিঙাটির কথা মনে আসে,
কালীদহে কবে তারা পড়েছিল একদিন ঝড়ের আকাশে—
সেদিনও অসংখ্য পাখি উড়েছিল না কি কালো বাতাসের গায়,
আজ সারা দিন এই বাদলের জলে ধলেশ্বরীর চরায়
গাঙশালিখের ঝাঁক, মনে হয়, যেন সেই কালীদহে ভাসে :
এই সব পাখিগুলো কিছুতেই আজিকার নয় যেন—নয়—

এ নদীও ধলেশ্বরী নয় যেন—এ-আকাশ নয় আজিকার :
ফণীমনসার বনে মনসা রয়েছে না কি ?—আছে ; মনে হয়,
এ নদী কি কালীদহ নয় ? আহা, ঐ ঘাটে এলানো খোঁপার
সনকার মুখ আমি দেখি না কি ? বিষণ্ন মলিন ক্লান্ত কী যে
সত্য সব—তোমার এ স্বপ্ন সত্য, মনসা বলিয়া গেল নিজে।

১০

জীবন অথবা মৃত্যু চোখে রবে—আর এই বাংলার ঘাস
রবে বুকে ; এই ঘাস ; সীতারাম রাজারাম রামনাথ রায়—
ইহাদের ঘোড়া আজও অন্ধকারে এই ঘাস ভেঙে চলে যায়—
এই ঘাস : এরই নীচে কঙ্কাবতী শঙ্খমালা করিতেছে বাস :
তাদের দেহের গন্ধ, চাঁপাফুল মাখা ম্লান চুলের বিন্যাস
ঘাস আজও ঢেকে আছে ; যখন হেমন্ত আসে গৌড় বাংলায়
কার্তিকের অপরাহ্ণে হিজলের পাতা শাদা উঠানের গায়
ঝড়ে পড়ে, পুকুরের ক্লান্ত জল ছেড়ে দিয়ে চলে যায় হাঁস,

আমি এ ঘাসের বুকে শুয়ে থাকি—শালিক নিয়েছে নিঙড়ায়ে
নরম হলুদ পায়ে এই ঘাস ; এ সবুজ ঘাসের ভিতরে
সোঁদা ধুলো শুয়ে আছে—কাঁচের মতন পাখা এ ঘাসের গায়ে
ভেরেণ্ডাফুলের নীল ভোমরারা বুলাতেছে—শাদা স্তন ঝরে
করবীর : কোন্-এক কিশোরী এসে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে ফুল,
তাই দুধ ঝরিতেছে করবীর ঘাসে ঘাসে : নরম ব্যাকুল।

১১

যেদিন সরিয়া যাব তোমাদের কাছ থেকে—দূর কুয়াশায়
চলে যাব, সেদিন মরণ এসে অন্ধকারে আমার শরীর

ভিক্ষা করে লয়ে যাবে ;—সেদিন দুদণ্ড এই বাংলার তীর—
এই নীল বাংলার তীরে শুয়ে একা একা কী ভাবিব, হায় ;
সেদিন রবে না কোনো ক্ষোভ মনে—এই সোঁদা ঘাসের ধুলায়
জীবন যে কাটিয়াছে বাংলায়—চারি দিকে বাঙালির ভিড়
বহুদিন কীর্তন ভাসান গান রূপকথা যাত্রা পাঁচালীর
নরম নিবিড় ছন্দে যারা আজও শ্রাবণের জীবন গোঙায়,
আমারে দিয়েছে তৃপ্তি ; কোনোদিন রূপহীন প্রবাসের পথে
বাংলার মুখ ভুলে খাঁচার ভিতরে নষ্ট শুকের মতন
কাটাই নি দিন মাস, বেহুলার লহনার মধুর জগতে
তাদের পায়ের ধূলো-মাখা পথে বিকায়ে দিয়েছি আমি মন
বাঙালি নারীর কাছে—চালধোয়া স্নিগ্ধ হাত, ধানমাখা চুল,
হাতে তার শাড়িটির কস্তা পড়া ;—ডাঁশা আম, কামরাঙা, কুল।

১২

পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত কোন্‌খানে সফলতা শক্তির ভিতর,
কোন্‌খানে আকাশের গায়ে রূঢ় মনুমেন্ট উঠিতেছে জেগে,
কোথায় মাস্তুল তুলে জাহাজের ভিড় সব লেগে আছে মেঘে,
জানি নাকো—আমি এই বাংলার পাড়াগাঁয়ে বাঁধিয়াছি ঘর :
সন্ধ্যায় যে দাঁড়কাক উড়ে যায় তালবনে—মুকে দুটো খড়
নিয়ে যায়—সকালে যে নিমপাখি উড়ে আসে কাতর আবেগে
নীল তেঁতুলের বনে—তেমনি করুণা এক বুকে আছে লেগে ;
বঁইচির বনে আমি জোনাকীর রূপ দেখে হয়েছি কাতর ;

কদমের ডালে আমি শুনেছি যে লক্ষ্মীপেঁচা গেয়ে গেছে গান
নিশুতি জ্যোৎস্নার রাতে—টুপ্‌ টুপ্‌ টুপ্‌ টুপ্‌ সারারাত ঝরে
শুনেছি শিশিরগুলো—ম্লান মুখে গড় এসে করেছে আহ্বান
ভাঙা সোঁদা ইঁটগুলো—তারই বুকে নদী এসে কী কথা মর্মরে,

কেউ নাই কোনোদিকে—তবু যদি জ্যোৎস্নায় পেতে থাক কান
শুনিবে বাতাসে শব্দ : 'ঘোড়া চ'ড়ে কই যাও হে রায়রায়ান—'

১৩

ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে
শিয়রে বৈশাখ মেঘ—শাদা শাদা যেন কড়ি-শঙ্খের পাহাড়
নদীর ওপার থেকে চেয়ে রবে—কোনো এক শঙ্খবালিকার
ধূসর রূপের কথা মনে হবে—এই আম-জামের ছায়াতে
কবে যেন তারে আমি দেখিয়াছি—কবে যেন রাখিয়াছে হাতে
তার হাত—কবে যেন তারপর শ্মশানচিতায় তার হাড়
ঝরে গেছে, কবে যেন ; এ জনমে নয় যেন—এই পাড়াগাঁর
পথে তবু তিনশো বছর আগে হয়তো বা—আমি তার সাথে

কাটায়েছি—পাঁচশো বছর আগে হয়তো বা—সাতশো বছর
কেটে গেছে তারপর তোমাদের আম জাম কাঁঠালের দেশে ;
ধান কাটা হয়ে গেলে মাঠে মাঠে কত বার কুড়ালাম খড়,
বাঁধিলাম ঘর এই শ্যামা আর খঞ্জনার দেশ ভালোবেসে,
ভাসানের গান শুনে কতবার ঘর আর খড় গেল ভেসে,
মাথুরের পালা বেঁধে কত বার ফাঁকা হল খড় আর ঘর।

১৪

ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে ;
তখনও যৌবন প্রাণে লেগে আছে হয়তো বা—আমার তরুণ দিন
তখনও হয় নি শেষ—সেই ভালো—ঘুম আসে—বাংলার তৃণ
আমার বুকের নীচে চোখ বুজে—বাংলার আমের পাতাতে
কাঁচপোকা ঘুমায়েছে—আমিও ঘুমায়ে রবো তাহাদের সাথে,

ঘুমাব প্রাণের সাধে এই মাঠে—এই ঘাসে—কথাভাষাহীন
আমার প্রাণের গল্প ধীরে ধীরে মুছে যাবে—অনেক নবীন
নতুন উৎসব রবে উজানের—জীবনের মধুর আঘাতে

তোমাদের ব্যস্ত মনে—তবুও কিশোর, তুমি নখের আঁচড়ে
যখন এ ঘাস ছিঁড়ে চলে যাবে—যখন মানিকমালা ভোরে
লাল লাল বটফল কামরাঙা কুড়াতে আসিবে এই পথে—
যখন হলুদ বোঁটা শেফালির কোনো এক নরম শরতে
ঝরিবে ঘাসের 'পরে—শালিক খঞ্জনা আজ কতদূর ওড়ে—
কতখানি রোদ—মেঘ—টের পাব শুয়ে শুয়ে মরণের ঘোরে।

১৫

যখন মৃত্যুর ঘুমে শুয়ে রব—অন্ধকারে নক্ষত্রের নীচে
কাঁঠালগাছের তলে হয়তো বা ধলেশ্বরী চিলাইয়ের পাশে—
দিনমানে কোনো মুখ হয়তো সে শ্মশানের কাছে নাহি আসে—
তবুও কাঁঠাল জাম বাংলার—তাহাদের ছায়া যে পড়িছে
আমার বুকের 'পরে—আমার মুখের 'পরে নীরবে ঝরিছে
খয়েরি অশথপাতা—বঁইচি শেয়ালকাঁটা আমার এ দেহ ভালোবাসে,
নিবিড় হয়েছে তাই আমার চিতার ছাইয়ে—বাংলার ঘাসে
গভীর ঘাসের গুচ্ছে রয়েছি ঘুমায়ে আমি—নক্ষত্র নড়িছে

আকাশের থেকে দূর—আরো দূর—আরো দূর—নির্জন আকাশে
বাংলার—তারপর অকারণ ঘুমে আমি পড়ে যাই ঢুলে ;
আবার যখন জাগি, আমার শ্মশানচিতা বাংলার ঘাসে
ভরে আছে, চেয়ে দেখি—বাসকের গন্ধ পাই—আনারস ফুলে
ভোমরা উড়িছে শুনি—গুবরে পোকার ক্ষীণ গুমরানি ভাসিছে বাতাসে
রোদের দুপুর ভরে—শুনি আমি : ইহারা আমারে ভালোবাসে—

১৬

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে ;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠালছায়ায় ;
হয়তো বা হাঁস হব—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে ;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায় ;

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে ;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে ;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে ;
রূপ্‌সার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়—রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক : আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে—

১৭

যদি আমি ঝরে যাই একদিন কার্তিকের নীল কুয়াশায় ;
যখন ঝরিছে ধান বাংলার ক্ষেতে ক্ষেতে ম্লান চোখ বুজে,
যখন চড়াই পাখি কাঁঠালিচাঁপার নীড়ে ঠোঁট আছে গুঁজে,
যখন হলুদ পাতা মিশিতেছে উঠানের খয়েরি পাতায়,
যখন পুকুরে হাঁস সোঁদা জলে শিশিরের গন্ধ শুধু পায়,
শামুক-গুগলিগুলো পড়ে আছে শ্যাওলার মলিন সবুজে—

তখন আমারে যদি পাও নাকো লালশাক-ছাওয়া মাঠে খুঁজে,
ঠেস্ দিয়ে বসে আর থাকি নাকো যদি বুনো চাল্তার গায়,

তা হলে জানিয়ো তুমি আসিয়াছে অন্ধকারে মৃত্যুর আহ্বান—
যার ডাক শুনে রাঙা রৌদ্রেরও চিল আর শালিকের ভিড়
একদিন ছেড়ে যাবে আম জাম বনে নীল বাংলার তীর,
যার ডাক শুনে আজ ক্ষেতে ক্ষেতে ঝরিতেছে খই আর মৌরীর ধান
কবে যে আসিবে মৃত্যু : বাসমতী চালে ভেজা শাদা হাতখান
রাখো বুকে, হে কিশোরী, গোরোচনারূপে আমি করিব যে স্নান—

১৮

মনে হয় একদিন আকাশের শুকতারা দেখিব না আর ;
দেখিব না হেলেঞ্চার ঝোপ থেকে একঝাড় জোনাকী কখন
নিভে যায়—দেখিব না আর আমি পরিচিত এই বাঁশবন,
শুকনো বাঁশের পাতা-ছাওয়া মাটি হয়ে যাবে গভীর আঁধার
আমার চোখের কাছে—লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে সে কবে আবার
পেঁচা ডাকে জ্যোৎস্নায়—হিজলের বাঁকা ডাল করে গুঞ্জরণ ;
সারা রাত কিশোরীর লাল পাড় চাঁদে ভাসে—হাতের কাঁকন
বেজে ওঠে : বুঝিব না—গঙ্গাজল, নারকোলনাড়ুগুলো তার

জানি না সে কারে দেবে—জানি না সে চিনি আর শাদা তালশাঁস
হাতে লয়ে পলাশের দিকে চেয়ে দুয়ারে দাঁড়ায়ে রবে কি না...
আবার কাহার সাথে ভালোবাসা হবে তার—আমি তা জানি না ;
মৃত্যুরে কে মনে রাখে ?...কীর্তিনাশা খুঁড়ে খুঁড়ে চলে বারো মাস
নতুন ডাঙার দিকে—পিছনের অবিরল মৃত চর বিনা
দিন তার কেটে যায়—শুকতারা নিভে গেলে কাঁদে কি আকাশ ?

১৯

যে শালিক মরে যায় কুয়াশায়—সে তো আর ফিরে নাহি আসে :
কাঞ্চনমালা যে কবে ঝরে গেছে—বনে আজও কলমীর ফুল
ফুটে যায়—সে তবু ফেরে না, হায়—বিশালাক্ষী : সেও তো রাতুল
চরণ মুছিয়া নিয়া চলে গেছে—মাঝপথে জলের উচ্ছ্বাসে
বাধা পেয়ে নদীরা মজিয়া গেছে দিকে দিকে—শ্মশানের পাশে
আর তারা আসে নাকো—সুন্দরীর বনে বাঘ ভিজে জুলজুল
চোখ তুলে চেয়ে থাকে—কত পাটরানীদের গাঢ় এলো চুল
এই গৌড় বাংলার—পড়ে আছে তাহার পায়ের তলে ঘাসে

জানে সে কি ! দেখে না কি তারাবনে পড়ে আছে বিচূর্ণ দেউল,
বিশুষ্ক পদ্মের দীঘি—ফোঁপরা মহলা ঘাট, হাজার মহাল
মৃত সব রূপসীরা : বুকে আজ ভেরেণ্ডার ফুলে ভীমরুল
গান গায়—পাশ দিয়ে খল্ খল্ খল্ খল্ বয়ে যায় খাল,
তবু ঘুম ভাঙে নাকো—একবার ঘুমালে কে উঠে আসে আর !
যদিও ডুকারি যায় শঙ্খচিল—মর্ম্মরিয়া মরে গো মাদার।

২০

কোথাও চলিয়া যাব একদিন—তারপর রাত্রির আকাশ
অসংখ্য নক্ষত্র নিয়ে ঘুরে যাবে কত কাল জানিব না আমি ;
জানিব না কত কাল উঠানে ঝরিবে এই হলুদ বাদামি
পাতাগুলো—মাদারের ডুমুরের—সোঁদা গন্ধ—বাংলার শ্বাস
বুকে নিয়ে তাহাদের—জানিব না পরথুপী-মধুকূপী ঘাস
কত কাল প্রান্তরে ছড়ায়ে রবে—কাঁঠালশাখার থেকে নামি
পাখনা ডলিবে পেঁচা এই ঘাসে—বাংলার সবুজ বালামী

ধানী শাল পশ্‌মিনা বুকে তার—শরতের রোদের বিলাস
কত কাল নিঙড়াবে—আঁচলে নাটার কথা ভুলে গিয়ে বুঝি
কিশোরের মুখ চেয়ে কিশোরী করিবে তার মৃদু মাথা নিচু ;
আসন্ন সন্ধ্যার কাক—করুণ কাকের দল খোড়ো নীড় খুঁজি
উড়ে যাবে—দুপুরে ঘাসের বুকে সিঁদুরের মতো রাঙা লিচু
মুখ গুঁজে পড়ে রবে—আমিও ঘাসের বুকে রব মুখ গুঁজি :
মৃদু কাঁকনের শব্দ—গোরোচনা জিনি রঙ চিনিব না কিছু—

২১

তোমার বুকের থেকে একদিন চলে যাবে তোমার সন্তান
বাংলার বুক ছেড়ে চলে যাবে ; যে ইঙ্গিতে নক্ষত্রও ঝরে,
আকাশের নীলাভ নরম বুক ছেড়ে দিয়ে হিমের ভিতরে
ডুবে যায়,—কুয়াশায় ঝ'রে পড়ে দিকে দিকে রূপশালি ধান
একদিন—হয়তো বা নিমপেঁচা অন্ধকারে গাবে তার গান,
আমারে কুড়ায়ে নেবে মেঠো ইঁদুরের মতো মরণের ঘরে—
হৃদয়ে ক্ষুদের গন্ধ লেগে আছে আকাঙ্ক্ষার—তবুও তো চোখের 'পরে
নীল মৃত্যু উজাগর—বাঁকা চাঁদ, শূন্য মাঠ, শিশিরের ঘ্রাণ—

কখন মরণ আসে কে বা জানে—কালীদহে কখন যে ঝড়
কমলের নাল ভাঙে—ছিঁড়ে ফেলে গাঙচিল শালিকের প্রাণ
জানিনাকো—তবু যেন মরি আমি এই মাঠঘাটের ভিতর,
কৃষ্ণা যমুনার নয়—যেন এই গাঙুড়ের ঢেউয়ের আঘ্রাণ
লেগে থাকে চোখে মুখে—রূপসী বাংলা যেন বুকের উপর
জেগে থাকে ; তারই নীচে শুয়ে থাকি যেন আমি অর্ধনারীশ্বর।

২২

গোলপাতা ছাউনির বুক চুমে নীল ধোঁয়া সকালে সন্ধ্যায়
উড়ে যায়—মিশে যায় আমবনে কার্তিকের কুয়াশার সাথে ;
পুকুরের লাল সর ক্ষীণ ঢেউয়ে বারবার চায় যে জড়াতে
বাঁশের হলুদ শাখা ; চুমো খেতে চায় মাছরাঙাটির পায় ;
এক-একটি ইঁট ধ্বসে—ডুবজলে ডুব দিয়ে কোথায় হারায়
ভাঙা ঘাটলায় এই—আজ আর কেউ এসে চালধোয়া হাতে
বিনুনি খসায় নাকো—শুকনো পাতা সারা দিন থাকে যে গড়াতে ;
কড়ি খেলিবার ঘর মজে গিয়ে গোখুরার ফাটলে হারায় ;

ডাইনীর মতো হাত তুলে তুলে ভাঁট আঁশশ্যাওড়ার বন
বাতাসে কী কথা কয় বুঝি নাকো,—বুঝি নাকো চিল কেন কাঁদে ;
পৃথিবীর কোনো পথে দেখি নাই আমি হায় এমন বিজন
শাদা পথ—সোঁদা পথ—বাঁশের ঘোমটা মুখে বিধবার ছাঁদে
চ'লে গেছে—শ্মশানের পারে বুঝি—সন্ধ্যা আসে সহসা কখন,
সজিনার ডালে পেঁচা কাঁদে নিম—নিম—নিম কার্তিকের চাঁদে।

২৩

দেশবন্ধু : ১৩২৬-১৩৩২-এর স্মরণে

অশ্বত্থে সন্ধ্যার হাওয়া যখন লেগেছে নীল বাংলার বনে
মাঠে মাঠে ফিরি একা : মনে হয় বাংলার জীবনে সংকট
শেষ হয়ে গেছে আজ—চেয়ে দেখ কত শত শতাব্দীর বট
হাজার সবুজ পাতা লাল ফল বুকে লয়ে শাখার ব্যজনে
আকাঙ্ক্ষার গান গায়—অশ্বত্থেরও কী যেন কামনা জাগে মনে :
সতীর শীতল শব বহু দিন কোলে লয়ে যেন অকপট

উমার প্রেমের গল্প পেয়েছে সে—চন্দ্রশেখরের মতো তার জট
উজ্জ্বল হতেছে তাই সপ্তমীর চাঁদে আজ পুনরাগমনে ;

মধুকূপী ঘাস-ছাওয়া ধলেশ্বরীটির পারে গৌরী বাংলার
এবার বল্লাল সেন আসিবে না জানি আমি—রায়গুণাকর
আসিবে না—দেশবন্ধু আসিয়াছে ক্ষুরধার পদ্মায় এবার,
কালীদহে ক্লান্ত গাঙশালিকের ভিড়ে যেন আসিয়াছে ঝড়,
আসিয়াছে চণ্ডীদাস—রামপ্রসাদের শ্যামা সাথে সাথে তার
শঙ্খমালা, চন্দ্রমালা : মৃত শত কিশোরীর কঙ্কণের স্বর।

২৪

ভিজে হয়ে আসে মেঘে এ-দুপুর—চিল একা নদীটির পাশে
জারুল গাছের ডালে ব'সে ব'সে চেয়ে থাকে ওপারের দিকে ;
পায়রা গিয়েছে উড়ে চবুতরে, খোপে তার—শসালতাটিকে
ছেড়ে গেছে মৌমাছি—কালো মেঘ জমিয়াছে মাঘের আকাশে,
মরা প্রজাপতিটির পাখার নরম রেণু ফেলে দিয়ে ঘাসে
পিঁপড়েরা চ'লে যায়—দুই দণ্ড আমগাছে শালিকে শালিকে
ঝুটোপুটি, কোলাহল—বউকথাকও আর রাঙা বউটিকে
ডাকে নাকো—হলুদ পাখনা তার কোন্ যেন কাঁঠালে পলাশে

হারায়েছে ; বউও উঠানে নাই—প'ড়ে আছে একখানা ঢেঁকি :
ধান কে কুটিবে বল—কতদিন সে তো আর কোটে নাকো ধান,
রোদেও শুকাতে সে যে আসে নাকো চুল তার—করে নাকো স্নান
এ-পুকুরে—ভাঁড়ারে ধানের বীজ কলায়ে গিয়েছে তার দেখি,
তবুও সে আসে নাকো ; আজ এ-দুপুরে এসে খই ভাজিবে কি ?
হে চিল, সোনালি চিল, রাঙা রাজকন্যা আর পাবে না কি প্রাণ ?

২৫

দাঁড়কাক

খুঁজে তারে মর মিছে—পাড়াগাঁর পথে তারে পাবে নাকো আর ;
রয়েছে অনেক কাক এ উঠানে—তবু সেই ক্লান্ত দাঁড়কাক
নাই আর—অনেক বছর আগে আমে জামে হৃষ্ট এক ঝাঁক
দাঁড়কাক দেখা যেত দিন রাত—সে আমার ছেলেবেলাকার
কবেকার কথা সব ; আসিবে না পৃথিবীতে সেদিন আবার :
রাত না ফুরাতে সে যে কদমের ডাল থেকে দিয়ে যেত ডাক—
এখনও কাকের শব্দে অন্ধকার ভোরে আমি বিমনা, অবাক
তার কথা ভাবি শুধু ; এতদিনে কোথায় সে ? কী যে হল তার,

কোথায় সে নিয়ে গেছে সঙ্গে ক'রে সেই নদী, ক্ষেত, মাঠ, ঘাস,
সেই দিন, সেই রাত্রি, সেই সব ম্লান চুল, ভিজে শাদা হাত,
সেই সব নোনা গাছ, করমচা, শামুক, গুগলি, কচি তালশাঁস,
সেই সব ভিজে ধুলো, বেলকুঁড়ি-ছাওয়া পথ—ধোঁয়াভরা ভাত,
কোথায় গিয়েছে সব ?—অসংখ্য কাকের শব্দে ভরিছে আকাশ
ভোর রাতে—নবান্নের ভোরে আজ বুকে যেন কিসের আঘাত।

২৬

পাড়াগাঁর দু-পহর ভালোবাসি—রৌদ্রে যেন গন্ধ লেগে আছে
স্বপনের—কোন্ গল্প, কী কাহিনী, কী স্বপ্ন যে বাঁধিয়াছে ঘর
আমার হৃদয়ে আহা, কেউ তাহা জানে নাকো—কেবল প্রান্তর
জানে তাহা, আর ঐ প্রান্তরে শঙ্খচিল ; তাহাদের কাছে
যেন এ-জনমে নয়—যেন ঢের যুগ ধরে কথা শিখিয়াছে
এ হৃদয়—স্বপ্নে যে-বেদনা আছে : শুষ্ক পাতা—শালিকের স্বর,

ভাঙা মঠ—নক্‌শাপেড়ে শাড়িখানা মেয়েটির রৌদ্রের ভিতর
হলুদ পাতার মতো স'রে যায়, জলসিড়িটির পাশে ঘাসে

শাখাগুলো নুয়ে আছে বহু দিন ছন্দহীন বুনো চালতার :
জলে তার মুখখানা দেখা যায়—ডিঙিও ভাসিছে কার জলে,
মালিক কোথাও নাই, কোনোদিন এই দিকে আসিবে না আর,
ঝাঁঝরা ফোঁপরা, আহা, ডিঙিটিরে বেঁধে রেখে গিয়েছে হিজলে :
পাড়াগাঁর দুপহর ভালোবাসি—রৌদ্রে যেন ভিজে বেদনার
গন্ধ লেগে আছে, আহা, কেঁদে কেঁদে ভাসিতেছে আকাশের তলে।

২৭

কখন সোনার রোদ নিভে গেছে—অবিরল শুপুরির সারি
আঁধারে যেতেছে ডুবে—প্রান্তরের পার থেকে গরম বাতাস
ক্ষুধিত চিলের মতো চৈত্রের এ অন্ধকারে ফেলিতেছে শ্বাস ;
কোন্ চৈতে চলে গেছে সেই মেয়ে—আসিবে না, করে গেছে আড়ি :
ক্ষীরুই গাছের পাশে একাকী দাঁড়ায়ে আজ বলিতে কি পারি
কোথাও সে নাই এই পৃথিবীতে—তাহার শরীর থেকে শ্বাস
ঝরে গেছে ব'লে তারে ভুলে গেছে নক্ষত্রের অসীম আকাশ,
কোথাও সে নাই আর—পাবনাকো তারে কোনো পৃথিবী নিঙাড়ি ?

এই ঘাসে—ফল্‌সা এ-ক্ষীরুয়ে যে গন্ধ লেগে আছে
আজও তার ; যখন তুলিতে যাই ঢেঁকিশাক—দুপুরের রোদে
সর্ষের ক্ষেতের দিকে চেয়ে থাকি—অঘ্রানে যে ধান ঝরিয়াছে,
তাহার দু-এক গুচ্ছ তুলে নিই, চেয়ে দেখি নির্জন আমোদে
পৃথিবীর রাঙা রোদ চড়িতেছে আকাঙ্ক্ষায় চিনিচাঁপা গাছে—
জানি সে আমার কাছে আছে আজও—আজও সে আমার কাছে আছে।

২৮

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে—সব চেয়ে সুন্দর করুণ :
সেখানে সবুজ ডাঙা ভ'রে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল ;
সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল ;
সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ ;
সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে—সেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল ;
সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল,
সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ ;

সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর ;
সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে ;
সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর—
শঙ্খমালা নাম তার : এ বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
তারে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো—বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর
তাই সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।

২৯

কত ভোরে—দুপহরে—সন্ধ্যায় দেখি নীল শুপুরির বন
বাতাসে কাঁপিছে ধীরে—খাঁচার শুকের মতো গাহিতেছে গান
কোন্ এক রাজকন্যা—পরনে ঘাসের শাড়ি—কালো চুলে ধান
বাংলার শালিধান—আঙিনায় ইহাদের করেছে বরণ,
হৃদয়ে জলের গন্ধ কন্যার—ঘুম নাই, নাহিকো মরণ
তার আর কোনোদিন—পালঙ্কে সে শোয় নাকো, হয় নাকো ম্লান,

লক্ষ্মীপেঁচা শ্যামা আর শালিকের গানে তার জাগিতেছে প্রাণ—
সারা দিন—সারা রাত বুকে করে আছে তারে শুপুরির বন ;

সকালে কাকের ডাকে আলো আসে, চেয়ে দেখি কালো দাঁড়কাক
সবুজ জঙ্গল ছেয়ে শুপুরির—শ্রীমন্তও দেখেছে এমন :
যখন ময়ূরপঙ্খী ভোরের সিন্ধুর মেঘে হয়েছে অবাক,
সুদূর প্রবাস থেকে ফিরে এসে বাংলার শুপুরির বন
দেখিয়াছে—অকস্মাৎ গাঢ় নীল ; করুণ কাকের ক্লান্ত ডাক
শুনিয়াছে—সে কত শতাব্দী আগে ডেকেছিল তাহারা যখন।

৩০

এই ডাঙা ছেড়ে হায় রূপ কে খুঁজিতে যায় পৃথিবীর পথে।
বটের শুকনো পাতা যেন এক যুগান্তের গল্প ডেকে আনে :
ছড়ায়ে রয়েছে তারা প্রান্তরের পথে পথে নির্জন আঘ্রাণে ;—
তাদের উপেক্ষা ক'রে কে যাবে বিদেশে বল—আমি কোনোমতে
বাসমতী ধানক্ষেত ছেড়ে দিয়ে মালাবারে—উটির পর্বতে
যাব নাকো—দেখিব না পামগাছ মাথা নাড়ে সমুদ্রের গানে
কোন্ দেশে—কোথায় এলাচিফুল দারুচিনি বারুণীর প্রাণে
বিনুনি খসায়ে বসে থাকিবার স্বপ্ন আনে—পৃথিবীর পথে

যাব নাকো : অশ্বত্থের ঝরাপাতা ম্লান শাদা ধুলোর ভিতর,
যখন এ দুপহরে কেউ নাই কোনোদিকে—পাখিটিও নাই,
অবিরল ঘাস শুধু ছড়ায়ে রয়েছে মাটি-কাঁকরের 'পর,
খড়কুটো উল্টায়ে ফিরিতেছে দু-একটা বিষণ্ন চড়াই,
অশ্বত্থের পাতাগুলো প'ড়ে আছে ম্লান শাদা ধুলোর ভিতর ;
এই পথ ছেড়ে দিয়ে এ জীবন কোনোখানে গেল নাকো তাই।

৩১

এখানে আকাশ নীল—নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল
ফুটে থাকে হিম শাদা—রঙ তার আশ্বিনের আলোর মতন ;
আকন্দফুলের কালো ভীমরুল এইখানে করে গুঞ্জরণ
রৌদ্রের দুপুর ভ'রে—বারবার রোদ তার চিক্কণ সোনালি চুল
কাঁঠাল জামের বুকে নিঙড়ায়—দহে বিলে চঞ্চল আঙুল
বুলায়ে বুলায়ে ফেরে এইখানে জাম লিচু কাঁঠালের বন,
ধনপতি, শ্রীমন্তের, বেহুলার, লহনার ছুঁয়েছে চরণ ;
মেঠো পথে মিশে আছে কাক আর কোকিলের শরীরের ধুল,

কবেকার কোকিলের, জান কি তা ? যখন মুকুন্দরাম হায়,
লিখিতেছিলেন ব'সে দুপহরে সাধের সে অন্নদামঙ্গল,
কোকিলের ডাক শুনে লেখা তার বাধা পায়—থেমে থেমে যায়—
অথবা বেহুলা একা যখন চলেছে ভেঙে গাঙুড়ের জল
সন্ধ্যার অন্ধকারে, ধানক্ষেতে, আমবনে, অস্পষ্ট শাখায়
কোকিলের ডাক শুনে চোখে তার ফুটেছিল কুয়াশা কেবল।

৩২

কোথাও মঠের কাছে—যেইখানে ভাঙা মঠ নীল হয়ে আছে
শ্যাওলায়—অনেক গভীর ঘাস জমে গেছে বুকের ভিতর,
পাশে দীঘি মজে আছে—রুপালি মাছের কণ্ঠে কামনার স্বর
যেইখানে পাটরানী আর তার রূপসী সখীরা শুনিয়াছে
বহু—বহু দিন আগে—যেইখানে শঙ্খমালা কাঁথা বুনিয়াছে
সে কত শতাব্দী আগে মাছরাঙা-ঝিলমিল—কড়ির ঘর ;
কোন্ যেন কুহকীর ঝাড়ফুঁকে ডুবে গেছে সব তারপর ;
একদিন আমি যাব দু-পহরে সেই দূর প্রান্তরের কাছে,

সেখানে মানুষ কেউ যায় নাকো—দেখা যায় বাঘিনীর ডোরা
বেতের বনের ফাঁকে—জারুল গাছের তলে রৌদ্র পোহায়
রূপসী মৃগীর মুখ দেখা যায়—শাদা ভাঁটপুষ্পের তোড়া
আলোকলতার পাশে গন্ধ ঢালে দ্রোণফুল বাসকের গায় ;
তবুও সেখানে আমি নিয়ে যাব একদিন পাট্‌কিলে ঘোড়া,
যার রূপ জন্মে জন্মে কাঁদায়েছে আমি তারে খুঁজিব সেথায়।

৩৩

চলে যাব শুকনো পাতা-ছাওয়া ঘাসে—জামরুল হিজলের বনে ;
তল্‌তা বাঁশের ছিপ হাতে রবে—মাছ আমি ধরিব না কিছু—
দীঘির জলের গন্ধে রুপালি চিতল তার রূপসীর পিছু
জামের গভীর ডাল-ছাওয়া শান্ত নীল জলে খেলিছে গোপনে ;
আনারসঝোপে ঐ মাছরাঙা তার মাছরাঙাটির মনে
অস্পষ্ট আলোয় যেন মুছে যায়—সিঁদুরের মতো রাঙা লিচু
ঝ'রে পড়ে পাতা ঘাসে—চেয়ে দেখি কিশোরী করেছে মাথা নিচু—
এসেছে সে দুপুরের অবসরে জামরুল লিচু আহরণে—

চলে যায় ; নীলাম্বরী স'রে যায় কোকিলের পাখনার মতো
ক্ষীরুয়ের শাখা ছুঁয়ে চালতার ডাল ছেড়ে বাঁশের পিছনে
কোনো দূর আকাঙ্ক্ষার ক্ষেতে মাঠে চলে যায় যেন অব্যাহত,
যদি তার পিছে যাও দেখিবে সে আকন্দের করবীর বনে
ভোমরার ভয়ে ভীরু ; বহু ক্ষণ পায়চারি করে আনমনে
তারপর চ'লে গেল : উড়ে গেল যেন নীল ভোমরার সনে।

৩৪

এখানে ঘুঘুর ডাকে অপরাহ্ণে শান্তি আসে মানুষের মনে ;
এখানে সবুজ শাখা আঁকাবাঁকা হলুদ পাখিরে রাখে ঢেকে ;
জামের আড়ালে সেই বউকথাকওটিরে যদি ফেল দেখে
একবার—একবার দুপহর অপরাহ্ণে যদি এই ঘুঘুর গুঞ্জনে
ধরা দাও—তা হলে অনন্তকাল থাকিতে হবে যে এই বনে ;
মৌরীর গন্ধ মাখা ঘাসের শরীরে ক্লান্ত দেহটিরে রেখে
আশ্বিনের ক্ষেতঝরা কচি-কচি শ্যামাপোকাদের কাছে ডেকে
রব আমি—চাকোরীর সাথে যেন চাকোরের মতন মিলনে ;

উঠানে কে রূপবতী খেলা করে—ছড়ায়ে দিতেছে বুঝি ধান
শালিকেরে : ঘাস থেকে ঘাসে ঘাসে খুঁটে খুঁটে খেতেছে সে তাই ;
হলুদ নরম পায়ে খয়েরি শালিকগুলো ডলিছে উঠান ;
চেয়ে দেখ সুন্দরীরে : গোরোচনা রূপ নিয়ে এসেছে কি রাই !
নীলনদে—গাঢ় রৌদ্রে—করে আমি দেখিয়াছি—করেছিল স্নান—

৩৫

শ্মশানের দেশে তুমি আসিয়াছ—বহুকাল গেয়ে গেছ গান
সোনালি চিলের মতো উড়ে উড়ে আকাশের রৌদ্র আর মেঘে—
লক্ষ্মীর বাহন যেই স্নিগ্ধ পাখি আশ্বিনের জ্যোৎস্নার আবেগে
গান গায়—শুনিয়াছি রাখিপূর্ণিমার রাতে তোমার আহ্বান
তার মতো ; আম চাঁপা কদমের গাছ থেকে গাহে অফুরান
যেন স্নিগ্ধ ধান ঝরে...অনন্ত সবুজ শালি আছে যেন লেগে
বুকে তব ; বল্লালের বাংলায় কবে যে উঠিলে তুমি জেগে ;
পদ্মা-মেঘনা-ইছামতী নয় শুধু—তুমি কবি করিয়াছ স্নান

সাত সমুদ্রের জলে—ঘোড়া নিয়ে গেছ তুমি ধূম্র নারীদেশে
অর্জুনের মতো আহা—আরো দূর ম্লান নীল রূপের কুয়াশা
ফুঁড়েছ সুপর্ণ তুমি—দূর রঙ আরো দূর রেখা ভালোবেসে ;
আমাদের কালীদহ—গাঙুড়—গাঙের চিল তবু ভালোবাসা
চায় যে তোমার কাছে—চায়, তুমি ঢেলে দাও নিজের নিঃশেষে
এই দহে—এই চূর্ণ মঠে মঠে—এই জীর্ণ বটে বাঁধ বাসা।

৩৬

তবু তাহা ভুল জানি—রাজবল্লভের কীর্তি ভাঙে কীর্তিনাশা ;
তবুও পদ্মার রূপ একুশরত্নের চেয়ে আরো ঢের গাঢ়—
আরো ঢের প্রাণ তার, বেগ তার, আরো ঢের জল, জয় আরো ;
তোমারও পৃথিবী পথ ; নক্ষত্রের সাথে তুমি খেলিতেছ পাশা:
শঙ্খমালা নয় শুধু : অনুরাধা রোহিণীরও চাও ভালোবাসা,
না জানি সে কত আশা—কত ভালোবাসা তুমি বাসিতে গো পার !
এখানে নদীর ধারে বাসমতী ধানগুলো ঝরিছে আবারও ;
প্রান্তরের কুয়াশায় এইখানে বাদুড়ের যাওয়া আর আসা—

এসেছে সন্ধ্যার কাক ঘরে ফিরে ;—দাঁড়ায়ে রয়েছে জীর্ণ মঠ ;
মাঠের আঁধার পথে শিশু কাঁদে—লালপেড়ে পুরোনো শাড়ির
ছবিটি মুছিয়া যায় ধীরে ধীরে—কে এসেছে আমার নিকট ?
'কার শিশু ? বলো তুমি': শুধালাম ; উত্তর দিল না কিছু বট ;
কেউ নাই কোনোদিকে—মাঠে পথে কুয়াশার ভিড় ;
তোমারে শুধাই কবি : 'তুমিও কি জান কিছু এই শিশুটির।'

৩৭

সোনার খাঁচার বুকে রহিব না আমি আর শুকের মতন ;
কী গল্প শুনিতে চাও তোমরা আমার কাছে—কোন্ গান, বলো,
তা হলে এ দেউলের খিলানের গল্প ছেড়ে চলো, উড়ে চলো—
যেখানে গভীর ভোরে নোনাফল পাকিয়াছে—আছে আতাবন ;
পউষের ভিজে ভোরে, আজ হায় মন যেন করিছে কেমন—
চন্দ্রমালা, রাজকন্যা, মুখ তুলে চেয়ে দেখো—শুধাই, শুন লো,
কী গল্প শুনিতে চাও তোমরা আমার কাছে—কোন্ গান, বলো,
আমার সোনার খাঁচা খুলে দাও, আমি যে বনের হীরামন ;

রাজকন্যা শোনে নাকো—আজ ভোরে আরসীতে দেখেনাকো মুখ,
কোথায় পাহাড় দূরে শাদা হয়ে আছে যেন কড়ির মতন—
সেই দিকে চেয়ে চেয়ে দিনভোর ফেটে যায় রূপসীর বুক !
তবুও সে বোঝে না কি আমারও যে সাধ আছে—আছে আনমন
আমারও যে...চন্দ্রমালা রাজকন্যা, শোনো শোনো, তোলো তো চিবুক।
হাড়পাহাড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে হিম হয়ে গেছে তার স্তন।

৩৮

কত দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়াছি আমরা দুজনে ;
আকাশপ্রদীপ জ্বেলে তখন কাহারা যেন কার্তিকের মাস
সাজায়েছে—মাঠ থেকে গাজন গানের ম্লান ধোঁয়াটে উচ্ছ্বাস
ভেসে আসে—ডানা তুলে সাপমাসী উড়ে যায় আপনার মনে
আকন্দ বনের দিকে—একদল দাঁড়কাক ম্লান গুঞ্জরণে
নাটার মতন রাঙা মেঘ নিঙড়ায়ে নিয়ে সন্ধ্যার আকাশ
দুমুহূর্তে ভ'রে রাখে—তারপর মৌরীর গন্ধ মাখা ঘাস

পড়ে থাকে ; লক্ষ্মীপেঁচা ডাল থেকে ডালে শুধু উড়ে চলে বনে

আধ ফোটা জ্যোৎস্নায় ; তখন ঘাসের পাশে কতদিন তুমি
হলুদ শাড়িটি বুকে অন্ধকারে ফিঙ্গার পাখনার মতো
বসেছ আমার কাছে এইখানে—আসিয়াছে শটিবন চুমি
গভীর আঁধার আরো—দেখিয়াছি বাদুড়ের মৃদু অবিরত
আসা-যাওয়া আমরা দুজনে বসে—বলিয়াছি ছেঁড়াফাঁড়া কত
মাঠ ও চাঁদের কথা : ম্লান চোখে একদিন সব শুনেছ তো।

৩৯

এ-সব কবিতা আমি যখন লিখেছি বসে নিজ মনে একা ;
চালতার পাতা থেকে টুপ্ টুপ্ জ্যোৎস্নায় ঝরেছে শিশির ;
কুয়াশায় স্থির হয়ে ছিল ম্লান ধানসিড়ি নদীটির তীর ;
বাদুড় আঁধার ডানা মেলে হিম জ্যোৎস্নায় কাটিয়াছে রেখা
আকাঙ্ক্ষার ; নিভু দীপ আগলায়ে মনোরমা দিয়ে গেছে দেখা
সঙ্গে তার কবেকার মৌমাছির...কিশোরীর ভিড়
আমের বউল দিল শীতরাতে—আনিল আতার হিম ক্ষীর ;
মলিন আলোয় আমি তাহাদের দেখিলাম—এ কবিতা লেখা

তাহাদের ম্লান চুল মনে ক'রে ; তাহাদের কড়ির মতন
ধূসর হাতের রূপ মনে ক'রে ; তাহাদের হৃদয়ের তরে।
সে কত শতাব্দী আগে তাহাদের করুণ শঙ্খের মতো স্তন
তাদের হলুদ শাড়ি—ক্ষীর দেহ—তাহাদের অপরূপ মন
চলে গেছে পৃথিবীর সব চেয়ে শান্ত হিম সান্ত্বনার ঘরে :
আমার বিষণ্ন স্বপ্নে থেকে-থেকে তাহাদের ঘুম ভেঙে পড়ে।

৪০

কত দিন তুমি আর আমি এসে এইখানে বসিয়াছি ঘরের ভিতর
খড়ের চালের নীচে, অন্ধকারে—সন্ধ্যায় ধূসর সজল
মৃদু হাত খেলিতেছে হিজল জামের ডালে—বাদুড় কেবল
করিতেছে আসা-যাওয়া আকাশের মৃদু পথে—ছিন্ন ভিজে খড়
বুকে নিয়ে সনকার মতো যেন পড়ে আছে নরম প্রান্তর ;
বাঁকা চাঁদ চেয়ে আছে—কুয়াশায় গা ভাসায়ে দেয় অবিরল
নিঃশব্দ গুবরে পোকা—সাপমাসী—ধানী শ্যামাপোকাদের দল ;
দিকে দিকে চালধোয়া গন্ধ মৃদু—ধূসর শাড়ির ক্ষীণ স্বর
শোনা যায়—মানুষের হৃদয়ের পুরোনো নীরব
বেদনার গন্ধ ভাসে—খড়ের চালের নীচে তুমি আর আমি
কত দিন মলিন আলোয় বসে দেখেছি বুঝেছি এই সব ;
সময়ের হাত থেকে ছুটি পেয়ে স্বপনের গোধূলিতে নামি
খড়ের চালের নীচে মুখোমুখি বসে থেকে তুমি আর আমি
ধূসর আলোয় বসে কতদিন দেখেছি বুঝেছি এই সব।

৪১

এখানে প্রাণের স্রোত আসে যায়—সন্ধ্যায় ঘুমায় নীরবে
মাটির ভিটের 'পরে—লেগে থাকে অন্ধকার ধুলোর আঘ্রাণ
তাহাদের চোখে-মুখে—কদমের ডালে পেঁচা গেয়ে যায় গান ;
মনে হয় একদিন পৃথিবীতে হয়তো এ জ্যোৎস্না শুধু রবে,
এই শীত রবে শুধু ; রাত্রি ভ'রে এই লক্ষ্মীপেচাঁ কথা কবে—
কাঁঠালের ডাল থেকে হিজলের ডালে গিয়ে করিবে আহ্বান
সাপমাসী পোকাটিরে...সেই দিন আঁধারে উঠিবে ন'ড়ে ধান

ইঁদুরের ঠোঁটে চোখে—বাদুড়ের কালো ডানা করমচা পল্লবে

কুয়াশারে নিঙড়ায়ে উড়ে যাবে আরো দূর নীল কুয়াশায়,
কেউ তাহা দেখিবে না—সেদিন এ পাড়াগাঁর পথের বিস্ময়
দেখিতে পাব না আর—ঘুমায়ে রহিবে সব : যেমন ঘুমায়
আজ রাতে ; যেমন—ঘুমায় মৃত যারা ; যেমন হতেছে ক্ষয়
অশ্বত্থ ঝাউয়ের পাতা চুপে চুপে আজ রাতে হায় ;
যেমন ঘুমায় মৃতা—তাহার বুকের শাড়ি যেমন ঘুমায়।

৪২

একদিন যদি আমি কোনো দূর মান্দ্রাজের সমুদ্রের জলে
ফেনার মতন ভাসি শীত রাতে—আসি নাকো তোমাদের মাঝে
ফিরে আর—লিচুর পাতার 'পরে বহুদিন সাঁঝে
যেই পথে আসা-যাওয়া করিয়াছি—একদিন নক্ষত্রের তলে
কয়েকটা নাটাফল তুলে নিয়ে আনারসী শাড়ির আঁচলে
ফিঙার মতন তুমি লঘু চোখে চ'লে যাও জীবনের কাজে,
এই শুধু...বেজির পায়ের শব্দ পাতার উপরে যদি বাজে
সারারাত...ডানার অস্পষ্ট ছায়া বাদুড়ের ক্লান্ত হয়ে চলে

যদি সে পাতার 'পরে—শেষ রাতে পৃথিবীর অন্ধকারে শীতে
তোমার ক্ষীরের মতো মৃদু দেহ—ধূসর চিবুক, বাম হাত
চালতা গাছের পাশে খোড়ো ঘরে স্নিগ্ধ হয়ে ঘুমায় নিভৃতে,
তবুও তোমার ঘুম ভেঙে যাবে একদিন চুপে অকস্মাৎ,
তুমি যে কড়ির মালা দিয়েছিলে—সে হার ফিরায়ে দিয়ে দিতে
যখন কে এক ছায়া এসেছিল...দরজায় করে নি আঘাত।

৪৩

দূর পৃথিবীর গন্ধে ভরে ওঠে আমার এ বাঙালির মন
আজ রাতে ; একদিন মৃত্যু এসে যদি দূর নক্ষত্রের তলে
অচেনা ঘাসের বুকে আমারে ঘুমায়ে যেতে বলে,
তবুও সে ঘাস এই বাংলার অবিরল ঘাসের মতন
মউরীর মৃদু গন্ধে ভরে রবে—কিশোরীর স্তন
প্রথম জননী হয়ে যেমন ননীর ঢেউয়ে গলে
পৃথিবীর সব দেশে—সব চেয়ে ঢের দূর নক্ষত্রের তলে
সব পথে এইসব শান্তি আছে : ঘাস—চোখ—শাদা হাত—স্তন—

কোথাও আসিবে মৃত্যু—কোথাও সবুজ মৃদু ঘাস
আমারে রাখিবে ঢেকে—ভোরে, রাতে, দুপহরে পাখির হৃদয়
ঘাসের মতন সাধে ছেয়ে রবে—রাতের আকাশ
নক্ষত্রের নীল ফুলে ফুটে রবে—বাংলার নক্ষত্র কি নয় ?
জানি নাকো ; তবুও তাদের বুকে স্থির শান্তি—শান্তি লেগে রয় :
আকাশের বুকে তারা যেন চোখ—শাদা হাত—যেন স্তন—ঘাস— ।

৪৪

১৩২৬-এর কতকগুলো দিনের স্মরণে

অশ্বত্থ বটের পথে অনেক হয়েছি আমি তোমাদের সাথী ;
ছড়ায়েছি খই ধান বহু দিন উঠানের শালিকের তরে ;
সন্ধ্যায় পুকুর থেকে হাঁসটিরে নিয়ে আমি তোমাদের ঘরে
গিয়েছি অনেক দিন—দেখিয়াছি ধূপ জ্বাল, ধর সন্ধ্যাবাতি
থোড়ের মতন শাদা ভিজে হাতে—এখুনি আসিবে কিনা রাতি

বিনুনি বেঁধেছ তাই—কাঁচপোকা টিপ তুমি কপালের ’পরে
পরিয়াছ...তারপর ঘুমায়েছ : জরিপাড় আঁচলটি ঝরে
পানের বাটার ’পরে ; নোনার মতন নম্র শরীরটি পাতি

নির্জন পালঙ্কে তুমি ঘুমায়েছ—বউকথাকওটির ছানা
নীল জামরুল-নীড়ে—জ্যোৎস্নায়—ঘুমায়ে রয়েছে যেন হায়,
আর রাত্রি মাতা-পাখিটির মতো ছড়ায়ে রয়েছে তার ডানা।...
আজ আমি ক্লান্ত চোখে ব্যবহৃত জীবনের ধুলোয় কাঁটায়
চলে গেছি বহু দূরে—দেখ নিকো, বোঝ নিকো, কর নিকো মানা ;
রূপসী শঙ্খের কৌটা তুমি যে গো প্রাণহীন—পানের বাটায়।

৪৫

ঘাসের বুকের থেকে কবে আমি পেয়েছি যে আমার শরীর—
সবুজ ঘাসের থেকে ; তাই রোদ ভালো লাগে—তাই নীলাকাশ
মৃদু ভিজে সকরুণ মনে হয়—পথে পথে তাই এই ঘাস
জলের মতন স্নিগ্ধ মনে হয়—মউমাছিদের যেন নীড়
এই ঘাস—যত দূর যাই আমি আরো যত দূর পৃথিবীর
নরম পায়ের তলে যেন কত কুমারীর বুকের নিশ্বাস
কথা কয়—তাহাদের শান্ত হাত খেলা করে—তাদের খোঁপার ফাঁস
খুলে যায়—ধূসর শাড়ির গন্ধে আসে তারা—অনেক নিবিড়

পুরোনো প্রাণের কথা কয়ে যায়—হৃদয়ের বেদনার কথা—
সান্ত্বনার নিভৃত নরম কথা—মাঠের চাঁদের গল্প করে—
আকাশের নক্ষত্রের কথা কয়—শিশিরের শীত সরলতা
তাহাদের ভালো লাগে—কুয়াশারে ভালো লাগে চোখের উপরে ;
গরম বৃষ্টির ফোঁটা ভালো লাগে ; শীত রাতে—পেঁচার নম্রতা ;
ভালো লাগে এই যে অশ্বত্থপাতা আমপাতা সারারাত ঝরে।

৪৬

বৃষ্টির জল

এই জল ভালো লাগে ;—বৃষ্টির রুপালি জল কতদিন এসে
ধুয়েছে আমার দেহ—বুলায়ে দিয়েছে চুল—চোখের উপরে
তার শান্ত স্নিগ্ধ হাত রেখে কত খেলিয়াছে—আবেগের ভরে
ঠোঁটে এসে চুমো দিয়ে চ'লে গেছে কুমারীর মতো ভালোবেসে ;
এই জল ভালো লাগে—নীল পাতা মৃদু ঘাস রৌদ্রের দেশে
ফিঙা যেমন তার দিনগুলো ভালোবাসে—বনের ভিতরে
বারবার উড়ে যায়—তেমনি গোপন প্রেমে এই জল ঝরে
আমার দেহের 'পরে আমার চোখের 'পরে ধানের আবেশে

ঝ'রে পড়ে—যখন অঘ্রান রাতে ভরা ক্ষেত হয়েছে হলুদ,
যখন জামের জালে পেঁচার নরম হিম গান শোনা যায়,
বনের কিনারে ঝরে যেই ধান বুকে ক'রে শান্ত শালি-ক্ষুদ,
তেমনি ঝরিছে জল আমার ঠোঁটের 'পরে—চোখের পাতায়—
আমার চুলের 'পরে—অপরাহ্নে রাঙা রোদ সবুজ আতায়
রেখেছে নরম হাত যেন তার—ঢালিছে বুকের থেকে দুধ।

৪৭

একদিন পৃথিবীর পথে আমি ফলিয়াছি ; আমার শরীর
নরম ঘাসের পথে হাঁটিয়াছে ; বসিয়াছে ঘাসে,
দেখিয়াছে নক্ষত্রেরা জোনাকী পোকার মতো কৌতুকের মতন আকাশে
খেলা করে ; নদীর জলের গন্ধে ভরে যায় ভিজে স্নিগ্ধ তীর
অন্ধকারে ; পথে পথে শব্দ পাই কাহাদের নরম শাড়ির,
ম্লান চুল দেখা যায় ; সান্ত্বনার কথা নিয়ে কারা কাছে আসে—

ধূসর কড়ির মতো হাতগুলো—নগ্ন হাত সন্ধ্যার বাতাসে
দেখা যায় ; হলুদ ঘাসের কাছে মরা হিম প্রজাপতিটির

সুন্দর করুণ পাখা পড়ে আছে—দেখি আমি ; চুপে থেমে থাকি ;
আকাশে কমলা রঙ ফুটে ওঠে সন্ধ্যায়—কাকগুলো নীল মনে হয় ;
অনেক লোকের ভিড়ে ডুবে যাই—কথা কই—হাতে হাত রাখি :
করুণ বিষণ্ন চুলে কার যেন কোথাকার গভীর বিস্ময়
লুকায়ে রয়েছে বুঝি...নক্ষত্রের নীচে আমি ঘুমাই একাকী !
পেঁচার ধূসর ডানা সারারাত জোনাকীর সাথে কথা কয়।

৪৮

পৃথিবীর পথে আমি বহু দিন বাস ক'রে হৃদয়ের নরম কাতর
অনেক নিভৃত কথা জানিয়াছি ; পৃথিবীতে আমি বহুদিন
কাটায়েছি ; বনে বনে ডালপালা উড়িতেছে—যেন পরী জিন্
কথা কয় ; ধূসর সন্ধ্যায় আমি ইহাদের শরীরের 'পর
খইয়ের ধানের মতো দেখিয়াছি ঝরে ঝর্ ঝর্
দু-ফোঁটা মাঘের বৃষ্টি—শাদা ধুলো জলে ভিজে হয়েছে মলিন,
ম্লান গন্ধ মাঠে ক্ষেতে—গুবরে পোকার তুচ্ছ বুক থেকে ক্ষীণ
অস্পষ্ট করুণ শব্দ ডুবিতেছে অন্ধকারে নদীর ভিতর :

এইসব দেখিয়াছি ; দেখিয়াছি নদীটিরে—মজিতেছে ঢালু অন্ধকারে ;
সাপমাসী উড়ে যায় ; দাঁড়কাক অশ্বত্থের নীড়ের ভিতর
পাখনার শব্দ করে অবিরাম ; কুয়াশায় একাকী মাঠের ধারে
কে যেন দাঁড়ায়ে আছে ; আরো দূরে দু-একটা স্তব্ধ খোড়ো ঘর
প'ড়ে আছে ; নলখাগড়ার বনে ব্যাঙ ডাকে কেন যেন—থামিতে কি পারে ;
'তুমি কেন এইখানে', 'তুমি কেন এইখানে'—শরের বনের থেকে

দেয় সে উত্তর।
(আবার পাখনা নাড়ে—কাকের তরুণ ডিম পিছলায়ে পড়ে যায়
শ্যাওড়ার ঝাড়ে।)

৪৯

মানুষের ব্যথা আমি পেয়ে গেছি পৃথিবীর পথে এসে—হাসির আস্বাদ
পেয়ে গেছি; দেখেছি আকাশে দূরে কড়ির মতন শাদা মেঘের পাহাড়ে
সূর্যের রাঙা ঘোড়া : পক্ষিরাজের মতো কমলারঙের পাখা ঝাড়ে
রাতের কুয়াশা ছিঁড়ে; দেখেছি শরের বনে শাদা রাজহাঁসদের সাধ
উঠেছে আনন্দে জেগে—নদীর স্রোতের দিকে বাতাসের মতন অবাধ
চ'লে গেছে কলরবে; দেখেছি সবুজ ঘাস—যত দূর চোখ যেতে পারে :
ঘাসের প্রকাশ আমি দেখিয়াছি অবিরল,—পৃথিবীর ক্লান্ত বেদনারে
ঢেকে আছে; দেখিয়াছি বাসমতী, কাশবন, আকাঙ্ক্ষার রক্ত, অপরাধ

মুছায়ে দিতেছে যেন বারবার—কোন্ এক রহস্যের কুয়াশার থেকে
যেখানে জন্মে না কেউ, যেখানে মরে না কেউ, সেই কুহকের থেকে এসে
রাঙা রোদ, শালি ধান, ঘাস, কাশ, মরালেরা বারবার রাখিতেছে ঢেকে
আমাদের রুক্ষ প্রশ্ন, ক্লান্ত ক্ষুধা, স্ফুট মৃত্যু—আমাদের বিস্মিত নীরব
রেখে দেয়—পৃথিবীর পথে আমি কেটেছি আঁচড় ঢের, অশ্রু গেছি রেখে :
তবু ঐ মরালীরা কাশ ধান রোদ ঘাস এসে এসে মুছে দেয় সব।

৫০

তুমি কেন বহু দূরে—ঢের দূরে—আরো দূরে—নক্ষত্রের অস্পষ্ট আকাশ,
তুমি কেন কোনোদিন পৃথিবীর ভিড়ে এসে বল নাকো একটিও কথা;
আমরা মিনার গড়ি—ভেঙে পড়ে দু-দিনেই—স্বপনের ডানা ছিঁড়ে ব্যথা

রক্ত হয়ে ঝরে শুধু এইখানে—ক্ষুধা হয়ে ব্যথা দেয়—নীল নাভিশ্বাস
ফেনায়ে তুলিছে শুধু পৃথিবীতে পিড়ামিড-যুগ থেকে আজও বারোমাস ;
আমাদের সত্য, আহা, রক্ত হয়ে ঝরে শুধু—আমাদের প্রাণের মমতা
ফড়িঙের ডানা নিয়ে ওড়ে, আহা : চেয়ে দেখে অন্ধকার কঠিন ক্ষমতা
ক্ষমাহীন—বারবার পথ আটকায়ে ফেলে—বারবার করে তারে গ্রাস ;

তারপর চোখ তুলে দেখি অই কোন্ দূর নক্ষত্রের ক্লান্ত আয়োজন
ক্লান্তিরে ভুলিতে বলে—ঘিয়ের সোনার-দীপে লাল নীল শিখা
জ্বলিতেছে যেন দূর রহস্যের কুয়াশায়—আবার স্বপ্নের গন্ধে মন
কেঁদে ওঠে—তবু জানি আমাদের স্বপ্ন হতে অশ্রু ক্লান্তি রক্তের কণিকা
ঝরে শুধু—স্বপ্ন কি দেখে নি বুদ্ধ—নিউসিডিয়ায় বসে দেখে নি মণিকা ?
স্বপ্ন কি দেখে নি রোম, এশিরিয়া, উজ্জয়িনী, গৌড়-বাংলা, দিল্লী, বেবিলন ?

৫১

আমাদের রূঢ় কথা শুনে তুমি স'রে যাও আরো দূরে বুঝি নীলাকাশ ;
তোমার অনন্ত নীল সোনালি ভোমরা নিয়ে কোনো দূর শান্তির ভিতরে
ডুবে যাবে ?...কত কাল কেটে গেল, তবু তার কুয়াশার পর্দা না সরে,
পিরামিড বেবিলন শেষ হল—ঝ'রে গেল কতবার প্রান্তরের ঘাস ;
তবুও লুকায়ে আছে যেই রূপ নক্ষত্রে তা কোনোদিন হল না প্রকাশ ;
যেই স্বপ্ন সেই সত্য নিয়ে আজ আমরা চলিয়া যাই ঘরে,
কোনো এক অন্ধকারে হয়তো তা আকাশের যাযাবর মরালের স্বরে
নতুন স্পন্দন পায়—নতুন আগ্রহে গন্ধে ভরে ওঠে পৃথিবীর শ্বাস ;

তখন আমরা অই নক্ষত্রের দিকে চাই—মনে হয় সব অস্পষ্টতা
ধীরে ধীরে ঝরিতেছে—যেই রূপ কোনোদিন দেখি নাই পৃথিবীর পথে,
যেই শান্তি মৃত জননীর মতো চেয়ে থাকে—কয় নাকো কথা,
যেই স্বপ্ন বারবার নষ্ট হয় আমাদের এই সত্য রক্তের জগতে,

আজ যাহা ক্লান্ত ক্ষীণ, আজ যাহা নগ্ন চূর্ণ—অন্ধ মৃত হিম,
একদিন নক্ষত্রের দেশে তারা হয়ে রবে গোলাপের মতন রক্তিম।

৫২

এই পৃথিবীতে আমি অবসর নিয়ে শুধু আসিয়াছি—আমি হৃষ্ট কবি
আমি এক—ধুয়েছি আমার দেহ অন্ধকারে একা একা সমুদ্রের জলে ;
ভালোবাসিয়াছি আমি রাঙা রোদ, ক্ষান্ত কার্তিকের মাঠে—ঘাসের আঁচলে
ফড়িঙের মতো আমি বেড়ায়েছি—দেখেছি কিশোরী এসে হলুদ করবী
ছিঁড়ে নেয়—বুকে তার লালপেড়ে ভিজে শাড়ি করুণ শঙ্খের মতো ছবি
ফুটাতেছে—ভোরের আকাশখানা রাজহাঁস ভরে গেছে নব কোলাহলে
নব নব সূচনার ; নদীর গোলাপি ঢেউ কথা বলে—তবু কথা বলে,
তবু জানি তার কথা কুয়াশায় ফুরায় না—কেউ যেন শুনিতেছে সবই

কোন্ রাঙা শাটিনের মেঘে ব'সে—অথবা শোনে না কেউ, শূন্য কুয়াশায়
মুছে যায় সব তার ; একদিন বর্ণচ্ছটা মুছে যাব আমিও অমন ;
তবু আজ সবুজ ঘাসের 'পরে বসে থাকি ; ভালোবাসি ; প্রেমের আশায়
পায়ের ধ্বনির দিকে কান পেতে থাকি চুপে ; কাঁটাবহরের ফল করি আহরণ :
কারে যেন এইগুনো দেব আমি ; মৃদু ঘাসে একা একা ব'সে থাকা যায়
এই সব সাধ নিয়ে ; যখন আসিবে ঘুম তারপর, ঘুমাব তখন।

৫৩

বাতাসে ধানের শব্দ শুনিয়াছি—ঝরিতেছে ধীরে-ধীরে অপরাহ্ণ ভরে ;
সোনালি রোদের রঙ দেখিয়াছি—দেহের প্রথম কোন্ প্রেমের মতন
রূপ তার—এলোচুল ছড়ায়ে রেখেছে ঢেকে গূঢ় রূপ—আনারস বন ;
ঘাস আমি দেখিয়াছি ; দেখেছি সজনে ফুল চুপে চুপে পড়িতেছে ঝ'রে

মৃদু ঘাসে ; শান্তি পায় ; দেখেছি হলুদ পাখি বহুক্ষণ থাকে চুপ করে,
নির্জন আমের ডালে দুলে যায়—দুলে যায়—বাতাসের সাথে বহুক্ষণ ;
শুধু কথা, গান নয়—নীরবতা রচিতেছে আমাদের সবার জীবন
বুঝিয়াছি : শুপুরির সারিগুলো দিনরাত হাওয়ায় উঠিতে আছে ন'ড়ে,

দিনরাত কথা কয়, ক্ষীরের মতন ফুল বুকে ধরে, তাদের উৎসব
ফুরায় না ; মাছরাঙাটির সাথী মরে গেছে—দুপুরের নিঃসঙ্গ বাতাসে
তবু ঐ পাখিটির নীল লাল কমলা রঙের ডানা স্ফুট হয়ে ভাসে
আম নিম জামরুলে ; প্রসন্ন প্রাণের স্রোত—অশ্রু নাই—প্রশ্ন নাই কিছু,
ঝিলমিল ডানা নিয়ে উড়ে যায় আকাশের থেকে দূর আকাশের পিছু ;
চেয়ে দেখি ঘুম নাই—অশ্রু নাই—প্রশ্ন নাই বটফলগন্ধ-মাখা ঘাসে।

৫৪

একদিন এই দেহ ঘাস থেকে ধানের আঘ্রাণ থেকে এই বাংলার
জেগেছিল ; বাঙালি নারীর মুখ দেখে রূপ চিনেছিল দেহ একদিন ;
বাংলার পথে পথে হেঁটেছিল গাঙচিল শালিকের মতন স্বাধীন ;
বাংলার জল দিয়ে ধুয়েছিল ঘাসের মতন স্ফুট দেহখানি তার ;
একদিন দেখেছিল ধূসর বকের সাথে ঘরে চ'লে আসে অন্ধকার
বাংলার ; কাঁচা কাঠ জ্বলে ওঠে—নীল ধোঁয়া নরম মলিন
বাতাসে ভাসিয়া যায় কুয়াশার করুণ নদীর মতো ক্ষীণ ;
ফেনসা ভাতের গন্ধে আমমুকুলের গন্ধ মিশে যায় যেন বারবার ;

এই সব দেখেছিল ; রূপ যেই স্বপ্ন আনে—স্বপ্নে যেই রক্তাক্ততা আছে,
শিখেছিল সেই সব একদিন বাংলার চন্দ্রমালা রূপসীর কাছে ;
তারপর বেতবনে, জোনাকী ঝিঁঝির পথে হিজল আমের অন্ধকারে
ঘুরেছে সে সৌন্দর্যের নীল স্বপ্ন বুকে ক'রে—রূঢ় কোলাহলে গিয়ে তারে—

ঘুমন্ত কন্যারে সেই জাগাতে যায় নি আর—হয়তো সে কন্যার হৃদয়
শঙ্খের মতন রুক্ষ, অথবা পদ্মের মতো—ঘুম তবু ভাঙিবার নয়।

৫৫

আজ তারা কই সব ? ওখানে হিজল গাছ ছিল এক—পুকুরের জলে
বহুদিন মুখ দেখে গেছে তার ; তারপর কী যে তার মনে হল কবে
কখন সে ঝরে গেল, কখন ফুরাল, আহা,—চলে গেল কবে যে নীরবে,
তাও আর জানি নাকো—ঠোঁট-ভাঙা দাঁড়কাক ঐ বেলগাছটির তলে
রোজ ভোরে দেখা দিত—অন্য সব কাক আর শালিকের হৃষ্ট কোলাহলে
তারে আর দেখি নাকো—কত দিন দেখি নাই ; সে আমার ছেলেবেলা হবে,
জানালার কাছে এক বোলতার চাক ছিল—হৃদয়ের গভীর উৎসবে
খেলা ক'রে গেছে তারা বহু দিন—ফড়িঙ কীটের দিন যত দিন চলে

তাহারা নিকটে ছিল—রোদের আনন্দে মেতে—অন্ধকারে শান্ত ঘুম খুঁজে
বহু দিন কাছে ছিল—অনেক কুকুর আজ পথে ঘাটে নড়চড়া করে
তবুও আঁধারে ঢের মৃত কুকুরের মুখ—মৃত বিড়ালের ছায়া ভাসে ;
কোথায় গিয়েছে তারা ? অই দূর আকাশের নীল লাল তারার ভিতরে
অথবা মাটির বুকে মাটি হয়ে আছে শুধু—ঘাস হয়ে আছে শুধু ঘাসে ?
শুধালাম...উত্তর নাইকো কিছু উদাসীন অসীম আকাশে।

৫৬

হৃদয়ে প্রেমের দিন কখন যে শেষ হয়—চিতা শুধু পড়ে থাকে তার,
আমরা জানি না তাহা—মনে হয় জীবনে যা আছে আজও তাই শালিধান
রূপশালি ধান তাহা...রূপ, প্রেম...এই ভাবি...খোসার মতন ম্লান
একদিন তাহাদের অসাড়তা ধরা পড়ে—যখন সবুজ অন্ধকার,
নরম রাত্রির দেশ, নদীর জলের গন্ধ কোন্ এক নবীনাগতার

মুখখানা নিয়ে আসে—মনে হয় কোনোদিন পৃথিবীতে প্রেমের আহ্বান
এমন গভীর ক'রে পেয়েছি কি : প্রেম যে নক্ষত্র আর নক্ষত্রের গান,
প্রাণ যে অন্ধকারের মতো প্রান্তরের গাঢ় নীল অমাবস্যার—

চলে যায় আকাশের সেই দূর নক্ষত্রের লাল নীল শিখার সন্ধানে,
প্রাণ যে আঁধার রাত্রি আমার এ—আর তুমি স্বাতীর মতন
রূপের বিচিত্র বাতি নিয়ে এলে—তাই প্রেম ধুলায় কাঁটায় যেইখানে
মৃত হয়ে পড়ে ছিল পৃথিবীর শূন্য পথে পেল সে গভীর শিহরণ ;
তুমি সখি, ডুবে যাবে মুহূর্তেই রোমহর্ষে—অরুণের স্নানে
জানি আমি ; প্রেম যে তবুও প্রেম : স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে রবে, বাঁচিতে সে জানে।

৫৭

কোনোদিন দেখিব না তারে আমি ; হেমন্তে পাকিবে ধান, আষাঢ়ের রাতে
কালো মেঘ নিঙড়ায়ে সবুজ বাঁশের বন গেয়ে যাবে উচ্ছ্বাসের গান
সারা রাত,—তবু আমি সাপচরা অন্ধ পথে—বেণুবনে তাহার সন্ধান
পাব নাকো : পুকুরের পাড়ে সে যে আসিবে না কোনোদিন হাসিনের সাথে,
সে কোনো জ্যোৎস্নায় আর আসিবে না—আসিবে না কখনও প্রভাতে,
যখন দুপুরে রোদে অপরাজিতার মুখ হয়ে থাকে ম্লান,
যখন মেঘের রঙে পথহারা দাঁড়কাক পেয়ে গেছে ঘরের সন্ধান,
ধূসর সন্ধ্যায় সেই আসিবে না সে এখানে—এইখানে ধুন্দুল লতাতে

জোনাকী আসিবে শুধু ; ঝিঁঝি শুধু সারা রাত কথা কবে ঘাসে আর ঘাসে ;
বাদুড় উড়িবে শুধু পাখনা ভিজায়ে নিয়ে শান্ত হয়ে রাতের বাতাসে ;
প্রতিটি নক্ষত্র তার স্থান খুঁজে জেগে রবে প্রতিটির পাশে
নীরব ধূলির কণা লেগে রবে তুচ্ছ অণুকণাটির শ্বাসে
অন্ধকারে—তুমি, সখি, চলে গেলে দূরে তবু—হৃদয়ের গভীর বিশ্বাসে
অশ্বত্থের শাখা ঐ দুলিতেছে : আলো আসে, ভোর হয়ে আসে।

৫৮

ঘাসের ভিতরে যেই চড়ায়ের শাদা ডিম ভেঙে আছে—আমি ভালোবাসি
নিস্তব্ধ করুণ মুখ তার এই—কবে যেন ভেঙেছিল—ঢের ধুলো খড়
লেগে আছে বুকে তার—বহুক্ষণ চেয়ে থাকি—তারপর ঘাসের ভিতর
শাদা শাদা ধুলোগুলো পড়ে আছে দেখা যায় : খইধান দেখি একরাশি
ছড়ায়ে রয়েছে চুপে : নরম বিষণ্ন গন্ধ পুকুরের জল থেকে উঠিতেছে ভাসি ;
কান পেতে থাক যদি—শোনা যায়, সরপুঁটি চিতলের উদ্ভাসিত স্বর
মীনকন্যাদের মতো : সবুজ জলের ফাঁকে তাদের পাতালপুরীর ঘর
দেখা যায়—রহস্যের কুয়াশায় অপরূপ—রুপালি মাছের দেহ : গভীর উদাসী

চলে যায় মন্ত্রিকুমারের মতো, কোটাল-ছেলের মতো, রাজার-ছেলের মতো মিলে
কোন্ এক আকাঙ্ক্ষার উদ্ঘাটনে কত দূরে—বহুক্ষণ চেয়ে থাকি একা ;
অপরাহ্ন এল বুঝি ?—রাঙা রৌদ্রে মাছরাঙা উড়ে যায়—ডানা ঝিলমিলে ;
এখুনি আসিবে সন্ধ্যা,—পৃথিবীতে ম্রিয়মাণ গোধূলি নামিলে
নদীর নরম মুখ দেখা যাবে—মুখে তার দেহে তার কত মৃদু রেখা
তোমারই মুখের মতো : তবুও তোমার সাথে কোনোদিন হবে নাকো দেখা।

৫৯

(এই সব ভালো লাগে) : জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের সোনালি রোদ এসে
আমারে ঘুমাতে দেখে বিছানায়,—আমার কাতর চোখ, আমার বিমর্ষ চুল—
এই নিয়ে খেলা করে : জানে সে যে বহুদিন আগে আমি করেছি কি ভুল
পৃথিবীর সব চেয়ে ক্ষমাহীন গাঢ় এক রূপসীর মুখ ভালোবেসে :
পউষের শেষ রাতে আজও আমি দেখি চেয়ে আবার সে আমাদের দেশে
ফিরে এল ; রঙ তার কেমন তা জানে অই টস্‌টসে্ ভিজে জামরুল,
নরম জামের মতো চুল তার, ঘুঘুর বুকের মতো করুণ আঙুল—

পউষের শেষ রাতে নিমপেঁচাটির সাথে আসে সে যে ভেসে

কবেকার মৃত কাক : পৃথিবীর পথে আজ নাই সে তো আর ;
তবুও সে ম্লান জানালার পাশে উড়ে আসে নীরব সোহাগে,
মলিন পাখনা তার খড়ের চালের হিম শিশিরে মাখায় ;
তখন এ পৃথিবীতে কোনো পাখি জেগে এসে বসেনি শাখায় ;
পৃথিবীও নাই আর—দাঁড়কাক একা একা সারা রাত জাগে ;
'কী বা, হায়, আসে যায়', বলি আমি, 'তারে যদি কোনোদিন না পাই আবার ?'
নিমপেঁচা তবু হাঁকে : 'পাবে নাকো কোনোদিন, পাবে নাকো কোনোদিন,
পাবে নাকো কোনোদিন আর।'

৬০

সন্ধ্যা হয়—চারিদিকে মৃদু নীরবতা ;
কুটা মুখে নিয়ে এক শালিক যেতেছে উড়ে চুপে ;
গোরুর গাড়িটি যায় মেঠো পথ বেয়ে ধীরে ধীরে ;
আঙিনা ভরিয়া আছে সোনালি খড়ের স্তূপে ;

পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে ;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে ;
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দুজনার মনে ;
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে।

৬১

একদিন কুয়াশার এই মাঠে আমারে পাবে না কেউ খুঁজে আর, জানি ;
হৃদয়ের পথ-চলা শেষ হল সেই দিন—গিয়েছে সে শান্ত হিম ঘরে,
অথবা সান্ত্বনা পেতে দেরি হবে কিছুকাল—পৃথিবীর এই মাঠখানি

ভুলিতে বিলম্ব হবে কিছুদিন ; এ মাঠের কয়েকটা শালিকের তরে

আশ্চর্য বিস্ময়ে আমি চেয়ে রব কিছুকাল অন্ধকার বিছানার কোলে,
আর সে সোনালি চিলের ডানা মেলে দূর থেকে আজও কি মাঠের কুয়াশায়
ভেসে আসে ? সেই ন্যাড়া অশ্বত্থের পানে আজও চ'লে যায় সন্ধ্যা সোনার মতো হলে
ধানের নরম শিষে মেঠো ইঁদুরের চোখ নক্ষত্রের দিকে আজও চায় ?

সন্ধ্যা হলে ? মউমাছি চাক আজও বাঁধে না কি জামর নিবিড় ঘন ডালে,
মউ খাওয়া হয়ে গেলে আজও তারা উড়ে যায় কুয়াশায় সন্ধ্যার বাতাসে—
কত দূরে যায়, আহা...অথবা হয়তো কেউ চালতার ঝরাপাতা জ্বালে
মধুর চাকের নীচে—মাছিগুলো উড়ে যায়...ঝ'রে পড়ে...ম'রে থাকে ঘাসে—

ভেবে ভেবে ব্যথা পাব—মনে হবে, পৃথিবীর পথে যদি থাকিতাম বেঁচে,
কিন্তু থাক্, সেই লক্ষ্মীপেঁচাটির মুখ যারে কোনোদিন ভালো ক'রে দেখি নাই আমি—
এমনি লাজুক পাখি—ধূসর ডানা কি তার কুয়াশার ঢেউয়ে ওঠে নেচে ;
যখন সাতটি তারা ফুটে ওঠে অন্ধকারে গাবের নিবিড় বুকে আসে সে কি নামি ?

জিউলির বাবলার আঁধার গলির ফাঁকে জোনাকীর কুহকের আলো
ঝরে না কি ? ঝিঁঝিঁর সবুজ মাংসে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে বউদের প্রাণ
ভুলে যায় ; অন্ধকারে খুঁজে তারে আকন্দবনের ভিড়ে কোথায় হারালো
মাকাল লতার তলে শিশিরের নীল জলে কেউ তার পাবে না সন্ধান।

আর সেই সোনালি চিলের ডানা—ডানা তার আজও কি মাঠের কুয়াশায়
ভেসে আসে ?—সেই ন্যাড়া অশ্বত্থের পানে আজও চ'লে যায় সন্ধ্যা
সোনার মতো হলে ?
ধানের নরম শিষে মেঠো ইঁদুরের চোখ নক্ষত্রের দিকে আজও চায় ?
আশ্চর্য বিস্ময়ে আমি চেয়ে রব কিছুকাল অন্ধকার বিছানার কোলে।

সমুদ্রের জলে আমি

সমুদ্রের জলে আমি দেহ ধুয়ে চেয়ে থাকি নক্ষত্রের আকাশের পানে
চারি দিকে অন্ধকার : নারীর মতন হাত ; কালো চোখ, ম্লান চুল ঝরে
যত দূর চোখ যায় নীল জল হৃষ্ট মরালের মতো কলরব করে
রাত্রিরে ডাকিতে চায়—বুকে তার, প্রেমমূঢ় পুরুষের মতন আহ্বানে
পৃথিবীর কত প্রেম শেষ হল—তবু এই সমুদ্রের আকাঙ্ক্ষার গানে
বাধা নাই, ভয় নাই, ক্লান্তি নাই, অশ্রু নাই—মালাবার ঢেউয়ের ভিতরে
চারি দিকে নীল নারিকেল বন সোনালি ফুলের গন্ধে, বিস্ময়ের ভরে
জানে তাহা—কতদিন থেকে ঐ মলয়ালী আর তার শিশু তাহা জানে

জানি না মান্দ্রাজ নাকি এই দেশ ? জানি না মলয় নাকি ? কিংবা মালাবার ?
জানি না এ পৃথিবীর কোন্ পথ—কোন্ ভাষা কোন্ মুখে এখানে বাতাসে
জানি না যৌবন কবে শেষ হয়ে গেছে কোন্ পৃথিবীর ধুলোতে আমার
তবুও আমার প্রাণ তামিলের কিশোরের মতো ঐ কিশোরীর পাশে
আবার নতুন জন্ম পায় আজ : কেউ নাই অন্ধকারে কবেকার ঘাসে
কত যে মউরী খই ঝরে গেছে—চারি দিকে ফুটে সব উঠিছে আবার।

'রূপসী-বাংলা' খাতা
প্রকাশ : ১৯৮৪

তোমরা স্বপ্নের হাতে

তোমরা স্বপ্নের হাতে ধরা দাও—আকাশের রৌদ্র ধুলো ধোঁয়া থেকে স'রে
এইখানে চলে এসো ; পৃথিবীর পথে আমি বহুদিন তোমাদের কথা
শুনিয়াছি—তোমাদের ম্লান মুখ দেখিয়াছি—তোমাদের ক্লান্ত রক্তাক্ততা
দেখিয়াছি কতদিন—ব্যথিত ধানের মতো বুক থেকে পড়িতেছে ঝরে
তোমাদের আশা শান্তি, ম্লান মেঘে সোনালি চিলের মতো কলরব করে
মিছে কেন ফেরো, আহা—পৃথিবীর পথ থেকে হে বিষণ্ণ, হে ক্লান্ত জনতা
তোমরা স্বপ্নের ঘরে চলে এসো—এখানে মুছিয়া যাবে হৃদয়ের ব্যথা
সন্ধ্যার বকের মতো চলে এসো নরম শাড়ির মতো শান্ত পথ ধরে।
চারি দিকে রাত্রিদিন কলরব করে যায় দাঁড়কাক বাদুড়ের মতো
পৃথিবীর পথে অই—সেখানে কী করে তবে শান্তি পাবে মানুষ বল তো
এখানে গোধূলি নষ্ট হয় নাকো কোনোদিন—কয়লার মতো রঙ—ম্লান
পশ্চিমের মেঘে ঐ লেগে আছে চিরদিন ; কড়ির মতন শাদা করুণ উঠান
পড়ে আছে চিরকাল ; গোধূলি নদীর জলে রূপসীর মতো তার মুখখানা দেখে
ধীরে—ধীরে—আরো ধীরে শান্তি ঝরে, স্বপ্ন ঝরে আকাশের থেকে।

'রূপসী-বাংলা' খাতা
প্রকাশ : ১৯৮৪

গুবরে ফড়িং শুধু

গুবরে ফড়িং শুধু উড়ে যায় আজ এই সন্ধ্যার বাতাসে,
খড়কুটা ঝরে শুধু শালিকের মুখ থেকে চুপে।
আবার শালিক, আহা, সেই খড়গুনো কুড়ায় নিশ্চুপে।
সন্ধ্যার লাল শিরা মৃদু চোখে ঘরে ফিরে আসে
ঘুঘুর নরম ডাকে—নীরব আকাশে
নক্ষত্রেরা শান্তি পায়—পউষের কুয়াশার ধূপে
পুঁয়ের সবুজ রাঙা লতা আছে ডুবে।

এ কোমল স্নিগ্ধ হিম সান্ত্বনার মাসে
চোখে তার শান্তি শুধু—লাল লাল ফলে বুক আছে দেখ ভ'রে।
গুবরে ফড়িং কই উড়ে যায় আজ এই সন্ধ্যার বাতাসে,
খড়কুটা ঝরে শুধু শালিকের মুখ থেকে চুপে
আবার শালিক অই খড়গুনো কুড়ায় নিশ্চুপে।
সন্ধ্যার লাল শিরা মৃদু চোখে ঘরে ফিরে আসে
তবুও তোমারে আমি কোনোদিন পাব নাকো অসীম আকাশে।

'রূপসী-বাংলা' খাতা
প্রকাশ : ১৯৮৪

অনন্ত জীবন যদি

অনন্ত জীবন যদি পাই আমি—তা হলে অনন্তকাল একা
পৃথিবীর পথে যদি ফিরি আমি দেখিব সবুজ ঘাস
ফুটে ওঠে—দেখিব হলুদ ঘাস ঝরে যায়—দেখিব আকাশ
শাদা হয়ে ওঠে ভোরে—ছেঁড়া মুনিয়ার মতো রাঙা রক্তরেখা
লেগে থাকে বুকে তার সন্ধ্যায়—বারবার নক্ষত্রের দেখা
পাব আমি ; দেখিব অচেনা নারী আল্‌গা খোঁপার ফাঁস
খুলে ফেলে চলে যায়—মুখে তার নাই আহা গোধূলির নরম আভাস।
অনন্ত জীবন যদি পাই আমি—তা হলে অসীমকাল একা
পৃথিবীর পথে যদি ফিরি আমি—ট্রাম্‌ বাস ধুলো
দেখিব অনেক আমি—দেখিব অনেকগুলো
বস্তি, হাট—এঁদো গলি, ভাঙা কল্‌কী হাঁড়ি,
মারামারি, গালাগালি, ট্যারা চোখ, পচা চিংড়ি—কত কী দেখিব নাহি লেখা
তবুও তোমার সাথে অনন্তকালেও আর হবে নাকো দেখা।

'রূপসী-বাংলা' খাতা
প্রকাশ : ১৯৮৪

ঘরের ভিতরে দীপ

ঘরের ভিতরে দীপ জ্বলে ওঠে—ধীরে ধীরে বৃষ্টি ক্ষান্ত হয় সন্ধ্যায়
যখন ঘরের দীপ জ্বলে ওঠে সন্ধ্যায়—ধীরে ধীরে বৃষ্টি ক্ষান্ত হয়,
ভিজে চালে ডুমুরের পাতা ঝরে—শালিক বসিয়া থাকে মুহূর্ত সময়
জানালার কাছে এসে, ভিজে জানালার কাছে—মৌমাছি বহুক্ষণ মৃদু গুমরায়
এই সব ভালো লাগে : এই সব ম্লান গন্ধ মৃদু স্বাদ চায়
পৃথিবীর পথে ঘুরে আমার হৃদয়,
ডুমুরের পাতা ঝরে ভিজে চালে—ধীরে ধীরে বৃষ্টি ক্ষান্ত হয়
মলিন শাড়ির ঘ্রাণ ধূপ হাতে দুয়ারে দাঁড়ায়।

এই সব ভালোবাসি—জীবনের পথে ঘুরে এইসব ভালোবাসে আমার হৃদয়
ঘরে আলো, বৃষ্টি ক্ষান্ত হল সন্ধ্যায়,
ঘরের নরম দীপ জ্বলে ওঠে, ধীরে ধীরে বৃষ্টি ক্ষান্ত হয়,
ভিজে চালে কদমের পাতা ঝরে—শালিক বসিয়া থাকে মুহূর্ত সময়,
মলিন শাড়ির ঘ্রাণ ধূপ হাতে দুয়ারে দাঁড়ায়,
মৃদু আরো মৃদু হয়ে জ্যোৎস্নায় বাতাসে হারায়।

'রূপসী-বাংলা' খাতা
প্রকাশ : ১৯৮৪

কতদিন ঘাসে আর মাঠে

কতদিন ঘাসে আর মাঠে
আমার উৎসাহে প্রাণ কাটে,
খড় খুঁটি—অশ্বত্থের শুকনো পাতা চুপে উল্টাই

দু-একটা পোকা যদি পাই
আমারে চেনা না নাকি : আমি যে চড়াই।
কত দিন তোমাদের ভোরের উঠানে
দু-একটা খই আর মুড়কির ঘ্রাণে
উড়ে আসি চুপে
দেখি কোনো রূপে
চাল ডাল ছোলা ক্ষুদ খুঁজে পাই কিনা
ঝুরঝুর করে ফুল ঝরায় সজিনা
থুপ্‌ থুপ্‌ থুপ্‌ থুপ্‌—একাকী লাফাই
ঘুম নাই—চোখে ক্লান্তি নাই
থুপ্‌ থুপ্‌ থুপীর মতন
দেখ নি কি করি আহরণ
চিনি মিঠায়ের গুঁড়ি—মিশ্রির কণা
ছাতু আটা... কলসীর পাশে বুঝি নাচিছে খঞ্জনা !
আকাশে কতটা রোদ
তোমাদের এত কী আমোদ।
ছোটো ছোটা ছেলে আর মেয়েদের দল
উঠানে কিসের এত ভিড়
ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে—তোমাদের নরম শরীর
হাতে তবু পাটকেল—ঢিল ?
আমারে তাড়াও কেন ? আমি বুঝি দাঁড়কাক চিল !
চীনেবাদামের খোসা শূন্য ঠোঙা এই শুধু চাই
আমি যে চড়াই।
যাই উড়ে যাই
জানালার পাশে
বোলতার চাক খুব বড়ো হয়ে আসে
হলদে বোলতা পাখি, ভাই

এসেছি চড়াই
এনেছি একটা কুটো আর এক খড়
এই নিয়ে ঘরের ভিতর
আমিও বানাব এক ঘর
কী বল তোমরা
ভাটের বনের থেকে এলে কি ভোমরা
মধু পেলে খুঁজে
সারাদিন একটুও ঘুমাই নি—চোখ আসে বুজে
মাকড়সা, অন্ধকারে আছো তুমি মিশে
এখানে কর্নিশে
আমারে ঘুমাতে দেবে ভাই
আমি যে চড়াই—
থাক ঘুম—যাই উড়ে যাই
আমি যে চড়াই।
ঘুম নাই—চোখে ক্লান্তি নাই
কাঠমল্লিকায়
কাঁঠালি শাখায়
করবীর বনে
হিজলের সনে
বেগুনের ভিড়ে
ঘাসের শরীরে
যাই—যাই—যাই
চাই—চাই—চাই
গাই—গাই—গাই
ঘুম নাই—নাই
আমি যে চড়াই।
তবু একদিন

যখন হলুদ তৃণ
ভরে আছে মাঠে
পাতায় শুকনো ডাঁটে
ভাসিছে কুয়াশা
দেখিলাম খানিকটা রোম
মাঠের কিনারে ঘাসে—নির্জন নরম
শিশিরে রয়েছে ডুবে—চোখ বুজে আছে
কেমন সহিষ্ণু ছায়া মুখের উপরে পড়িয়াছে
বহুক্ষণ আমারে থাকিতে বলে এইখানে।
এই স্থির নীরবতা, এই করুণতা
মৃত্যুরে নিঃশেষ করে দেয় নাকি : নক্ষত্রের সাথে গিয়ে কয় নাকি কথা ?
এর চেয়ে বেশি রূপ, বেশি রেখা, বেশি করুণতা
আর কে দেখাতে পারে
আকাশের নীল বুকে—অথবা এ ধুলোর আঁধারে।

'রূপসী-বাংলা' খাত
প্রকাশ : ১৯৮৪

আকাশে চাঁদের আলো

১

আকাশে চাঁদের আলো—উঠানে চাঁদের আলো— নীলাভ চাঁদের আলো—
এমন চাঁদের আলো আজ
বাতাসে ঘুঘুর ডাক—অশথে ঘুঘুর ডাক—হৃদয়ে ঘুঘু যে ডাকে—নরম
ঘুঘুর ডাক আজ
তুমি যে রয়েছ কাছে—ঘাসে যে তোমার ছায়া—তোমার হাতের ছায়া
—তোমার শাড়ির ছায়া ঘাসে

আকাশে চাঁদের আলো—উঠানে চাঁদের আলো—নীলাভ চাঁদের আলো
—এমন চাঁদের আলো আজ

২

কেউ যে কোথাও নাই—সকলে গিয়েছে মরে—সকলে গিয়েছে চলে—
উঠান রয়েছে শুধু একা
শিশুরা কাঁদে না কেউ—রুগিরা হাঁপায় না তো—বুড়োরা কয় না কথা :
থুবড়ো ব্যথার কথা যত
এখানে সকাল নাই—এখানে দুপুর নাই—এখানে জনতা নাই—এখানে
সমাজ নাই—নাইকো মূর্খ ধাঁধা কিছু
আকাশে চাঁদের আলো—উঠানে চাঁদের আলো—নীলাভ চাঁদের আলো
—এমন চাঁদের আলো আজ

৩

আর তো ক্লান্তি নাই—নাইকো চেষ্টা কাজ—নাইকো রক্ত ব্যথা—বিমূঢ়
ভিড়ের থেকে নিয়েছি জীবন ভরে ছুটি
হেঁটেছি অনেক পথ—আমার ফুরালো পথ—এখানে সকল পথ তোমার
পায়ের পথে গিয়েছে নীলাভ ঘাসে ঘুছে
তুমি যে রয়েছ কাছে—ঘাসে যে তোমার ছায়া—তোমার হাতের ছায়া
—তোমার শাড়ির ছায়া ঘাসে
আকাশে চাঁদের আলো—উঠানে চাঁদের আলো—নীলাভ চাঁদের আলো
—এমন চাঁদের আলো আজ

‘রূপসী-বাংলা’ খাতা
প্রকাশ : ১৯৮৪

কেমন বৃষ্টি ঝরে

কেমন বৃষ্টি ঝরে—মধুর বৃষ্টি ঝরে—ঘাসে যে বৃষ্টি ঝরে—
রোদে যে বৃষ্টি ঝরে আজ
কেমন সবুজ পাতা—জামীর সবুজ আরো—ঘাস যে হাসির মতো—
রোদ যে সোনার মতো ঘাসে
সোনার রেখার মতো—সোনার রিঙের মতো—রোদ যে মেঘের কোলে
—তোমার গালের টোলে রোদ
তোমার চুলে যে রোদ—মেঘের মতন চুলে—তোমার চোখে যে রোদ
—সেও যে মেঘের মতো চোখ
আকাশে সোনালি নিল পাখনা ছড়ায়ে কাঁদে—(এমন সোনালি চিল)
সোনালি রেণুর মতো ঝরিছে কান্না আহা, মিশরে শুনেছি যেন কবে
আকাশে এমনই ছেঁড়া ময়লা মেঘের রাশ—পড়েছে তাদের ছায়া
নীলের ঘোলা জলে নিঝুম পিরামিডে
এমনই সোনালি রোদ—সোনার থামের মতো—ঘিয়ের শিখার মতো
রয়েছে আকাশ ছিঁড়ে তবু
কেঁদেছে সোনালি চিল এমনই আকাশ ঘুরে—শুনেছি মিশরে আমি
হাজার হাজার যুগ আগে
তোমার চুলে যে রোদ—মেঘের মতন চুলে—তোমার চোখে যে রোদ
—সেও যে মেঘের মতো চোখ
কেমন বৃষ্টি ঝরে—মধুর বৃষ্টি ঝরে—ঘাসে যে বৃষ্টি ঝরে—
রোদে যে বৃষ্টি ঝরে আজ

'রূপসী-বাংলা' খাতা
প্রকাশ : ১৯৮৪

সন্ধ্যা হয়ে আসে

সন্ধ্যা হয়ে আসে—সন্ধ্যা হয়ে আসে—
একা একা মাঠের বাতাসে

ঘুরি আমি—বসি আমি ঘাসে।

অই দূরে দেখা যায় কার লালপাড়
প্রসাদের বউ বুঝি—পাশে বুঝি তার
প্রসাদ রয়েছে বসে—বাড়িতেছে সন্ধ্যার আঁধার

বছর চারেক হল হয়েছিল দুজনের বিয়ে,
মনে পড়ে ; তারপর কুড়িয়ে-বাড়িয়ে
আজও তারা যায় নি হারিয়ে।

রোজই তারা সন্ধ্যা হলে আসে
এই মাঠে—বসে থাকে ঘাসে,
লক্ষ-লক্ষ তারার আকাশে

বসে থাকে—মনে হয়
মাঠের চাঁদের কথা কয়
দুজনার প্রাণে ঢের শান্তি ও বিস্ময়
আছে আমি জানি
এরা দুটি পৃথিবীর আঁচলের প্রাণী
মনে কোনো প্রশ্ন নাই—দ্বিধা নাই জানি

প্রাণের আশ্চর্য টান আছে
চিরদিন থাকে কাছে কাছে
বিচ্ছেদে বিনষ্ট হয় পাছে

জীবনের শান্ত গল্প—প্রসাদ কখনও তাই
বড় বেশি তীর্থে যায় নাই

যদি তারে এ কথা শুধাই

মৃত্যুরেও দেবে নাকি ফাঁকি ?
কিন্তু থাক্...চেয়ে দেখ যেন দুটি পাখি
বসে আছে—পাখনায় শান্ত পাখা ঢাকি

নক্ষত্রও চেয়ে দেখে সব
এমন নিবিড় স্নিগ্ধ—এমন নীরব
ভালোবাসা : মাটিতেও নয় অসম্ভব ?

এই তারা বলে
নীল লাল আলো নিয়ে জ্বলে
চেয়ে দেখে আকাশের তলে

রক্তে রক্তে ভরে আছে মানুষের মন
রোম নষ্ট হয়ে গেছে...গেছে বেবিলন
পৃথিবীর সব গল্প কীটের মতন

একদিন ভেঙে যাবে : হয়ে যাবে ধুলো আর ছাই
রোম নাই আজ আর—বেবিলন নাই
আজও তবু হৃদয়ের হৃদয়কে চাই।

'রূপসী-বাংলা' খাতা
প্রকাশ : ১৯৮৪

গল্পে আমি পড়িয়াছি

গল্পে আমি পড়িয়াছি কাঞ্চী কাশী বিদিশার কথা
কোনোদিন চোখে দেখি নাই
একদিন ভাবিলাম মাঠে মাঠে কুয়াশায়

যদি আমি কোনোদিন বিদিশায় যাই—

মাঠে মাঠে কুয়াশায় ভাবিলাম এই কথা
বহুদিন বহু-বহু রাত ধরে আমি
যদি আমি—কোনোদিন যদি আমি
অবন্তীর পথে গিয়ে নামি—

পউষের কুয়াশায় সাপের খোলস, পাতা, ডিম
পড়ে আছে ঘাসে,
কেন যে করুণ চোখ পথ ভুলে ভেসে গেল
ময়জানি নদীটির পাশে—

এসেছে এ কার বজরা
চারি দিকে শীত নদী : যেন মরুভূমি
বজরার জানালায় কার মুখ,
এই পথে এতদিন পরে কেন তুমি ?

কবেকার মাঠ—পথ—মন্দির কুয়াশার ফাঁকে দিল দেখা
হৃদয়ে তাতাল বালির মতো তৃষা
নদীর আঁধার জলে ভরে গেল
আমি যে গো দেখেছি বিদিশা।

সব কথা মনে পড়ে
জলসিড়ি নদী আর জানে না সে কথা
নীলাভ ঘাসের পথে জ্যোৎস্নায়।

'রূপসী-বাংলা' খাতা
প্রকাশ : ১৯৮৪

চিরদিন শহরেই থাকি

চিরদিন শহরেই থাকি
পড়ে থাকি পাটের আড়তে
করি কেরানির কাজ—শুভ লাভে যদি কোনোমতে
দিন যায় চ'লে
আকাশের তলে
নক্ষত্রেরা কয় কোন্ কথা
জ্যোৎস্নায় প্রাণের জড়তা
ব্যথা কেন পায়
সে সব খবর নিয়ে কাজ কিবা হায়

বিয়ে হয়েছিল কবে—মরে গেছে বউ
যদিও মহুয়া গাছে ফুটে ওঠে মউ
একবার ঝরে গেলে তবু তারপর
মহুয়া মহুয়া তবু : কেরানির ঘর
কেরানির ঘর শুধু হায়
জীবনের গল্প শুধু হায়
জীবনের গল্প শুধু একবার আসে—শুধু একবার নীল কুয়াশায়
নিঃশেষে ফুরায়।

দেবতা বুঝি না আমি
তীর্থ করিনাকো
তোমরা ঠাকুর নিয়ে থাকো।
তবু আমি একবার ছুটি পেয়ে বেড়াবার তরে
গেলাম খানিকটা দূর—তারকেশ্বরে

গভীর অসাধ নিয়ে—গাঢ় অনিচ্ছায়
ট্রেনে আমি চড়িলাম হায়
কলরবে ধোঁয়ায় ধুলায়
সাধ করে কে বা মিছে যায়

জানি না ঈশ্বর কে বা—জানি শুধু ভুখা ভগবান
দিনগত পাপক্ষয় ক'রে পাব ত্রাণ
তারপর একদিন নিমতলা ঘাটে
কিংবা কাশী মিত্রের তল্লাটে
পড়ে রব

তবুও যখন আমি ঢের রাতে ফিরিলাম ঘর
বুকে জানে সেই দেশ : তারকেশ্বর।
দেবতারে কে খুঁজেছে—সারাদিন ঘুরিয়াছি পথে
অবসন্ন ধুলোর জগতে
অসংখ্য ভিড়ের মাঝে আমি
একখানা মুখ দেখে গিয়েছি যে থামি
কবে যেন সিংহের মূর্তির কাছে তারে
দেখিয়াছি, এশিরিয়া বেবিলনে তাহারে ফেলেছি দেখে আমি
দেখেছি মিশরে
ঈসিসের ঘরে
সারদিন—দিনমান আজ এই তারকেশ্বরে
আবার তাহার মুখ দেখিলাম, (আহা,)
ধানসিড়ি নদীটির বিকেলবেলার মৌন জলে
বেতের ফলের মতো যেই চোখ, যেই রূপ
ধরা দেয় পৃথিবীর নীরব আঁচলে
দেখিলাম তাহা

আবার তাহার মুখ দেখিলাম, আহা।

'রূপসী-বাংলা' খাতা
প্রকাশ : ১৯৮৪

ঘাটশিলা—ঘাটশিলা

ঘাটশিলা—ঘাটশিলা—
কলকাতা ছেড়ে বল ঘাটশিলা কে যায় মিছাই
চিরদিন কলকাতা থাকি আমি,
ঘাটশিলা ছাই।

চিঠির উপরে তবু চিঠি
কয়েকটা দিন
এইখানে এসে তুমি থেকে যাও
চিঠিগুনো হয়ে গেল পুরোনো মলিন

তবু আমি গেলাম না
যদিও দেখেছি আমি কলকাতা থেকে
কত দিন কত রাত
ঘাটশিলা গিয়েছে অনেকে

একদিন তারপর—বহুদিন পরে
অনেক অসাধ অনিচ্ছায়
ঘাটশিলা চলিলাম
ঘাটশিলা দেখিলাম হায়

আবার এসেছি ফিরে—ধোঁয়ায় ধুলায় ভিড়ে

ফুটপাথে—ট্রামের জগতে
পথ থেকে পথে ফিরি
পথ থেকে ক্লান্ত পথে পথে।
কী হল তোমার, আহা,
আমার হৃদয়
তোমারে যে গোধূলির তেপান্তরে
মায়াবীর মতো মনে হয়,

যেন এই পৃথিবীর বেলা শেষ হয়ে গেছে
ম্লান ঘোড়া নিয়ে একা তুমি
কড়ির পাহাড় খুঁজে ঘুরিতেছ
ঘুরিছ হাড়ের মরুভূমি।

'রূপসী-বাংলা' খাতা
প্রকাশ : ১৯৮৪

সাতটি তারার তিমির
১৯৪৮

হুমায়ুন কবির

বন্ধুবরেষু

আকাশলীনা

সুরঞ্জনা, অইখানে যেয়োনাকো তুমি,
বোলোনাকো কথা অই যুবকের সাথে ;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা :
নক্ষত্রের রুপালি আগুন ভরা রাতে ;

ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে ;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার ;
দূর থেকে দূরে—আরও দুরে
যুবকের সাথে তুমি যেয়োনাকো আর।

কী কথা তাহার সাথে ?—তার সাথে !
আকাশের আড়ালে আকাশে
মৃত্তিকার মতো তুমি আজ :
তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে।

সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস :
বাতাসের ওপারে বাতাস—
আকাশের ওপারে আকাশ।

কবিতা। আশ্বিন ১৩৪৪

ঘোড়া

আমরা যাইনি মরে আজও—তবু কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয় :
মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে ;
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন—এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর ’পরে।

আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে একভিড় রাত্রির হাওয়ায় ;
বিষণ্ন খড়ের শব্দ ঝরে পড়ে ইস্পাতের কলে ;
চায়ের পেয়ালা ক’টা বেড়ালছানার মতো—ঘুমে—ঘেয়ো
কুকুরের অস্পষ্ট কবলে

হিম হয়ে নড়ে গেল ও-পাশের পাইস্-রেস্তরাঁতে,
প্যারাফিন-লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে।
সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে ;
এইসব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে।

চতুরঙ্গ। আষাঢ় ১৩৪৭

সমারূঢ়

‘বরং নিজেই তুমি লেখনাকো একটি কবিতা—’
বলিলাম ম্লান হেসে ; ছায়াপিণ্ড দিল না উত্তর ;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়—সে যে আরূঢ় ভণিতা :
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের ’পর
বসে আছে সিংহাসনে—কবি নয়—অজর, অক্ষর
অধ্যাপক,—দাঁত নেই—চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি ;
বেতন হাজার টাকা মাসে—আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি ;
যদিও সে সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিল—হাঙরের ডেউয়ে খেয়েছিল লুটোপুটি।

কবিতা। আশ্বিন ১৩৪৪

নিরঙ্কুশ

মালয় সমুদ্রপারে সে এক বন্দর আছে শ্বেতাঙ্গিনীদের।
যদিও সমুদ্র আমি পৃথিবীতে দেখে গেছি ঢের :
নীলাভ জলের রোদে কুয়ালালুম্পুর, জাভা, সুমাত্রা ও ইন্দোচীন, বালি
অনেক ঘুরেছি আমি—তারপর এখানে বাদামি মলয়ালি
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে কাঁদ সারাদিন।

শাদা-শাদা ছোটো ঘর নারকেলক্ষেতের ভিতরে
দিনের বেলায় আরও গাঢ় শাদা জোনাকির মতো ঝরঝরে।
শ্বেতাঙ্গদম্পতি সব সেইখানে সামুদ্রিক কাঁকড়ার মতো
সময় পোহায়ে যায় ; মলয়ালী ভয় পায় ভ্রান্তিবশত,
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে কাঁদে সারাদিন।

বাণিজ্যবায়ুর গল্পে একদিন শতাব্দীর শেষে
অভ্যুত্থান শুরু হ'ল এইখানে নীল সমুদ্রের কটিদেশে ;
বাণিজ্যবায়ুর হর্ষে কোনো একদিন,
চারিদিকে পামগাছ—ঘোলা মদ—বেশ্যালয়—সেঁকো—কেরোসিন
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে রোখে সারাদিন।

সারাদিন দূর থেকে ধোঁয়া রৌদ্রে রিরংসায় সে উনপঞ্চাশ
বাতাস তবুও বয়—উদীচীর বিকীর্ণ বাতাস ;
নারকেলকুঞ্জবনে শাদা-শাদা ঘরগুলো ঠাণ্ডা করে রাখে ;
লাল কাঁকরের পথ—রক্তিম গির্জার মুণ্ড দেখা যায় সবুজের ফাঁকে :
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে নীলিমায় লীন।

নিরুক্ত। আশ্বিন ১৩৪৮

রিস্টওয়াচ

কামানের ক্ষোভে চূর্ণ হয়ে
আজ রাতে ঢের মেঘ হিম হয়ে আছে দিকে-দিকে।
পাহাড়ের নিচে—তাহাদের কারু-কারু মণিবন্ধে ঘড়ি
সময়ের কাঁটা হয়তো বা ধীরে-ধীরে ঘুরাতেছে ;
চাঁদের আলোর নিচে এই সব অদ্ভুত প্রহরী
কিছুক্ষণ কথা কবে ;—
হৃদয়যন্ত্রের যেন প্রীত আকাঙ্ক্ষার মতো নড়ে,
সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের আলো গিলে।
জলপাইপল্লবের তলে ঝরা বিন্দু-বিন্দু শিশিরের রাশি
দূর সমুদ্রের শব্দ
শাদা চাদরের মতো—জনহীন—বাতাসের ধ্বনি

দু-এক মুহূর্ত আরও ইহাদের গড়িবে জীবনী।
স্তিমিত—স্তিমিত আরও করে দিয়ে ধীরে
ইহারা উঠিবে জেগে অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে।

কবিতা। পৌষ ১৩৪৫

গোধূলিসন্ধির নৃত্য

দরদালানের ভিড়—পৃথিবীর শেষে
যেইখানে পড়ে আছে—শব্দহীন—ভাঙা—
সেইখানে উঁচু-উঁচু হরীতকী গাছের পিছনে
হেমন্তের বিকেলের সূর্য গোল—রাঙা—
চুপে-চুপে ডুবে যায়—জ্যোৎস্নায়।
পিপুলের গাছে বসে পেঁচা শুধু একা
চেয়ে দেখে; সোনার বলের মতো সূর্য আর
রুপার ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা।

হরীতকী শাখাদের নিচে যেন হীরের স্ফুলিঙ্গ
আর স্ফটিকের মতো শাদা জলের উল্লাস;
নৃমুণ্ডের আবছায়া—নিস্তব্ধতা—
বাদামি পাতার ঘ্রাণ—মকুকূপী ঘাস।

কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো;
পুরুষ তাদের: কৃতকর্ম নবীন;
খোঁপার ভিতরে চুলে: নরকের নবজাত মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে হঙকঙের তৃণ।

সেখানে গোপন জল ম্লান হয়ে হীরে হয় ফের,
পাতাদের উৎসরণে কোনো শব্দ নাই ;
তবু তারা টের পায় কামানের স্থবির গর্জনে
বিনষ্ট হতেছে সাংহাই।

সেইখানে যূথচারী কয়েকটি নারী
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নিচে চোখ আর চুলের সংকেতে
মেধাবিনী ;—দেশ আর বিদেশের পুরুষেরা
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে।

প্রগাঢ় চুম্বন ক্রমে টানিতেছে তাহাদের
তুলোর বালিশে মাথা রেখে আর মানবীয় ঘুমে
স্বাদ নেই ;—এই নিচু পৃথিবীর মাঠের তরঙ্গ দিয়ে
ওই চূর্ণ ভূখণ্ডের বাতাসে—বরুণে

ক্রূর পথ নিয়ে যায় হরীতকী বনে—জ্যোৎস্নায়।
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন
শেষ হয়ে গেছে সব ;—বিনুনিতে নরকের নির্বচন মেঘ
পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক—কর্কট—তুলা—মীন।

পরিচয়। চৈত্র ১৩৪৫

যেইসব শেয়ালেরা

যেইসব শেয়ালেরা—জন্ম-জন্ম শিকারের তরে
দিনের বিশ্রুত আলো নিভে গেলে পাহাড়ের বনের ভিতরে
নীরবে প্রবেশ করে—বার হয়—চেয়ে দেখে বরফের রাশি
জ্যোৎস্নায় পড়ে আছে ;—উঠিতে পারিত যদি সহসা প্রকাশি

সেইসব হৃদ্‌যন্ত্র মানবের মতো আত্মায় :
তাহলে তাদের মনে যেই এক বিদীর্ণ বিস্ময়
জন্ম নিত ;—সহসা তোমাকে দেখে জীবনের পারে
আমারও নিরভিসন্ধি কেঁপে ওঠে স্নায়ুর আঁধারে।

পরিচয়। চৈত্র ১৩৪৫

সপ্তক

এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে,—জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা।
অনেক হয়েছে শোয়া ;—তারপর একদিন চলে গেছে কোন্ দূর মেঘে।
অন্ধকার শেষ হলে যেই স্তর জেগে ওঠে আলোর আবেগে ;
সরোজিনী চলে গেল অতদূর ? সিঁড়ি ছাড়া—পাখিদের মতো পাখা বিনা ?
হয়তো বা মৃত্তিকার জ্যামিতিক ঢেউ আজ ? জ্যামিতির ভূত বলে আমি তো জানি না।
জাফরান-আলোকের বিশুষ্কতা সন্ধ্যার আকাশে আছে লেগে :
লুপ্ত বেড়ালের মতো ; শূন্য চাতুরির মূঢ় হাসি নিয়ে জেগে।

পরিচয়। চৈত্র ১৩৪৫

একটি কবিতা

পৃথিবী প্রবীণ আরও হয়ে যায় মিরুজিন নদীটির তীরে ;
বিবর্ণ প্রাসাদ তার ছায়া ফেলে জলে।
ও প্রাসাদে কারা থাকে ?—কেউ নেই—সোনালি আগুন চুপে জলের শরীরে
নড়িতেছে—জ্বলিতেছে—মায়াবীর মতো জাদুবলে।
সে আগুন জ্বলে যায়—দহে নাকো কিছু।
সে আগুন জ্বলে যায়
সে আগুন জ্বলে যায়

সে আগুন জ্বলে যায়—দহেনাকো কিছু।
নিমীল আগুনে ঐ আমার হৃদয়
মৃত এক সারসের মতো।
পৃথিবীর রাজহাঁস নয়—
নিবিড় নক্ষত্র থেকে যেন সমাগত
সন্ধ্যার নদীর জলে একভিড় হাঁস অই—একা;
এখানে পেল না কিছু; করুণ পাখায়
তাই তারা চলে যায় শাদা, নিঃসহায়।
মূল সারসের সাথে হল মুখ দেখা।

২

রাত্রির সংকেতে নদী যত দূর ভেসে যায়—আপনার অভিজ্ঞান নিয়ে
আমারও নৌকার বাতি জ্বলে;
মনে হয় এইখানে লোকশ্রুত আমলকী পেয়ে গেছি
আমার নিবিষ্ট করতলে;
সব কেরোসিন-অগ্নি মরে গেছে; জলের ভিতরে আভা দহে যায়
মায়াবীর মতো জাদুবলে।
পৃথিবীর সৈনিকেরা ঘুমায়েছে বিম্বিসার রাজার ইঙ্গিতে
ঢের দূর ভূমিকার ’পর;
সত্য সারাৎসার মূর্তি সোনার বৃষের ’পরে ছুটে সারাদিন
হয়ে গেছে এখন পাথর;
যে সব যুবারা সিংহীগর্ভে জন্মে পেয়েছিল কৌটিল্যের সংযম
তারাও মরেছে—আপামর।
যেন সব নিশিডাকে চলে গেছে নগরীকে শূন্য করে দিয়ে—
সব ক্বাথ বাথরুমে ফেলে;
গভীর নিসর্গ সাড়া দিয়ে শ্রুত-বিস্মৃতির নিস্তব্ধতা ভেঙে দিত তবু
একটি মানুষ কাছে পেলে;

যে মুকুর পারদের ব্যবহার জানে শুধু, যেই দীপ প্যারাফিন,
বাটা মাছ ভাজে যেই তেলে,
সম্রাটের সৈনিকেরা যে সব লাবণি, লবণরাশি খাবে জেগে উঠে,
অমায়িক কুটুম্বিনী জানে ;
তবুও মানুষ তার বিছানায় মাঝরাতে নৃমুণ্ডের হেঁয়ালিকে
আঘাত করিবে কোন্‌খানে ?
হয়তো নিসর্গ এসে একদিন বলে দেবে কোনো এক সম্রাজ্ঞীকে
জলের ভিতরে এই অগ্নির মানে।

অভিভাবিকা

তবুও যখন মৃত্যু হবে উপস্থিত
আর-একটি প্রভাতের হয়তো বা অন্যতর বিস্তীর্ণতায়,—
মনে হবে
অনেক প্রতীক্ষা মোরা করে গেছি পৃথিবীতে
চোয়ালের মাংস ক্রমে ক্ষীণ করে
কোনো এক বিশীর্ণ কাকের অক্ষিগোলকের সাথে
আঁখি-তারকার সব সমাহার এক দেখে ;
তবু লঘু হাস্যে—সন্তানের জন্ম দিয়ে—
তারা আমাদের মতো হবে—সেই কথা জেনে—ভুলে গিয়ে—
লোল হাস্যে জলের তরঙ্গ মোরা শুনে গেছি আমাদের প্রাণের ভিতর,
নব শিকড়ের স্বাদ অনুভব করে গেছি—ভোরের স্ফটিক রৌদ্রে।
অনেক গন্ধর্ব, নাগ, কুকুর, কিন্নর, পঙ্গপাল
বহুবিধ জন্তুর কপাল
উন্মোচিত হয়ে বিরুদ্ধে দাঁড়ায়ে থাকে পথ-পথান্তরে ;
তবু ঐ নীলিমাকে প্রিয় অভিভাবিকার মতো মনে হয় ;
হাতে তার তুলাদণ্ড ;

শান্ত—স্থির ;
মুখের প্রতিজ্ঞাপাশে নির্জন, নীলাভ বৃত্তি ছাড়া কিছু নেই।
যেন তার কাছে জীবনের অভ্যুদয়
মধ্য-সমুদ্রের ’পরে অনুকূল বাতাসের প্ররোচনাময়
কোনো এক ক্রীড়া—ক্রীড়া,
বেরিলমণির মতো তরঙ্গের উজ্জ্বল আঘাতে মৃত্যু।
স্থির—শুভ্র—নৈসর্গিক কথা বলিবার অবসর।

নতুন পত্র। আশ্বিন ১৩৪৬

কবিতা

আমাদের হাড়ে এক নির্ধূম আনন্দ আছে জেনে
পঙ্কিল সময়স্রোতে চলিতেছি ভেসে ;
তা না হলে সকলই হারায়ে যেত ক্ষমাহীন রক্তে—নিরুদ্দেশে।
হে আকাশ, একদিন ছিলে তুমি প্রভাতের তটিনীর ;
তারপর হয়ে গেছ দূর মেরুনিশীথের স্তব্ধ সমুদ্রের।
ভোরবেলা পাখিদের গানে তাই ভ্রান্তি নেই,
নেই কোনো নিষ্ফলতা আলোকের পতঙ্গের প্রাণে।
বানরী ছাগল নিয়ে যে ভিক্ষুক প্রতারিত রাজপথে ফেরে—
আঁজলায় স্থির শান্ত সলিলের অন্ধকারে—
খুঁজে পায় জিজ্ঞাসার মানে।
চামচিকা বার হয় নিরালোকে ওপারের বায়ুসন্তরণে ;
প্রান্তরের অমরতা জেগে ওঠে একরাশ প্রাদেশিক ঘাসের উন্মেষে ;
জীর্ণতম সমাধির ভাঙা ইঁট অসম্ভব পরগাছা ঘেঁষে
সবুজ সোনালিচোখ ঝিঁঝি-দম্পতির ক্ষুধা করে আবিষ্কার।
একটি বাদুড় দূর স্বোপার্জিত জ্যোৎস্নার মনীষায় ডেকে নিয়ে যায়

যাহাদের যতদূর চক্রবাল আছে লভিবার।
হে আকাশ, হে আকাশ,
একদিন ছিলে তুমি মেরুনিশীথের স্তব্ধ সমুদ্রের মতো ;
তারপর হয়ে গেছ প্রভাতের নদীটির মতো প্রতিভার।

মনোসরণি

মনে হয় সমাবৃত হয়ে আছি কোন্ এক অন্ধকার ঘরে—
দেয়ালের কার্নিশে মক্ষিকারা স্থিরভাবে জানে :
এইসব মানুষেরা নিশ্চয়তা হারায়েছে নক্ষত্রের দোষে ;
পাঁচ ফুট জমিনের শিষ্টতায় মাথা পেতে রেখেছে আপোসে।

হয়তো চেঙ্গিস আজও বাহিরে ঘুরিতে আছে করুণ রক্তের অভিযানে।
বহু উপদেশ দিয়ে চলে গেলে কনফুশিয়াস—
লবেজান হাওয়া এসে গাঁথুনির ইঁট সব করে ফেলে ফাঁস।
বাতাসে ধর্মের কল নড়ে ওঠে—নড়ে চলে ধীরে।
সূর্যসাগরতীরে মানুষের তীক্ষ্ণ ইতিহাসে
কত কৃষ্ণ জননীর মৃত্যু হল রক্তে—উপেক্ষায় ;
বুকের সন্তান তবু নবীন সংকল্পে আজও আসে।
সূর্যের সোনালি রশ্মি, বোলতার স্ফটিক পাখনা,
মরুভূর দেশে যেই তৃণগুচ্ছ বালির ভিতরে
আমাদের তামাশার প্রগল্‌ভতা হেঁট শিরে মেনে নিয়ে চুপে
তবু দুই দণ্ড এই মৃত্তিকার আড়ম্বর অনুভব করে,
যে সারস-দম্পতির চোখে তীক্ষ্ণ ইস্পাতের মতো নদী এসে
ক্ষণস্থায়ী প্রতিবিম্বে—হয়তো বা
ফেলেছিল সৃষ্টির আগাগোড়া শপথ হারিয়ে
যে বাতাস সারাদিন খেলা করে অরণ্যের রঙে,

যে বনানী সুর পায়—

আর যারা মানবিক ভিত্তি গড়ে—ভেঙে গেল বার-বার—
হয়তো বা প্রতিভার প্রকম্পনে—ভুল করে—বধ করে—প্রেম ;—
সূর্যের স্ফটিক আলো স্তিমিত হবার আগে সৃষ্টির পারে
সেইসব বীজ আজও জন্ম পায় মৃত্তিকা অঙ্গারে।
পৃথিবীকে ধাত্রীবিদ্যা শিখায়েছে যারা বহুদিন
সেইসব আদি অ্যামিবারা আজ পরিহাসে হয়েছে বিলীন।
সূর্যসাগরতীরে তবুও জননী বলে সন্ততিরা চিনে নেবে কারে।

আনন্দবাজার পত্রিকা। শারদীয় ১৩৪৬

নাবিক

কোথাও তরণী আজ চলে গেছে আকাশরেখায়—তবে—এই কথা ভেবে
নিদ্রায় আসক্ত হতে গিয়ে তবু বেদনায় জেগে ওঠে পরাস্ত নাবিক ;
সূর্য যেন পরম্পরাক্রম আরও—অইদিকে—সৈকতের পিছে
বন্দরের কোলাহল—পাম সারি—তবু তার পরে স্বাভাবিক

স্বর্গীয় পাখির ডিম সূর্য যেন সোনালি চুলের ধর্মযাজিকার চোখে ;
গোধূম-ক্ষেতের ভিড়ে সাধারণ কৃষকের খেলার বিষয় ;
তবু তারপরে কোনো অন্ধকার ঘর থেকে অভিভূত নৃমুণ্ডের ভিড়
বল্লমের মতো দীর্ঘ রশ্মির ভিতরে নিরাশ্রয়—

আশ্চর্য সোনার দিকে চেয়ে থাকে ; নিরন্তর দ্রুত উন্মীলনে
জীবাণুরা উড়ে যায়—চেয়ে দেখে—কোনো এক বিস্ময়ের দেশে।
হে নাবিক, হে নাবিক, কোথায় তোমার যাত্রা সূর্যকে লক্ষ্য করে শুধু ?
বেবিলন, নিনেভে, মিশুর, চীন, উরের আরশি থেকে ফেঁসে

অন্য এক সমুদ্রের দিকে তুমি চলে যাও—দুপুরবেলায় ;
বৈশালীর থেকে বায়ু—গেৎসিমানি—আলেক্‌জান্দ্রিয়ার
মোমের আলোকগুলো রয়েছে পিছনে পড়ে অমায়িক সংকেতের মতো ;
তারাও সৈকত। তবু তৃপ্তি নেই। আরও দূর চক্রবাল হৃদয়ে পাবার

প্রয়োজন র'য়ে গেছে—যতদিন স্ফটিক-পাখনা মেলে বোলতার ভিড়
উড়ে যায় রাঙা রৌদ্রে ; এয়ারোপ্লেনের চেয়ে প্রমিতিতে নিটোল সারস
নীলিমাকে খুলে ফেলে যতদিন ; ভুলের বুনুনি থেকে আপনাকে মানবহৃদয় :
উজ্জ্বল সময়-ঘড়ি—নাবিক—অনন্ত নীর অগ্রসর হয়।

পরিচয়। ফাল্গুন ১৩৪৬

রাত্রি

হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল ;
অথবা সে হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিল ফেঁসে।
এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।
একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে

অস্থির পেট্রল ঝেড়ে—সতত সতর্ক থেকে তবু
কেউ যেন ভয়াবহভাবে পড়ে গেছে জলে।
তিনটি রিক্‌শ ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে
মায়াবীর মতো জাদুবলে।
আমিও ফিয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে—হঠকারিতায়
মাইল-মাইল পথ হেঁটে—দেয়ালের পাশে
দাঁড়ালাম বেন্টিক্ স্ট্রিটে গিয়ে—টেরিটিবাজারে ;

চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে।

মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে।
কেরোসিন, কাঠ, গালা, গুনচট, চামড়ার ঘ্রাণ
ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে
ধনুকের ছিলা রাখে টান।

টান রাখে মৃত ও জাগ্রৎ পৃথিবীকে।
টান রাখে জীবনের ধনুকের ছিলা।
শ্লোক আওড়ায়ে গেছে মৈত্রেয়ী কবে ;
রাজ্য জয় করে গেছে অমর আত্তিলা।

নিতান্ত নিজের সুরে তবুও তো উপরের জানালার থেকে
গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী ;
পিতৃলোক হেসে ভাবে, কাকে বলে গান—
আর কাকে সোনা, তেল, কাগজের খনি।

ফিরিঙ্গি যুবক ক'টি চলে যায় ছিমছাম।
থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে ;
হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার করে
বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

লঘু মুহূর্ত

এখন দিনের শেষে তিনজন আধো আইবুড়ো ভিখিরির
অত্যন্ত প্রশান্ত হল মন ;
ধূসর বাতাস খেয়ে এক গাল—রাস্তার পাশে
ধূসর বাতাস দিয়ে করে নিল মুখ আচমন।
কেননা এখন তারা যেই দেশে যাবে তাকে রাঙা নদী বলে :
সেইখানে ধোপা আর গাধা এসে জলে
মুখ দেখে পরস্পরের পিঠে চড়ে জাদুবলে।

তবুও যাবার আগে তিনটি ভিখিরি মিলে গিয়ে
গোল হয়ে বসে গেল তিন মগ চায়ে ;
একটি উজির, রাজা, বাকিটা কোটাল,
পরস্পরকে তারা নিল বাৎলায়ে।
তবু এক ভিখিরিনী তিনজন খোঁড়া, খুড়ো, বেয়াইয়ের টানে—
অথবা চায়ের মগে কুটুম হয়েছে এই জ্ঞানে
মিলেমিশে গেল তারা চার জোড়া কানে।

হাইড্র্যান্ট থেকে কিছু জল ঢেলে চায়ের ভিতরে
জীবনকে আরও স্থির, সাধুভাবে তারা
ব্যবহার করে নিতে গেল সোঁদা ফুটপাতে বসে ;
মাথা নেড়ে দুঃখ করে বলে গেল : 'জলিফলি ছাড়া
চেৎলার হাট থেকে টালার জলের কল আজ
এমন কী হত জাঁহাবাজ ?
ভিখিরিকে একটি পয়সা দিতে ভাসুর-ভাদ্রবৌ সকলে নারাজ।'

বলে তারা রামছাগলের মতো রুখু দাড়ি নেড়ে
একবার চোখ ফেলে মেয়েটির দিকে
অনুভব করে নিল এইখানে চায়ের আমেজে
নামায়েছে তারা এক শাঁকচুন্নিকে।
এ মেয়েটি হাঁস ছিল একদিন হয়তো বা, এখন হয়েছে হাঁসহাঁস।
দেখে তারা তুড়ি দিয়ে বার করে দিল তাকে আরেক গেলাস ;
'আমাদের সোনা-রুপো নেই, তবু আমরা কে কার ক্রীতদাস ?'

এ সব সফেন কথা শুনে এক রাতচরা ডাঁশ ;
লাফায়ে-লাফায়ে যায় তাহাদের নাকের ডগায় ;
নদীর জলের পারে বসে যেন, বেন্টিক্ স্ট্রিটে
তাহারা গণনা করে গেল এই পৃথিবীর ন্যায়-অন্যায় ;
চুলের এঁটিলি মেরে গুনে গেল অন্যায়-ন্যায় ;
কোথায় ব্যয়িত হয়—কারা করে ব্যয় ;
কী-কী দেয়া-থোয়া হয়—কারা কাকে দেয় ;

কী করে ধর্মের কল নড়ে যায় মিহিন বাতাসে ;
মানুষটা মরে গেলে যদি তাকে ওষুধের শিশি
কেউ দেয়—বিনি দামে—তবে কার লাভ—
এই নিয়ে চারজনে করে গেল ভীষণ সালিশি।
কেননা এখন তারা যেই দেশে যাবে তাকে উড়ো নদী বলে ;
সেইখানে হাড়হাভাতে ও হাড় এসে জলে
মুখ দেখে—যতদিন মুখ দেখা চলে।

নিরুক্ত। পৌষ ১৩৪৮

হাঁস

নয়টি হাঁসকে রোজ চোখ মেলে ভোরে
দেখা যায় জলপাই পল্লবের মতো স্নিগ্ধ জলে ;
তিনবার তিন গুনে নয় হয় পৃথিবীর পথে ;
এরা তবু নয়জন মায়াবীর মতো জাদুবলে।

সে নদীর জল খুব গভীর—গভীর ;
সেইখানে শাদা মেঘ—লঘু মেঘ এসে
দিনমানে আরও নিচে ডুবে গিয়ে তবু
যেতে পারেনাকো কোনো সময়ের শেষে।

চারিদিকে উঁচু-উঁচু উলুবন, ঘাসের বিছানা ;
অনেক সময় ধরে চুপ থেকে হেমন্তের জল
প্রতিপন্ন হয়ে গেছে যে সময়ে নীলাকাশ বলে
সুদূরে নারীর কোলে তখন হাঁসের দলবল

মিশে গেছে অপরাহ্নে রোদের ঝিলিকে ;
অথবা ঝাঁপির থেকে অমেয় খইয়ের রঙ ঝরে ;
সহসা নদীর মতো প্রতিভাত হয়ে যায় সব ;
নয়টি অমল হাঁস নদীতে রয়েছে মনে পড়ে।

নিরুক্ত। পৌষ ১৩৪৮

উন্মেষ

কোথাও নদীর পারে সময়ের বুকে—
দাঁড়ায়ে রয়েছে আজও সাবেককালের এক স্তিমিত প্রাসাদ ;

দেয়ালে একটি ছবি : বিচারসাপেক্ষভাবে নৃসিংহ উঠেছে ;
কোথাও মঙ্গল সংঘটন হয়ে যাবে অচিরাৎ।

নিবিড় রমণী তার জ্ঞানময় প্রেমিকের খোঁজে
অনেক মলিন যুগ—অনেক রক্তাক্ত যুগ সমুত্তীর্ণ করে,
আজ এই সময়ের পারে এসে পুনরায় দেখে
আবহমানের ভাঁড় এসেছে গাধার পিঠে চড়ে।

স্বাক্ষরের অক্ষরের অমেয় স্তূপের নিচে বসে থেকে যুগ
কোথাও সংগতি তবু পায়নাকো তার ;
ভারে কাটে—তথাপিও ধারে কাটে বলে
সমস্ত সমস্যা কেটে দেয় তরবার।

*

চোখের উপরে
রাত্রি ঝরে ;
যে দিকে তাকাই
কিছু নাই
রাত্রি ছাড়া ;
অন্ধকার সমুদ্রের তিমির মতন
উদীচীর দিকে ভেসে যাই ;
হনলুলু সাগরের জল,
ম্যানিলা—হাওয়াই,
টাহিটির দ্বীপ,
কাছে এসে দূরে চলে যায়—
দূরতর দেশে।
কী এক অশেষ কাজ করেছিল তিমি ;
সিন্ধুর রাত্রির জল এসে

মৃদু মর্মরিত জলে মিশে গিয়ে তাকে
বোর্নিওর সাগরের শেষে—
যেখানে বোর্নিও নেই—ম্লান আলাস্কাকে
ডাকে।
যতদূর যেতে হয়
ততদূর অবাচীর অন্ধকারে গিয়ে
তিমির-শিকারি এক নাবিককে আমি
ফেলেছি হারিয়ে ;
তিমির-পিপাসী এক রমণীকে আমি
হারায়ে ফেলেছি ;
কোথায় রয়েছি—
জীবন হয়ে কবে
ভূমিষ্ঠ হয়েছি।
এই তো জীবন :
সমুদ্রের অন্ধকারে প্রবেশাধিকারে ;
নিপট আঁধার ;
ভালো বুঝে পুনরায়
সাগরের সৎ অন্ধকারে নিষ্ক্রমণ।
সবই আজও প্রতিশ্রুতি, তাই
দোষ হয়ে সব
হয়ে গেছে গুণ।
বেবুনের রাত্রি নয় তার হৃদয়ের
রাত্রির বেবুন।

নিরুক্ত। পৌষ ১৩৪৮

চক্ষুস্থির

ক্লান্ত জনসাধারণ আমি আজ—চিরকাল ;—আমার হৃদয়ে
পৃথিবীর দণ্ডীদের মতো পরিমিত ভাষা নেই।
রাত্রিবেলা বহুক্ষণ মোমের আলোর দিকে চেয়ে,
তারপর ভোরবেলা যদি আমি হাত পেতে দিই
সূর্যের আলোর দিকে,—তবুও আমার সেই একটি ভাবনা
অতীব সহজ ভাষা খুঁজে নিতে গিয়ে
হৃদয়ঙ্গম করে সব আড়ষ্ট, কঠিন দেবতারা
অপরূপ মদ খেয়ে মুখ মুছে নিয়ে
পুনরায় তুলে নেয় অপূর্ব গেলাস ;
উত্তেজিত না হয়েই অনায়াসে বলে যায় তারা :
হেমন্তের ক্ষেতে কবে হলুদ ফসল ফলেছিল,
অথবা কোথায় কালো হ্রদ ঘিরে ফুটে আছে সবুজ সিঙাড়া।
রক্তাতিপাতের দেশে বসেও তাদের সেই প্রাঞ্জলতায়
দেখে যাই সোনালি ফসল, হ্রদ, সিঙাড়ার ছবি ;
আমার প্রেমিক সেই জলের কিনারে ঘাসে—দক্ষ প্রজাপতি ;
মানুষ-ও-ছাগমুণ্ড কেটে তাকে শুদ্ধ করে দিয়ে যাবে অনাগত সবই,
একদিন হয়তো বা ;—আজ সব উত্তমর্ণ দেবতাকে আমার হৃদয়
যে সব পবিত্র মদ দিয়েছিল—যে সব মদির
আলোর রঙের মতো ম্লান মদ দিয়ে গিয়েছিল,—
যখনই চুমুক দিই হয়ে থাকি চর্মচক্ষুস্থির !

ক্ষেতে-প্রান্তরে

১

ঢের সম্রাটের রাজ্যে বাস করে জীব
অবশেষে একদিন দেখেছে দু'তিন ধনু দূরে

কোথাও সম্রাট নেই, তবুও বিপ্লব নেই, চাষা
বলদের নিঃশব্দতা ক্ষেতের দুপুরে।
বাংলার প্রান্তরের অপরাহ্ণ এসে
নদীর খাড়িতে মিশে ধীরে
বেবিলন লণ্ডনের জন্ম, মৃত্যু হলে—
তবুও রয়েছে পিছু ফিরে।
বিকেল এমন বলে একটি কামিন এইখানে
দেখা দিতে এল তার কামিনীর কাছে ;—
মানবের মরণের পরে তার মমির গহ্বর
এক মাইল রৌদ্রে পড়ে আছে।

২

আবার বিকেলবেলা নিভে যায় নদীর খাড়িতে ;
একটি কৃষক শুধু ক্ষেতের ভিতরে
তার বলদের সাথে সারাদিন কাজ করে গেছে ;
শতাব্দী তীক্ষ্ণ হয়ে পড়ে।
সমস্ত গাছের দীর্ঘ ছায়া
বাংলার প্রান্তরে পড়েছে ;
এ দিকের দিনমান—এ যুগের মতো শেষ হয়ে গেছে,
না জেনে কৃষক চোত-বোশেখের সন্ধ্যার বিলম্বনে পড়ে
চেয়ে দেখে থেমে আছে তবুও বিকাল ;
উনিশশো বেয়াল্লিশ বলে মনে হয়
তবুও কি উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল।

৩

কোথাও শান্তির কথা নেই তার, উদ্দীপ্তিও নেই ;

একদিন মৃত্যু হবে, জন্ম হয়েছে ;
সূর্য উদয়ের সাথে এসেছিল ক্ষেতে ;
সূর্যাস্তের সাথে চলে গেছে।
সূর্য উঠবে জেনে স্থির হয়ে ঘুমায়ে রয়েছে।
আজ রাতে শিশিরের জল
প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতি নিয়ে খেলা করে ;
কৃষাণের বিবর্ণ লাঙল,
ফালে-ওপড়ানো সব অন্ধকার ঢিবি,
পোয়াটাক মাইলের মতন জগৎ
সারাদিন অন্তহীন কাজ করে, নিরুৎকীর্ণ মাঠে
পড়ে আছে সৎ কি অসৎ ?

৪

অনেক রক্তের ধ্বকে অন্ধ হয়ে তারপর জীব
এইখানে তবুও পায়নি কোনো ত্রাণ ;
বৈশাখের মাঠের ফাটলে
এখানে পৃথিবী অসমান।
আর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।
কেবল খড়ের স্তূপ পড়ে আছে দুই-তিন মাইল,
তবু তা সোনার মতো নয় ;
কেবল কাস্তের শব্দ পৃথিবীর কামানকে ভুলে
করুণ, নিরীহ, নিরাশ্রয়।
আর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।
জলপিপি চলে গেলে বিকেলের নদী কান পেতে
নিজের জলের সুর শোনে ;
জীবাণুর থেকে আজ কৃষক, মানুষ
জেগেছে কি হেতুহীন সংপ্রসারণে—

ভ্রান্তিবিলাসে নীল আচ্ছন্ন সাগরে ?
চৈত্য, ক্রুশ্, নাইন্টি-থ্রি ও সোভিয়েট শ্রুতি-প্রতিশ্রুতি
যুগান্তের ইতিহাস, অর্থ দিয়ে কূলহীন সেই মহাসাগরের প্রাণ
চিনে চিনে হয়তো বা নচিকেতা প্রচেতার চেয়ে অনিমেষে
প্রথম ও অন্তিম মানুষের প্রিয় প্রতিমান
হয়ে যায় স্বাভাবিক জনমানবের সূর্যালোকে।

নিরুক্ত। আষাঢ় ১৩৪৯

বিভিন্ন কোরাস

পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থেকে আমাদের আয়ু
এখন মৃত্যুর শব্দ শোনে দিনমান।
হৃদয়কে চোখঠার দিয়ে ঘুমে রেখে
হয়তো দুর্গোগে তৃপ্তি পেতে পারে কান ;
এ রকম একদিন মনে হয়েছিল ;—
অনেক নিকটে তবু সেই ঘোর ঘনায়েছে আজ ;
আমাদের উঁচু-নিচু দেয়ালের ভিতরে খোঁড়লে
ততোধিক গুণাগার আপনার কাজ
করে যায় ;—ঘরের ভিতর থেকে খসে গিয়ে সন্ততির মন
বিভীষণ, নৃসিংহের আবেদন পরিপাক করে
ভোরের ভিতর থেকে বিকেলের দিকে চলে যায়,
রাতকে উপেক্ষা করে পুনরায় ভোরে
ফিরে আসে ;—তবুও তাদের কোনো বাসস্থান নেই,
যদিও বিশ্বাসে চোখ বুজে ঘর করেছি নির্মাণ
ঢের আগে একদিন ;—গ্রাসাচ্ছাদন নেই তবুও তাদের,
যদিও মাটির দিকে মুখ রেখে পৃথিবীর ধান

রুয়ে গেছি একদিন ;—অন্য সব জিনিস হারায়ে,
সমস্ত চিন্তার দেশ ঘুরে তবু তাহাদের মন
অলোকসামান্যভাবে সুচিন্তাকে অধিকার করে
কোথাও সম্মুখে পথ, পশ্চাদ্‌গমন
হারায়েছে—উতরোল নীরবতা আমাদের ঘরে।
আমরা তো বহুদিন লক্ষ্য চেয়ে নগরীর পথে
হেঁটে গেছি ;—কাজ করে চলে গেছি অর্থভোগ করে ;
ভোট দিয়ে মিশে গেছি জনমতামতে।
গ্রন্থকে বিশ্বাস করে পড়ে গেছি ;
সহধর্মীদের সাথে জীবনের আখড়াই, স্বাক্ষরের অক্ষরের কথা
মনে করে নিয়ে ঢের পাপ করে, পাপকথা উচ্চারণ করে,
তবুও বিশ্বাসভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে জীবনের যৌন একাগ্রতা
হারাইনি ;—তবুও কোথাও কোনো প্রীতি নেই এতদিন পরে।
নগরীর রাজপথে মোড়ে-মোড়ে চিহ্ন পড়ে আছে ;
একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে
তবুও আতঙ্কে হিম—হয়তো দ্বিতীয় কোনো মরণের কাছে।
আমাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, নারী, হেমন্তের হলুদ ফসল
ইতস্তত চলে যায় যে যাহার স্বর্গের সন্ধানে ;
কারু মুখে তবুও দ্বিরুক্তি নেই—পথ নেই বলে,
যথাস্থান থেকে খসে তবুও সকলই যথাস্থানে
রয়ে যায় ;—শতাব্দীর শেষ হলে এ রকম আবিষ্ট নিয়ম
নেমে আসে ;—বিকেলের বারান্দার থেকে সব জীর্ণ নরনারী
চেয়ে আছে পড়ন্ত রোদের পারে সূর্যের দিকে :
খণ্ডহীন মণ্ডলের মতো বেলোয়ারি।

২

নিকটে মরুর মতো মহাদেশ ছড়ায়ে রয়েছে :

যতদূর চোখ যায়—অনুভব করি ;
তবু তাকে সমুদ্রের তিতীর্ষু আলোর মতো মনে করে নিয়ে
আমাদের জানালায় অনেক মানুষ,
চেয়ে আছে দিনমান হেঁয়ালির দিকে।
তাদের মুখের পানে চেয়ে মনে হয়
হয়তো বা সমুদ্রের সুর শোনে তারা,
ভীত মুখশ্রীর সাথে এ রকম অনন্য বিস্ময়
মিশে আছে ;—তাহারা অনেক কাল আমাদের দেশে
ঘুরে-ফিরে বেড়িয়েছে শারীরিক জিনিসের মতো ;
পুরুষের পরাজয় দেখে গেছে বাস্তব দৈবের সাথে রণে ;
হয়তো বস্তুর বল জিতে গেছে প্রজ্ঞাবশত ;
হয়তো বা দৈবের অজেয় ক্ষমতা—
নিজের ক্ষমতা তার এত বেশি বলে
শুনে গেছে ঢের দিন আমাদের মুখের ভণিতা ;
তবুও বক্তৃতা শেষ হয়ে যায় বেশি করতালি শুরু হলে।
এরা তাহা জানে সব।
আমাদের অন্ধকারে পরিত্যক্ত ক্ষেতের ফসল
ঝাড়ে-গোছে অপরূপ হয়ে উঠে তবু
বিচিত্র ছবির মায়াবল।
ঢের দূরে নগরীর নাভির ভিতরে আজ ভোরে
যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে নাই তাহাদের অবিকার মন
শৃঙ্খলায় জেগে উঠে কাজ করে—রাত্রে ঘুমায়
পরিচিত স্মৃতির মতন।
সেই থেকে কলরব, কাড়াকাড়ি, অপমৃত্যু, ভ্রাতৃবিরোধ,
অন্ধকার সংস্কার, ব্যাজস্তুতি, ভয়, নিরাশার জন্ম হয়।
সমুদ্রের পরপার থেকে তাই স্মিতচক্ষু নাবিকেরা আসে ;
ঈশ্বরের চেয়ে স্পর্শময়

আক্ষেপে প্রস্তুত হয়ে অর্ধনারীশ্বর
তরাইয়ের থেকে লুব্ধ বঙ্গোপসাগরে
সুকুমার ছায়া ফেলে সূর্যিমামার
নাবিকের লিবিডোকে উদ্বোধিত করে।

৩

ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস,
অথবা সবুজ বুঝি ঘাস।
অথবা নদীর নাম মনে করে নিতে গেলে চারিদিকে প্রতিভাত হয়ে উঠে নদী
দেখা দেয় বিকেল অবধি,
অসংখ্য সূর্যের চোখে তরঙ্গের আনন্দে গড়ায়ে
ডাইনে আর বাঁয়ে
চেয়ে দেখে মানুষের দুঃখ, ক্লান্তি, দীপ্তি, অধঃপতনের সীমা ;
উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে ঠেকে পুনরায় নতুন গরিমা
পেতে চায় ধোঁয়া, রক্ত, অন্ধ আধারের খাত বেয়ে ;
ঘাসের চেয়েও বেশি মেয়ে ;
নদীর চেয়েও বেশি উনিশশো তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ, উৎক্রান্ত পুরুষের হাল ;
কামানের ঊর্ধ্বে রৌদ্রে নীলাকাশে অমল মরাল
ভারতসাগর ছেড়ে উড়ে যায় অন্য এক সমুদ্রের পানে—
মেঘের ফোঁটার মতো স্বচ্ছ, গড়ানে ;
সুবাতাস কেটে তারা পালকের পাখি তবু ;
ওরা এলে সহসা রোদের পথে অনন্ত পারুলে
ইস্পাতের সূচীমুখ ফুটে ওঠে ওদের কাঁধের ’পরে, নীলিমার তলে ;
অবশেষে জাগরূক জনসাধারণ আজ চলে ?
রিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়
চেয়েছে ভাবের ঘরে চুরি বিনে জ্ঞান ও প্রণয় ?
মহাসাগরের জল কখনও কি সৎবিজ্ঞাতার মতো হয়েছিল স্থির—

নিজের জলের ফেনশির
নীড়কে কি চিনেছিল তনুবাত নীলিমার নিচে ?
না হলে উচ্ছল সিন্ধু মিছে ?
তবুও মিথ্যা নয় : সাগরের বালি পাতালের কালি ঠেলে
সময়সুখ্যাত শুণে অন্ধ হয়ে, পরে আলোকিত হয়ে গেলে।

কবিতা। আষাঢ় ১৩৪৯

স্বভাব

যদিও আমার চোখে ঢের নদী ছিল একদিন
পুনরায় আমাদের দেশে ভোর হলে,
তবুও একটি নদী দেখা যেত শুধু তারপর ;
কেবল একটি নারী কুয়াশা ফুরোলে
নদীর রেখার পার লক্ষ্য করে চলে।
সূর্যের সমস্ত গোল সোনার ভিতরে
মানুষের শরীরের স্থিরতর মর্যাদার মতো
তার সেই মূর্তি এসে পড়ে।
সূর্যের সম্পূর্ণ বড়ো বিভোর পরিধি
যেন তার নিজের জিনিস।
এতদিন পরে সেই সব ফিরে পেতে
সময়ের কাছে যদি করি সুপারিশ
তাহলে সে স্মৃতি দেবে সহিষ্ণু আলোয়
দু-একটি হেমন্তের রাত্রির প্রথম প্রহরে ;
যদিও লক্ষ লোক পৃথিবীতে আজ
আচ্ছন্ন মাছির মতো মরে—
তবুও একটি নারী 'ভোরের নদীর

জলের ভিতরে জল চিরদিন সূর্যের আলোয় গড়াবে'
এ-রকম দু-চারটে ভয়াবহ স্বাভাবিক কথা
ভেবে শেষ হয়ে গেছে একদিন সাধারণভাবে।

কবিতা। আষাঢ় ১৩৪৯

প্রতীতি

বাতাবিলেবুর পাতা উড়ে যায় হাওয়ায়—প্রান্তরে,—
শার্সিতে ধীরে-ধীরে জলতরঙ্গের শব্দ বাজে ;
একমুঠো উড়ন্ত ধুলোয় আজ সময়ের আস্ফোট রয়েছে ;
না হলে কিছুই নেই লবেজান লড়ায়ে জাহাজে।

বাইরে রৌদ্রের ঋতু বছরের মতো আজ ফুরায়ে গিয়েছে ;
হোক না তা ; প্রকৃতি নিজের মনোভাব নিয়ে অতীব প্রবীণ ;
হিসেবে বিষণ্ন সত্য রয়ে গেছে তার ;
এবং নির্মল ভিটামিন।

সময় উচ্ছিন্ন হয়ে কেটে গেলে আমাদের পুরানো গ্রহের
জীবনস্পন্দন তার রূপ নিতে দেরি করে ফেলে,—
জেনে নিয়ে যে যাহার স্বজনের কাজ করে না কি—
পরার্থের কথা ভেবে ভালো লেগে গেলে।

মানুষেরই ভয়াবহ স্বাভাবিকতার সুর পৃথিবী ঘুরায় ;
মাটির তরঙ্গ তার দু-পায়ের নিচে
অধোমুখে ধসে যায়—চারিদিকে কামাতুর ব্যক্তিরা বলে :
এ রকম রিপুচরিতার্থ করে বেঁচে থাকা মিছে।

কোথাও নবীন আশা রয়ে গেছে ভেবে
নীলিমার অনুকল্পে আজ যারা সয়েছে বিমান,—
কোনো এক তনুবাত শিখরের প্রশান্তির পথে
মানুষের ভবিষ্যৎ নেই—এই জ্ঞান

পেয়ে গেছে ;—চারিদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন নেশন পড়ে আছে :
সময় কাটায়ে গেছে মোহ ঘোচাবার
আশা নিয়ে মঞ্জুভাষা, ডোরিয়ান গ্রীস,
চীনের দেয়াল, পীঠ, পেপিরাস, কারারা-পেপার।

তাহারা মরেনি তবু ;—ফেনশীর্ষ সাগরের ডুবুরির মতো
চোখ বুজে অন্ধকার থেকে কথা-কাহিনীর দেশে উঠে আসে ;
যত যুগ কেটে যায় চেয়ে দেখে সাগরের নীল মরুভূমি
মিশে আছে নীলিমার সীমাহীন ভ্রান্তিবিলাসে।

ক্ষতবিক্ষত জীব মর্মস্পর্শে এলে গেলে—তবুও হেঁয়ালি ;
অবশেষে মানবের স্বাভাবিক সূর্যালোকে গিয়ে
উত্তীর্ণ হয়েছে ভেবে—উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল
‘তেতাল্লিশ’ পঞ্চাশের দিগন্তরে পড়েছে বিছিয়ে

মাটির নিঃশেষ সত্য দিয়ে গড়া হয়েছিল মানুষের শরীরের ধুলো :
তবুও হৃদয় তার অধিক গভীরভাবে হতে চায় সৎ,
ভাষা তার জ্ঞান চায়, জ্ঞান তার প্রেম,—ঢের সমুদ্রের বালি
পাতালের কালি ঝেড়ে হয়ে পড়ে বিষণ্ন, মহৎ।

আনন্দবাজার পত্রিকা। শারদীয় ১৩৪৯

ভাষিত

আমার এ জীবনের ভোরবেলা থেকে—
সে-সব ভূখণ্ড ছিল চিরদিন কণ্ঠস্থ আমার ;
একদিন অবশেষে টের পাওয়া গেল
আমাদের দু-জনার মতো দাঁড়াবার

তিল ধারণের স্থান তাহাদের বুকে
আমাদের পরিচিত পৃথিবীতে নেই।
একদিন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সাথে পথ ধরে
ফিরে এসে বাংলার পথে দাঁড়াতেই

দেখা গেল পথ আছে,—ভোরবেলা ছড়ায়ে রয়েছে,—
দক্ষিণ, পশ্চিম, পূর্ব, উত্তরের দিক
একটি কৃষাণ এসে বার-বার আমাকে চেনায় ;
আমার হৃদয় তবু অস্বাভাবিক।

পরিচয় নেই তার,—পরিচিত হয় না কখনও ;
রবিফসলের দেশে রৌদ্রের ভিতরে
মনে হয় সুচেতনা, তোমারও হৃদয়ে
ভুল এসে সত্যকে অনুভব করে।

সময়ের নিরুৎসুক জিনিসের মতো—
আমার নিকট থেকে আজও বিংশ শতাব্দীতে তোমাকে ছাড়ায়ে
ডান পথ খুলে দিল বলে মনে হল,
যখন প্রচুরভাবে চলে গেছি বাঁয়ে।

এ-রকম কেন হয়ে গেল তবে সব

বুদ্ধের মৃত্যুর পরে কল্কি এসে দাঁড়াবার আগে।
একবার নির্দেশের ভুল হয়ে গেলে
আবার বিশুদ্ধ হতে কতদিন লাগে ?

সমস্ত সকালবেলা এই কথা ভেবে পথ চলে
যখন পথের রেখা নগরীতে—দুপুরের শেষে
আমাকে উঠায়ে দিয়ে মৈথুনকালের সব সাপেদের মতো
মিশে গেল পরস্পরের কায়ক্লেশে,

তাকাতেই উঁচু-নিচু দেয়ালের অন্তরঙ্গ দেশ দেখা গেল ;
কারু তরে সর্বদাই ভীত হয়ে আছে এক তিল ;—
এ-রকম মনে হল বিদ্যুতের মতন সহসা ;
সাগর—সাগর সে কি—অথবা কপিল ?

এ-রকম অনুভব আমাকে ধারণ করে চুপে
স্থির করে রেখে গেল পথের কিনারে ;
আকাশ নিজের স্থানে নেই মনে হল ;
আকাশকুসুম তবু ফুটেছে পাপড়ি অনুসারে।

তবুও পৃথিবী নিজে অভিভূত বলে
ইহাদেরও নেই কোনো ত্রাণ :
সকলই মহৎ হতে চেয়ে শুধু সুবিধা হতেছে ;
সকলই সুবিধা হতে গিয়ে তবু প্রধূমায়মান।

বিতর্ক আমার মতো মানুষের তরে নয় তবু ;
আবেগ কি ক্রমেই আরেক তিল বিশোধিত হয় ?
নিষ্পন্ন ভীষণ লিপি লিখে দিল সূর্যদেবীকে ;

সৌরকরময় চীন, রুশের হৃদয়।

চতুরঙ্গ। আশ্বিন ১৩৪৯

সৃষ্টির তীরে

বিকেলের থেকে আলো ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে নিভে যায়—তবু
ঢের স্মরণীয় কাজ শেষ হয়ে গেছে :
হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে ;
সম্রাটের ইশারায় কঙ্কালের পাশাগুলো একবার সৈনিক হয়েছে :
সচ্ছল কঙ্কাল হয়ে গেছে তারপর
বিলোচন গিয়েছিল বিবাহ-ব্যাপারে ;
প্রেমিকারা সারাদিন কাটায়েছে গণিকার বারে ;
সভাকবি দিয়ে গেছে বাক্‌বিভূতিকে গালাগাল।
সমস্ত আচ্ছন্ন সুর একটি ওঙ্কার তুলে বিস্মৃতির দিকে উড়ে যায়।
এ বিকেল মানুষ না মাছিদের গুঞ্জরনময় !
যুগে-যুগে মানুষের অধ্যবসায়
অপরের সুযোগের মতো মনে হয়।
কুইস্‌লিং বানাল কি নিজ নাম—হিটলার সাত কানাকড়ি
দিয়ে তাহা কিনে নিয়ে হয়ে গেল লাল :
মানুষেরই হাতে তবু মানুষ হতেছে নাজেহাল ;
পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকরি।
এ কেমন পরিবেশে রয়ে গেছি সবে—
বাক্‌পতি জন্ম নিয়েছিল যেই কালে,
অথবা সামান্য লোক হেঁটে যেতে চেয়েছিল স্বাভাবিকভাবে পথ দিয়ে,
কী করে তা হলে তারা এ রকম ফিচেল পাতালে
হৃদয়ের জন-পরিজন নিয়ে হারিয়ে গিয়েছে ?
অথবা যে-সব লোক নিজের সুনাম ভালোবেসে
দুয়ার ও পরচুলা না এঁটে জানে না কোনো লীলা,

অথবা যে-সব নাম ভালো লেগে গিয়েছিল : আপিলা চাপিলা ;
—রুটি খেতে গিয়ে তারা ব্রেড্‌বাস্কেট খেল শেষে।
এরা সব নিজেদের গণিকা, দালাল, রেস্ত, শত্রুর খোঁজে
সাত-পাঁচ ভেবে সনির্বন্ধতায় নেমে আসে ;
যদি বলি, তারা সব তোমাদের চেয়ে ভালো আছে ;
অসৎপাত্রের কাছে তবে তারা অন্ধ বিশ্বাসে
কথা বলেছিল বলে দুই হাত সতর্কে গুটায়ে
হয়ে ওঠে কী যে উচাটন !—
কুকুরের ক্যানারির কান্নার মতন :
তাজা ন্যাক্‌ড়ার ফালি সহসা ঢুকেছে নালি ঘায়ে।
ঘরের ভিতর কেউ খোয়ারি ভাঙছে বলে কপাটের জং
নিরস্ত হয় না তার নিজের ক্ষয়ের ব্যবসায়ে,
আগাগোড়া গৃহকেই চৌচির করেছে বরং ;
অরেঞ্জপিকোর ঘ্রাণ নরকের সরায়ের চায়ে
ক্রমেই অধিক ফিকে হয়ে আসে ; নানারূপ জ্যামিতিক টানের ভিতরে
স্বর্গ মর্ত পাতালের কুয়াশার মতন মিলনে
একটি গভীর ছায়া জেগে ওঠে মনে ;—
অথবা তা ছায়া নয়—জীব নয় সৃষ্টির দেয়ালের ’পরে।
আপাদমস্তক আমি তার দিকে তাকায়ে রয়েছি ;
গগ্যাঁর ছবির মতো—তবুও গগ্যাঁর চেয়ে শুরু হাত থেকে
বেরিয়ে সে নাকচোখে ক্বচিৎ ফুটেছে টায়ে-টায়ে :
নিভে যায়—জ্বলে ওঠে, ছায়া, ছাই, দিব্যযোনি মনে হয় তাকে।
স্বাতীতারা শুকতারা সূর্যের ইস্কুল খুলে
সে মানুষ নরক বা মর্তে বাহাল
হতে গিয়ে বৃষ ও মেষ বৃশ্চিক সিংহের প্রাতঃকাল
ভালোবেসে নিতে যায় কন্যা মীন মিথুনের কূলে।

আনন্দবাজার পত্রিকা। শারদীয় ১৩০৫

জুহু

সান্টা ক্রুজ্ থেকে নেমে অপরাহ্নে জুহুর সমুদ্রপারে গিয়ে
কিছুটা স্তব্ধতা ভিক্ষা করেছিল সূর্যের নিকটে থেমে সোমেন পালিত ;
বাংলার থেকে এত দূরে এসে—সমাজ, দর্শন, তত্ত্ব, বিজ্ঞান হারিয়ে,
প্রেমকেও যৌবনের কামাখ্যার দিকে ফেলে পশ্চিমের সমুদ্রের তীরে
ভেবেছিল বালির উপর দিয়ে সাগরের লঘুচোখ কাঁকড়ার মতন শরীরে
ধবল বাতাস খাবে সারাদিন ;—যেইখানে দিন গিয়ে বৎসরে গড়ায়—
বছর আয়ুব দিকে—নিকেল-ঘড়ির থেকে সূর্যের ঘড়ির কিনারায়
মিশে যায়—সেখানে শরীর তার নটকান-রক্তিম রৌদ্রের আড়ালে
অরেঞ্জস্কোয়াশ খাবে হয়তো বা, বোম্বায়ের ‘টাইম্‌স্’টাকে বাতাসের বেলুনে উড়িয়ে,
বর্তুল মাথায় সূর্য বালি ফেনা অবসর অরুণিমা ঢেলে,
হাতির হাওয়ার লুপ্ত কয়েতের মতো দেবে নিমেষে ফুরিয়ে
চিন্তার বুদবুদ্‌দের ! পিঠের ওপার থেকে তবু এক আশ্চর্য সংগত
দেখা দিল। ঢেউ নয়, বালি নয়, উনপঞ্চাশ বায়ু, সূর্য নয় কিছু—
সেই রলরোলে তিন-চার ধনু দূরে-দূরে এয়ারোড্রামের কলরব
লক্ষ্য পেল অচিরেই—কৌতূহলে হৃষ্ট সব সুর
দাঁড়াল তাহাকে ঘিরে বৃষ মেষ বৃশ্চিকের মতন প্রচুর ;
সকলেরই ঝিঁক চোখে—কাঁধের উপরে মাথা-পিছু
কোথাও দ্বিরুক্তি নেই মাথার ব্যথার কথা ভেবে।
   নিজের মনের ভুলে কখন সে কলমকে খড়্গের চেয়ে
ব্যাপ্ত মনে করে নিয়ে লিখেছে ভূমিকা, বই, সকলকে সম্বোধন করে !
কখন সে বজেট-মিটিং, নারী, পার্টি-পলিটিক্স, মাংস, মার্মালেড ছেড়ে
অবতার বরাহকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিল !—
টোমাটোর মতো লাল গাল নিয়ে শিশুদের ভিড়
কুকুরের উৎসাহ, ঘোড়ার সওয়ার, পার্শী, মেম, খোজা, বেদূইন, সমুদ্রের তীর,
জুহু, সূর্য, ফেনা, বালি—সান্টাক্রুজে সবচেয়ে পররতিময় আত্মক্রীড়

সে ছাড়া তবে কে আর ?—যেন তার দুই গালে নিরুপম দাড়ির ভিতরে
দুটো বৈবাহিক পেঁচা ত্রিভুবন আবিষ্কার করে তবু ঘরে
বসে আছে ;—মুন্সী, সাভারকর, নরীম্যান তিন দৃষ্টিকোণ থেকে নেমে এসে
দেখে গেল, মহিলারা মর্মরের মতো স্বচ্ছ কৌতূহলভরে,
অব্যয় শিল্পীরা সব : মেঘ না চাইতে এই জল ভালোবাসে।

বৈশাখ ২। ১৩৫০

সোনালি সিংহের গল্প

আমাদের পরিজন নিজেদের চিনেছিল না কি ?
এই সেই সংকল্পের পিছে ফিরে হেমন্তের বেলাবেলি দিন
নির্দোষ আমোদে সাঙ্গ করে ফেলে চায়ের ভিতরে ;
চায়ের অসংখ্য ক্যান্টিন।
আমাদের উত্তমর্ণদের কাছে প্রতিজ্ঞার শর্ত চেয়ে তবু
তাহাদের খুঁজে পাই ছিমছাম,—কনুয়ের ভরে
বসে আছে প্রদেশের দূর বিসারিত সব ক্ষমতার লোভে।
কোথায় প্রেমিক তুমি : দীপ্তির ভিতরে !
কোথাও সময় নেই আমাদের ঘড়ির আধারে।
আমাদের স্পর্শাতুর কন্যাদের মন
বিশৃঙ্খল শতাব্দীর সর্বনাশ হয়ে গেছে জেনে
সপ্রতিভ রূপসীর মতো বিচক্ষণ,
যে-কোনো রাজার কাজে উৎসাহিত নাগরের তরে ;
যে-কোনো ত্বরান্বিত উৎসাহের তরে ;
পৃথিবীর বারগৃহ ধরে তারা উঠে যেতে চায়।
নীরবতা আমাদের ঘরে।
আমাদের ক্ষেতে-ভুঁয়ে অবিরাম হতমান সোনা
ফলে আছে বলে মনে হয় ;

আমাদের হৃদয়ের সাথে
সে সব ধানের আন্তরিক পরিচয়
নেই ; তবু এইসব ফসলের দেশে
সূর্য নিরন্তর হিরন্ময় ;
আমাদের শস্য তবু অবিকল পরের জিনিস
মিড্‌ল্‌ম্যানদের কাছে পর নয়।
তাহারা চেনায়ে দেয় আমাদের ঘিঞ্জি ভাঁড়ার,
আমাদের জরাজীর্ণ ডাক্তারের মুখ,
আমাদের উকিলের অনুপ্রাণনাকে,
আমাদের গড়পড়তার সব পড়তি কৌতুক
তাহারা বেহাত করে ফেলে সব।
রাজপথে থেকে-থেকে মূঢ় নিঃশব্দতা
বেড়ে ওঠে ;—অকারণে এর-ওর মৃত্যু হয়ে গেলে—
অনুভব করে তবু বলবার মতো কোনো কথা
নেই। বিকেলে গা ঘেঁষে সব নিরুত্তেজ সরজমিনে বসে
বেহেড আত্মার মতো সূর্যাস্তের পানে
চেয়ে থেকে নিভে যায় এক পৃথিবীর
প্রক্ষিপ্ত রাত্রির লোকসানে।
তবুও ভোরের বেলা বার-বার ইতিহাসে সঞ্চারিত হয়ে
দেখেছে সময়, মৃত্যু, নরকের থেকে পাপীতাপীদের গালাগালি
সরায়ে মহান সিংহ আসে যায় অনুভাবনায় স্নিগ্ধ হয়ে—
যদি না সূর্যাস্তে ফের হয়ে যায় সোনালি হেঁয়ালি।

অনুসূর্যের গান

কোনো এক বিপদের গভীর বিস্ময়
আমাদের ডাকে।

পিছে-পিছে ঢের লোক আসে।
আমরা সবের সাথে ভিড়ে চাপা পড়ে—তবু—
বেঁচে নিতে গিয়ে
জেনে বা না-জেনে ঢের জনতাকে পিষে—ভিড় করে,
করুণার ছোটো-বড়ো উপকণ্ঠে—সাহসিক নগরে-বন্দরে
সর্বদাই কোনো-এক সমুদ্রের দিকে
সাগরের প্রয়াণে চলেছি।
সে সমুদ্র—
জীবন বা মরণের ;
হয়তো বা আশার দহনে উদ্বেল।
যারা বড়ো, মহীয়ান—কোনো-এক উৎকণ্ঠার পথে
তবু স্থির হয়ে চলে গেছে ;
একদিন নচিকেতা বলে মনে হতো তাহাদের ;
একদিন আত্তিলার মতো তবু ;
আজ তারা জনতার মতো।
জীবনের অবিরাম বিশৃঙ্খলা স্থির করে দিতে গিয়ে তবু
সময়ের অনিবার উদ্ভাবনা এসে
যে সব শিশুকে যুবা—প্রবীণ করেছে তারপর,
তাদের চোখের আলো
অনাদির উত্তরাধিকার থেকে, নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে
তাদের প্রায়ান্ধ চোখ আজ রাতে লেন্‌স্,
চেয়ে দেখে চারিদিকে অগণন মৃতদের চক্ষের ফস্‌ফোরেসেন্‌স্।
তাদের সম্মুখে আলো
দীনাত্মা তারার
জ্যোৎস্নার মতন।
জীবনের শুভ অর্থ ভালো করে জীবনধারণ
অনুভব করে তবু তাহাদের কেউ-কেউ আজ রাতে যদি

অই জীবনের সব নিঃশেষ সীমা
সমুজ্জ্বল, স্বাভাবিক হয়ে যাবে মনে ভেবে—
স্মরণীয় অঙ্কে কথা বলে,
তা হলে সে কবিতা কালিমা
মনে হবে আজ ?
আজকে সমাজ
সকলের কাছ থেকে চেয়েছে কি নিরন্তর
তিমিরবিদারী অনুসূর্যের কাজ।

পূর্বাশা। কার্তিক ১৩৪০

তিমিরহননের গান

কোনো হ্রদে
কোথাও নদীর ঢেউয়ে
কোনো-এক সমুদ্রের জলে
পরস্পরের সাথে দু-দণ্ড জলের মতো মিশে
সেই এক ভোরবেলা শতাব্দীর সূর্যের নিকটে
আমাদের জীবনের আলোড়ন—
হয়তো বা জীবনকে শিখে নিতে চেয়েছিল।
অন্য এক আকাশের মতো চোখ নিয়ে
আমরা হেসেছি,
আমরা খেলেছি ;
স্মরণীয় উত্তরাধিকারে কোনো গ্লানি নেই ভেবে
একদিন ভালোবেসে গেছি।
সেই সব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো তবু—
তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক।
হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলোক।

সেই জের টেনে আজও খেলি।
সূর্যালোক নেই—তবু—
সূর্যালোক মনোরম মনে হলে হাসি।
স্বতই নিমর্ষ হয়ে ভদ্রসাধারণ
চেয়ে দেখে তবু সেই বিষাদের চেয়ে
আরও বেশি কালো-কালো ছায়া
লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসাব ডিঙিয়ে
নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজে উঠে
নর্দমায় নেমে—
ফুটপাত থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাথে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা মরে যেতে জানে।
এরা সব এই পথে ;
ওরা সব ওই পথে—তবু
মধ্যবিত্তমদির জগতে
আমরা বেদনাহীন—অন্তহীন বেদনার পথে।
কিছু নেই,—তবু এই জের টেনে খেলি ;
সূর্যালোকে প্রজ্ঞাময় মনে হলে হাসি ;
জীবিত বা মৃত রমণীর মতো ভেবে—অন্ধকারে—
মহানগরীর মৃগনাভি ভালোবাসি।

তিমিরহননে তবু অগ্রসর হয়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী ?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হতে চাই।
আমরা তো তিমিরবিনাশী।

কবিতা। পৌষ ১৩৫০

বিস্ময়

কোথাও নতুন দিন রয়ে গেছে না কি।
উঠে বসে সকলের সাথে কথা বলে
সমিতির কোলাহলে মিশে
তবুও হিসেব দিতে হয় এসে কোনো-এক স্থানে ;
—সেখানে উটের পিঠে সার্থবাহ দিগন্তরে মিলিয়ে গিয়েছে ;
সাইরেনের কথা স্থির ;
আর শেষ সাগরে জাহাজডুবি জীবনে মিটেছে ;
বন্দরের অধিকারীদের হাল, কৃচ্ছ্র, আলোড়ন,
মানুষের মরণের ভয়ের ক্ষয়ের জন্যে মানুষের সর্বস্বসাধন
হতে চায়,—হয়তো বা হয়ে গেছে সার্বজনীন কল্যাণ।

জানি এ-রকম দিন আজও আসেনিকো।
এ-রকম যুগ ঢের—হয়তো বা আরও ঢের দূরের জিনিস।
আজ, এই ভূমিকায় মুহূর্তের বিস্মৃতির, স্মৃতির ভিতরে
সারাদিন সকলের সাথে ব্যবহৃত হয়ে চলি,
জিতে হেরে লুকায়ে সন্ধান ভুলে ; নিরুদ্দিষ্ট ভয়
খামিরের মতো এসে আমাদের সবের হৃদয়
অধিকার করে রাখে।

চারিদিকে সরবরাহের সুর সারাদিনমান
কী চাহিদা কাদের মেটায়।
মানুষের জন্যে মানুষের সব সম্ভ্রমের ভাষা, ভাঙাগড়া, ভালোবাসা
এতদিন পরে এই অন্ধ পরিণতির মতন
হয়ে গিয়ে তবুও কঠিন ক্রান্তি না কি ?

কোলাহলে ভিড়ে গেছে জনসাধারণ ;
জীবনের রক্তের বিনিময়ে ফাঁকি
প্রাণ ভরে তুলে নিয়ে পরস্পরের দাবি হিংসা প্রেম ঊর্ণাকঙ্কালে মিলে গিয়ে
তবুও যে যার নিজ অন্ধ কাঠামোর কাছে ঠেকে—অহরহ—
সময়ের অনাবিষ্কৃত অন্তরীপ।

মনে হয় কোনো-এক সমুদ্রের মাইলের—মাইলের দূর দিগন্তর
উদ্বেল, নিরপরাধভাবে
জীবনের মতো নীল হয়ে, তবু—মৃত্যুর মতন প্রভাবে।
অন্ধকার ঝড় থেকে অঙ্কে অগণন মেরুপাহাড়ের পাখি
সে তার নিজের বুকে টেনে নিয়ে—
অই পারে নব বসন্তের দেশে খুলে দিতে চেয়েছিল না কি ?
সনাতন সত্যে অন্ধ হয়ে তবু—মিথ্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে
পাখিদের ডেকে নিয়ে উড়ায়ে দিতেছে ;
মৃত্তিকার মর্মে ম্লান অম্লান উপকূলে হয়তো বা—আর-একবার তবু ওড়াবার মতো ;
মরণ বা প্রলোভন উপচায়ে—জীবনের নির্দেশবশত।

পূর্বাশা। চৈত্র ১৩৫০

সৌরকরোজ্জ্বল

পরের ক্ষেতের ধানে মই দিয়ে উঁচু করে নক্ষত্রে লাগানো
সুকঠিন নয় আজ ;
যে-কোনো পথের বাঁকে ভাঙনের নদীর শিয়রে
তাদের সমাজ।
তবুও তাদের ধারা—ধর্ম অর্থ কাম কলরব কুশীলব—
কিংবা এ-সব থেকে আসন্ন বিপ্লব

ঘনায়ে—ফসল ফলায়ে—তবু যুগে-যুগে উড়ায়ে গিয়েছে পঙ্গপাল।
কাল তবু—হয়তো আগামী কাল।
তবুও নক্ষত্র নদী সূর্য নারী সোনার ফসল মিথ্যা নয়।
মানুষের কাছ থেকে মানবের হৃদয়ের বিবর্ণতা ভয়
শেষ হবে ; তৃতীয় চতুর্থ—আরও সব
আন্তর্জাতিক গড়ে ভেঙে গড়ে দীপ্তিমান কৃষিজাত জাতক মানব।

সূর্যতামসী

কোথাও পাখির শব্দ শুনি ;
কোনো দিকে সমুদ্রের সুর ;
কোথাও ভোরের বেলা রয়ে গেছে—তবে।
অগণন মানুষের মৃত্যু হলে—অন্ধকারে জীবিত ও মৃতের হৃদয়
বিস্মিতের মতো চেয়ে আছে ;
এ কোন্ সিন্ধুর সুর :
মরণের—জীবনের ?
এ কি ভোর ?
অনন্ত রাত্রির মতো মনে হয় তবু।
একটি রাত্রির ব্যথা সয়ে—
সময় কি অবশেষে এ-রকম ভোরবেলা হয়ে
আগামী রাতের কালপুরুষের শস্য বুকে করে জেগে ওঠে।
কোথাও ডানার শব্দ শুনি ;
কোনো দিকে সমুদ্রের সুর—
দক্ষিণের দিকে,
উত্তরের দিকে,
পশ্চিমের পানে।
সৃজনের ভয়াবহ মানে—

তবু জীবনের বসন্তের মতন কল্যাণে
সূর্যালোকিত সব সিন্ধুপাখিদের শব্দ শুনি ;
ভোরের বদলে তবু সেইখানে রাত্রিকরোজ্জ্বল
ভিয়েনা, টোকিয়ো, রোম, মিউনিখ—তুমি ?
সার্থবাহ, সার্থবাহ, অই দিকে নীল,
সমুদ্রের পরিবর্তে আটলান্টিক চার্টার নিখিল মরুভূমি !
বিলীন হয় না মায়ামৃগ—নিত্য দিকদর্শিন্ ;
অনুভব করে নিয়ে মানুষের ক্লান্ত ইতিহাস
যা জেনেছে—যা শেখেনি—
সেই মহাশ্মশানের গর্ভাঙ্কে ধূপের মতো জ্বলে
জাগে না কি হে জীবন—হে সাগর—
শকুন্ত-ক্রান্তির কলরোলে।

রাত্রির কোরাস

এখন সে কত রাত ;
এখন অনেক লোক দেশ-মহাদেশে সব নগরীর গুঞ্জরন হতে
ঘুমের ভিতরে গিয়ে ছুটি চায়।
পরস্পরের পাশে নগরীর ঘ্রাণের মতন
নগরী ছড়ায়ে আছে।
কোনো ঘুম নিঃসাড় মৃত্যুর নামান্তর।
অনেকেরই ঘুম
জেগে থাকা।
নগরীর রাত্রি কোনো হৃদয়ের প্রেয়সীর মতো হতে গিয়ে
নটীরও মতন তবু নয় ;—
প্রেম নেই—প্রেমব্যসনেরও দিন শেষ হয়ে গেছে ;
একটি অমেয় সিঁড়ি মাটির উপর থেকে নক্ষত্রের
আকাশে উঠেছে ;

উঠে ভেঙে গেছে।
কোথাও মহান কিছু নেই আর তারপর।
ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রাণের প্রয়াস রয়ে গেছে ;
তুচ্ছ নদী-সমুদ্রের চোরাগলি ঘিরে
রয়ে গেছে মাইন, ম্যাগ্নেটিক মাইন, অনন্ত কন্‌ভয়,—
মানবকদের ক্লান্ত সাঁকো ;
এর চেয়ে মহীয়ান আজ কিছু নেই জেনে নিয়ে
আমাদের প্রাণে উত্তরণ আসে নাকো।
সূর্য অনেক দিন জ্বলে গেছে মিশরের মতো নীলিমায়।
নক্ষত্র অনেক দিন জেগে গেছে চীন, কুরুবর্ষের আকাশে।
তারপর ঢের যুগ কেটে গেলে পর
পরস্পরের কাছে মানুষ সফল হতে গিয়ে এক অস্পষ্ট রাত্রির
অন্তর্যামী যাত্রীদের মতো
জীবনের মানে বার করে তবু জীবনের নিকটে ব্যাহত
হয়ে আরও চেতনার ব্যথায় চলেছে।
মাঝে-মাঝে থেমে চেয়ে দেখে
মাটির উপর থেকে মানুষের আকাশে প্রয়াণ
হল তাই মানুষের ইতিহাসবিবর্ণ হৃদয়
নগরে-নগরে গ্রামে নিষ্প্রদীপ হয়।
হেমন্তের রাতের আকাশে আজ কোনো তারা নেই।
নগরীর—পৃথিবীর মানুষের চোখ থেকে ঘুম
তবুও কেবলই ভেঙে যায়
স্‌প্লিন্টারের অনন্ত নক্ষত্রে।
পশ্চিমে প্রেতের মতন ইউরোপ ;
পুব দিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা ;
আফ্রিকার দেবতাত্মা জন্তুর মতন ঘনঘটাচ্ছন্নতা ;
ইয়াঙ্কির লেন-দেন ডলারে প্রত্যয় ;—

এই সব মৃত হাত তবে
নব-নব ইতিহাস-উন্মেষের না কি ?—
ভেবে কারু রক্তে স্থির প্রীতি নেই—নেই ;—
অগণন তাপী সাধারণ প্রাচী অবাচীর উদীচীর মতন একাকী
আজ নেই—কোথাও দিৎসা নেই—জেনে
তবু রাত্রিকরোজ্জ্বল সমুদ্রের পাখি।

আনন্দবাজার পত্রিকা। শারদীয় ১৩৫১

নাবিকী

হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে
এ-রকম অনেক হেমন্ত ফুরায়েছে
সময়ের কুয়াশায় ;
মাঠের ফসলগুলো বার-বার ঘরে
তোলা হতে গিয়ে তবু সমুদ্রের পারের বন্দরে
পরিচ্ছন্নভাবে চলে গেছে।
মৃত্তিকার ঐ দিক আকাশের মুখোমুখি যেন শাদা মেঘের প্রতিভা ;
এই দিকে ঋণ, রক্ত, লোকসান, ইতর, খাতক ;
কিছু নেই—তবুও অপেক্ষাতুর ;
হৃদয়স্পন্দন আছে—তাই অহরহ
বিপদের দিকে অগ্রসর ;
পাতালের মতো দেশ পিছে ফেলে রেখে
নরকের মতন শহরে
কিছু চায় ;
কী যে চায়।
যেন কেউ দেখেছিল খণ্ডাকাশ যতবার পরিপূর্ণ নীলিমা হয়েছে,
যতবার রাত্রির আকাশ ঘিরে স্মরণীয় নক্ষত্র এসেছে,

আর তাহাদের মতো নরনারী যতবার
তেমন জীবন চেয়েছিল,
যত নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে গেছে রৌদ্রের আকাশে,
নদীর ও নগরীর
মানুষের প্রতিশ্রুতির পথে যত
নিরুপম সূর্যালোক জ্বলে গেছে—তার
ঋণ শোধ করে দিতে গিয়ে এই অনন্ত রৌদ্রের অন্ধকার।
মানবের অভিজ্ঞতা এ-রকম।
অভিজ্ঞতা বেশি ভালো হলে তবু ভয়
পেতে হত?
মৃত্যু তবে ব্যসনের মতো মনে হত?
এখন ব্যসন কিছু নেই।
সকলেই আজ এই বিকেলের পরে এক তিমির রাত্রির
সমুদ্রের যাত্রীর মতন
ভালো-ভালো নাবিক ও জাহাজের দিগন্তর খুঁজে
পৃথিবীর ভিন্ন-ভিন্ন নেশনের নিঃসহায় প্রতিভূর মতো
পরস্পরকে বলে, 'হে নাবিক, হে নাবিক তুমি—
সমুদ্র এমন সাধু, নীল হয়ে—তবুও মহান মরুভূমি;
আমরাও কেউ নই—'
তাহাদের শ্রেণী যোনি ঋণ রক্ত রিরংসা ও ফাঁকি
উঁচুনিচু নরনারী নিক্তিনিরপেক্ষ হয়ে আজ
মানবের সমাজের মতন একাকী
নিবিড় নাবিক হলে ভালো হয়;
হে নাবিক, হে নাবিক জীবন অপরিমেয় নাকি।

বৈশাখী ৩। ১৩৫১

সময়ের কাছে

সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চলে যেতে হয়
কী কাজ করেছি আর কী কথা ভেবেছি।
সেইসব একদিন হয়তো বা কোনো-এক সমুদ্রের পারে
আজকের পরিচিত কোনো নীল আভার পাহাড়ে
অন্ধকারে হাড়কঙ্করের মতো শুয়ে
নিজের আয়ুর দিন তবুও গণনা করে যায় চিরদিন ;—
নীলিমার থেকে ঢের দূরে সরে গিয়ে,
সূর্যের আলোর থেকে অন্তর্হিত হয়ে ;
পেপিরাসে—সেদিন প্রিণ্টিং প্রেসে কিছু নেই আর ;
প্রাচীন চীনের শেষে নবতম শতাব্দীর চীন
সেদিন হারিয়ে গেছে।

আজকে মানুষ আমি তবুও তো—সৃষ্টির হৃদয়ে
হৈমন্তিক স্পন্দনের পথের ফসল ;
আর এই মানবের আগামী কঙ্কাল ;
আর নব—
নব-নব মানবের তরে
কেবলই অপেক্ষাতুর হয়ে পথ চিনে নেওয়া—
চিনে নিতে চাওয়া ;
আর সে-চলার পথে বাধা দিয়ে অন্নের সমাপ্তিহীন ক্ষুধা ;
(কেন এই ক্ষুধা—
কেনই সমাপ্তিহীন !)
যারা সব পেয়ে গেছে তাদের উচ্ছিষ্ট,
যারা কিছু পায় নাই তাদের জঞ্জাল ;
আমি এই সব।

সময়ের সমুদ্রের পারে
কালকের ভোরে আর আজকের এই অন্ধকারে
সাগরের বড়ো শাদা পাখির মতন
দুইটি ছড়ানো ডানা বুক নিয়ে কেউ
কোথাও উচ্ছল প্রাণশিখা
জ্বালায়ে সাহস সাধ স্বপ্ন আছে—ভাবে।
ভেবে নিক—যৌবনের জীবন্ত প্রতীক : তার জয় !
প্রৌঢ়তার দিকে তবু পৃথিবীর জ্ঞানের বয়স
অগ্রসর হয়ে কোন আলোকের পাখিকে দেখেছে ?—
জয়, তার জয়, যুগে-যুগে তার জয় !—
ডোডো পাখি নয়।

মানুষেরা বারবার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে ;
নব-নব ইতিহাস-সৈকতে ভিড়েছে ;
তবুও কোথায় সেই অনির্বচনীয়
স্বপনের সফলতা—নবীনতা—শুভ্র মানবিকতার ভোর ?
নচিকেতা জরাথুষ্ট্র লাওৎ-সে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী
হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে ?
অন্ধকারে ইতিহাসপুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়
যতই শান্তিতে স্থির হয়ে যেতে চাই ;
কোথাও আঘাত ছাড়া—তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই।
হে কালপুরুষ তারা, অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে
কেবলই গতির গুণগান গেয়ে—সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছন্দ উৎসবে :
নতুন তরঙ্গে রৌদ্রে বিপ্লবে মিলনসূর্যে মানবিক রণ
ক্রমেই নিস্তেজ হয়, ক্রমেই গভীর হয় মানবিক জাতীয় মিলন ?
নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় করে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন

হবে না কি মানবকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে !
সেই সব সুনিবিড় উদ্‌বোধনে—‘আছে আছে আছে’ এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয় ;—
জয় অস্তসূর্য, জয় অলখ অরুণোদয়, জয়।

লোকসামান্য

অন্ধভাবে আলোকিত হয়েছিল তারা
জীবনের সাগরে-সাগরে :
বঙ্গোপসাগরে,
চীনের সমুদ্রে—দ্বীপপুঞ্জের সাগরে।
নিজের মৎসর নিয়ে নিশানের ’পরে সূর্য এঁকে
চোখ মেরেছিল তারা নীলিমার সূর্যের দিকে।
তারা সব আজ রাতে বিলোড়িত জাহাজের খোল
সাগরকীটের মৃত শরীরের আলেয়ার মতো
সময়ের দোলা খেয়ে নড়ে ;
‘এশিয়া কি এশিয়াবাসীর
কোপ্রস্‌পেরিটির
সূর্যদেবীর নিজ প্রতীতির তরে ?’
বলে সে পুরোনো যুগ শেষ হয়ে যায়।
কোথাও নতুন দিন আসে ;
কে জানে সেখানে সৎ নবীনতা রয়ে গেছে কিনা ;
সূর্যের চেয়েও বেশি বালির উত্তাপে
বহুকাল কেটে গেছে বহুতর শ্লোগানের পাপে।
এ রকম ইতিহাসে উৎস রক্ত হয়ে
এই নব উত্তরাধিকারে
স্বর্গতি না হোক—তবু মানুষের চরিত্র সংহত হয় না কি ?
হে সাগর সময়ের,

হে মানুষ,—সময়ের সাগরের নিরঞ্জন-ফাঁকি
চিনে নিয়ে বিমলিন নাবিকের মতন একাকী
হলেও সে হত, তবু পৃথিবীর বড়ো রৌদ্রে—আরও প্রিয়তর জনতায়
'নেই' এই অনুভব জয় করে আনন্দে ছড়ায়ে যেতে চায়।

জনান্তিকে

তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই—তবু,
গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই—তুমি
আজও এই পৃথিবীতে রয়ে গেছ।
কোথাও সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ ;
বহুদিন থেকে শান্তি নেই।
নীড় নেই
পাখিরও মতন কোনো হৃদয়ের তরে !
পাখি নেই।
মানুষের হৃদয়কে না জাগালে তাকে
ভোর, পাখি, অথবা বসন্তকাল বলে
আজ তার মানবকে কী করে চেনাতে পারে কেউ।
চারিদিকে অগণন মেশিন ও মেশিনের দেবতার কাছে
নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করে নিতে গিয়ে তবু
মানুষ এখনও বিশৃঙ্খল।
দিনের আলোর দিকে তাকালেই দেখা যায় লোক
কেবলই আহত হয়ে মৃত হয়ে স্তব্ধ হয় ;
এ ছাড়া নির্মল কোনো জননীতি নেই।
যে মানুষ—যেই দেশ টিকে থাকে সে-ই
ব্যক্তি হয়—রাজ্য গড়ে—সাম্রাজ্যের মত কোনো ভূমা
চায়। ব্যক্তির দাবিতে তাই সাম্রাজ্য কেবলই ভেঙে গিয়ে
তারই পিপাসায়

গড়ে ওঠে।
এ ছাড়া অমল কোনো রাজনীতি পেতে হলে তবে
উজ্জ্বল সময়স্রোতে চলে যেতে হয়।
সেই স্রোত আজও এই শতাব্দীর তরে নয়।
সকলের তরে নয়।
পঙ্গপালের মতো মানুষেরা চরে ;
ঝরে পড়ে।

এইসব দিনমান মৃত্যু আশা আলো গুনে নিতে
ব্যাপ্ত হতে হয়।
নব প্রস্থানের দিকে হৃদয় চলেছে।

চোখ না এড়ায়ে তবু অকস্মাৎ কখনও ভোরের জনান্তিকে
চোখে থেকে যায়
আরও এক আভা :
আমাদের এই পৃথিবীর এই ধৃষ্ট শতাব্দীর
হৃদয়ের নয়—তবু হৃদয়ের নিজের জিনিস
হয়ে তুমি রয়ে গেছ।

তোমার মাথার চুলে কেবলই রাত্রির মতো চুল
তারকার অনটনে ব্যাপক বিপুল
রাতের মতন তার একটি নির্জন নক্ষত্রকে
ধরে আছে।
তোমার হৃদয়ে গায়ে আমাদের জনমানবিক
রাত্রি নেই। আমাদের প্রাণে এক তিল
বেশি রাত্রির মতো আমাদের মানবজীবন
প্রচারিত হয়ে গেছে বলে—

নারি,
সেই এক তিল কম
আর্ত রাত্রি তুমি।

শুধু অন্তহীন ঢল, মানব-খচিত সাঁকো, শুধু অমানব নদীদের
অপর নারীর কণ্ঠ তোমার নারীর দেহ ঘিরে ;
অতএব তার সেই সপ্রতিভ অমেয় শরীরে
আমাদের আজকের পরিভাষা ছাড়া আরও নারী
আছে। আমাদের যুগের অতীত এক কাল
রয়ে গেছে।
নিজের নুড়ির 'পরে সারাদিন নদী
সূর্যের—সুরের বীথি, তবু
নিমেষে উপল নেই—জলও কোন্ অতীতে মরেছে ;
তবুও নবীন নুড়ি—নতুন উজ্জ্বল জল নিয়ে আসে নদী ;
জানি আমি জানি আদিনারীশরীরিণীকে স্মৃতির
(আজকে হেমন্ত ভোরে) সে কবের আঁধার অবধি ;—
সৃষ্টির ভীষণ অমা ক্ষমাহীনতায়
মানবের হৃদয়ের ভাঙা নীলিমায়
বকুলের বনে মনে অপার রক্তের ঢলে গ্লেশিয়ারে জলে
অসতী না হয়ে তবু স্মরণীর অনন্ত উপলে
প্রিয়াকে পীড়ন করে কোথায় নভের দিকে চলে।

পূর্বাশা। কার্তিক ১৩৫২

মকরসংক্রান্তির রাতে

(আবহমান ইতিহাসচেতনা একটি পাখির মতো যেন)

কে পাখি সূর্যের থেকে সূর্যের ভিতরে

নক্ষত্রের থেকে আরও নক্ষত্রের রাতে
আজকের পৃথিবীর আলোড়ন হৃদয়ে জাগিয়ে
আরো বড়ো বিষয়ের হাতে
সে সময় মুছে ফেলে দিয়ে
কী এক গভীর সুসময় !
মকর'ক্রান্তির রাত অন্তহীন তারায় নবীন :
—তবুও তা পৃথিবীর নয় ;
এখন গভীর রাত, হে কালপুরুষ,
তবু পৃথিবীর মনে হয়।

শতাব্দীর যে-কোনো নটীর ঘরে
নীলিমার থেকে কিছু নিচে
বিশুদ্ধ মুহূর্ত তার মানুষীর ঘুমের মতন ;
ঘুম ভালো,—মানুষ সে নিজে
ঘুমাবার মতন হৃদয়
হারিয়ে ফেলেছে তবু।
অবরুদ্ধ নগরী কি ? বিচূর্ণ কি ? বিজয়ী কি ? এখন সময়
অনেক বিচিত্র রাত মানুষের ইতিহাসে শেষ করে তবু
রাতের স্বাদের মতো সপ্রতিভ বলে মনে হয়।
মানুষের মৃত্যু, ক্ষয়, প্রেম, বিপ্লবের ঢের নদীর নগরে
এই পাখি আর এই নক্ষত্রেরা ছিল মনে পড়ে।
মকর'ক্রান্তির রাতে গভীর বাতাস।
আকাশের প্রতিটি নক্ষত্র নিজ মুখ চেনাবার
মতন একান্ত ব্যাপ্ত আকাশকে পেয়ে গেছে আজ।
তেমনই জীবনপথে চলে যেতে হলে তবে আর
দ্বিধা নেই ;—পৃথিবী ভঙ্গুর হয়ে নিচে রক্তে নিভে যেতে চায় ;
পৃথিবী প্রতিভা হয়ে আকাশের মতো এক শুভ্রতায় নেমে

নিজেকে মেলাতে গিয়ে বেবিলন লণ্ডন
দিল্লি কলকাতার নক্‌টার্নে
অভিভূত হয়ে গেলে মানুষের উত্তরণ জীবনের মাঝপথে থেমে
মহান তৃতীয় অঙ্কে : গর্ভাঙ্কে তবুও লুপ্ত হয়ে যাবে না কি !—
সূর্যে, আরও নব সূর্যে দীপ্ত হয়ে প্রাণ দাও—প্রাণ দাও পাখি।

কবিতা। আশ্বিন ১৩৫২

উত্তরপ্রবেশ

পুরোনো সময় সুর ঢের কেটে গেল।
যদি বলা যেত :
সমুদ্রের পারে কেটে গেছে,
সোনার বলের মতো সূর্য ছিল পুবের আকাশে—
সেই পটভূমিকায় ঢের
ফেনশীর্ষ ঢেউ,
উড়ন্ত ফেনার মতো অগণন পাখি।
পুরোনো বছর দেশ ঢের কেটে গেল
রোদের ভিতরে ঘাসে শুয়ে ;
পুকুরের জল থেকে কিশোরের মতো তৃপ্ত হাতে
ঠাণ্ডা পানিফল, জল ছিঁড়ে নিতে গিয়ে ;
চোখের পলকে তবু যুবকের মতো
মৃগনাভিঘন বড়ো নগরের পথে
কোনো-এক সূর্যের জগতে
চোখের নিমেষ পড়েছিল।

সেইখানে সূর্য তবু অস্ত যায়।
পুনরুদয়ের ভোরে আসে

মানুষের হৃদয়ের অগোচর
গম্বুজের উপরে আকাশে।
এ ছাড়া দিনের কোনো সুর
নেই ;
বসন্তের অন্য সাড়া নেই।
প্লেন আছে :
অগণন প্লেন
অগণ্য এয়ারোড্রোম
রয়ে গেছে।
চারিদিকে উঁচু-নিচু অন্তহীন নীড়—
হলেও বা হয়ে যেত পাখির মতন কাকলির
আনন্দে মুখর ;

সেইখানে ক্লান্তি তবু—
ক্লান্তি—ক্লান্তি
কেন ক্লান্তি
তা ভেবে বিস্ময় ;
সেইখানে মৃত্যু তবু ;
এই শুধু—
এই ;
চাঁদ আসে একলাটি ;
নক্ষত্রেরা দল বেঁধে আসে ;
দিগন্তের সমুদ্রের থেকে হাওয়া প্রথম আবেগে
এসে তবু অস্ত যায় ;
উদয়ের ভোরে ফিরে আসে
আপামর মানুষের হৃদয়ের অগোচর
রক্ত হেডলাইনের—রক্তের উপরে আকাশে।

এ ছাড়া পাখির কোনো সুর—
বসন্তের অন্য কোনো সাড়া নেই।
নিখিল ও নীড় জনমানবের সমস্ত নিয়মে
সজন নির্জন হয়ে থাকে
ভয় প্রেম জ্ঞান ভুল আমাদের মানবতা রোল
উত্তরপ্রবেশ করে আরও বড় চেতনার লোকে ;
অনন্ত সূর্যের অস্ত শেষ করে দিয়ে
বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস,
এ ভোর নবীন বলে মেনে নিতে হয় ;
এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব ; আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়।

যুগান্তর। শারদীয় ১৩৫২

দীপ্তি

তোমার নিকট থেকে
যত দূর দেশে
আমি চলে যাই
তত ভালো।
সময় কেবলই নিজ নিয়মের মতো ;—তবু কেউ
সময়স্রোতের ’পরে সাঁকো
বেঁধে দিতে চায় ;
ভেঙে যায় ;
যত ভাঙে তত ভালো।
যত স্রোত বয়ে যায়
সময়ের
সময়ের মতন নদীর
জলসিঁড়ি, নিপার, ওডার, রাইন, রেবা, কাবেরীর

তুমি তত বহে যাও,
আমি তত বহে চলি,
তবুও কেহই কারু নয়।

আমরা জীবন তবু।

তোমার জীবন নিয়ে তুমি
সূর্যের রশ্মির মতো অগণন চুলে
রৌদ্রের বেলার মতো শরীরের রঙে
খরতর নদী হয়ে গেলে
হয়ে যেতে।
তবুও মানুষী হয়ে
পুরুষের সন্ধান পেয়েছ ;
পুরুষের চেয়ে বড়ো জীবনের হয়তো বা।

আমিও জীবন তবু ;—
ক্বচিৎ তোমার কথা ভেবে
তোমার সে শরীরের থেকে ঢের দূরে চলে গিয়ে
কোথাও বিকেলবেলা নগরীর উৎসারণে উচল সিঁড়ির
উপরে রৌদ্রের রঙ জ্বলে ওঠে—দেখে
বুদ্ধের চেয়েও আরো দীন সুষমার সুজাতার
মৃত বৎসকে বাঁচায়েছে
কেউ যেন ;
মনে হয়,
দেখা যায়।

কেউ নেই—স্তব্ধতায় ; তবুও হৃদয়ে দীপ্তি আছে।

দিন শেষ হয়নি এখনও।
জীবনের দিন—কাজ—
শেষ হতে আজও ঢের দেরি।
অন্ন নেই। হৃদয়বিহীনভাবে আজ
মৈত্রেয়ী ভূমার চেয়ে অন্নলোভাতুর।
রক্তের সমুদ্র চারিদিকে ;
কলকাতা থেকে দূর
গ্রীসের অলিভ-বন
অন্ধকার।

অগণন লোক মরে যায় ;
এম্পিডোক্লেসের মৃত্যু নয় ;—
সেই মৃত্যু ব্যসনের মতো মনে হয়।

এ-ছাড়া কোথাও কোনো পাখি
বসন্তের অন্য কোনো সাড়া নেই।
তবু এক দীপ্তি রয়ে গেছে।

বৈশাখী ৪। ১৩৫২

সূর্যপ্রতিম

আমরণ কেবলই বিপন্ন হয়ে চলে
তারপর যে বিপদ আসে
জানি
হৃদয়ঙ্গম করার জিনিস ;
এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

বালুচরে নদীটির জল ঝরে,
খেলে যায় সূর্যের ঝিলিক,
মাছরাঙা ঝিক্‌মিক্‌ করে উড়ে যায় ;
মৃত্যু আর করুণার দুটো তরোয়াল আড়াআড়ি
গড়ে ভেঙে নিতে চায় এইসব সাঁকো ঘর বাড়ি ;
নিজেদের নিশিত আকাশ ঘিরে থাকে।

এ-রকম হয়েছে অনেক দিন—রৌদ্রে বাতাসে ;
যারা সব দেখেছিল—
যারা ভালোবেসেছিল এইসব—তারা
সময়ের সুবিধায় নিলেম বিকিয়ে গেছে আজ।
তারা নেই।
এসো আমরা যে যার কাছে—যে যার যুগের কাছে সব
সত্য হয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠি।
নব পৃথিবীকে পেতে সময় চলেছে ?
হে অবাচী, হে উদীচী, কোথাও পাখির শব্দ শুনি ;
কোথাও সূর্যের ভোর রয়ে গেছে বলে মনে হয় !
মরণকে নয় শুধু—
মরণসিন্ধুর দিকে অগ্রসর হয়ে
যা-কিছু দেখার আছে
আমরাও দেখে গেছি ;
ভুলে গেছি, স্মরণে রেখেছি।
পৃথিবীর বালি রক্ত কালিমার কাছে তারপর
আমরা খারিজ হয়ে দোটানার
অন্ধকারে তবুও তো
চক্ষুস্থির রেখে
গণিকাকে দেখায়েছি ফাঁদ ;

প্রেমিককে শিখায়েছি ফাঁকির কৌশল।
শেখাইনি ?

শতাব্দী আবেশে অস্তে চলে যায় :
বিপ্লবী কি স্বর্ণ জমায়।
আকণ্ঠ মরণে ডুবে চিরদিন
প্রেমিক কি উপভোগ করে যায়
              স্নিগ্ধ সার্থবাহদের ঋণ।
তবে এই অলক্ষিতে কোন্‌খানে জীবনের আশ্বাস রয়েছে।

আমরা অপেক্ষাতুর ;
চাঁদের ওঠার আগে কালো সাগরের
মাইলের পরে আরো অন্ধকার ডাইনি মাইলের
পাড়ি দেওয়া পাখিদের মতো
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় যোগান দিয়ে ভেসে
এ অনন্ত প্রতিপদে তবু
চাঁদ ভুলে উড়ে যাওয়া চাই,
উড়ে যেতে চাই।

পিছনের ঢেউগুলো প্রতারণা করে ভেসে গেছে ;
সামনের অভিভূত অন্তহীন সমুদ্রের মতন এসেছে ;
লবণাক্ত পালকের ডানায় কাতর
ঝাপটার মতো ভেঙে বিশ্বাসহন্তার মতো কেউ
সমুদ্রের অন্ধকার পথে পড়ে আছে।
মৃত্যু আজীবন অগণন হল, তবু
এ-রকমই হবে।

'কেবলই ব্যক্তির—ব্যক্তির মৃত্যু শেষ করে দিয়ে আজ
আমরাও মরে গেছি সব—'
দলিলে না মরে তবু এ রকম মৃত্যু অনুভব
করে তারা হৃদয়বিহীনভাবে ব্যাপ্ত ইতিহাস
সাঙ্গ করে দিতে চেয়ে যতদূর মানুষের প্রাণ
অতীতে ম্লানায়মান হয়ে গেছে সেই সীমা ঘিরে
জেগে ওঠে উনিশশো তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ, অনন্তের
অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে।

চতুরঙ্গ। আশ্বিন ১৩৫১

শ্রেষ্ঠ কবিতা
১৯৫৪

কবিতা কী এ জিজ্ঞাসার কোনো আবছা উত্তর দেওয়ার আগে এটুকু অন্তত স্পষ্টভাবে বলতে পারা যায় যে কবিতা অনেক রকম। হোমরও কবিতা লিখেছিলেন, মালার্মে র‍্যাঁবো ও রিলকেও। শেক্সপীয়র বদ্‌লেয়র রবীন্দ্রনাথ ও এলিয়টও কবিতা রচনা করে গেছেন। কেউ-কেউ কবিকে সবের ওপরে সংস্কারকের ভূমিকায় দেখেন ; কারো কারো ঝোঁক একান্তই রসের দিকে। কবিতা রসেরই ব্যাপার, কিন্তু এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস—শুদ্ধ কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়।

বিভিন্ন অভিজ্ঞ পাঠকের বিচার ও রুচির সঙ্গে যুক্ত থাকা দরকার কবির ; কবিতার সম্পর্কে পাঠক ও সমালোচকেরা কীভাবে দায়িত্ব সম্পন্ন করছেন—এবং কীভাবে তা করা উচিত সেইসব চেতনার ওপর কবির ভবিষ্যৎ কাব্য, আমার মনে হয়, আরো স্পষ্টভাবে দাঁড়াবার সুযোগ পেতে পারে। কাব্য চেনবার আস্বাদ করবার ও বিচার করবার নানারকম স্বভাব ও পদ্ধতির বিচিত্র সত্যমিথ্যার পথে আধুনিক কাব্যের আধুনিক সমালোচককে প্রায়ই চলতে দেখা যায়, কিন্তু সেই কাব্যের মোটামুটি সত্যও অনেক সময়ই তাঁকে এড়িয়ে যায়।

আমার কবিতাকে বা এ কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ; কেউ বলেছেন, এ কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার ; কারো মীমাংসায় এ কাব্য একান্তই প্রতীকী ; সম্পূর্ণ অবচেতনার ; সুররিয়ালিস্ট। আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য—কোনো কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে ; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়। কিন্তু কবিতাসৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুই-ই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-মনের ব্যাপার ; কাজেই পাঠক ও সমালোচকদের উপলব্ধি ও মীমাংসায় এত তারতম্য। একটা সীমারেখা আছে এ তারতম্যের ; সেটা ছাড়িয়ে গেলে বড়ো সমালোচককে অবহিত হতে হয়।

নানা দেশে অনেকদিন থেকেই কাব্যের সংগ্রহ বেরুচ্ছে। বাংলায় কবিতার সঞ্চয়ন খুবই কম। নানা শতকের অক্সফোর্ড বুক অব ভর্সের সংকলকদের মধ্যে বড়ো কবি প্রায়ই কেউ নেই ; কিন্তু সংকলনগুলো ভালো হয়েছে ; ঢের পুরোনো কাব্যের বাছবিচারে বেশি সার্থকতা বেশি সহজ, নতুন কবি ও কবিতার খাঁটি বিচার বেশি কঠিন। অনেক কবির সমাবেশে একটি সংগ্রহ ; একজন কবির প্রায় সমস্ত উল্লেখ্য কবিতা নিয়ে আর এক জাতীয় সংকলন ; পশ্চিমে এ ধরনের অনেক বই আছে ; তাদের ভেতর কয়েকটি তাৎপর্যে—এমনকি মাহাত্ম্যে প্রায় অক্ষুণ্ন। আমাদের দেশে দু-একজন পূর্বজ (উনিশ-বিশ শতকের) কবির নির্বাচিত কাব্যাংশ প্রকাশিত হয়েছিল ; কতদূর সফল হয়েছে এখনো ঠিক বলতে পারছি না। ভালো কবিতা যাচাই করবার বিশেষ শক্তি সংকলকের থাকলেও আদি নির্বাচন অনেক সময়ই কবির মৃত্যুর পরে খাঁটি সংকলনে গিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পায়। কিন্তু কোনো

কোনো সংকলনে প্রথম থেকেই যথেষ্ট নির্ভুল চেতনার প্রয়োগ দেখা যায়। পাঠকদের সঙ্গে বিশেষভাবে যোগ স্থাপনের দিক দিয়ে এ ধরনের প্রাথমিক সংকলনের মূল্য আমাদের দেশেও লেখক পাঠক ও প্রকাশকদের কাছে ক্রমেই বেশি স্বীকৃত হচ্ছে হয়ত। যিনি কবিতা লেখা ছেড়ে দেননি তাঁর কবিতার এ-রকম সংগ্রহ থেকে পাঠক ও সমালোচক এ কাব্যের যথেষ্ট সংগত পরিচয় পেতে পারেন ; যদিও শেষ পরিচয়লাভ সমসাময়িকদের পক্ষে নানা কারণেই দুঃসাধ্য।

এই সংকলনের কবিতাগুলো শ্রীযুক্ত বিরাম মুখোপাধ্যায় আমার পাঁচখানা কবিতার বই ও অন্যান্য প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা থেকে সঞ্চয় করেছেন, তাঁর নির্বাচনে বিশেষ শুদ্ধতার পরিচয় পেয়েছি। বিন্যাস-সাধনে মোটামুটিভাবে রচনা-কালক্রম অনুসরণ করা হয়েছে।

কলকাতা **জীবনানন্দ দাশ**

২০.৪.১৯৫৪

তবু

সে অনেক রাজনীতি রুগ্ন নীতি মারী
মন্বন্তর যুদ্ধ ঋণ সময়ের থেকে
উঠে এসে এই পৃথিবীর পথে আড়াই হাজার
বছরে বয়সী আমি ;
বুদ্ধকে স্বচক্ষে মহানির্বাণের আশ্চর্য শান্তিতে
চলে যেতে দেখে—তবু—অবিরল অশান্তির দীপ্তি ভিক্ষা ক'রে
এখানে তোমার কাছে দাঁড়ায়ে রয়েছি ;
আজ ভোরে বাংলার তেরোশো চুয়ান্ন সাল এই
কোথাও নদীর জলে নিজেকে গণনা করে নিতে ভুলে গিয়ে
আগামী লোকের দিকে অগ্রসর হয়ে যায় ; আমি
তবুও নিজেকে রোধ করে আজ থেমে যেতে চাই
তোমার জ্যোতির কাছে ; আড়াই হাজার
বছর তা হলে আজ এইখানে শেষ হয়ে গেছে।

নদীর জলের পথে মাছরাঙা ডানা বাড়াতেই
আলো ঠিকরায়ে গেছে—যারা পথে চলে যায় তাদের হৃদয়ে ;
সৃষ্টির প্রথম আলোর কাছে ; আহা,
অন্তিম আভার কাছে ; জীবনের যতিহীন প্রগতিশীলতা
নিখিলের স্মরণীয় সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে ; দেখ
পাখি চলে, তারা চলে, সূর্য মেঘে জ্বলে যায়, আমি
তবুও মধ্যম পথে দাঁড়ায়ে রয়েছি—তুমি দাঁড়াতে বলো নি।
আমাকে দেখ নি তুমি ; দেখাবার মতো
অপব্যয়ী কল্পনার ইন্দ্রত্বের আসনে আমাকে
বসালে চকিত হয়ে দেখে যেতে যদি—তবু, সে আসনে আমি

যুগে যুগে সাময়িক শত্রুদের বসিয়েছি, নারি,
ভালোবেসে ধ্বংস হয়ে গেছে তারা সব।
এ রকম অন্তহীন পটভূমিকায়—প্রেমে—
নতুন ঈশ্বরদের বারবার লুপ্ত হতে দেখে
আমারও হৃদয় থেকে তরুণতা হারায়ে গিয়েছে ;
অথচ নবীন তুমি।
নারি, তুমি সকালের জল উজ্জ্বলতা ছাড়া পৃথিবীর কোনো নদীকেই
বিকেলে অপর ঢেউয়ে খরশান হতে
দিতে ভুলে গিয়েছিলে ; রাতের প্রখর জলে নিয়তির দিকে
বহে যেতে দিতে মনে ছিলো কি তোমার ?
এখনও কি মনে নেই ?

আজ এই পৃথিবীর অন্ধকারে মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাস
কেবলই শিথিল হয়ে যায় ; তবু তুমি
সেই শিথিলতা নও, জানি, তবু ইতিহাসরীতিপ্রতিভার
মুখোমুখি আবছায়া দেয়ালের মতো নীল আকাশের দিকে
ঊর্ধ্বে উঠে যেতে চেয়ে তুমি
আমাদের দেশে কোনো বিশ্বাসের দীর্ঘ তরু নও।

তবু
কী যে উদয়ের সাগরের প্রতিবিম্ব জ্বলে ওঠে রোদে !
উদয় সমাপ্ত হয়ে গেছে নাকি সে অনেক আগে ?
কোথাও বাতাস নেই, তবু
মর্মরিত হয়ে ওঠে উদয়ের সমুদ্রের পারে।
কোনো পাখি
কালের ফোকরে আজ নেই, তবু, নব সৃষ্টিমরালের মতো কলস্বরে
কেন কথা বলি ; কোনো নারী
নেই, তবু আকাশহংসীর কণ্ঠে ভোরের সাগর উতরোল।

পৃথিবীতে

শস্যের ভিতরে রৌদ্রে পৃথিবীর সকালবেলায়
কোনো-এক কবি বসে আছে ;
অথবা সে কারাগারে ক্যাম্পে অন্ধকারে ;
তবুও সে প্রীত অবহিত হয়ে আছে

এই পৃথিবীর রোদে—এখানে রাত্রির গন্ধে—নক্ষত্রের তরে।
তাই সে এখানকার ক্লান্ত মানবীয় পরিবেশ
সুস্থ্ করে নিতে চায় পরিচ্ছন্ন মানুষের মতো,
সব ভবিতব্যতার অন্ধকারে দেশ

মিশে গেলে ; জীবনকে সকলের তরে ভালো ক'রে
পেতে হলে এই অবসন্ন ম্লান পৃথিবীর মতো
অম্লান ; অক্লান্ত হয়ে বেঁচে থাকা চাই।
একদিন স্বর্গে যেতে হত।

আজকাল। শারদীয় ১৩৫২

এই সব দিনরাত্রি

মনে হয় এর চেয়ে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ভালো।
এইখানে
পৃথিবীর এই ক্লান্ত এ অশান্ত কিনারা দেশে
এখানে আশ্চর্য সব মানুষ রয়েছে।
তাদের সম্রাট নেই, সেনাপতি নেই ;
তাদের হৃদয়ে কোনো সভাপতি নেই ;
শরীর বিবশ হলে অবশেষে ট্রেড-ইউনিয়নের

কংগ্রেসের মতো কোনো আশা-হতাশার
কোলাহল নেই।

অনেক শ্রমিক আছে এইখানে।
আরো ঢের লোক আছে
সঠিক শ্রমিক নয় তারা।
স্বাভাবিক মধ্যশ্রেণী নিম্নশ্রেণী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিধি থেকে ঝ'রে
এরা তবু মৃত নয় ; অন্তবিহীন কাল মৃতবৎ ঘোরে।
নামগুলো কুশ্রী নয়, পৃথিবীর চেনা-জানা নাম এই সব।
আমরা অনেক দিন এ-সব নামের সাথে পরিচিত ; তবু,
গৃঢ় নীড় নির্দেশ সকলই হারায়ে ফেলে ওরা
জানে না কোথায় গেলে মানুষের সমাজের পারিশ্রমিকের
মতন নির্দিষ্ট কোনো শ্রমের বিধান পাওয়া যাবে ;
জানে না কোথায় গেলে জল তেল খাদ্য পাওয়া যাবে ;
অথবা কোথায় মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিন্ধুতীর আছে।

মেডিকেল ক্যাম্বেলের বেলগাছিয়ার
যাদবপুরের বেড কাঁচড়াপাড়ার বেড সব মিলে কতগুলো সব ?
ওরা নয়—সহসা ওদের হয়ে আমি
কাউকে শুধায়ে কোনো ঠিকমতো জবাব পাইনি।
বেড আছে, বেশি নেই—সকলের প্রয়োজনে নেই।
যাদের আস্তানা ঘর তল্পিতল্পা নেই
হাসপাতালের বেড হয়তো তাদের তরে নয়।
বটতলা মুচিপাড়া তালতলা জোড়াসাঁকো—আরো ঢের ব্যর্থ অন্ধকারে
যারা ফুটপাত ধ'রে অথবা ট্রামের লাইন মাড়িয়ে চলছে
তাদের আকাশ কোন্ দিকে ?
জানু ভেঙে পড়ে গেলে হাত কিছুক্ষণ আশাশীল

হয়ে কিছু চায়—কিছু খোঁজে ;
এ ছাড়া আকাশ আর নেই।
তাদের আকাশ
সর্বদাই ফুটপাতে ;
মাঝে মাঝে এম্বুলেন্‌স্‌ গাড়ির ভিতরে
রণক্লান্ত নাবিকেরা ঘরে
ফিরে আসে
যেন এক অসীম আকাশে।

এ-রকম ভাবে চ'লে দিন যদি রাত হয়, রাত যদি হয়ে যায় দিন,
পদচিহ্নময় পথ হয় যদি দিকচিহ্নহীন,
কেবলই পাথুরেঘাটা নিমতলা চিৎপুর—
খালের এপার-ওপার রাজাবাজারের অস্পষ্ট নির্দেশে
হাঘরে হাভাতেদের তবে
অনেক বেডের প্রয়োজন ;
বিশ্রামের প্রয়োজন আছে ;
বিচিত্র মৃত্যুর আগে শান্তির কিছুটা প্রয়োজন।
হাসপাতালের জন্যে যাহাদের অমূল্য দাদন,
কিংবা যারা মরণের আগে মৃতদের
জাতিধর্ম নির্বিচারে সকলকে—সব তুচ্ছতম আর্তকেও
শরীরের সান্ত্বনা এনে দিতে চায়,
কিংবা যারা এইসব মৃত্যু রোধ করে এক সাহসী পৃথিবী
সুবাতাস সমুজ্জ্বল সমাজ চেয়েছে—
তাদের ও তাদের প্রতিভা প্রেম সংকল্পকে ধন্যবাদ দিয়ে
মানুষকে ধন্যবাদ দিয়ে যেতে হয়।
মানুষের অনিঃশেষ কাজ চিন্তা কথা
রক্তের নদীর মতো ভেসে গেলে, তারপর, তবু, এক অমূল্য মুগ্ধতা

অধিকার করে নিয়ে ক্রমেই নির্মল হতে পারে।

ইতিহাস অর্ধসত্যে কামাচ্ছন্ন এখনো কালের কিনারায় ;
তবুও মানুষ এই জীবনকে ভালোবাসে ; মানুষের মন
জানে জীবনের মানে : সকলের ভালো ক'রে জীবনযাপন।
কিন্তু সেই শুভ রাষ্ট্র ঢের দূরে আজ।
চারি দিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়—অলীক প্রয়াণ।
মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর ;
যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল ;
মানুষের লালসার শেষ নেই ;
উত্তেজনা ছাড়া কোনো দিন ঋতু ক্ষণ
অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ
অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ
নেই।
কেবলই আসন থেকে বড়ো, নবতর
সিংহাসনে যাওয়া ছাড়া গতি নেই কোনো।
মানুষের দুঃখ কষ্ট মিথ্যা নিষ্ফলতা বেড়ে যায়।

মনে পড়ে কবে এক রাত্রির স্বপ্নের ভিতরে
শুনেছি একটি কুষ্ঠকলঙ্কিত নারী
কেমন আশ্চর্য গান গায় ;
বোবা কালা পাগল মিনসে এক অপরূপ বেহালা বাজায় ;
গানের ঝংকারে যেন সে এক একান্ত শ্যাম দেবদারুগাছে
রাত্রির বর্ণের মতো কালো কালো শিকারী বেড়াল
প্রেম নিবেদন করে আলোর রঙের মতো অগণন পাখিদের কাছে ;
ঝর্ ঝর্ ঝর্
সারারাত শ্রাবণের নির্গলিত ক্লেদরক্ত বৃষ্টির ভিতর

এ পৃথিবী ঘুম স্বপ্ন রুদ্ধশ্বাস
শঠতা রিরংসা মৃত্যু নিয়ে
কেমন প্রদত্ত কালো গণিকার উল্লোল সংগীতে
মুখের ব্যাদান সাধ দুর্দান্ত গণিকালয়—নরক শ্মশান হল সব।
জেগে উঠে আমাদের আজকের পৃথিবীকে এ-রকম ভাবে অনুভব
আমিও করেছি রোজ সকালের আলোর ভিতরে
বিকেলে—রাত্রির পথে হেঁটে ;
দেখেছি রাজনীগন্ধা নারীর শরীর অন্ন মুখে দিতে গিয়ে
আমরা অঙ্গার রক্ত : শতাব্দীর অন্তহীন আগুনের ভিতরে দাঁড়িয়ে।

এ আগুন এত রক্ত মধ্যযুগ দেখেছে কখনও ?
তবুও সকল কাল শতাব্দীকে হিসেব নিকেশ করে আজ
শুভ কাজ সূচনার আগে এই পৃথিবীর মানবহৃদয়
স্নিগ্ধ হয়—বীতশোক হয় ?
মানুষের সব গুণ শান্ত নীলিমার মতো ভালো ?
দীনতা : অন্তিম গুণ, অন্তহীন নক্ষত্রের আলো।

চতুরঙ্গ। কার্তিক-পৌষ ১৩৫৬

লোকেন বোসের জর্নাল

সুজাতাকে ভালোবাসতাম আমি—
এখন কি ভালোবাসি ?
সেটা অবসরে ভাববার কথা,
অবসর তবু নেই ;
তবু একদিন হেমন্ত এলে অবকাশ পাওয়া যাবে ;
এখন শেল্‌ফে চার্বাক ফ্রয়েড প্লেটো পাভ্‌লভ্ ভাবে

সুজাতাকে আমি ভালোবাসি কিনা।

পুরোনো চিঠির ফাইল কিছু আছে :
    সুজাতা লিখেছে আমার কাছে,
বারো তেরো কুড়ি বছর আগের সে-সব কথা ;
    ফাইল নাড়া কী যে মিহি কেরানির কাজ ;
        নাড়বো না আমি,
        নেড়ে কার কী সে লাভ ;
মনে হয় যেন অমিতা সেনের সাথে সুবলের ভাব,
    সুবলেরই শুধু ? অবশ্য আমি তাকে
মানে এই—এই অমিতা বলছি যাকে—
    কিন্তু কথাটা থাক ;
    কিন্তু তবুও—
    আজকে হৃদয় পথিক নয় তো আর,
    নারী যদি মৃগতৃষ্ণার মতো—তবে
    এখন কী করে মন ক্যারাভান হবে।

প্রৌঢ় হৃদয়, তুমি
সেই সব মৃগতৃষ্ণিকাতালে ঈষৎ সিমুমে
হয়তো কখনো বৈতাল মরুভূমি,
হৃদয়, হৃদয় তুমি !
তারপর তুমি নিজের ভিতরে ফিরে এসে তবু চুপে
মরীচিকা জয় করেছ বিনয়ী যে ভীষণ নামরূপে—
সেখানে বালির সৎ নীরবতা ধু ধু
প্রেম নয় তবু প্রেমেরই মতন শুধু।

অমিতা সেনকে সুবল কি ভালোবাসে ?

অমিতা নিজে কি তাকে ?
অবসরমতো কথা ভাবা যাবে,
ঢের অবসর চাই ;
দূর ব্রহ্মাণ্ডকে তিলে টেনে এনে সমাহিত হওয়া চাই ;
এখুনি টেনিসে যেতে হবে তবু,
ফিরে এসে রাতে ক্লবে ;
কখন সময় হবে।

হেমন্তে ঘাসে নীল ফুল ফোটে—
হৃদয় কেন যে কাঁপে,
'ভালোবাসতাম'—স্মৃতি—অঙ্গার—পাপে
তর্কিত কেন রয়েছে বর্তমান।
সে-ও কি আমায়—সুজাতা আমায় ভালোবেসে ফেলেছিল।
আজও ভালোবাসে না কি ?
ইলেক্‌ট্রনেরা নিজ দোষগুণে বলয়িত হয়ে রবে ;
কোনো অন্তিম ক্ষালিত আকাশে এর উত্তর হবে ?

সুজাতা এখন ভুবনেশ্বরে ;
অমিতো কি মিহিজামে ?
বহুদিন থেকে ঠিকানা না জেনে ভালোই হয়েছে—সবই।
ঘাসের ভিতরে নীল শাদা ফুল ফোটে হেমন্তরাগে ;
সময়ের এই স্থির এক দিক,
তবু স্থিরতর নয় ;
প্রতিটি দিনের নতুন জীবাণু আবার স্থাপিত হয়।

পূর্বাশা। কার্তিক ১৩৫৭

১৯৪৬-৪৭

দিনের আলোয় ওই চারি দিকে মানুষের অস্পষ্ট ব্যস্ততা :
পথে-ঘাটে ট্রাক ট্রামলাইনে ফুটপাতে ;
কোথায় পরের বাড়ি এখুনি নিলেম হবে—মনে হয়,
জলের মতন দামে।
সকলকে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে পৌঁছুবে
সকলের আগে সকলেই তাই।

অনেকেরই ঊর্দ্ধশ্বাসে যেতে হয়, তবু
নিলেমের ঘরবাড়ি আসবাব—অথবা যা নিলেমের নয়
সে সব জিনিস
বহুকে বঞ্চিত ক'রে দু জন কি একজন কিনে নিতে পারে।
পৃথিবীতে সুদ খাটে : সকলের জন্যে নয়।
অনির্বচনীয় হুণ্ডি একজন দু জনের হাতে।
পৃথিবীর এইসব উঁচু লোকদের দাবি এসে
সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।
বাকি সব মানুষেরা অন্ধকারে হেমন্তের অবিরল পাতার মতন
কোথাও নদীর পানে উড়ে যেতে চায়,
অথবা মাটির দিকে—পৃথিবীর কোনো পুনঃপ্রবাহের বীজের ভিতরে
মিশে গিয়ে। পৃথিবীতে ঢের জন্ম নষ্ট হয়ে গেছে জেনে, তবু
আবার সূর্যের গন্ধে ফিরে এসে ধুলো ঘাস কুসুমের অমৃতত্বে কবে
পরিচিত জল, আলো আধো অধিকারিণীকে অধিকার করে নিতে হবে :
ভেবে তারা অন্ধকারে লীন হয়ে যায়।
লীন হয়ে গেলে তারা তখন তো—মৃত।
মৃতেরা এ পৃথিবীতে ফেরে না কখনও
মৃতেরা কোথাও নেই ; আছে ?
কোনো কোনো অঘ্রানের পথে পায়চারি-করা শান্ত মানুষের

হৃদয়ের পথে ছাড়া মৃতেরা কোথাও নেই বলে মনে হয় ;
তা হলে মৃত্যুর আগে আলো অন্ন আকাশ নারীকে
কিছুটা সুস্থিরভাবে পেলে ভালো হত।

বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল।
সূর্য অস্তে চলে গেলে কেমন সুকেশী অন্ধকার
খোঁপা বেঁধে নিতে আসে—কিন্তু কার হাতে ?
আলুলায়িত হয়ে চেয়ে থাকে—কিন্তু কার তরে ?
হাত নেই—কোথাও মানুষ নেই ; বাংলার লক্ষ গ্রামরাত্রি একদিন
আলপনার, পটের ছবির মতো সুহাস্যা, পটলচেরা চোখের মানুষী
হতে পেরেছিল প্রায় ; নিভে গেছে সব।

এইখানে নবান্নের ঘ্রাণ ওরা সেদিনও পেয়েছে ;
নতুন চালের রসে রৌদ্রে কতো কাক
এ-পাড়ার বড়ো মেজো...ও-পাড়ার দুলে বোয়েদের
ডাকশাঁখে উড়ে এসে সুধা খেয়ে যেত ;
এখন টুঁ শব্দ নেই সেই সব কাকপাখিদেরও ;
মানুষের হাড় খুলি মানুষের গণনার সংখ্যাধীন নয় ;
সময়ের হাতে অন্তহীন।

ওখানে চাঁদের রাতে প্রান্তরে চাষার নাচ হত
ধানের অদ্ভুত রস খেয়ে ফেলে মাঝি-বাগ্‌দির
ঈশ্বরী মেয়ের সাথে
বিবাহের কিছু আগে—বিবাহের কিছু পরে—সন্তানের জন্মাবার আগে।
সে সব সন্তান আজ এ যুগের কুরাষ্ট্রের মূঢ়
ক্লান্ত লোকসমাজের ভিড়ে চাপা পড়ে
মৃতপ্রায় ; আজকের এই সব গ্রাম্য সন্ততির

প্রপিতামহের দল হেসে খেলে ভালোবেসে—অন্ধকারে জমিদারদের
চিরস্থায়ী ব্যবস্থাকে চড়কের গাছে তুলে ঘুমায়ে গিয়েছে।
ওরা খুব বেশি ভালো ছিল না ; তবুও
আজকের মন্বন্তর দাঙ্গা দুঃখ নিরক্ষরতায়
অন্ধ শতচ্ছিন্ন গ্রাম্য প্রাণীদের চেয়ে
পৃথক আর-এক স্পষ্ট জগতের অধিবাসী ছিল।

আজকে অস্পষ্ট সব ? ভালো করে কথা ভাবা এখন কঠিন ;
অন্ধকারে অর্ধসত্য সকলকে জানিয়ে দেবার
নিয়ম এখন আছে ; তারপর একা অন্ধকারে
বাকি সত্য আঁচ করে নেওয়ার রেওয়াজ
রয়ে গেছে ; সকলেই আড়চোখে সকলকে দেখে।

সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়—দ্বেষ।
সৃষ্টির মনের কথা : আমাদেরই আন্তরিকতাতে
আমাদেরই সন্দেহের ছায়াপাত টেনে এনে ব্যথা
খুঁজে আনা। প্রকৃতির পাহাড়ে পাথরে সমুচ্ছল
ঝর্নার জল দেখে তারপর হৃদয়ে তাকিয়ে
দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল
হয়ে আছে ব'লে বাঘ হরিণের পিছু আজও ধায় ;
মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর
ভরে গেছে ; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি ; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদয়ে কঠিন হয়ে বধ করে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর
কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজপ্রতিম বিমূঢ়কে
বধ করে ঘুমাতেছি—তাহার অপরিসর বুকের ভিতরে
মুখ রেখে মনে হয় জীবনের স্নেহশীল ব্রতী

সকলকে আলো দেবে মনে করে অগ্রসর হয়ে
তবুও কোথাও কোনো আলো নেই বলে ঘুমাতেছে।

ঘুমাতেছে।
যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হয়ে
বলে যাবে কাছে এসে, 'ইয়াসিন আমি,
হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ—
আর তুমি ?' আমার বুকের 'পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
চোখ তুলে শুধাবে সে—রক্তনদী উদ্বেলিত হয়ে
ব'লে যাবে, 'গগন, বিপিন, শশী, পাথুরেঘাটার ;
মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রীটের, এন্টালির—'
কোথাকার কেবা জানে ; জীবনের ইতর শ্রেণীর
মানুষ তো এরা সব ; ছেঁড়া জুতো পায়ে
বাজারের পোকাকাটা জিনিসের কেনাকাটা করে ;
সৃষ্টির অপরিক্লান্ত চারণার বেগে
এই সব প্রাণকণা জেগেছিল—বিকেলের সূর্যের রশ্মিতে
সহসা সুন্দর বলে মনে হয়েছিল কোনো উজ্জ্বল চোখের
মনীষী লোকের কাছে এই সব অণুর মতন
উদ্ভাসিত পৃথিবীর উপেক্ষিত জীবনগুলোকে।
সূর্যের আলোর ঢলে রোমাঞ্চিত রেণুর শরীরে
রেণুর সংঘর্ষে যেই শব্দ জেগে ওঠে
সেখানে সময় তার অনুপম কণ্ঠের সংগীতে
কথা বলে ; কাকে বলে ? ইয়াসিন মকবুল শশী
সহসা নিকটে এসে কোনো-কিছু বলবার আগে
আধ-খণ্ড অনন্তের অন্তরের থেকে যেন ঢের
কথা বলে গিয়েছিল ; তবু—
অনন্ত তো খণ্ড নয় ; তাই সেই স্বপ্ন, কাজ, কথা

অখণ্ড অনন্তে অন্তর্হিত হয়ে গেছে ;
কেউ নেই, কিছু নেই—সূর্য নিভে গেছে।

এ যুগে এখন ঢের কম আলো সব দিকে, তবে।
আমরা এ পৃথিবীর বহুদিনকার
কথা কাজ ব্যথা ভুল সংকল্প চিন্তার
মর্যাদায় গড়া কাহিনীর মূল্য নিংড়ে এখন
সঞ্চয় করেছি বাক্য শব্দ ভাষা অনুপম বাচনের রীতি।
মানুষের ভাষা তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো
না পেলে নিছক ক্রিয়া ; বিশেষণ ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল
জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।
অনেক বিদ্যার দান উত্তরাধিকারে পেয়ে তবু
আমাদের এই শতকের
বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসের ভিড় শুধু—বেড়ে যায় শুধু ;
তবুও কোথাও তার প্রাণ নেই বলে অর্থময়
জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে ; জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।

এ-যুগে কোথাও কোনো আলো—কোনো কান্তিময় আলো
চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের ; নেই তো নিঃসৃত অন্ধকার
রাত্রির মায়ের মতো : মানুষের বিহ্বল দেহের
সব দোষ প্রক্ষালিত করে দেয়—মানুষের বিহ্বল আত্মাকে
লোকসমাগমহীন একান্তের অন্ধকারে অন্তঃশীল ক'রে
তাকে আর শুধায় না—অতীতের শুধানো প্রশ্নের
উত্তর চায় না আর—শুধু শব্দহীন মৃত্যুহীন
অন্ধকারে ঘিরে রাখে, সব অপরাধ ক্লান্তি ভয় ভুল পাপ
বীতকাম হয় যাতে—এ জীবন ধীরে ধীরে বীতশোক হয়,
স্নিগ্ধতা হৃদয়ে জাগে ; যেন দিকচিহ্নময় সমুদ্রের পারে

কয়েকটি দেবদারুগাছের ভিতরে অবলীন
বাতাসের প্রিয়কণ্ঠ কাছে আসে—মানুষের রক্তাক্ত আত্মায়
সে-হাওয়া অনবচ্ছিন্ন সুগমের—মানুষের জীবন নির্মল।
আজ এই পৃথিবীতে এমন মহানুভব ব্যাপ্ত অন্ধকার
নেই আর ? সুবাতাস গভীরতা পবিত্রতা নেই ?
তবুও মানুষ অন্ধ দুর্দশার থেকে স্নিগ্ধ আঁধারের দিকে
অন্ধকার হ'তে তার নবীন নগরী গ্রাম উৎসবের পানে
যে অনবনমনে চলেছে আজও—তার হৃদয়ের
ভুলের পাপের উৎস অতিক্রম ক'রে চেতনার
বলয়ের নিজ গুণ রয়ে গেছে বলে মনে হয়।

পূর্বাশা। কার্তিক ১৩৫৫

মানুষের মৃত্যু হলে

মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
থেকে যায় ; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।

আজকের আগে যেই জীবনের ভিড় জমেছিল
তারা মরে গেছে ;
প্রতিটি মানুষ তার নিজের স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে
অন্ধকারে হারায়েছে ;
তবু তারা আজকের আলোর ভিতরে
সঞ্চারিত হয়ে উঠে আজকের মানুষের সুরে
যখন প্রেমের কথা বলে
অথবা জ্ঞানের কথা—
অনন্ত যাত্রার কথা মনে হয় সে-সময়

দীপংকর শ্রীজ্ঞানের ;
চলেছে—চলেছে—

একদিন বুদ্ধকে সে চেয়েছিল বলে ভেবেছিল।
একদিন ধূসর পাতায় যেই জ্ঞান থাকে—তাকে।
একদিন নগরীর ঘুরোনো সিঁড়ির পথ বেয়ে
বিজ্ঞানে প্রবীণ হয়ে—তবু—কেন অম্বাপালীকে
চেয়েছিল প্রণয়ে নিবিড় হয়ে উঠে।

চেয়েছিল—
পেয়েছিল শ্রীমতীকে কম্প্র প্রাসাদে :
সেই সিঁড়ি ঘুরে প্রায় নীলিমার গায়ে গিয়ে লাগে ;
সিঁড়ি উদ্ভাসিত করে রোদ ;
সিঁড়ি ধরে ওপরে ওঠার পথে আরেকরকম
বাতাস ও আলোকের আসাযাওয়া স্থির ক'রে কী অসাধারণ
প্রেমের প্রয়াণ ? তবু—এই শেষ অনিমেষ পথে
দেখেছে সে কোনো-এক মহীয়সী আর তার শিশু ;
দু-জনেই মৃত।
অথবা কেউ কি নেই !
ওইখানে কেউ নেই।
মৃত্যু আজ নারীনর্দামার ক্বাথে ;
অন্তহীন শিশুফুটপাতে ;
আর সেই শিশুদের জনিতার কিউক্লীবতায়।

সকল রৌদ্রের মতো ব্যাপ্ত আশা যদি
গোলকধাঁধায় ঘুরে আবার প্রথম স্থানে ফিরে আসে
শ্রীজ্ঞান কী তবে চেয়েছিল ?

সূর্য যদি কেবলই দিনের জন্ম দিয়ে যায়,
রাত্রি যদি শুধু নক্ষত্রের,
মানুষ কেবলই যদি সমাজের জন্ম দেয়,
সমাজ অস্পষ্ট বিপ্লবের,
বিপ্লব নির্মম আবেশের,
তা হলে শ্রীজ্ঞান কিছু চেয়েছিল ?

নগরীর সিঁড়ি প্রায় নীলিমার গায়ে লেগে আছে ;
অথচ নগরী মৃত।
সে সিঁড়ির আশ্চর্য নির্জন
দিগন্তরে এক মহীয়সী,
আর তার শিশু ;
তবু কেউ নেই।

ঢের ভারতীয় কাল—পৃথিবীর আয়ু—শেষ করে
জীবনের বঙ্গাব্দ পর্বের প্রান্তে ঠেকে,
পনরুদ্‌যাপনের মতন আরেকবার এই
তেরোশো পঞ্চাশ সাল থেকে শুরু করে ঢের দিন
আমারও হৃদয় এই সব কথা ভেবে
সৃষ্টির উৎস আর উৎসারিত মানুষকে তবু
ধন্যবাদ দিয়ে যায়।
কেননা সৃষ্টির নিহিত ছলনা ছেলে-ভুলোবার মতো তবু নয় ;
মানুষও ঘুমের আগে কথা ভেবে সব সমাধান
ক'রে নিতে চায়।
কথা ভেবে হৃদয় শুকায় জেনে কাজ করে।

সময় এখনো শাদা জলের বদলে বোনভায়ের
নিয়ত বিপন্ন রক্ত রোজ
মানুষকে দিয়ে যায় ;
ফসলের পরিবর্তে মানুষের শরীরে মানুষ
গোলাবাড়ি উঁচু করে রেখে নিয়তির
অন্ধকারে অমানব ;
তবুও গ্লানির মতো মানুষের মনের ভিতরে
এইসব জেগে থাকে ব'লে
শতকের আয়ু—আধো আয়ু—আজ ফুরিয়ে গেলেও এই শতাব্দীকে তারা
কঠিন নিস্পৃহভাবে আলোচনা ক'রে
আশায় উজ্জ্বল রাখে ; না হলে এ ছাড়া
কোথাও অন্য কোন প্রীতি নেই।
মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
থেকে যায় ; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
আরো ভালো—আরো স্থির দিকনির্ণয়ের মতো চেতনার
পরিমাপে নিয়ন্ত্রিত কাজ
কতদূর অগ্রসর হয়ে গেল জেনে নিতে আসে।

পূর্বাশা। বৈশাখ ১৩৫৭

অনন্দা

এই পৃথিবীর এ এক শতচ্ছিদ্র নগরী।
দিন ফুরুলে তারার আলো খানিক নেমে আসে।
গ্যাসের বাতি দাঁড়িয়ে থাকে রাতের বাতাসে।
দ্রুতগতি নরনারীর ক্ষণিক শরীর থেকে
উৎসারিত ছায়ার কালো ভারে

আঁধার আলোয় মনে হতে পারে
এ-সব দেয়াল যে-কোনো নগরীর ;
সন্দেহ ভয় অপ্রেম দ্বেষ অবক্ষয়ের ভিড়
সূর্য-তারার আলোয় অঢেল রক্ত হতে পারে
যে-কোনো দিন ; সে কতবার আঁধার বেশি শানিত হয়েছে ;
বাহক নেই—দুরন্ত কাল নিজেই বয়েছে
নিজেরই শব নিজে মানুষ,
মানবপ্রাণের রহস্যময় গভীর গুহার থেকে
সিংহ শকুন শেয়াল নেউল সর্পদন্ত ডেকে।

হৃদয় আছে বলেই মানুষ দেখ, কেমন বিচলিত হয়ে
বোনভায়েকে খুন ক'রে সেই রক্ত দেখে আঁশটে হৃদয়ে
জেগে উঠে ইতিহাসের অধম স্থূলতাকে
ঘুচিয়ে দিতে জ্ঞানপ্রতিভা আকাশ প্রেম নক্ষত্রকে ডাকে।
এই নগরী যে-কোনো দেশ ; যে-কোনো পরিচয়ে
আজ পৃথিবীর মানবজাতির ক্ষয়ের বলয়ে
অন্তবিহীন ফ্যাক্টরি ক্রেন ট্রাকের শব্দে ট্র্যাফিক কোলাহলে
হৃদয়ে যা হারিয়ে গেছে মেশিনকণ্ঠে তাকে
শূন্য অবলেহন থেকে ডাকে।

'তুমি কি গ্রীস পোল্যাণ্ড চেক প্যারিস মিউনিক
টোকিও রোম ন্যুইয়র্ক ক্রেমলিন আটলান্টিক
লণ্ডন চীন দিল্লী মিশর করাচী প্যালেস্টাইন ?
একটি মৃত্যু, এক ভূমিকা, একটি শুধু আইন।'
বলছে মেশিন। মেশিনপ্রতিম অধিনায়ক বলে :
'সকল ভূগোল নিতে হবে নতুন ক'রে গ'ড়ে
আমার হাতে গড়া ইতিহাসের ভেতরে,

নতুন সময় সীমাবলয় সবই তো আজ আমি ;
ওদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে আমার স্বত্বাধিকারকামী ;
আমি সংঘ জাতি রীতি রক্ত হলুদ নীল
সবুজ শাদা মেরুন অশ্লীল
নিয়মগুলো বাতিল করি ; কালো কোর্তা দিয়ে
ওদের ধূসর পাটকিলে বফ্ কোর্তা তাড়িয়ে
আমার অনুচরের বৃন্দ অন্ধকারের বার
আলোক ক'রে কী অবিনাশ দ্বৈপ-পরিবার।

এই দ্বীপই দেশ ; এ-দ্বীপ নিখিল তবে।
অন্য সকল দ্বীপের হতে হবে
আমার মতো—আমার অনুচরের মতো ধ্রুব।
হে রক্তবীজ, তুমি হবে আমার আঘাত পেয়ে
অনবতুল আমির মতো শুভ।'

সবাই তো আজ যে যার অন্তরঙ্গ জিনিস খুঁজে
মানবভ্রাতাবোনকে বুকে টেনে নেবার ছলে
তাদের নিকেশ ক'রে অনির্বচন রক্তে এই পৃথিবীর জলে
নানারকম নতুন নামের বৃহৎ ভীষণ নদী হয়ে গেল ;
এই পৃথিবীর সব নগরী পরিক্রমা ক'রে
নতুন অভিধানের শব্দে ছন্দে জেগে সুপরিসর ভোরে
এ-সব নদী গভীরতর মানে পেতে চায়—
দিকসময়ের আতল রক্ত ক্ষালন ক'রে অননুতপ্ততায় ;
বাস্তবিকই জল কি জলের নিকটতম মানে ?
অথবা কি মানবরক্ত বহন করি নির্মম অজ্ঞানে ?
কি আন্তরিক অর্থ কোথায় আছে ?
এই পৃথিবীর গোষ্ঠীরা কি পরস্পরের কাছে

ভাইয়ের মতো : সৎ প্রকৃতির স্পষ্ট উৎস থেকে
মানবসভ্যতার এই মলিন ব্যতিক্রমে জেগে উঠে ?
যে যার দেহ আত্মা ভালোবেসে অমল জলকণার মতন সমুদ্রকে এক মুঠে
ধ'রে আছে ?
ভালো করে বেঁচে থাকার বিশদ নির্দেশে
সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে এসে
হিংসা গ্লানি মৃত্যুকে শেষ ক'রে
জেগে আছে ?

জেগে উঠে সময়সাগরতীরে সূর্যস্রোতে
তবুও ক্লান্ত পতিত মলিন হতে
কী আবেদন আসছে মানুষ প্রতিদিনই—
কোথার থেকে শুকুনক্রান্তি বলে :
'জলের নদী ? জেগে উঠুক আপামরের রক্তকোলাহলে !'

এ-সুর শুরু হয়েছিলো কুরুবর্ষে—বেবিলনে ট্রয়ে ;
মানুষ মানী জ্ঞানী প্রধান হয়ে গেছে ; তবুও হৃদয়ে
ভালোবাসার যৌনকুয়াশা কেটে
যে-প্রেম আসে সেটা কি তার নিজের ছায়ার প্রতি ?
জলের কলরোলের পাশে এই নগরীর অন্ধকারে আজ
আঁধার আরো গভীরতর করে ফেলে সভ্যতার এই অপার আত্মরতি ;
চারি দিকে নীল নরকে প্রবেশ করার চাবি
অসীম স্বর্গ খুলে দিয়ে লক্ষ কোটি নরককীটের দাবি
জাগিয়ে তবু সে-কীট ধ্বংস করার মতো হয়ে
ইতিহাসের গভীরতর শক্তি ও প্রেম রেখেছে কিছু হয়তো হৃদয়ে।

আছে

এখন চৈত্রের দিন নিভে আসে—আরো নিভে আসে ;
এখানে মাঠের ’পরে শুয়ে আছি ঘাসে ;
এসে শেষ হয়ে যায় মানুষের ইচ্ছা কাজ পৃথিবীর পথে,
দু-চারটে—বড়ো জোর একশো শরতে ;

উর ময় চীন ভারতের গল্প বহিঃপৃথিবীর শর্তে হয়ে গেছে শেষ ;
জীবনের রূপ আর রক্তের নির্দেশ
পৃথিবীর কাম আর বিচ্ছেদের ভূমা—মনে হয়—এক তিলের সমান ;
কিন্তু এই চেয়ে থাকা, স্থিতি, রাত্রি, শান্তি—অফুরান।
চারি দিকে বড়ো বড়ো আকাশ ও গাছের শরীরে
সময় এসেছে তার নীড়ে।
ভালো লাগে পৃথিবীর রূঢ় নষ্ট সভ্যতার দিনের ব্যত্যয় ;
অন্ধকার সনাতনে মিশে যাওয়া—কিন্তু মরণের ঘুম নয় ;

জেগে থাকা ; নক্ষত্রের বাগীশ্বরী দ্যোতনার থেকে কিছু দূরে ;
পৃথিবীর অবলুপ্ত জ্ঞানী বন্ধুরে
এই স্তব্ধ মাটিতেই মিশে যেতে হল জেনে তবু চোখ রেখে নীলাকাশে
শুয়ে থাকা পৃথিবীর মাধুরীর অন্ধকার ঘাসে।

কবিতা। আশ্বিন ১৩৫৯

যাত্রী

মনে হয় প্রাণ এক দূর স্বচ্ছ সাগরের কূলে
জন্ম নিয়েছিল কবে ;
পিছে মৃত্যুহীন জন্মহীন চিহ্নহীন

কুয়াশার যে-ইঙ্গিত ছিল—
সেই সব ধীরে ধীরে ভুলে গিয়ে অন্য এক মানে
পেয়েছিল এখানে ভূমিষ্ঠ হয়ে—আলো জল আকাশের টানে ;
কেন যেন কাকে ভালোবেসে।

মৃত্যু আর জীবনের কালো আর শাদা
হৃদয়ে জড়িয়ে নিয়ে যাত্রী মানুষ
এসেছে এ-পৃথিবীর দেশে ;
কঙ্কাল অঙ্গার কালি—চারি দিকে রক্তের ভিতরে
অন্তহীন করুণ ইচ্ছার চিহ্ন দেখে
পথ চিনে এ-ধুলোয় নিজের জন্মের চিহ্ন চেনাতে এলাম ;
কাকে তবু ?
পৃথিবীকে ? আকাশকে ? আকাশে যে-সূর্য জ্বলে তাকে ?
ধুলোর কণিকা অণুপরমাণু ছায়া বৃষ্টি জলকণিকাকে ?
নগর বন্দর রাষ্ট্র জ্ঞান অজ্ঞানের পৃথিবীকে ?

যেই কুজ্ঝটিকা ছিল জন্মসৃষ্টির আগে, আর
যে-সব কুয়াশা রবে শেষে একদিন
তার অন্ধকার আজ আলোর বলয়ে এসে পড়ে পলে-পলে ;
নীলিমার দিকে মন যেতে চায় প্রেমে ;
সনাতন কালো মহাসাগরের দিকে যেতে বলে।
তবু আলো পৃথিবীর দিকে
সূর্য রোজ সঙ্গে করে আনে
যেই ঋতু যেই তিথি যে-জীবন যেই মৃত্যুরীতি
মহাইতিহাস এসে এখনও জানে নি যার মানে ;

সেদিকে যেতেছে লোক গ্লানি প্রেম ক্ষয়

নিত্য পদচিহ্নের মতো সঙ্গে করে ;
নদী আর মানুষের ধাবমান ধূসর হৃদয়
রাত্রি পোহালো ভোরে—কাহিনীর কত শত ভোরে
নব সূর্য নব পাখি নব চিহ্ন নগরে নিবাসে ;
নব-নব যাত্রীদের সাথে মিশে যায়
প্রাণলোকযাত্রীদের ভিড় ;
হৃদয়ে চলার গতি গান আলো রয়েছে, অকূলে
মানুষের পটভূমি হয়তো বা শাশ্বত যাত্রীর।

আনন্দবাজার পত্রিকা। শারদীয় ১৩৬০

স্থান থেকে

স্থান থেকে স্থানচ্যুত হয়ে
চিহ্ন ছেড়ে অন্য চিহ্নে গিয়ে
ঘড়ির কাঁটার থেকে সময়ের স্নায়ুর স্পন্দন
খসিয়ে বিমুক্ত করে তাকে
দেখা যায় অবিরল শাদা-কালো সময়ের ফাঁকে
সৈকত কেবলই দূরে সৈকতে ফুরায় ;
পটভূমি বারবার পটভূমিচ্ছেদ
করে ফেলে আঁধারকে আলোর বিলয়
আলোককে আঁধারের ক্ষয়
শেখায় শুক্ল সূর্যে ; গ্লানি রক্তসাগরের জয়
দেখায় কৃষ্ণ সূর্যে ; ক্রমেই গভীর কৃষ্ণ হয়।

দিনরাত

সারা দিন মিছে কেটে গেল ;
সারা রাত বড্ড খারাপ

নিরাশায় ব্যর্থতায় কাটবে ; জীবন
দিনরাত দিনগতপাপ

ক্ষয় করবার মতো ব্যবহার শুধু।
ফণীমনসার কাঁটা তবুও তো স্নিগ্ধ শিশিরে
মেখে আছে ; একটিও পাখি শূন্যে নেই ;
সব জ্ঞানপাপী পাখি ফিরে গেছে নীড়ে।

পৃথিবীতে এই

পৃথিবীতে এই জন্মলাভ তবু ভালো ;
ভূমিষ্ঠ হবার পরে যদিও ক্রমেই মনে হয়
কোনো-এক অন্ধকার স্তব্ধ সৈকতের
বিন্দুর ভেতর থেকে কোনো
অন্য দূর স্থির বলয়ের
চিহ্ন লক্ষ্য করে দুই শব্দহীন শেষ সাগরের
মাঝখানে কয়েক মুহূর্ত এই সূর্যের আলো।

কেন আলো ? মাছিদের ওড়াউড়ি ?
কেবলই ভঙ্গুর চিহ্ন মুখে নিয়ে জল
সুয়েজ হেলেস্‌পন্ট প্রশান্ত লোহিতে
পরিণতি চায় এই মাছি মাছরাঙা
প্রেমিক নাবিক নষ্ট নাসপাতি মুখ
ঠোঁট চোখ নাক করোটির গন্ধ
স্পষ্ট এক নিরসনে স্থির করে রেখে দেবে ব'লে ;
চলেছে—চলেছে—

শিশির কুয়াশা বৃষ্টি ঝড়ের বিহ্বল আলোড়ন
সমুদ্রের শত মৃত্যুশীল ফাঁকি
ডানে-বাঁয়ে সারা দিন আবছা মরণ
ঝেড়ে ফেলে—ঝাপ্‌সায় বিপদের ঘণ্টা বাজিয়ে
আমাদের আশা ভালোবাসা ব্যথা রণঘড়ি সূর্যের ঘড়ি
চিন্তা বুদ্ধি চাকার ঘুরুনি গ্লানি দাঁতালো ইস্পাত
খানিকটা আলো উজ্জ্বলতা শান্তি চায় ;

জলের মরণশীল চ্ছলচ্ছল শুনে
কম্পাসের চেতনাকে সর্বদাই উত্তরের দিকে রেখে
সমুদ্রকে সর্বদাই শান্ত হতে বলে
আমরা অন্তিম মূল্য পেতে চাই—প্রেমে ;
পৃথিবীর ভরাট বাজার ভরা লোকসান
লোভ পচা উদ্ভিদ কুষ্ঠ মৃত গলিত আমিষ গন্ধ ঠেলে
সময়ের সমুদ্রকে বারবার মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে যেতে ব'লে।

অন্যান্য কবিতা
১৯১৯-১৯৫৪

এই কবিতাপর্যার ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত নানা সাময়িকপত্রে ও সংকলনগ্রন্থে ছাপা হয়েছে, প্রকাশক্রম অনুসারে এখানে পর পর সাজিয়ে দেওয়া হল।

-স.

বর্ষ-আবাহন

ওই যে পূর্ব তোরণ-আগে
দীপ্ত নীলে, শুভ্র রাগে
প্রভাত রবি উঠল জেগে
　　দিব্য পরশ পেয়ে,
নাই গগনে মেঘের ছায়া
যেন স্বচ্ছ স্বর্গকায়া
ভুবন ভরা মুক্ত মায়া
　　মুগ্ধ-হৃদয় চেয়ে।
অতীত নিশি গেছে চলে
চিরবিদায় বার্তা ব'লে,
কোন্ আঁধারের গভীর তলে
　　রেখে স্মৃতিলেখা,
এসো এসো ওগো নবীন,
চলে গেছে জীর্ণ মলিন—
আজকে তুমি মৃত্যুবিহীন
　　মুক্ত সীমারেখা।

বেদুইন

ধবল কঙ্কাল যেথা দিকে দিকে রয়েছে ছড়ায়ে
অন্তহীন বালুকা জড়ায়ে
দিবানিশি জ্বলিতেছে লক্ষ চুল্লিশিখা
পথে পথে দৈন্য যেথা, গ্লানি বিভীষিকা,
নিঃসহায় প্রাণ,
মরুভূ-ঝটিকা গর্জে দিকে দিকে ক্ষিপ্ত, বহ্নিমান !
কোটি কোটি বিষতীব্র ভুজঙ্গম ফণার ঘূর্ণনে
মরীচিকা জাগে ক্ষণে ক্ষণে'—
মোহের মাধুরী মাখা মৃত্যুর পাথার !
—শ্যামা বসুন্ধরা ত্যজি সেই পথে তুমি কেন যাও বারবার
ওগো বেদুইন !
—মোদের নগর পল্লী—আমাদের সুসজ্জিত, শান্ত রাত্রি দিন
ঝলমল প্রাসাদ বিপণি,
লীলাকক্ষ, নৃত্যগীত, প্রমোদের ধ্বনি
বিভ্রম, বিলাস,
মনোহরা এ ধরণী—পুষ্পকুঞ্জ, জ্যোৎস্নানিশি, সুরভিত এই মধুমাস
এ বিচিত্র গৃহাঙ্গন, এই অন্তঃপুর,
শান্ত সুমধুর,
প্রেয়সীর হাসি অশ্রু মাখা ;
—যৌবনের এ জয়পতাকা,
মোদের এ বর্ষ, ঋতু, উষা, বিভাবরী
তোমারে করে না মুগ্ধ—কোন দূর দিগন্তের দীর্ঘ পথ ধরি,
ধু ধু ধু ধু বালুকার বিজন সংকটে,
চক্রবালতটে

উঠিতেছ আস্ফালিয়া তুমি !
—তোমার চরণতলে নাচিতেছে যোজনান্ত তপ্ত মরুভূমি
উন্মাদ, উত্তাল।
বালুকার পারাবার, আকাশের আরক্ত মশাল
বক্ষে তব আসিতেছে ছুটে !
শ্যেনতীক্ষ্ণ তীব্র রক্ত তোমার ও আঁখির সম্পুটে
পলে-পলে ঘুরে যায় ধূম্রাকাশ গিরি, বালিয়াড়ি।
তন্দ্রাহারা যাত্রী ওগো—শ্রান্তিহীন মরুপথচারী,
হারায়েছ দিশা
অনন্ত নৃত্যের লোভে, অফুরন্ত উল্লাসের তৃষা
চিত্তে তব নিরন্তর উঠিতেছে দহি,
হে দূর-বিরহী !
—মৌন গৃহতলে বসি নিরালা—একাকী,
শতাব্দীর সভ্যতার পিঞ্জরের পাখি
আছি মোরা আর্ত ম্লান আঁখি দুটি তুলে !
—সীমাহারা নীলিমার কূলে
যেতে চাই ছুটে,
অসংখ্য শৃঙ্খলাঘাতে বিদ্রোহীর বক্ষে শুধু রক্ত ওঠে ফুটে !
ভাঙে না এ প্রাচীরের কারা,
জেগে আছে চিরন্তন ব্যর্থ বিধিবিধানের এই মিথ্যা বিরাট পাহারা !
মনে মোর ঘুরে মরে লক্ষ্যহারা, বাধাবন্ধহীন
মরুভূর কোন্ বেদুইন।

আঁধারের যাত্রী

চারিদিকে ধু ধু রাতি—সৃজনের অন্ধকাররাশি,
জোনাকির মতো প্রাণ তার মাঝে চলিছে উদাসী !

পত্রগুচ্ছে যেটুকু নিশীথ,
যে খণ্ড আঁধারটুকু, যে তুষার শীত,
তারই বুকে ঢালি তাপ, জ্বালি আমি শিখা,
অনন্ত শর্বরী দূরে ছড়ায়েছে ব্যথা-বিভীষিকা !
কোন্ দূর অলক্ষ্যের পানে
স্পন্দহীন প্রেতপুরে—শোকের শ্মশানে,
মূক তরুচ্ছায়াতলে, নিঃশব্দ গহ্বরে
কলহীন তটিনীর তরঙ্গের 'পরে
ছুটিয়া যেতেছে মোর সচকিত প্রাণ,
মৌন অভিযান !
আমার এ কম্প্রবক্ষে তৃপ্তিহীন বিচ্ছুরণ জ্বলে ;
দূরে দূরে দিগন্তের তলে
ছুটে যাই দিশাহারা, আকুল, চঞ্চল,
কেঁদে ওঠে বিটপীর ভগ্নশাখা, বনানীর পল্লব-অঞ্চল !
বালুকাসৈকতে বাজে তটিনীর গান
ক্ষুব্ধ ম্রিয়মাণ !
সৃজন-পুলিনে বসি মায়াবীর বেশে
অন্তহীন ইন্দ্রজাল রচিতেছে কে সে !
কোথা তব গুপ্ত কক্ষ—রহস্যের দ্বার
ওগো অন্ধকার !
হে অচল রুদ্ধ আয়তন,
বিজন গোপন !
তমিস্রার ঊর্মিরাশি—দুশ্চর, দুস্তর,
চির রাত্রি—তার মাঝে আমি নিশাচর !
নিষ্প্রভ এ চোখে মোর পশে নাকো নক্ষত্রের শিখা,
দীপহীন অমাতটে নাচে একা প্রাণ খদ্যোতিকা !
প্রান্তরের পারে জ্বলে অনেক আলেয়া,

তার মাঝে মোর এই নিশীথের খেয়া
চলে একা ভেসে,
স্বপ্নাবিষ্ট মৌন অভিসারিকার বেশে !

মোর আঁখিজল

মোর আঁখিজল
কাহাদের লাগি আজি উচ্ছ্বসিয়া উঠিতেছে আকুল, চঞ্চল !
জীবনে পায় নি যারা স্নেহ, প্রেম, ক্ষমা,
যাহাদের মঙ্গলেতে উষাহীন অমা
জাগিতেছে দুশ্চর দুস্তর,
যাহাদের মৌন চোখ—অশ্রু সকাতর
চাহিয়াছে বারবার আকাশের পানে
তুচ্ছতম আলোর সন্ধানে
—আঁধারের আবর্তের তলে
প্রেতসম যাহাদের প্রাণ ভেসে চলে
শ্মশানের শেষে !
কোন্ ক্রূর পিশাচের অবিজ্ঞেয় অঙ্গুলিনির্দেশে
যাহারা ঝরিয়া পড়ে পতঙ্গের প্রায়—
লক্ষ কোটি অন্যায়ের অনলশিখায় !
যাহাদের দ্বারে
প্রেয়সী আসে না কভু স্মিতহাস্যে মাল্যের সম্ভারে ;
প্রেমের সন্ধানে
যাহারা ছুটিয়া গেছে প্রেতপুরে, নরকের পানে
—মেটে নাই তৃষা,
অসম্বৃত কামনার কারাগারে বারবার হারায়েছে দিশা
পৃথিবীর নিঃসহায় শৃঙ্খলিত প্রাণ,

লক্ষ লক্ষ আর্ত ম্লান পিষ্ট ভগবান,
আজ মোর বুকে কেঁদে ওঠে।
—নিখিলের ব্যথা আজ অশ্রু হয়ে মোর চোখে ফোটে !

হাজার বর্ষ আগে

সেই মেয়েটি এর থেকে নিকটতর হল না :
কেবল সে দূরের থেকে আমার দিকে একবার তাকালো
আমি বুঝলাম
চকিত হয়ে মাথা নোয়ালো সে
কিন্তু তবুও তার তাকাবার প্রয়োজন—সপ্রতিভ হয়ে
সাত-দিন আট-দিন ন-দিন দশ-দিন
সপ্রতিভ হয়ে—সপ্রতিভ হয়ে
সমস্ত চোখ দিয়ে আমাকে নির্দিষ্ট করে
অপেক্ষা করে—অপেক্ষা করে
সেই মেয়েটি এর চেয়ে নিকটতর হল না
কারণ, আমাদের জীবন পাখিদের মতো নয়
যদি হত
সেই মাঘের নীল আকাশে
(আমি তাকে নিয়ে) একবার ধবলাটের সমুদ্রের দিকে চলতাম
গাঙশালিকের মতো আমরা দু-টিতে
আমি কোনো এক পাখির জীবনের জন্যে অপেক্ষা করছি
তুমি কোনো এক পাখির জীবনের জন্যে অপেক্ষা করছো
হয়তো হাজার-হাজার বছর পরে
মাঘের নীল আকাশে
সমুদ্রের দিকে যখন উড়ে যাবো

আমাদের মনে হবে
হাজার-হাজার বছর আগে আমরা এমন উড়ে যেতে চেয়েছিলাম।

উষা। আষাঢ় ১৩৩৩

ভারতবর্ষ

জাগিয়াছে শুভ্র উষা—পুণ্য বেদবতী
প্রাচীমঞ্চে, ভারতের উদয়গগনে।
কোন্ এক আদি মহাতপস্যার ক্ষণে
বাজিয়াছে আমাদের মঙ্গল আরতি !
মধুমান্ সূর্য সোম ঢালিয়াছে জ্যোতি
আমাদের নদী গিরি নির্ঝর কাননে,
অর্পিয়াছে শান্তি স্বস্তি নিখিলের মনে
আমাদের কাব্য কলা—মোদের ভারতী !
মৃত্যুর সাগর মন্থি অমৃতের তরে
যুগে যুগে ছুটে গেছে মোদের সন্তান !
অসুর-আবাসে ভস্ম শ্মশানের ’পরে
গেয়েছে তিমিরাতীত আদিত্যের গান
বিতরি প্রেমের চরু সর্ব চরাচরে
মাগিয়াছে পরাবিদ্যা—চরম কল্যাণ।

বিজয়ী

নহি আমি উঞ্ছবৃত্তি, উদাসী ভিক্ষুক ;
দ্বারে-দ্বারে যাচ্ঞা মাগি বেড়ায় না মন।
মোর তাই নাই শঙ্কা, নাই নিষ্পেষণ ;
নম্র নহে শির মোর,—নত নহে বুক।

বিজয়ী সৈনিক আমি, আমার কার্মুক
করিতেছে অহরহ অসত্য খণ্ডন ;
টঙ্কারে-টঙ্কারে ভরি ধরার অঙ্গন
ছুটিতেছে চিত্ত মোর উৎসাহী, উৎসুক।

কোথায় চকিত ভীত যাত্রিকের দল ?
নির্জিতা বসুধা কোথা ? নিপীড়িত জীব !
কোথা হিংসা, অত্যাচার, অসুরের বল !
কোথা সিংহাসন জুড়ে গেছে আছে ক্লীব !
আছি আমি সব্যসাচী,—দৃপ্ত, অচঞ্চল,
হস্তে মোর অনিদ্রিত উদ্যত গাণ্ডীব।

গণবাণী। শ্রাবণ ১৩৩৩

রামদাস

যুগসন্ধিতে ভারত যখন সহসা তিমিরময়—
বীর সন্ন্যাসী গাহিয়া উঠিলে নব আলোকের জয় !
অনাগত এক আশার স্বপ্নে নিমিষে উঠিলে জাগি,
মাতিয়া উঠিলে দশের লাগিয়া, দেশ-দেবতার লাগি।
ওহে সাগ্নিক, প্রাণের অনলে জ্বালালে বিশাল শিখা,
যত মোহ মায়া ভ্রান্তি বেদনা নিরাশার কুহেলিকা
স্পর্শে তোমার, হে মহাজাতক, নিমেষে হইল ছাই !
সমাজের বুকে পাতিলে আসন, সংসারে নিলে ঠাঁই ;
স্তিমিত ভীতের আড়ষ্ট গৃহ কারা-আয়তন ভেঙে
জাতির মুক্তি, দেশের সেবায় আত্ম-আহুতি মেগে
ঊর্ধ্বগ-হোম জ্বালালে একাকী নিখিল মারাঠাময় !

জরার হৃদয়ে করেছিলে তুমি যৌবন সঞ্চয়
মন্ত্রে তোমার—সংসারে তুমি আসনি উদাসী বেশে ;
পাপপ্রপঞ্চ পঙ্কিল পথে নিয়তি বিধির ক্লেশে
সাজো নিকো তুমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী উদাসীন ;
নিরাশাতিমিরে বসিয়া একাকী অরুণোদয়ের দিন
চেয়েছিলে তুমি, জেগেছিলে তুমি মোহকারাগার ভেঙে
কর্ম্মের জয়ে, ত্যাগের পর্বে, সেবার মহিমা মেগে !
ছত্রপতির হে বিজয়ী গুরু, মারাঠার গৌরব !
চন্দনসম বুকের রক্তে বিতরিলে সৌরভ !
দেশের লাগিয়া ধূপের মতন অনলশিখায় দহি
বেদনা মথিয়া দিকে দিকে গেলে শান্তির বাণী বহি !
গরল ভখিয়া মৃত্যু মথিয়া জীবনের অবদান
তুমি সঁপে গেলে, হে বীর কর্ম্মী, হে প্রেমিক মহীয়ান !

নিবেদন

কবিযশ চাহি না মা, তোমার দুয়ারে
আসিয়াছি মুগ্ধ প্রাণে পূজিতে তোমারে !
বিগত শৈশবে কবে অরুণের সনে
ছন্দোময়ী উদেছিলে মোর বাতায়নে !
এসেছিলে চিত্তে মোর পুলক সঞ্চারি
নিখিল কবির কাব্যে ঝঙ্কারি ঝঙ্কারি
মানসে জাগলে মম অপরূপ জ্যোতি !
দিবাকর জিনি—তব গরিমা ভারতী
আমারে নিয়েছে ডেকে, কৃতঞ্জলিপাণি

তুচ্ছ অর্ঘ্য লয়ে আমি ওগো বঙ্গবাণী,
এসেছি তোমার রাঙা চরণসমীপে।
কোটি বরপুত্র যেথা গন্ধে বর্ণে দীপে
তোমার আঙিনাখানি রেখেছে উজ্জ্বল,
আমি সেথা আনিয়াছি এক ফোঁটা জল,
নিঃস্ব ব্যর্থ হৃদয়ের ব্যথা-উপহার
নেবে কি মা ? মোর তরে খুলিবে কি দ্বার !

কোহিনূর

তোমারে ঘেরিয়া জাগে কত স্বপ্ন—স্মৃতির শ্মশান,
ভূলুণ্ঠিত লুব্ধ অভিযান ;
সাম্রাজ্যের অশ্রু, রক্ত, সমাধি, পতন
হে হীরক, একে একে করেছ চুম্বন !
স্পর্শে তব অনাদি অতীত যেন নিরন্তর মর্মে ওঠে ধ্বনি !
মাধবের বক্ষে তুমি ছিলে কি গো স্যমন্তক মণি !
শ্রীহরির বনমালা চুমি
দিব্য গন্ধে অকলঙ্ক অঙ্ক তব ভরেছিলে তুমি
ওগো কোহিনূর !
হৃদে তব আজও বুঝি গাঁথা আছে গোপনীয় বাঁশরির সুর,
যুগান্তের গাঢ় নীল পুলিনের ভাষা,
বাসনা পিপাসা !
অরুণ ময়ূখ স্পর্শে নিশান্তের স্বপ্ন যাও ভুলি !
নব নবীনের লাগি যুগে যুগে উঠিছ মুকুলি
অভিনব রূপে !
নির্মম কালের অগ্নি-অঙ্গারের স্তূপে

দেহ তব যায় না দহিয়া
হে অটুট বজ্রমণি, কোটি কোটি প্রেমিকের বরণীয়া প্রিয়া ;
গিয়েছিলে কবে তুমি পাঠানের অন্তঃপুরে পশি
সুলতান-প্রেয়সী !
হারেমের অন্ধকারে লক্ষ বাঁদী বেগমের মাঝে
স্থিরপ্রভা দামিনীর সাজে !
মৌন শিখা স্পর্শে তব করেছিলে ইন্দুনিভা কত শত রূপসীর বদন পাণ্ডুর
ওগো কোহিনূর !
কত রতিনিন্দিতার বক্ষে তুমি বাজাইলে বেদনার কেকা
ম্লান করি দিলে কত আননের সুশ্রী শশীলেখা,
বিচ্ছুরিলে জ্যোতিঃপাত মদগর্ব মোগলের প্রমোদসভাতে
বিভ্রমের লীলাকক্ষে—বিলাসের খুশ্‌রোজ রাতে
শাহী বেগমের আঁখি হয়েছিল অশ্রু ছলছল
তোমার সম্পদস্বপ্নে—অলখিতে ছায়াচ্ছন্ন হয়েছিল
উল্লাসের সে মোতিমহল।
নিশীথলাঞ্ছন বিভা জ্বলিয়া উঠিল কবে কাম্য মণি-ময়ূরের চোখে—
কত দীর্ঘ শতাব্দীর অশ্রু দৈন্য শোকে
করে গেল জয়শ্রীসম্পাত
উদয়-অরুণসম, তারপর কবে অকস্মাৎ
অস্তগত সাম্রাজ্যের কবর ভাঙিয়া
অভিসারে চলে গেল, প্রিয়া-উদাসিয়া
দূর সিন্ধুপারে
ঐশ্বর্য-তোরণ-তটে তুঙ্গ সিংহদ্বারে !
নব অভিনন্দনের উন্মেষের দেশে,
আমাদের সৌভাগ্যের শোকরক্ত স্তব্ধ বেলাশেষে !

বাসে না সে অশ্রুহিম কুহেলিরে ভালো

মৃত্যুর পিঙ্গল ছায়া প্রেতপুর কালো
আলেয়ার আলো
করে নাকো বিমুগ্ধ তাহারে !
পিরামিডসম সুপ্ত সমাধির দ্বারে
দাঁড়ায় না নিষ্পলক প্রহরীর বেশে !
—চেয়ে থাকে,
কবে কোন্ প্রেমাস্পদ এসে
অঙ্কে তার এঁকে দেয় যৌবনের অরুণ-চুম্বন
নিমেষের আঁখিপাতে কেড়ে লয় মন !

অলকা

(মেঘদূত)

ওগো জলধর, তোমারই মতো সে কাম্য অলকাপুরী,
বিদ্যুৎসম ললিত ললনা শোভে তার বুক জুড়ি় !
ইন্দ্রচাপের মতো বিরাজিছে চিত্রসৌধরাশি,
মেঘবারিসম স্বচ্ছ মানিক ওঠে সেথা পরকাশি !
প্রাসাদকক্ষে সংগীতধ্বনি মেঘমৃদঙ্গসম,
আকাশচুম্বী অভ্রেরই মতো সে পুরী তুঙ্গতম !

সেথা, নারীর হস্তে লীলাউৎপল, চিকুরে কুন্দফুল,
কর্ণে তাদের শোভে নিরুপম শিরীষ-কুসুম-দুল !
আনন তাহার করিছে শুভ্র লোধ্ররেণুকা মাখি
মাধবীবনের নব কুরুবকে চূড়াপাশ দেছে ঢাকি !
সীথিসীমন্ত সাজায়েছে বালা হেম কদম্ব দিয়া,
প্রিয়ের সঙ্গে বিহার করিছে সেথায় যক্ষপ্রিয়া !

তরুরাজি সদা পুষ্পফুল্ল—মহাবিহ্বল অলি !
মধুগুঞ্জনে নিত্য রহিছে মুখর বনস্থলী,
সেই অলকার সরোরূহে সদা কমল রয়েছে ফুটে,
মেখলার মতো চারুচঞ্চল মরাল যেতেছে ছুটে !
মনোরম সেথা ময়ূরকলাপ—পোষা ময়ূরের কেকা—
তিমিরবিহীন যামিনী জুড়িয়া জ্যোৎস্না দিতেছে দেখা !

অশ্রু সেথায় ক্ষরে আনন্দে, নাহিকো বিষাদভার,
মদনশরের দাহন ব্যতীত পীড়ন নাহি রে আর !
প্রণয়কলহ ব্যতীত সেথায় বিরহ কভু না ঘটে,
সেই সে সুদূর কামনার পুর—কল্পলোকের তটে !
জরার প্রহারে অঙ্গ কখনও জর্জর নাহি হয়—
নরনারী সেথা প্রমোদমুখর—চিরযৌবনময় !

ঝরা ফসলের গান

আঁধারে শিশির ঝরে
ঘুমোনো মাঠের পানে চেয়ে চেয়ে চোখদুটো ঘুমে ভরে।
আজিকে বাতাসে ভাসিয়া আসিছে হলুদ পাতার ঘ্রাণ,
কাশের গুচ্ছ ঝরে পড়ে হায়, খসে পড়ে যায় ধান
বিদায় জানাই—গেয়ে যাই আমি ঝরা ফসলের গান—
নিভায়ে ফেলিয়ো দেয়ালি আমার খেয়ালের খেলাঘরে !

ওগো পাখি, ওগো নদী,
এতকাল ধরে দেখেছ আমারে—মোরে চিনে থাক যদি,
আমারে হারায়ে তোমাদের বুকে ব্যথা জাগে যদি ভাই—
জেনো আমি এক দুখজাগানিয়া—বেদনা জাগাতে চাই।

পাই নাই কিছু, ঝরা ফসলের বিদায়ের গান তাই
গেয়ে যাই আমি, মরণেরে ঘিরে এ মোর সপ্তপদী।

ঝরা ফসলের ভাষা
কে শুনিবে হায় !—হিমের হাওয়ার বিজন গাঁয়ের চাষা
হয়তো তাহার সুরটুকু বুকে গেঁথে, ফিরে যায় ঘরে,
হয়তো সাঁঝের সোনার বরন গোপন মেঘের তরে
সুরটুকু তার রেখে যায় সব, বুকখানা তবু ভরে
ঘুমের নেশায়, চোখে চুমো খায় স্বপনের ভালোবাসা !

ওগো নদী, ওগো পাখি,
আমি চলে গেলে আমারে আবার ফিরিয়া ডাকিবে নাকি !
আমারে হারায়ে তোমাদের বুকে ব্যথা জাগে যদি ভাই,
জেনো আমি এক দুখজাগানিয়া—বেদনা জাগাতে চাই !
পাই নাই কিছু, ঝরা ফসলের বিদায়ের গান তাই
গেয়ে যাই আমি, গাহিতে গাহিতে ঘুমে বুজে আসে আঁখি !

পলাতক

কারা অশ্বারোহী কবে উষাকালে এসে
হারায়ে গিয়েছে দূর সাঁঝে—নিরুদ্দেশে
না জানি কিসের খোঁজে কতকাল ধরি !
যৌবনের রক্ত মোর উঠিছে শিহরি
তাহাদেরই মতো আজ—তাই পলাতক
আসিয়াছি চুপে চুপে—আলোর পলক
নিভে যায় যেইখানে পশ্চিমের মেঘে,

যেইখানে মায়াবীর ইশারার বেগে
এলোমেলো ঢেউগুলো হয়ে গেছে রাঙা
নারিকেল ছায়া ছুঁয়ে আধো ভাঙা ভাঙা
বাতাসের ব্যথা যায় বহি,—
দক্ষিণ সমুদ্রপারে আমি অশ্বারোহী
আসিয়াছি আর-এক—এই পথ কবে
স্বপন-বাউল যুবা-নবীনের রবে
ভরেছিল কত বার !—তাহাদের পক্ষিরাজ আসি
দিনশেষে এই পথে দাঁড়াত উদাসী !
সে কোন্ বন্দিনী যেন—শোনে আজও সিন্ধুর ধীবর
আচম্বিত কান্না তার দূর মধ্যসমুদ্রের ’পর—
তাহাদের নিয়েছিল ডাকি !
কোন্ একাকিনী যেন, তারই পানে নির্জন একাকী
ছুটে গিয়েছিল তারা, পৃথিবীর পরাজয়-জয়
পিছে ফেলে—পথে পথে হারায়ে সঞ্চয় !
আজ তারা কোথা সব জানি না তো কিছু !
আলোয় চিনিয়া পথ—তাহাদের পিছু
আমিও এসেছি এই বালুকার ’পর
আর-এক কবি-যুবা ! কাঁকর, পাথর,
এ মাটির রুক্ষ পথ—লাগে নাই ভালো,
যাহা-কিছু পাই নাই, যা-কিছু হারালো
সবই খুঁজে পাব আমি সন্ধ্যার আঁধারে,
নট্‌কান্-রাঙা মেঘে সমুদ্রের পারে !

যুবা অশ্বারোহী

যুবা অশ্বারোহী,
রাঙা কঙ্করের পথে কোন্ ব্যথা বহি
ফিরিতেছ একা একা নদীতীরে—সাঁঝে।
তোমারে চিনি না মোরা, আমাদের মাঝে
তোমারে পাই নি খুঁজে, দুপুরের রূঢ় কলরবে
নগরীর পথে মোরা নামিয়াছি যবে,
বন্দরের কোলাহলে—বেসাতির ফাঁদে
আধো হর্ষে—আধেক বিষাদে
বিকিকিনি করিয়াছি শুরু,
তুলিয়াছি স্থবিরের মতো দুটি ভুরু,
সংকোচ সংশয় ভয়ে উঠিয়াছি দহি—
দূরে—দূরে—কে তুমি বিরহী
ফিরিয়াছ, স্বপ্নালস আঁখি
দুটি তুলি দিবালোকে একান্ত একাকী
ছুটিয়াছ পাথারের বালুবেলা-পানে !
বনে বনে যখন অঘ্রানে
পাতা ঝরে—সবুজ পৃথিবী
যখন হারায়ে ফেলে শ্যাম বাস, কুসুমের নীবী,
ঝাউশাখে পাখিনীর নীড়
ভেঙে যায়—কুয়াশার ভিড়
পথে পথে কালো হয়ে ওঠে,
অবেলায় নেভে আলো—সুন্দরীর ঠোঁটে
ডালিম ফুলের রঙ হয়ে যায় নীল,
মোরা ঘরে ফিরে যাই—কার ঝিল্‌মিল্
মায়ার মুকুরে তুমি একা দেখ ছবি !
পৃথিবীর যত গুণী আর যত কবি

তাহারে চেনে কি তারা ? দিয়েছে কি ধরা
বাউলের বীণাতারে সে কখনও ?—তাহার পসরা
ধরণীর মধুকর-ডিঙাগুলি খুঁজে
পাব মোরা কোনো দিন !—তাই চোখ বুজে
মাটির বুকের ’পরে মুখখানা রাখি,
আমরা ঘুমায়ে পড়ি ; নির্জন একাকী
পাথরের পথ দিয়া অশ্বারোহী কোন্
চলে যায়—শুনেছি কখন
বিক্ষুব্ধ ক্ষুরের শব্দ—দেয়ালের গায়
সুর তার বেজে ওঠে, বিদায় জানায় !

পলাতকা

পাড়ার মাঝারে সবচেয়ে সেই কুঁদুলি মেয়েটি কই !
কত দিন পরে পল্লীর পথে ফিরিয়া এসেছি ফের—
সারাদিনমান মুখখানি জুড়ে ফুটিত যাহার খই
কই কই বালা আজিকে তোমার পাই না কেন গো টের !

তোমার নখের আঁচড় আজিও লুকায়ে যায় নি বুকে,
কাঁকন-কাঁদানো কণ্ঠ তোমার আজিও বাজিছে কানে !
যেই গান তুমি শিখায়ে দিছিলে মনের সারিকা-শুকে
তাহারই ললিত লহরী আজিও বহিয়া যেতেছে প্রাণে !
কই বালা কই !—প্রণাম দিলে না !—মাথায় নিলে না ধূলি !
—বহু দিন পরে এসেছি আবার বনতুলসীর দেশে !
কুটিরের পথে ফুটিয়া রয়েছে রাঙা রাঙা জবাগুলি—
উজান নদীতে কোথায় আমার জবাটি গিয়েছে ভেসে।

কবি

বীণা হাতে আমি তব সিংহাসনতলে
কালে কালে আসি কবি—কভু পরি গলে
জয়মালা, কভু হিংস্র নির্দয় বিদ্রূপ
তুলে লই অকুণ্ঠিতে, খুঁজে ফিরি রূপ
সৃজনের ছায়াধূপে, আকাশে আলোকে,
ধরণী ডুকারি ওঠে যে ব্যর্থতা-শোকে,
তারও মাঝে স্বপ্ন খুঁজি, বীণাতারে বুনি
তারও সুর,—আন্‌মনে গান গাই গুণী !
তুলিয়া লয়েছি আমি পতাকা তোমার,
হে সুন্দর, আমি তব দৌবারিক—দক্ষিণের দ্বার
উন্মুক্ত রেখেছি নব নবীনের লাগি !
অন্ধকারে দীপ হাতে আছি আমি জাগি।
আমি হেরিয়াছি—শুভ্র তোমার গৌরব
ঘৃণ্য নগণ্যের মুখে, কালে কালে করিয়াছে স্তব
বীভৎস কুৎসিত কুণ্ডে, পঙ্কের ভাণ্ডারে
তোমারেই ; দেখিয়াছি তুমি আসি দাঁড়ায়েছ দ্বারে
অন্ধকারে—রিক্ততারে করিয়াছ জয়ী
তোমার মঞ্জীর-স্পর্শে চুপে রহি রহি !
বিকৃত তৃষ্ণার ব্যথা—বন্ধনের রক্তকৃষ্ণ রেখা
বিনাশিয়া অরুণিমা দিয়ে গেছ দেখা
রাত্রির যাত্রীর ভীত নিঃস্পন্দিত চোখে !—
অতি দূর অনাগত স্বপ্নের আলোকে
আগতের ভাবলোকে তুলেছ উৎসব
কবি আমি, যুগে যুগে করি তব স্তব !

দিবস-নিশার রক্ত—দহনের আলো
জাগায় বিনিদ্র ব্যথা—তবু বাসি ভালো
সুর তার ; যা হারাল, পাবনাকো ফিরে,
তারই খোঁজে নিত্য উষা গোধূলির তীরে
ফিরি আমি—অশ্রুমান, ব্যথার তাপস !
ভালোবাসি বেদনারে, ঐশ্বর্যের যশ
চাহিনাকো—মাগি নাকো প্রসাদ সম্মান
আমি কবি—পথে পথে গেয়ে যাব গান ;
পদে পদে মৃত্তিকারে মঞ্জীরের মতো
বাজায়ে চলিব আমি—আমি অনাহত
আদি মানবের ছন্দে উঠিব ঝঙ্কারি
নীলিমার জয়গান—শ্যামশষ্প নিঙাড়ি নিঙাড়ি
ভরি লব শোণিতের সুরাপাত্রখানা !
যে-ছবি ফোটে নি আজও—যেই রূপ অনামা, অজানা
সিন্ধুতীরে পেতে লব রৌদ্রের শয়ন ;
তাম্রঅঙ্গে শঙ্খচূর্ণ ধূম্র বালু মাখি,
কলরবে পায়ে-চলা পথ যাব আঁকি
সমুদ্রফেনার মতো ; যেই কথা কহে নাই কেউ
যে গান গায়নি কেহ—তারি সিন্ধুঢেউ
তুলে যাব কূলে কূলে—পৃথিবীর প্রথম বয়স
ফিরায়ে আনিব আমি—আদি উষা—আদিম দিবস,
ঊর্মিস্নাত মানবের অসীম উল্লাস,
প্রথম রহস্য-ব্যথা—বিস্ময়ের ত্রাস,
প্রকাশ করিব মোর স্নায়ুর যৌবনে !
আদিম সন্তান আমি—রোম-শিহরণে
গাব গান ; স্বর্ণশীর্ষ নীবারমঞ্জরী—
মধ্যাহ্ন রৌদ্রের বুকে আপনারে ছিন্ন করি করি।

পরবাসী

যাহাদের পায়ে পায়ে চলে চলে জাগিয়াছে আঁকাবাঁকা চেনা পথগুলি,
দিকে দিকে পড়ে আছে যাহাদের দেহমাটি—করোটির ধূলি,
যাহারা ভেনেছে ধান গান গেয়ে—খুঁটেছে পাখির মতো মিঠে খুদকুঁড়া,
যাহাদের কামনার ইশারায় মাটি হল পানপাত্র, শষ্প হল সুরা !
ছুঁয়ে ছেনে বারবার এ ভাঁড়ার করে গেছে স্যাঁতসেঁতে ম্লান,
আনাচে-কানাচে আজও দুলিতেছে যাহাদের উড়ানি-পিরান,
যাদের দেহের ছায়া পাঁচিলের গায় গায় মেখে গেছে মায়া,
দেয়ালের শেওলায় নীল হয়ে জেগে আছে যাহাদের কায়া,
যারা গেছে বীজ বুনে মাঠে মাঠে,—চষে গেছে মাটি,
কেটেছে ফসল,—শালি বেঁধে-বেঁধে নেছে আঁটি আঁটি
তুলিয়াছে গোলাবাড়ি—যত তিষি ধান খড় ভরা,
পেঁচা-ইঁদুরের সনে আন্‌মনে জাগিয়াছে যাদের প্রহরা,
পনির ননীর গন্ধে ভরিয়াছে যাহাদের তুষ্ট গৃহস্থালি,
ধুনুচিতে ধূপ ঢেলে—উঠানে প্রদীপ জ্বালি জ্বালি
ঘরে ঘরে ফিরিয়াছে যারা কালো ছায়ার মতন,
চরকায় সুতো কেটে তুলিয়াছে তন্ময় গুঞ্জন,
কহিয়াছে আধো আধো কত কথা—নিভায়েছে—জ্বালায়েছে আলো,
দেয়ালে তাদের ছায়া জাগিয়াছে এলোমেলো—কালো—
না জানি কোথায় তারা, কত দূরে—জানি না তো কিছু !
রাতভোর ঘোর ঘোর চোখ মোর, ঘাড়খানা নিচু
তাদের সন্ধানে যেন—যাহাদের রেণুঝরা হিম মরা প্রজাপতি ডানা
দিকে দিকে পড়ে আছে—মনে হয় কত চেনা—কত তারা জানা !
তাহাদেরই পরীপাখা ওড়ে যেন পউষের নদীটির বুকে !
শিশিরনিবিড় মাঠ-পাথারের মুখে

তারা যেন কথা কয় !—শাঁইঝাড়ে—শালুকের দলে
জোনাকির পাখনার তলে যেন তাহাদের দীপ আজও জ্বলে !
সঙ্গোপনে বনে বনে ফেরে তারা—জ্যোৎস্নারাতে পিয়ালের মৌ
আজও তারা পান করে, আজও তারা গান করে—বাসরের বর আর বউ !
শিশিরের জলে জলে স্নান করে—ভিজে ভিজে বালুচর দিয়া
বুনো হাঁস-হাঁসীদের সনে ফেরে পরবাসী প্রিয় আর প্রিয়া !
কোরা-ডাহুকের বুকে কান পেতে শুনে যায় গান—
তাদের আঙুল ছুঁয়ে চুলবুল করে ওঠে হেমন্তের মাঠভরা ধান !
তাদের দেখেছি আমি গেঁয়ো পথে—দেখেছে রে ধাঙড়ের বধূ,
মৌচুষ্‌কির সনে তারা বনে লুটে খায় কম্‌লার মধু !
নোনার পাতায় তারা মাথা পেতে খায় তাতা ক্ষীর !
বেদের মতন তারা আসে যায়—অবেলায় ভেঙে ফেলে ভিড়।
তাদের দেখেছি আমি শাদা ভোরে—ঘুঘু ডাকা উদাস দুপুরে !
—সাঁঝের নদীর বাটে—ভাঙা হাট—ভিজা মাঠ জুড়ে ;
পাড়াগাঁর পথে পথে নিঝ্‌ঝুম চাঁদিনীর রাতে
ফিরেছে রে, ভিড়েছে রে কত বার তারা মোর সাথে !

আদিম

প্রথম মানুষ কবে
এসেছিল এই সবুজ মাঠের ফসলের উৎসবে !
দেহ তাহাদের এই শস্যের মতো উঠেছিল ফলে,
এই পৃথিবীর ক্ষেতের কিনারে, সব্‌জির কোলে কোলে
এসেছিল তারা ভোরের বেলায় রৌদ্র পোহাবে ব'লে—
এসেছিল তারা পথ ধরে এই জলের গানের রবে !
এই পৃথিবীর ভাষা
ভালোবেসেছিল, ভালো লেগেছিল এ মাটির ভালোবাসা !

ভালো লেগেছিল এ বুকের ক্ষুধা, শস্যের মতো সাধ !
এই আলো আর ধুলোর পিপাসা, এই শিশিরের স্বাদ
ভালো লেগেছিল—বুকে তাহাদের জেগেছিল আহ্লাদ !
প্রথম মানুষ—চোখে তাহাদের প্রথম ভোরের আশা !
এসেছিল সন্তান—
দেহে তাহাদের নীল সাগরের ঢেউয়ের ফেনার ঘ্রাণ !
শঙ্খের মতো কানে তাহাদের সিন্ধু উঠিত গেয়ে।
শস্যের মতো তারা ঐ নীল আকাশের পানে চেয়ে
গেয়ে গেছে গান ! ধানের গন্ধে পৃথিবীর ক্ষেত ছেয়ে
আলোয় ছায়ায় ফসলের মতো করিয়া গিয়াছে স্নান !
সে কোন্ প্রথম ভোরে
প্রথম মানুষ আসিল প্রথম মানুষীর হাত ধরে !
ভালো লেগেছিল এ দেহের ক্ষুধা, শস্যের মতো সাধ !
এই আলো আর ধুলোর পিপাসা, এই শিশিরের স্বাদ
ভালো লেগেছিল—বুকে তাহাদের জেগেছিল আহ্লাদ !
নীল আকাশের প্রথম রৌদ্র ক্ষেতে পড়েছিল ঝরে !

আজ

আমার হাতের কাজ আজ রাত্রে গিয়েছে ফুরায়ে—
আমার এ ক্লান্ত পায়ে
নাই আর পথের পিপাসা !
যে ভালোবাসার ভাষা
মানুষ শুনিতে চায়—যেই প্রেম নিয়া
মানুষ চলিতে চায় পৃথিবীর পথে পথে প্রিয়া—
তাহার সন্ধানে
তোমারে ডেকেছি আমি বারবার !

—দূর আলো—দূর এক আঁধারের পানে
তবু তুমি চলে গেছ, আসিবে না ফিরে,
হারায়ে গিয়েছ তুমি পৃথিবীর দিন আর রাত্রির ভিড়ে !

ফসলের দিন

কোনো এক প্রেমিকের তরে
তোমার অন্তরে
ভালোবাসা আছে ;
কোনো এক প্রণয়ীর কাছে
এক দিন দেখেছি তোমারে—
যে ভালোবেসেছে, কত ভালোবাসা দেখাতে সে পারে
জেনেছি সেদিন !
তারপর ফসল ঝরিয়া গেছে কত বার—
কত বার ঝরে গেছে তৃণ
মাটির উপরে !
—তবু জানি, কোনো এক প্রেমিকের তরে
তোমার অন্তরে
ভালোবাসা আছে !
কোনো এক প্রণয়ীর কাছে
একদিন দেখেছি তোমারে—
যে ভালোবেসেছে, কত ভালোবাসা দেখাতে সে পারে
জেনেছি সেদিন !

যেতে হবে বলে
তুমি গেছ চলে,
দূরে গেছ সরে ;
যেতে হবে ! তাই আমি হাতখানা ধরে

তোমারে আনি নি ডেকে কাছে !
একদিন, তবু—মনে আছে
তুমি এসেছিলে ;
আমারে বাস নি ভালো সেই দিনও, জানি আমি,
কিন্তু তুমি ভালোবেসেছিলে
তোমার ভিতরে যেই নারী আছে তারে,
জানিয়াছি—কত ভালবাসিতে সে পারে !
আমারে বাস নি তুমি ভালো,
কিন্তু সেই নারী—আজ সেও কি ফুরালো
তোমার অন্তরে !
প্রেমিকের তরে
যেই ভালোবাসা দিতে পারে শুধু প্রণয়িনী—
পাব না তা—কিন্তু এক মানুষীরে চিনি,
অকাজ-কাজের মাঝে—মানুষের পাশে
বারবার আসে !
আমারে বাস নি তুমি ভালো
কিন্তু সে মানুষী আজ সেও কি হারাল !

এক দিন এসেছিলে নক্ষত্রের তলে—
পৃথিবীর প্রণয়িনী যেই কথা বলে
প্রেমিকের কানে কানে, আকাশ একাকী
শোনে যাহা—বলেছিলে তা কি
সেই রাত্রে—ঢুলে-ঢুলে এসে !
জানি, তুমি ভালোবেসে
সেই দিন আস নাই,—
আজ তুমি চলে আস যদি,—
ভালোবাসা বুকে লয়ে আসিবে না, জানি আমি—

তবু এই পৃথিবীর নদী,
আর এই নক্ষত্র আকাশ,
অন্ধকার রাত্রির নিশ্বাস
চাহিছে তোমারে !
আমারে বাস নি ভালো, তবু আজ ফসলের ভারে
নতুন ধানের গন্ধে উঠিয়াছি ফ'লে
নবীন প্রণয়ী আমি,—পৃথিবীর কোলে !
চেয়ে আছি—আসিবে কখন !
ঈশানের মেঘের মতন
আসিছে সময় !
—তাহারই গম্ভীর গান শুনি আমি—
তোমার গানের শব্দ নয় !

আমরা

যেই ঘুম ভাঙে নাকো কোনো দিন ঘুমাতে ঘুমাতে
সব চেয়ে সুখ আর সব চেয়ে শান্তি আছে তাতে !
আমরা সে সব জানি ; তবুও দু চোখ মেলে জেগে
আমরা চলিতে আছি আমাদের আকাঙ্ক্ষার পিছে—
নক্ষত্রগ্রহের পিছে নক্ষত্রের ছায়ার মতন
ভাসিয়া চলিতে আছে ঢেউ তুলে আমাদের মন
নদীর জলের মতো—সিন্ধুর স্রোতের মতো বেগে
পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষার পার খুঁজে ছুটিয়া চলিছে।

কিংবা তারে খুঁজে কেউ পেয়েছে কি পৃথিবীর পারে !—
মৃত্যুর শান্তির চেয়ে হৃদয়ের যেই আকাঙ্ক্ষারে
আমরা বেসেছি ভালো ; খুঁজে তারে পেয়েছে কি কেউ
পৃথিবীর দিন আর পৃথিবীর রাত্রির আড়ালে !

সকল সাম্রাজ্য ছেড়ে—সকল নিশান ছেড়ে ছেড়ে
হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষারে—আমাদের এই হৃদয়েরে
আমরা বেসেছি ভালো !—থামে যদি সমুদ্রের ঢেউ,
আমরা যাব না থেমে,—যাব নাকো ডুবে কোনো কালে !
এই পার—অই পার—কোনো এক পারাপার থেকে
রাত্রিরে ডাকিছে দিন—দিনেরে যেতেছে রাত্রি ডেকে !
আমরা ডেকেছি তারে আলো-আঁধারের মতো হয়ে
আঁধার আলোর খোঁজে ; আমরাও তাহার পিছনে
ছুটিতে চেয়েছি সব ; আমরাও খুঁজিতেছি তারে
পৃথিবীর পারে গিয়ে, আর ঐ নক্ষত্রের পারে
ডাকিতে চেয়েছি তারে ; পুবের হাওয়ার মতো বয়ে
মিশিতে চেয়েছি গিয়ে পশ্চিমের বাতাসের সনে।

পশ্চিম সিন্ধুর মতো অন্ধকারে ফুলে দুলে উঠে
আমরা চলিতে চাই পুবের সিন্ধুর দিকে ছুটে !
মনের আশার মতো হৃদয়ের নিরাশারে খুঁজে,
আশার আকাশ খুঁজে অন্তরের নিরাশার মতো
আমরা ছুটিতে চাই পৃথিবীর পথ ছেড়ে দিয়ে ;
পিপাসা পিছনে ফেলে তোমারে পিছনে ফেলে প্রিয়ে !
যদিও সকল ভুলে কার্তিকের মাঠে চোখ বুজে
ঘুমায়ে অনেক শান্তি, ছুটিতেছি তবু ইতস্ততঃ !

যদিও অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছি পথে হেঁটে হেঁটে
বারবার জেগে জেগে অনেক সময় গেছে কেটে—
ঘুম ভালো সব চেয়ে, মৃত্যুর মতন ঘুম ভালো
যদিও সকল শক্তি সার সব ঐশ্বর্যের চেয়ে—
তবুও ঘুমের আগে আকাঙ্ক্ষার অধীরতা এসে

আমাদের সকলেরে চুমো দিয়ে গেছে ভালোবেসে !
আকাশে সূর্যের আলো আর ঐ নক্ষত্রের আলো
জ্বলিতেছে আমাদের আকাঙ্ক্ষার কাছে ছন্দ পেয়ে !

কারণ শান্তির চেয়ে অস্থিরতা—বেদনা—বিস্ময়
—আকাঙ্ক্ষার পিছে যেই ব্যথা-অধীরতা জেগে রয়—
মৃত্যুর শান্তির চেয়ে আমরা বেসেছি ভালো তারে !
যদিও গিয়েছি চিরে, পৃথিবীর বুকের মতন
হৃদয় রয়েছে ভরে অন্ধকার গহ্বরে কবরে,
তবুও রয়েছি জেগে রাত্রিদিন জাগিবার পরে !
রাত মুছে যায় দিনে, দিন ডোবে রাতের আঁধারে ;
—তাদের মতন হয়ে ভাসিয়া চলিতে আছে মন !

কোথায় সে জেগে আছে ?—ঘুমায়েছে ?—জেগে আছে সে কি !
তোমরা দেখেছ তারে ? আমরা চকিতে যারে দেখি
যাহার ঐশ্বর্য এই পৃথিবীর রাজ্যের মতন
নয়, তবু যে খেলেছে মানুষের ইচ্ছা ক্ষুধা লয়ে !
যার শক্তি বেশি ওই নক্ষত্রের প্রভাবের চেয়ে !—
পৃথিবীর মেয়ে সে কি ? নক্ষত্রের ?—তবে কার মেয়ে !
দেখেছি কোথায় তারে ! তারে আমি দেখেছি কখন !
আমরা ঢেউয়ের মতো তাহার পিছনে চলি বয়ে !

তারে খুঁজে ব্যথা শুধু, তারে খুঁজে শুধু বিহ্বলতা।
আবার ফিরিয়া এসে হে প্রিয়া তুমিও কবে কথা—
কিন্তু সে কি কোনোদিন তাকায়েছে আমাদের দিকে ?
পিছনে ফিরেছে সে কি ?—আমরা ছুটেছি তার পিছে !
আমরা ডেকেছি তারে—শুধু ব্যথা—ব্যথা তারে ডেকে !

তবুও পাখির মতো কাঁটার উপরে বুক রেখে
আমরা ডেকেছি তারে—আমাদের কাছে গান শিখে
দিনের রাতের ঢেউ জেগে উঠে তাহারে ডাকিছে !

কোথায় গিয়েছে প্রিয়া ?—কখন পিছনে পড়ে গেলে !
আমরা কাহারে খুঁজে তোমারে তুলেছি অবহেলে !
পৃথিবীর মাঠে পথে মানুষের মতো কাজ ক'রে
যে আরাম, বীজ বুনে—মানুষের মতো শস্য তুলে
যেই সুখ, ক্লান্ত মানুষের মতো আঁধারে ঘুমায়ে
যেই শান্তি, পাতার মতন ফলে যেই স্বাদ গায়ে—
হিমের হাওয়ার বুকে সহজে পাতার মতো ঝ'রে
যেই স্বচ্ছলতা—সব—আমরা সকলে গেছি ভুলে।

তবুও এই পথ ছেড়ে লাঙল-কাস্তে হাতে নিয়ে
আমরা যাব না হেঁটে পৃথিবীর শস্যক্ষেত দিয়ে।
—যদিও নদীর জলে,—যত দিন কেটে যায়, দেখি—
আরও বেশি—আমাদের মুখ আরো বেশি ম্লান হয় !
যদিও অনেক ঘুম—আরো ঘুম নেমে আসে চোখে—
রাতের আঁধারে এই—আর এই তারার আলোকে
নিভিয়া গিয়েছে বাতি পৃথিবীতে—তবু নিভেছে কি
যে মশাল অন্ধকারে আমাদের হাতে জেগে রয় !

সে মশাল অন্ধকারে আমাদের হাতে জেগে রয় !—
যদিও পেয়েছে ঘুম, ঘুমের মতন কিছু নয়—
যদিও সকল সাধ অনুভূতি আস্বাদের চেয়ে
সব পিছে ফেলে রেখে—সবাই ঘুমেরে ভালোবাসে—
—কারণ, সবাই শান্তি—মৃত্যুর ঘুমের শান্তি চায়—

পথ হেঁটে হেঁটে তবু চলিতেছি—যা চলিয়া যায়
তারই পিছে পিছে গিয়ে—ব্যথা পেয়ে—শুধু ব্যথা পেয়ে
জেগে আছি—যদিও আবার ঘুম—চোখে ঘুম আসে !
জ্বলিতেছে যে মশাল অন্ধকারে আমাদের হাতে !
সমুদ্র দাঁড়াতে পারে—পারি নাকো আমরা দাঁড়াতে !
পৃথিবী ঘুমাতে পারে—আমাদের চোখে ঘুম নাই !
নক্ষত্র নিভিতে পারে—আমরা যেতেছি তবু জ্বলে !
আমরা বাতাস হয়ে চলিতেছি দিকে দিকে বয়ে !
সময়ের সাথে সাথে আমরা সময় হয়ে হয়ে
যতদিন জেগে আছি এমনই জাগিতে শুধু চাই !
আমরা চলিতে চাই আকাশ বাতাস পায়ে দলে !

আজ

কোথাও রয়েছে মৃত্যু—কোনো এক দূর পারাপারে
পশ্চিম সাগরে এক—যেইখানে সব শেষ তারা
অবসন্ন হয়ে যায়—ডুবে যায় ভোরের আঁধারে,
আকাশ পায় না আর যেইখানে সমুদ্রের সাড়া ;
আমাদের হৃদয়ের সব আশা-হতাশা যেখানে
বরফের মতো কথা কহিতেছে বরফের কানে—
পরিশ্রান্ত পেগানেরা একদিন চিনেছিল যারে—
সব চেয়ে অবসাদ সঙ্গে করে এনেছিল যারা !

সেইখানে আছে মৃত্যু পৃথিবীর আকাশের শেষে
সকল মেঘের পরে—মেঘের রঙের আরো পিছে,
যেইখানে রঙ নাই—রক্ত নাই—সেই এক দেশে
ঘুমন্তের কানে-কানে সেইখানে ঘুম কী কহিছে !

ফুরায়েছে শুনিবার জানিবার সব অবসর—
বরফের হাত শুধু বরফের হাতের উপর।
কুয়াশার ঠোঁট শুধু কুয়াশার ঠোঁটে গিয়ে মেশে ;
দিনের পায়ের শব্দ মাথার স্বপ্নের মতো মিছে !

রাতের পাখার পাখি ঝরায় না পালক সেখানে,
ধরায় না বাতি আর নক্ষত্রেরা—ক্লান্ত নক্ষত্রেরা—
অবসন্ন নদী ছোটে নাকো শ্রান্ত সমুদ্রের পানে,
সন্তানের মতো জন্মে পৃথিবীতে জেগে আছে এরা !
ইহারা শিশুর মতো—পৃথিবীর শৈশবের দিন
শেষ হয়ে গেছে তবু, বৈকালও যে হয়েছে মলিন।
সকল-শেষের সুর শোনা যায় সকলের গানে—
জীবনের সব সাধ অগাধ মৃত্যুর ঢেউয়ে ঘেরা !
সিন্ধুর শঙ্খের কানে সমুদ্রের সুরের মতন—
রক্তের গানের মতো আমাদের দেহের ভিতরে
হে মৃত্যু,—তোমার গান শুনিতেছে—শুনিতেছে মন।
ঘুমন্ত মাথার মতো কোনো এক বিছানার 'পর
বুজায়ে রাখিতে চাই যা বুঝেছি, যা জেনেছি—সব !
আকাঙ্ক্ষা চাই না আর, আঘাতের চাই না উৎসব।
অনেক জাগার পরে ঘুমাবার করি আয়োজন—
গুহার ছায়ার মতো ছায়ার গুহার মতো ঘরে !

কারণ অনেক জেগে আমরা দেখেছি রোদ, রূপ— ।
দেবতা দেখে নি ভয়ে—আমরা দেখেছি জেগে জেগে ;
দেখেছি সকল আলো হয়ে যায় অঙ্গারের স্তূপ
তোমার পায়ের তলে, মানুষের মতন আবেগে
নক্ষত্রেরা কেঁপে ওঠে তোমার জানুর নীচে এসে ;

মোমের মতন গলে জ্বলেছি তোমারে ভালোবেসে ;—
আগুন হয়েছ তুমি, হয়ে গেছি আমি তার ধূপ ;
বিদ্যুতের মতো তুমি জেগেছ বুকের ’পরে মেঘে !

দেবতা দেখে নি ভয়ে—সময়ের তাই সে দেবতা !
সকল ঐশ্বর্য—রাজ্য—নিশানের আগে তার জয় !
তোমারে সে দেখে নাই, শোনে নি তোমার মুখে কথা
তোমার ঠোঁটের চুমা তাহার ঠোঁটের তরে নয়।
তোমার চুলের কালো সাপ তার লাগেনি কপালে
পরিচ্ছন্ন আকাশের ’পরে তার নক্ষত্র সে জ্বালে ;
একে একে শেষ হয় সকলের সকল ক্ষমতা—
ফুরায় না কোনো দিন দেবতার সীমানা, সময় !

আর অই দেবতার ছেলে এক—ক্রুশ তার বুকে ;
সে শুধু জেনেছে ব্যথা—ক্রুশে শুধু যেই ব্যথা আছে !
যেই গাঢ় বেদনায় মাথা তার পড়িয়াছে ঝুঁকে,
যে ব্যথার রক্ত তার ক্রুশের উপরে ঝরিয়াছে,
পেগান্ জানিত না তো সেই ব্যথা ; তবুও পেগান্
সব চেয়ে অবসাদে নষ্ট করে গেছে তার প্রাণ !
সব চেয়ে বড়ো ব্যথা বিষণ্নতা ছিল তার মুখে,
কারণ ভিনাস্, তুমি এক দিন ছিলে তার কাছে !

এক দিন এক রাত তার কাছে বসিয়াছ এসে,
এক রাত—এক দিন এসেছ আমার কাছে তুমি !
সকল ভুলেছি আমি কেবল তোমারে ভালোবেসে,
ফুলের ঘ্রাণের মতো তোমার মাথার চুল চুমি !
তোমার হাতের ’পরে এক রাত এই হাত রেখে !

দুই চোখ দিয়ে আমি নিয়েছি তোমার চোখ দেখে !
আজও তুমি জেগে আছ আমাদের অবসন্ন দেশে,
সবাই ঘুমায়ে পড়ে—তবু তুমি পড় নাই ঘুমি।

ভিনাস্ আজিও তুমি মাথা তুলে রহিয়াছ জেগে—
ভরেছে দুধারে ঘাড় সাপের ফণার মতো চুলে !
ঠোঁটের উপরে ঠোঁট চুমোর মতন আছে লেগে !
ফেনার মতন রক্ত দেহে তার উঠিতেছে দুলে !
গ্রীষ্মের সিন্ধুর মতো তার অই দেহের উষ্ণতা
বিমর্ষ ঘুঘুর মতো চোখে তার সে কী বিষণ্ণতা !
হৃদয় ভরিয়া ওঠে অবসাদে—বিষাদে—আবেগে—
বিকালের সমুদ্রের মতো ক্ষুধা উঠিতেছে ফুলে।

তোমার পেগান্ রাজ্য ভেসে গেছে মেঘের মতন—
তাহার সে বজ্র ভেঙে পড়ে আছে পৃথিবীর পিছে,
চলে গেছে গ্রীক সব—হীদেন্ গ্রীকের মতো মন
তোমার মুখের পানে চেয়ে বুকে আবার জাগিছে !
কোথা আছো ?—আজিকার পৃথিবীর কে তুমি দেবতা ?
উৎসব তোমার বুকে—আমার এ মুখে বিহ্বলতা ?
নক্ষত্রের স্বপ্ন তুমি দেখ, আমি দেখি দুঃস্বপন।
তবুও মিথ্যার মতো দেবতারে মনে হয় মিছে !

কারণ দু হাত তুমি রাখ নাই ভিনাসের হাতে ;
তোমার দু হাত শুধু পেয়েছিল মেরী মাদালিন্—
তাহার চুলের ’পরে ফুলের মতন আশীর্বাদে,
দেবতার দুই হাত এসেছিল নেমে এক দিন !
আজিকার পৃথিবীর দেবতার এই শুধু সাধ—

শুধু তৃপ্তি—শুধু তৃপ্তি—সান্ত্বনার শীত আশীর্বাদ !
পৃথিবীর ব্যথা ছাড়া আর কোন্ ব্যথা বুকে বাধে ?
যে ব্যথার কাছে এই পৃথিবীর সব ব্যথা ক্ষীণ !

চোখ মেলে তারে তুমি একবার নেবে নাকি দেখে ?
তোমার দু চোখ শুধু চেয়ে রবে নক্ষত্রের পানে ?
কিংবা এই মানুষেরা যেইখানে ঝরে একে একে
তুমি শুধু চলে যাবে সেই সব মশানে-মশানে !
তোমার হৃদয় শুধু রাখিবে কি কুৎসিতের হাতে ?
তোমার বুকের রক্ত ঝরাবে কি ক্রুশের আঘাতে ?
তোমার ক্রুশের চিহ্ন সকল পৃথিবী দেবে ঢেকে ?
এর চেয়ে বেশি কিছু আজিকার দেবতা কি জানে !
দেবতা রয়েছে বেঁচে তাই আজ—মরিবে না আর !
শেষ হবে নাকো আর মেসায়ার মুখ থেকে কথা,
পুরানো রাত্রির মতো আসিবে না নতুন আঁধার,
মুছে দেবে নাকো আর এ নতুন আলোর স্পষ্টতা !
কারণ এ রোদ-আলো শান্ত ; শাদা সকাল-বিকাল,
পৃথিবীতে রৌদ্র তবু এক দিন ছিল আরো লাল !
সেই রক্তে আজ আর দেবতার নাই দরকার—
কারণ সে রক্তে জ্বালা, আগুনের মতো শুধু ব্যথা।

সকলের মতো চলে আমিও হতাম ক্লান্ত যদি
আর এক অবসাদে পরিশ্রান্ত হতাম না আর—
পৃথিবীর অন্ধকারে সব চেয়ে পরিশ্রান্ত নদী
জানে এই পরিশ্রম ?—আর জানে এই অন্ধকার ?
পৃথিবীর অন্ধকারে সবচেয়ে গভীর সাগর
খুঁজে যায় আরও গাঢ় কোনো এক গহ্বরের ঘর—

মৃত্যু এসে একদিন দেবে তারে সকল অবধি—
শেষ হবে খুঁজিবার জানিবার দরকার তার !

কোথায় রয়েছে মৃত্যু ? কোন্ দিকে ? খুঁজি আমি তারে,
কোথাও রয়েছে মৃত্যু—যেইখানে তুমি আর নাই !
যেখানে তারার আলো কিংবা কালো রাতের আঁধারে
তোমারে চিনি না আর—আমি শুধু তোমারে চিনাই !
ঘুমের—চোখের ঘুম মরণের বুকের উপরে ;
প্রেমিকের মতো চুমো আমার সে ঠোঁট থেকে ঝরে
মৃত্যুর ঠোঁটের 'পরে ; এক শীত-সমুদ্রের পারে
আমার জীবন পুড়ে পৃথিবীতে হয়ে গেছে ছাই !

তুমি নাই, চোখের ঘুমের মতো ঘুম হয়ে আছি ;
বিছানায় মৃত্যু শুয়ে—তার পাশে আমি ঘুম—আমি !
মানুষীর মতো করে তারে আমি ভালোবাসিয়াছি !
বিবাহের খাটের উপরে তার আসিয়াছি নামি !
বাহিরে শীতের রাত—জীবনের শীত আর ব্যথা ;
ঘোড়ার খুরের শব্দ—খুরের পথের পিচ্ছিলতা !
এখানে গ্রীষ্মের রাত—আমাদের মুখে ঘাম, মাছি !
ঠোঁটে ঠোঁট, কপালের কালো চুল উঠিতেছে ঘামি !

যে কথা শিখিনি আমি কোনোদিন পৃথিবীর দেশে
এইখানে তার ভাষা আস্বাদের মতো মনে হয়।
যেই ভালোবাসা আমি পাই নাই ঢের ভালোবেসে
এইখানে শুরু হয় প্রথম সে প্রেমের সময় !
অই দূর পৃথিবীর সুস্থ প্রেমিকেরা শুধু জানে
যে প্রেম চেয়েছি আমি—যে প্রেম পেয়েছি আমি গানে !

এইখানে সেই প্রেম মাংস লয়ে দাঁড়ায়েছে এসে।
শরীরের রক্তে তার শরীরের রক্ত লেগে রয় !

এই মৃত্যু ; এক দিন পৃথিবীর পথের জীবনে
বিমর্ষ হয়েছি আমি প্রেমের অনেক গল্প শুনে ;
প্রণয়ের ঢের গান বিষ হয়ে জেগেছিল মনে—
মাছির মতন পাখা পুড়ে গেছে প্রেমের আগুনে !
আগুনের মতো প্রেম, তবুও আগুন প্রেম নয়—
মোমের মতন দেহ প্রেমের আগুন শুধু সয় !
জীবনের শীত তারে জ্বালায় নি—জ্বলেছে মরণে !
পৃথিবীর শীতে কারা বসে থাকে দিন গুনে গুনে !

আমিও ঘুরেছি ঢের অই দূর পৃথিবীর শীতে,
ঘোড়ার খুরের শব্দ অনেক শুনেছি আমি কানে,
এক মুখ চিনে আর কিছু আমি চাই নি চিনিতে !
কার ভুরু খুঁজিবে সে একবার তার ভুরু জানে !
কার চোখ দেখিবে যে একবার দেখে তার চোখ !
সব মেয়েমানুষের মাঝে সেই এক মেয়েলোক !—
আগুন ধরাতে জানে বরফের বুকে ব্যথা দিতে—
বরফ ছড়াতে জানে আগুনের মতো রাঙা প্রাণে !

অন্ধকারে গাঢ় শাদা সমুদ্রের মতো তার হাসি !
ক্ষুধা তার সাগরের ভিতরের গহ্বরের মতো !
আমার পিপাসা তবু তার চেয়ে গভীর পিপাসী—
ফুরায়ে গিয়েছে তবু পিপাসার সেই সমুদ্র তো !
কে ফুরাল ! আহা আহা—কেন তাহা ফুরাল এমন !
জীবনের পারে বসে মরণের গন্ধে ভরে মন—

ফুটেছে বিষের ফুল—নাইট্‌শেড—তারে ভালোবাসি !
জীবনেরে কোনো দিন ভালো আমি বেসেছি কি তত !

সিন্ধুর বুকের থেকে জেগেছিল ভিনাসের মতো,
আমার হৃদয়ে যেই সিন্ধু আছে, তার বুক থেকে !
আমার ভিনাস্‌ তুমি—আমি জানি, তুমিও জান তো !
তোমারে এনেছি আমি গভীর সমুদ্র থেকে ডেকে !
আমার দু চোখ দিয়ে তোমারে এনেছি ডেকে আমি,
আমারে মায়াবী জেনে আমার নিকটে এসে থামি,
ঢেলেছে চুলের থেকে সাপের ফণার বিষ যত !
তবুও তোমার চুলে রেখেছি মাথার চুল ঢেকে !
গ্রীষ্মের সিন্ধুর ঘ্রাণ রয়েছে তোমার দেহে লেগে—
সে কোন্‌ সাগর দূর—কেউ তার জানে নাকো পার—
সেখানে ঘুমায়ে ছিলে পিপাসার আক্ষেপে—আবেগে !—
দরকার হল তাই জাগিবার আর জাগাবার !
পৃথিবীতে এমন জাগে নি আর কোনো দিন কেউ—
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে বানায় সে সমুদ্রের ঢেউ !
দেবতারা ঘুমায়েছে সন্ধ্যার মেঘের মতো মেঘে,
সে তবু জাগিয়া ওঠে—তার চোখে ঘুম নাই আর !

শেষের ঘুমের ঘাম কেবল কপালে লেগে আছে ;
অবসন্ন হয়ে চোখ একদিন ফেলেছিলে বুজে—
নতুন মেসায়া এক তখন আকাশে জাগিয়াছে,
তোমার সাম্রাজ্য তুমি সেই দিন পাও নাই খুঁজে।
তোমার অবশ চোখ সেই দিন হয়েছে মলিন—
তোমার ঘুমের পর সেদিন জেগেছে নেজারিন্‌ !
সেই হতে জেগেছে সে—পৃথিবী গিয়েছে তার কাছে,

তাহার বুকের ’পরে সবাই রয়েছে মুখ গুঁজে !

সকল ঘোড়ার খুর গিয়েছে রোমের দিকে ছুটে—
সকল পেগান্ রোম তাদের পায়ের তলে পিষে
সকল পেগান্ গ্রীস্ তবুও ঘুমের থেকে উঠে
আবার ওঠে নি জেগে পুরোনো পেগান্ সেই গ্রীসে !
কারণ নতুন আলো এনেছে নতুন এক ত্রাণ—
আর কেউ রহিবে না অ্যাপোলোর মতন পেগান্ !
সমুদ্রের পাপ থেকে তুমি আর উঠিবে না ফুটে,
ফুটিবে না তুমি আর হৃদয়ের সাগরের বিষে !

তোমার চোখের পানে চেয়ে লোক হবে না মলিন,
আগুনের জিভে খেয়ে যাবে না মোমের মতো গলে !
এই শান্তি হাতে করে আনিয়াছি নিজে নেজারিন্,
আগুনের মতো তুমি—সেই সূর্য ওঠে তবু জ্বলে !
তোমরা পাথর আজ, তোমরা হয়েছ আজ কাঠ !
রোমের মেসায়া সে যে, পৃথিবীর সে একা সম্রাট !
আগুনের মতো সে যে, তোমরা তাহার কাছে তৃণ—
তোমরা তৃণের মতো আগুনে-আগুনে শেষ হলে !

আমি তবু মেসায়ার হাত ছেড়ে আসিয়াছি চলে—
ঘুরায়ে নিয়েছি ঘোড়া রোমের পথের থেকে আমি,
এক দিন—এক রাত সে যে এসে বসেছিল কোলে !
তোমার মুখের থেকে সেই বুক আরো গাঢ়, স্বামী !
শুনিয়াছি—মাউন্টের ’পরে তুমি কী কয়েছ কথা—
দেখেছি মেসায়া, আমি তোমার মুখের বিমর্ষতা !
তোমার পথের থেকে তবু আমি পড়িয়াছি স্খলে !

কোথায় চলেছি আমি ! কোথায় যাব যে আমি থামি !

যাহারা রোমান্ ছিল মার্চ করে তারা আজি যায়
তোমার রাজ্যের দিকে—তোমার ক্রুশের 'পরে সবে—
চুমো দিয়ে চলে যায় চুপে চুপে বেলা-অবেলায়—
আমারও কি সেই ক্রুশে একবার চুমো দিতে হবে ?
যে ঠোঁটে আগুন আছে—যেই ঠোঁটে নাই কোনো জল
তারে তুমি করিবে কি বরফের মতন শীতল !
আমার পিছনে ও কি ?—নেজারিন্, তুমি নাকি হায় !
তোমার বিষণ্ণ চোখ কত দিন চোখে লেগে রবে !

তুমি শান্তি, আর তুমি আকাশের আশ্বাসের দূত ;—
আমারে কি শান্তি দেবে ? আনিবে কি সান্ত্বনার ছায়া !
যেখানে শিশুরা আর মাদালিন্, মেরী আর রুথ,
সেইখানে চলে যাও অবসন্ন আচ্ছন্ন—মেসায়া !
সেইখানে ক্রুশে বিঁধে কাঁদিতেছে মানুষের শ্বাস,
যেইখানে জন্ম লয় পাইলেট—জুডা—ব্যারাব্বাস
ভূতের মতন ভাসে তাহাদের হৃদয়ের ভূত—
সেইখানে দয়া আনো, সেইখানে আনো তুমি মায়া !

তোমার পায়ের পথ ছেড়ে তবু তুমি পলাতক,—
সবাই রেখেছে, তবু রাখি নাই মেসায়ার মান !
আমার পায়ের শব্দ হয়তো বা শুনিছে নরক !
বধির নরক, শোনো, আমি এক অধীর পেগান্ !
পৃথিবীর পথ খুঁজে পথ আমি পাই নাই কোনো,
ঘুমন্ত হীদেন্ তুমি আমার পায়ের শব্দ শোনো !
এ হৃদয়ে নাই কোনো ক্রুশকাঠ ধরিবার শখ,

পাপের হাতের থেকে চাই নাকো কোনো পরিত্রাণ !

ক্লেশে তাপ আছে, তবু, আমি চাই সেই অভিশাপ !
সবচেয়ে পতিতের মতো আমি কহিতেছি কথা,—
সিন্ধুর ফেনার মতো ভাসে যেই বিষ, যেই পাপ—
আমার হৃদয়ে তার অসুস্থতা ; তাহার সুস্থতা !
আমি সমুদ্রের মতো আকাঙ্ক্ষায়, আলোড়নে গাঢ় ।
আমারে পৃথক কর,—পৃথক করিতে যদি পার !
শীতল করিতে পার, ক্রুশ, তুমি আমার উত্তাপ ?
নির্মল করিতে পার, নেজারিন্, এই আবিলতা ?

নেজারিন্, দেখেছ কি কোনো দিন চোখ তুলে তারে ?
ফলন্ত শস্যের মত পৃথিবী গিয়েছে ভরে ক্রুশে !
তাদের ছায়ায় নয়,—ভিনাসের চুলের আঁধারে
হৃদয়ের শেষ রক্ত আমি তবু লইতেছি শুষে !
কারণ পতিত আমি, কোনো দিন চাই নাই ত্রাণ,—
আমার শরীরে রক্ত গাহিতেছে সমুদ্রের গান !
গাহিবে সে যত দিন গাঢ় হয়ে গাহিতে সে পারে ।
যতদিন মানুষীর অভিশাপ চাহিবে মানুষে !

তারে তুমি দেখিবে না, করিয়াছে সে কি অপরাধ ?
শান্তির ঘুঘুর মতো শাদা সে কি ? লিলির মতন ?
ভ্যালির লিলির মতো মাংসের পাপড়িতে স্বাদ ?—
সল্ যারে জেনেছিল—বুঝেছিল যারে সলোমন !
সমুদ্রের পারে যেই ফুল ফোটে গ্রীষ্মের বিকালে,
অনেক ফেনার গন্ধ ঘাম ঘ্রাণ যাহার কপালে,
ক্ষুধা যার গরমের সমুদ্রের মতন অগাধ—

আমার ভিনাস্ তাই !—তোমার, সে লিলি কি তেমন !

কে বানাল ?—বুকে তার দিল এত সাগরের বিষ !
কে বানাল তারে, আহা, তুমি তাহা জান না দেবতা !
জেনেছ কাঁটার চুমা—কাঁটায় নাইকো তার কিস্
তাহার ঠোঁটের 'পরে কার ঠোঁট রয়েছে, দেখ তা।
করুণ লিলির গায় এমন থাকে কি লেগে লিলি ?
শীতল লিলির স্বাদ চিনায়েছে তোমারে, গ্যালিলি !
জেনেছ কি, এক দিন জেনেছে যা গ্রীক অ্যাডনিস্ ?
পরাজয় করেছে সে পৃথিবীর এই বর্বরতা !

এসেছে নতুন ভোর নতুন দিনের আলো লয়ে—
আজ কেউ গ্রীক নয়, খোঁড়া—খর্ব—চায় সব ত্রাণ।
এক দিন হয়েছে যা, গেছে তার সব শেষ হয়ে !
গোধূলির আলো এসে ঘিরিয়াছে তোমারে পেগান্।
অনেক শীতের রাত নামিতেছে আকাশের থেকে,
দেবতা পেতেছে ব্যথা পৃথিবীর দরিদ্রতা দেখে,
শান্তির নিশ্বাস তার অশান্তির ঢেউয়ে চলে বয়ে,
তাহার গ্যাবার্ডিনে লেগে আছে মঙ্গলের ঘ্রাণ।
নেমেছে শুভ্রের দিন—পেগানের গোধূলির আলো
ডুবে গেছে পশ্চিমের পাহাড়ের পিছনে সাগরে !
এই রাতে জানালায় নক্ষত্রের মতো বাতি জ্বালো,
শীতের উঠান ছেড়ে সবাই চলিয়া এসো ঘরে ;
পিছনে পড়িয়া থাক যেই সব রবে পড়ে পিছে,—
পৃথিবীর বালকের বিস্ময়ের বিহ্বলতা মিছে !
নেমেছে শান্তির দিন, সান্ত্বনারে বাসি সবে ভালো,
মঙ্গলের দেবতার পূজা আজ করি পরস্পরে !

চারি দিকে জ্ঞান আছে—পুরানো জ্ঞানের মতো নয় ;
চারি দিকে বোধ কোন্ ?—আমি তার পাই নাকো আলো,
যেই সময়েরে আর আনিবে না অসীম সময়,
অগাধ অতীতে যার সমুদ্রের সীমানা হারাল—
আমি একা বসে আছি আজ সেই সাগরের পারে ;
সব চেয়ে বেশি আলো সব চেয়ে গভীর আঁধারে
সেইখানে মিশে যায়—সেইখানে সব শেষ হয়—
তারপর, হে জিহোবা, আকাশে তোমার বজ্র জ্বালো !

আবার নতুন মাংসে তোমার পৃথিবী ফেলো ভরে,
রক্তের হাড়ের বীজ বিছায়ে দিতেছ তুমি পথে ;
নতুনের বিধানের অই শ্রান্ত পথ ধরে ধরে
মুশার মতন মাথা দেখা দেবে উষার পর্বতে ;
তোমার কমান্ড্‌মেন্ট, সেইসব অবসন্ন শোভা—
আবার দেখাবে তুমি আমাদের, বিরক্ত-জিহোবা !
কবরে যাদের হাড় আজ আর ওঠে নাকো নড়ে—
সেই মৃতদের তুমি ক্লান্ত হয়ে দেবে তো ঘুমোতে !

তাহারা ঘুমাক্—আহা—আমিও তাদের মতো ঢুলে
ঘুমায়ে যেতাম যদি তাদের কিনারে মাথা রেখে !
আজিকার এই জ্ঞান আর এই অজ্ঞানতা ভুলে
অবসন্ন ডান হাত দিয়ে ক্লান্ত কপালেরে ঢেকে
আমিও হতাম যদি অতীতের মতন অগাধ !
সব চেয়ে অবসন্ন ! সব চেয়ে বড়ো অবসাদ !
আজিকার এই শীত পৃথিবীর কোলে থেকে তুলে
আমারে তোমার কোলে তুমি এসে নিতে যদি ডেকে !

আজ এই পৃথিবীরে করিয়াছি আমি অস্বীকার,
আর তার জ্ঞান আমি জানিব না, শুনিব না কথা,
দেখিব না আর তার আলো আমি—তার অন্ধকার ;
বুঝিব না এ আলোয় আছে কোন্ নতুন স্বচ্ছতা !
জানিব না এ নতুন দেবতার কোন্ রূপ আছে।—
তাহারে যে চায় নাই তাদের সে ভালোবাসিয়াছে ;
আমারে যে চায় নাই আমি তবু চুমো চাই তার,
যারে আমি পাই নাই তারে খুঁজে চাই আমি ব্যথা।

তারপর শান্তি চাই—তোমার মতন শান্তি নয় !
সেইখানে আলো নাই, দূত নাই, ইশা, তুমি নাই,
সেইখানে জিহোবার মুখে চেয়ে কাটে না সময়,
সময়ের বুকে শুয়ে সেইখানে সময় কাটাই ?
তোমার ড্রামের শব্দ একদিন উঠিবে কি বেজে !
ডুম্‌স্‌ডে-র ড্রাম-ট্রাম্‌পেট তারা ভুলে গিয়েছে যে !
যেই ঘুমে ক্লান্ত কপালের ঘাম ভুলে যেতে হয়,
সেই ঘুম,—আমি শুধু পেগানের সেই ঘুম চাই !

নক্ষত্র, কেমন করে জেগে থাক

নক্ষত্র, কেমন করে জেগে থাক তুমি অই আকাশের শীতে।
যখন সকল বাতি নিভে যায়, নক্ষত্র কেমন করে জ্বল !
আমাদের দলে যায় মৃত্যু এসে অন্ধকারে ; তারপর, তারে তুমি দল ;
তোমারে তবুও মৃত্যু আমাদের মতো করে একবার চেয়েছে দলিতে !
হিম হাওয়া অন্ধকারে পৃথিবীর রুগ্ন বিরহীরে ব্যথা দিতে
চলে আসে,—সে বেদনা কোনোদিন বুকে তুমি পেয়েছ কি বল ?

তুমিও জেনেছ ব্যথা সে নক্ষত্র,—নিঃশব্দে তবুও পথ চল ;
যে ফসল ঝরে যায় তার মতো আমাদের হতেছে ফলিতে !

অন্ধকার পৃথিবীর দিকে চেয়ে কখন জেগেছে বুকে ভয় ;
সবুজ পাতার গন্ধে ফুটে ওঠে হলুদ পাতার মত প্রাণ
এইখানে ;—কাস্তে হাতে চারিদিকে ফিরিতেছে এখানে সময় !
দিনেরে ডাকিছে রাত্রি,—মৃত্যু এসে জীবনেরে করিছে আহ্বান
এইখানে ;—কখন ফুরাতে হয়,—কখন থামিয়া যেতে হয়—
এই ভয়ে নক্ষত্র তোমার চোখ কোনোদিন হয়েছে কি ম্লান !

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

ঘুমায়ে পড়িতে হবে একদিন

ঘুমায়ে পড়িতে হবে একদিন আকাশের নক্ষত্রের তলে
শ্রান্ত হয়ে—উত্তর মেরুর শাদা তুষারের সিন্ধুর মতন !
এই রাত্রি,—এই দিন,—এই আলো,—জীবনের এই আয়োজন,—
আকাশের নীচে এসে ভুলে যাব ইহাদের আমরা সকলে !
একদিন শরীরের স্বাদ আমি জানিয়াছি, সাগরের জলে
দেহ ধুয়ে ;—ভালোবেসে বুঝিয়াছি আমাদের হৃদয় কেমন !
একদিন জেগে থেকে দেখিয়াছি আমাদের জীবনের এই আলোড়ন,
আঁধারের কানে আলো—রাত্রি দিনের কানে কত কথা বলে

শুনিয়াছি ;—এই দেখা—জেগে থাকা একদিন তবু সাঙ্গ হবে,—
মাঠের শস্যের মত আমাদের ফলিবার রয়েছে সময় ;
একবার ফলে গেলে তারপর ভালো লাগে মরণের হাত,—
ঘুমন্তের মত করে আমাদের কখন সে বুকে তুলে লবে !—
সেই মৃত্যু কাছে এসে একে-একে সকলেরে বুকে তুলে লয় ;—

সময় ফুরায়ে গেলে সবচেয়ে ভালো লাগে তাহার আস্বাদ !—

রচনা : ‘রূপসী-বাংলা’র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

যতদিন আলো আছে

যতদিন আলো আছে আমাদের জাগিবার শেষ অবসর
যতদিন রয়েছে এ পৃথিবীতে,—উচ্ছৃঙ্খল সৃজনের পানে
আমরা তাকায়ে রব ততদিন ;—যদি কোনো শৃঙ্খলার গানে
আকাশ ভরিতে পারি,—শান্ত করে দিতে পারি পৃথিবীর জ্বর
আমাদের গানে যদি ;—হাত ধরে আসিয়াছি তাই পরস্পর !
একদিন অন্ধকারে মৃত্যু এসে কথা কবে আমাদের কানে,—
জানি না কি ? আজ তবু আসিয়াছি হে জীবন, তোমার আহ্বানে !
ঘুমের সান্ত্বনা ভুলে জেগে আছি বেদনার গহ্বরের পর !

জেগে আছি ধীর চোখে ;—তাহাদের স্থির আলো লয়ে
আকাশে নক্ষত্র জাগে শৃঙ্খলায় আকাশের নক্ষত্রের সাথে ;
তাহাদের ছন্দ এনে সৃজনের অন্ধকারে যদি স্থির হয়ে
আমরা জ্বলিতে পারি ; যদি পারি নক্ষত্রের মতন জ্বালাতে
পৃথিবীরে ;—আগুনের অসহিষ্ণু স্ফুলিঙ্গের মতো আজ দহে
তারার আলোর মতো জ্বলিয়া উঠিতে পারি যদি কালরাতে !

রচনা : ‘রূপসী-বাংলা’র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

হৃদয়ের ক্লান্তি ভুলে

হৃদয়ের ক্লান্তি ভুলে, সারাদিন জীবনের ক্ষেতে কাজ করে,
তারপর—ভালো লাগে পৃথিবীর অন্ধকার,—ঘুমের সময় ;

বীজ বুনে শস্য কেটে—তারপর আমাদের প্রাণ ক্লান্ত হয়,
লাঙল পড়িয়া থাকে মাঠে-মাঠে,—তারার আলোয় থাকে পড়ে
তখন হাতের কাস্তে ;—ঘুমন্ত দেখে না সেই তারার আলোরে !
যখন অনেক ঘুম পৃথিবীতে আমাদের বুকে জন্ম লয় ;
পৃথিবীর ফসলের ক্ষেতে বসে অবসাদ জেনেছে হৃদয়
আমাদের দুই চোখ তাই ঘুমে আরও ঘুমে উঠিয়াছে ভরে !

পৃথিবী বিদায় লয়ে দূরে—দূরে—আরও দূরে—দূরে চলে যায়,
তাহার পায়ের শব্দ তারপর থেকে যায় নক্ষত্রের তলে ;
তারার আলোর মতো দিনের আলোর কাছে লয়েছি বিদায়,
স্থির নক্ষত্রের মতো ঘুমায়ে রয়েছি ধীর নদীটির জলে ;
ঘুমের সান্ত্বনা শান্তি পাবে বলে সকলেই ক্লান্ত হতে চায়,—
ব্যথা পেতে চায় গিয়ে একবার পৃথিবীর ক্লান্তি—কোলাহলে !

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

অন্তরে চাই না তাপ

অন্তরে চাই না তাপ,—হৃদয়ে তারার মতো স্থির আলো চাই ;
শান্তির বীজের মতো ছড়ায়ে থাকিতে চাই পৃথিবীর পরে !
সকল সাম্রাজ্য রাজ্য সিংহাসন আমাদের মন ক্লান্ত করে,
আকাশের নক্ষত্রের তলে এসে তারপর আমরা দাঁড়াই !
দুই চোখ মেলে জেগে যেই তৃপ্তি পৃথিবীতে কেহ পায় নাই,
যেই শান্তি যেই সান্ত্বনা রয়ে গেছে মরণের ঘুমের ভিতরে,
তাহার আস্বাদ পেতে চলে আসি শান্ত এক আকাশের তরে !—
ধীর নক্ষত্রের তলে জেগে-জেগে আকাঙ্ক্ষা মিটাই ;
এই ভালো,—নক্ষত্রের স্থির আলো—পথিকের চোখের ধীরতা ;
পৃথিবীর কোলাহলে জাগিবার যতটুকু রয়েছে সময়—

তাপ নয়,—জ্বালা নয়,—তারার মতন আলো আর নিশ্চয়তা
আকাশের বুক থেকে চেয়ে নিয়ে আমাদের স্থির হতে হয় !
অসহিষ্ণু পৃথিবী কি কোনোদিন শুনিতেছে জীবনের কথা ?
উচ্ছৃঙ্খল পৃথিবী কি কোনোদিন ভুলে যায় মরণের ভয় !

রচনা : ‘রূপসী-বাংলা’র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

নক্ষত্র হারায়ে ফেলে

নক্ষত্র হারায়ে ফেলে কোনোদিন যদি তার হৃদয়ের জ্যোতি,
সিন্ধুর সুরের ছন্দ অন্ধকারে কোনোদিন যদি স্তব্ধ হয়,
উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা যদি এই পৃথিবীর বুকে লেগে রয়,
প্রাণেরে শাসন করে কোনোদিন যদি মৃত্যু—নিরাশা—নিয়তি,
যদি পথ বুজে যায়,—স্তব্ধ হয়ে থেমে যায় পথিকের গতি,
ক্লান্ত হয়ে ঘুমাবার অবসর খুঁজে ফেরে যদি এ হৃদয়,—
তা হলে প্রেমেরে সে কি হারায়েছে ?—জীবনের সাথে কথা কয়
যেই প্রেম,—যার দুটি হাত ধরে ভুলে যাই পৃথিবীর ক্ষতি ;
কোনো দূর আকাশের নক্ষত্রের বুক থেকে পৃথিবীতে তারে
আমরা ডাকিয়া আনি,—সে আসিবে কবে ?—তার অপেক্ষায় থেকে
মানুষ জাগিয়া রয় ;—মানুষের মতো আর কে জাগিতে পারে
প্রেমের প্রতীক্ষা করে,—হে প্রেম,—তোমারে ডেকে-ডেকে !
আমাদের সব আলো নিভে যায় আমাদের সব দীপাধারে,—
হৃদয়ের অন্ধকারে তারার মতন আলো লয়ে জ্বলিবে কে !

রচনা : ‘রূপসী-বাংলা’র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

তুমিও মৃত্যুর মতো

তুমিও মৃত্যুর মতো ওহে সিন্ধু অই দূর উত্তর মেরুর,—
জীবনের ঘণ্টা নিয়ে কেউ গিয়ে তোলে নাকো কোনো কোলাহল
তোমার বুকের পরে,—মৃত্যুর চুমোর মতো ঘুমন্ত শীতল
তোমার হৃদয় এই ;—আকাঙ্ক্ষা নাইকো তার,—কোনো এক দূর
অধীর করে না তারে ;—আমাদের অন্তরের অসহিষ্ণু সুর
শোনো না সে,—খোঁজে না সে অবসাদে অন্য-এক আকাশের তল !
তারার আলোর নীচে পড়ে আছে শান্ত হিম সমুদ্র ধবল !
জীবনের সব শ্রান্তি শেষ হলে মরণের মতন মধুর
যেই অবসর আসে তারার আলোর তলে আমাদের তরে
কোনো এক শীতরাতে পৃথিবীর অন্ধকার ঘুমের জগতে,—
তখন তোমার মতো হে সমুদ্র, আমরা ঘুমাই পরস্পরে !
তখন জানি না আর,—জানিতে চাই না আর পৃথিবীর পথে
কারা সব জেগে আছে !—জানিতে চাহি না কারা কোলাহল করে !
অথবা ঘুমায় কারা ক্লান্ত হয়ে তুষারের সমুদ্রে-পর্বতে !—

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

আকাশের বুক থেকে

আকাশের বুক থেকে নক্ষত্রেরে মুছে ফেলে তুমি যাও চলে
হে সময়,—সিন্ধুরেও তুমি এসে একদিন স্তব্ধ করে যাও ;
ডুবায়ে নিভায়ে যাও সবই তুমি,—তুমি এসে সকল ফুরাও ;
তুমি একা জেগে থাক হে সময়, সকলের জাগা শেষ হলে !

পথে-পথে পড়ে যায় পথিকেরা,—তবু তুমি পড় নাকো স্খলে !
সবারে ভুলায় মৃত্যু ;—হে সময়, তুমি নিজে মৃত্যুরে ভুলাও !

হে পথিক, মৃত্যুর সান্ত্বনা ভুলে আর কোন্ শান্তি তুমি চাও ?
কোন্ স্বস্তি জেগে থেকে ? বলো তুমি কোন্ স্বাদ একা জ্বলে-জ্বলে !

আমরা জেনেছি ক্লান্তি,—তাই ভালোবাসিয়াছি ঘুমের সময়,
আলো আর অন্ধকারে অসংযত সমুদ্রের মতো ঢেউ তুলে
অনেক আকাশ খুঁজে ছুটে-ছুটে তারপর দুই চোখ অবসন্ন হয় !
নক্ষত্র—পৃথিবী—সিন্ধু—ঘুমে তাই একে-একে পড়িতেছে ঢুলে,
তোমার পায়ের পথ প্রতীক্ষায় প্রেমিকের মতো জেগে রয় !
তোমার মতন সে-ও ভুলে গেছে ঘুম, গেছে মরণেরে ভুলে !—

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

আমি যদি কোনোদিন

আমি যদি কোনোদিন চলে যাই এই আলো অন্ধকার ছেড়ে,
চলে যাই যদি আমি অন্য এক অন্ধকার—আলোর আকাশে,
পায়ের অক্ষর যদি মুছে যায় যদি এই ধুলোমাটিঘাসে,
ওগো পথ,—একজন চলে যাবে তবে শুধু,—পাবে অনেকেরে
তোমার বুকের কাছে তবু তুমি ;—কখন যে ক্লান্তি এসে ঘেরে
আমাদের,—কখন জড়ায়ে পড়ি অবসাদে—সময়ের ফাঁসে !—
কখন পাতার মতো খসে যাই ক্ষয়ে যাই উত্তর বাতাসে !
কখন মাছির মতো আমাদের মৃত্যু এসে নিয়ে যায় কেড়ে

আমরা জানি না কিছু ;—একদিন ওগো পথ,—যাই যদি চলে,—
শীতরাতে স্থির নক্ষত্রের তলে আসে যদি ঘুমের সময়,
মনে হয় যদি ঐ আকাশের নক্ষত্রের সাথে শেষ হলে
মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয়—শান্তি তবে হয়,—

সেই কথা কে শুনিবে সেইদিন !—তখন যে ঘুমায়ে সকলে ;
আমার পায়ের পথ পৃথিবীর সে কি তবু কান পেতে রয় !

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

দূর পথে জন্ম নিয়ে

দূর পথে জন্ম নিয়ে রহিতাম যদি আমি—কাফিরের ছেলে !
সবুজ শাখার মত সেইখানে মানুষের হৃদয় সচ্ছল,
অন্তরের অবসরে শান্ত হয়ে আছে সেই আকাশের তল,—
বুক থেকে আমাদের আজিকার পৃথিবীর ফাঁস খুলে ফেলে
সেইখানে বসে যদি রহিতাম বালকের মতো অবহেলে !
সেইখানে কোনোদিন এই চূর্ণ পৃথিবীর কোনো কোলাহল
কেউ গিয়ে শোনে নাকো ;—শুদ্ধ হয়ে ধরণীর সমুদ্রের জল
যেই সাধ পূর্ণ করে অন্ধকারে আকাশের নক্ষত্রেরে পেলে

আমিও তেমন করে অসহিষ্ণু হৃদয়ের অন্বেষণ ভুলে,
সেই দূর আকাশের আলো আর আঁধারের সাথে এক হয়ে
রহিতাম সেইখানে জীবনেরে শিশুর মতন বুকে তুলে !
কাফির ছেলের মতো রহিতাম সে অনেক অবসর লয়ে ;
জন্মাতাম যদি আমি দূর পথে সকল শৃঙ্খল খুলে-খুলে,—
প্রভাতের সমুদ্রের শাদা ফেনা—সচ্ছল জলের মতো বয়ে !

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

লাল মানুষের মতো

লাল মানুষের মতো সমুদ্রের শঙ্খ আর ঝিনুক কুড়ায়ে
রব আমি অই সমুদ্রের পাশে তাহাদের অবকাশ লয়ে ;

সেইসব মানুষের ভিড়ে গিয়ে তাহাদের মতো আমি হয়ে
শরীর ভাসায়ে দেব তাহাদের মতো আমি সাগরের গায়ে !
সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো ছুটে গিয়ে লব আমি হৃদয়ে জড়ায়ে
সমুদ্রের শাদা ফেনা ;—আমি সেই সাগরের পারে যাব রয়ে
সব ভুলে ;—আমি এই এখানের পৃথিবীর বুক থেকে ক্ষয়ে
ঢেউয়ের মতন গিয়ে লুটায়ে পড়িব সেই পৃথিবীর পায়ে !

সেখানে অনেক আলো জেগে ওঠে পরিচ্ছন্ন ভোরের আকাশে,
হাতের শাঁখের মতো তাহাদের সেইখানে সিন্ধু গায় গান !
তারার আলোয় ভেসে সেইখানে পরিষ্কার রাত্রি চলে আসে,
নক্ষত্র সিন্ধুর মতো সেইখানে জেগে আছে মানুষের প্রাণ !
শাদা ফেনা শঙ্খ লয়ে ভুলে আছে,—হৃদয়ের সান্ত্বনা আশ্বাসে
বসে আছে,—বেঁচে আছে পরিচ্ছন্ন আকাশের রাত্রির সমান !

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

আবার দেখেছি স্বপ্ন

আবার দেখেছি স্বপ্ন কাল রাতে,—নক্ষত্রের আলোয় শীতল
আকাশ ছড়ায়ে ছিল শান্ত হয়ে,—মৃত্যুর মতন স্তব্ধ হয়ে ;
পৃথিবীর বুক থেকে কে আমারে নক্ষত্রের কাছে ডেকে লয়ে
চলে গেল ;—সেখানে আকাশে আর ছিল নাকো কোনো কোলাহল !

তারে আমি বলিলাম, 'আমিও তো খুঁজেছি এ আকাশের তল,—
সহিষ্ণু নদীর মতো ঘুম ভুলে সবচেয়ে ক্লান্ত পথ বয়ে,
পৃথিবীর অন্ধকার পথে ঘুরে মানুষের মতো ব্যথা সয়ে
খুঁজেছি তো' ;—চেয়ে আমি দেখিলাম চোখে তার ভরে আছে জল !

চোখ বুজে আমার এ করতল সে কেবল টেনে নিল বুকে,

আর কিছু বলিল না ;—বলিবার কি যে ছিল গেলাম তা ভুলে ;
নক্ষত্রের কোলে থেকে পৃথিবীর মানুষের মতন অসুখে
বুক তার ভরে আছে !—পৃথিবীর পার থেকে নিল তাই তুলে
সে আমারে ;—যেই বিরহের ব্যথা জেনেছি লাগিয়া আছে মুখে,—
তারই বোধ অনুভূতি জেগে আছে তার চোখে নক্ষত্রের কূলে— !

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

অনেক অপেক্ষা করে

অনেক অপেক্ষা করে বসে আছ তুমি এই পৃথিবীর পারে,
নক্ষত্রের কাল গুনে এক হয়ে আকাশের নক্ষত্রের সাথে
জেগে আছ, হে মানুষ,—তুমি এই পৃথিবীর অন্ধকার রাতে ;
কাহার পায়ের শব্দ শুনেছ কোথায় তুমি !—কবে তুমি কারে
দেখেছ তোমার মতো বসে আছে !—দেখিয়াছ কোন দেবতারে
যন্ত্রণার ক্রুশ লয়ে স্তব্ধ হয়ে চোখ বুজে একাকী—দাঁড়াতে
তোমার মতন এসে !—দেখেছ কি পরস্পরে হাত ধরে হাতে
যতদিন জেগে আছ পৃথিবীর নদী আর পর্বতের ধারে !

আকাশ হতেছে ক্লান্ত,—আকাশের সব তারা অবসন্ন হয় ;
আকাশের বুক থেকে পুরাতন দেবতারা পড়িতেছে খসে ;
মৃত্যু শুধু জেগে আছে,—মৃত্যুর মতন জেগে রয়েছে সময় ;
তাহাদের সাথে তুমি সহিষ্ণু মানুষ হয়ে রহিয়াছ বসে,—
বেদনার পরে শান্তি—হতাশার শেষে এক আশা জেগে রয়
যখন নিয়তি নিজে একদিন মরে যায় নক্ষত্রের দোষে— !

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

কোথায় পেয়েছ তুমি

কোথায় পেয়েছ তুমি হৃদয়ের স্থির আলো পৃথিবীর কবি !
নক্ষত্র ধরেছে হাত ধীর হয়ে আকাশের নক্ষত্রের সাথে
যেই শান্তি শৃঙ্খলার গান গেয়ে কোনো এক তুষারের রাতে,—
যখন নিয়তি-ব্যথা অন্ধকার পৃথিবীতে উঠেছে বিক্ষোভি ;
ঘুমায়ে পড়েছে প্রেম ক্লেশ পেয়ে মৃত্যুর শীতল চুমা লভি ;—
তখন তাদের মতো জেগে আছ হাত রেখে নক্ষত্রের হাতে !
সময় ফুরায়ে যায়,—আকাশের ছন্দ তবু পারে কি ফুরাতে !—
শুদ্ধ পুরোহিতদের মতো অই নক্ষত্রেরা যায় যারে স্তবি

পরিচ্ছন্ন আকাশের পারে এসে ! পৃথিবীর অন্ধকারে ঢেকে
আকাশের নক্ষত্রের তলে এসে হৃদয়ের অবসর নিয়ে
পূজা করে যারে মধ্য সিন্ধু তার পবিত্র জলের অভিষেকে !
পৃথিবীর মানুষের ভগ্ন ভাষা হে কবি, তোমার আলো দিয়ে
গহ্বরের নগ্নতারে পূর্ণ করে নিয়ে তার প্রার্থনা কি শেখে
পৃথিবীর ক্লান্ত মানুষের দল, হে কবি, তোমার কাছে গিয়ে !

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

পৃথিবীর সাথে চলে

পৃথিবীর সাথে চলে ক্লান্ত হয়ে খুঁজিনাকো তবু অবসর ;
কারণ,—দিনের পরে রাত আসে,—লয়ে আসে তার নিশ্চয়তা
জীবনের পরে মৃত্যু ;—যতদিন জেগে আছি নক্ষত্রের প্রথা
কে করিবে বিশৃঙ্খল ?—যতদিন সমুদ্রের শাসনের স্বর
জেগে আছে,—যতদিন দিনরাত হাত ধরে চলে পরস্পর

চোখ বুজে মেনে নিতে হবে এই পৃথিবীর তীক্ষ্ণতা-খর্বতা
ধীর মানুষের মতো ;—সারাদিন পথে চলে সকলের কথা
শুনে নিয়ে তারপর অন্ধকারে খুঁজে নেব আমাদের ঘর ;

ঘুমাবার অবসর এর আগে খুঁজিবে কে পৃথিবীর পথে !
যেই বীজ বুনে গেছি তার শস্য একবার নিতে হবে কেটে,
একবার সৃজনের নিয়মের অর্থ বুঝে নেব ভালোমতো,
তার শৃঙ্খলার সাথে হৃদয়েরে নিতে হবে ভালো করে এঁটে ;
জীবনের সাথে-সাথে ফিরে-ফিরে পৃথিবীর পথে হেঁটে-হেঁটে
ঢেউয়ের ফেনার মতো তারপর তৃপ্ত হয়ে ঘুমাব সৈকতে !

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

এ হৃদয় শুধু এক সুর

এ হৃদয় শুধু এক সুর জানে,—সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো শুধু এক গান
জানি আমি ;—ভুলিয়া গিয়াছি আমি পৃথিবীর—আকাশের আর সব ভাষা ;
চিনেছি তোমারে আমি সকলের মাঝখানে,—জেনেছি তোমার ভালোবাসা !
জীবনের কোলাহলে সবচেয়ে আগে গিয়ে তোমারেই করেছি আহ্বান !
দিন নিভে গেলে পরে রহিয়াছে অন্ধকার আকাশের বুকে যেই স্থান
স্থির নক্ষত্রের তরে,—সিন্ধুর ঢেউয়ের বুকে রয়েছে যে ফেনার পিপাসা,
মানুষের বেদনার গহ্বরের অন্ধকারে আলোর মতন যেই আশা
জেগে থাকে,—হলুদ পাতার বুকে লেগে থাকে যেই মিষ্ট মরণের ঘ্রাণ

কোনো এক শীতরাতে ;—আমার হৃদয়ে এসে তুমি জেগে রয়েছ তেমন !
পৃথিবীর শুদ্ধ পুরোহিতদের মতো অই প্রভাতের সমুদ্রের জল
অই দূর আকাশের বুক থেকে মুছে ফেলিতেছে সব আঁধার যেমন
তুমিও ফেলেছ ধুয়ে বুক থেকে সব ব্যথা—সব গ্লানি—কলঙ্ক সকল !

তুমি জেগে আছ বলে আমি এই পৃথিবীতে জাগিবার করি আয়োজন,
যখন ঘুমায়ে যাবে তোমার বুকের পরে মৃত্যু হয়ে ঘুমাব কেবল !—

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

বাহিরের ডাক ছেড়ে

বাহিরের ডাক ছেড়ে একদিন রাত্রির পাখির মতো ঘরের ভিতর
চলে গেছিলাম আমি,—সেইদিন ভালো লেগেছিল শান্তি সান্ত্বনার স্বাদ
তুমি কাছে ছিলে বলে ;—তাই মনে হয়েছিল মানুষের হৃদয়ের সাধ
যে ভালোবেসেছে তার ভালোবাসা লয়ে শুধু একখানা ঘর
বাঁধিয়া রাখিতে চায় ;—নির্ভর করিতে চায় হৃদয়ের প্রেমের উপর !
কারণ, তারার মতো স্থির প্রেম,—বালির মতো এই পৃথিবীর বাঁধ
খসে পড়ে চারিদিকে ;—প্রেম যে দিয়েছে তারে মনে-মনে করি আশীর্বাদ
আজও আমি,—ভালোবেসে মনে পড়ে কাটায়েছি রাত আর দিন পরস্পর

আমরা দুজনে ;—আজ তুমি চলে গেছ—ফলে গেছে যে এক ফসল,—
ঝরে গেছে ;—চারিদিকে ধোঁয়াধুলো—পৃথিবীর প্রতিহত মানুষের ভিড়,—
আমিও এসেছি আজ তাহাদের মাঝখানে—পূর্ণ করে তাহাদের স্থল ;
তবুও আমারে যদি ডেকে নাও পথ থেকে যদি প্রিয়া রব কি বধির !
সারারাত ঢেউ তুলে ক্লান্ত হয়ে নক্ষত্রেরে ডাকে অই সমুদ্রের জল,—
দূর আকাশের পর তোমার মতন প্রিয়া তবুও নক্ষত্র থাকে স্থির !

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

জীবনের যতদিন কেটে গেছে

জীবনের যতদিন কেটে গেছে অন্ধকারে একবার তাহাদের স্মৃতি
ভাসিয়া উঠিল মনে ;—তখন শীতের রাত, গাছের শাখার থেকে ঝরে

শিশির—হলুদ পাতা ;—মরণের গন্ধে এই পৃথিবীর নদী মাঠ ভরে,
হৃদয়ের মাঝখানে শূন্য এক গহ্বরের মতন বিকৃতি
জেগে থাকে ;—অন্ধকারে পড়ে থেকে একাকী শিশুর মত বুকে জাগে ভীতি !
আমার যে দিনরাত্রি ফুরায়েছে একবার তাহাদের কথা মনে পড়ে ;
প্রেম লয়ে যে এসেছে একদিন, তারপর চলে গেছে—আমি তার তরে
একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখি চারিদিকে,—আকাশের নক্ষত্রসমিতি

হারায়ে গিয়েছে কোথা ?—চেয়ে দেখি কোনো দিকে কেউ নাই, কিছু নাই আর !
তোমার পায়ের শব্দ কখন থামিয়া গেল চোখ বুজে একবার তাই
ভেবে দেখি,—চোখ মেলে জেগে দেখি আকাশের বুকে আরও জমেছে আঁধার !
নিঃসাড় মাঠের পর আড়ষ্ট নদীর পর কিছু নাই,—কেউ আর নাই !
মরণের হাতে তাই অবসন্ন হয়ে আমি হাত তুলে দিলাম আমার,
চেয়ে দেখি প্রেম তুমি পাশে এসে দাঁড়ায়েছ, মৃত্যু দহে হয়ে গেছে ছাই !

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

একদিন, মনে আছে

একদিন, মনে আছে সে এক বিস্তৃত রাতে জেগে থেকে বলিয়াছি আমি,
'কোন দূর নক্ষত্রের ফাঁস খুলে পৃথিবীর পারে নেমে এলে মহীয়সী,
আড়ষ্ট শীতের রাতে আকাশের কোল থেকে বলো কেন পড়িয়াছ খসি
পবিত্র তারার মতো আলো লয়ে মানুষের দারিদ্র্যের মাঝখানে নামি !
—এখানে ফুরায় সব,—শূন্য হয়,—স্তব্ধ হয় সব শক্তি,—যার সব থামি,
হৃদয় কাতর হয়ে তৃপ্তি চায় অন্য নিঃসহায় হৃদয়ের পাশে বসি,
সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো এইখানে ইচ্ছা শুধু একবার উঠিবে উচ্ছ্বসি,
তারপর, ভেঙে যাবে ;—প্রেম নয়,—কিন্তু মৃত্যু আমাদের সকলের স্বামী— !

তোমার নক্ষত্র ছেড়ে কেন তুমি আমাদের মাঝখানে এই পৃথিবীতে
চলে এলে ?—কোন্ স্থির নক্ষত্র যে কতদূরে তোমার আশায় জেগে রয় !
জানে সে কি নামিয়া এসেছ তুমি নষ্ট ক্ষেত্রে আড়ষ্ট মাঠের এই শীতে।'
'হে প্রেম, তোমারে খুঁজে অনেক নক্ষত্রে গিয়ে তারপর থামিতে যে হয়
তোমার বুকের পরে ;—যেইখানে জেগে আছ সেইখানে হয় যে জাগিতে,
যেইখানে ঘুমায়েছ সেইখানে ওগো প্রেম মৃত্যু খুঁজে লয় যে হৃদয় !'

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো

সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো পৃথিবীর দিন আর রাত্রি শুধু করে কোলাহল,
মাঝে-মাঝে শুধু এক অসম্ভব নিঃশব্দতা পৃথিবীর পথে জন্ম লয় !
কান পেতে শুনি যেন সেই কালে জীবনের ক্ষেতে-ক্ষেতে যেতেছে সময়
বীজ বুনে,—পৃথিবীর পথে-পথে ব্যস্ত হয়ে চলিতেছে তাহার লাঙল !
অনেক নক্ষত্র লয়ে সে সময় ভরপুর হয়ে থাকে আকাশের তল,—
মনে হয় কোনোদিকে কোনো ক্ষতি হয় নিকো,—কারু যেন হয় নাই ক্ষয়,—
ছড়ায়ে রয়েছে শুধু চারিদিকে আমাদের জীবনের অনেক বিষয় !
চারিদিকে খুঁজে পাওয়া যায় ঢের আমাদের হৃদয়ের ভরসার স্থল !—

কোনোদিন ঝরে না যা,—স্থির হয়ে পরিচ্ছন্ন আকাশের মতো টিকে থাকে,
প্রেম—আশা,—আমাদের তুলে দেই সে সময় একেবারে তাহাদের হাতে ;
সময় অধীর হয়ে চলে যায় ;—জানি,—তবু অন্তরের এই ধীরতাকে
যখন সে শ্রদ্ধা করে কোনো এক শান্ত দিনে,—হেমন্তের কোনো এক রাতে ;—
তখন সে রেখে যায় মুখোমুখি হে জীবন, ওগো প্রেম তোমাকে-আমাকে !
সময় না ফুরাবার আগে আর আমরা কি আমাদের পারিব ফুরাতে !

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

মৃত্যুরে বেসেছি ভালো

মৃত্যুরে বেসেছি ভালো সকলের আগে আমি,—মৃত্যুরে তবুও করে ভয় ;
কখন অনেক পথ ঘুরে এসে ক্লান্ত হয়ে তারপর আর একবার
আমাদের শীতল হাত খুঁজে তুমি—ভুল করে মরণের কাস্তের ধার
হৃদয়ে তুলিয়া লবে ;—জেগে আছি তাই আমি,—অন্তরের সকল বিষয়
ছড়ায়ে রেখেছি আজ ;—কখন আসিবে তুমি,—কোথায় পায়ের শব্দ হয়,—
অপেক্ষায় বসে আছি ;—যদিও লেগেছে ভালো মৃত্যু আর মৃত্যুর আঁধার !
ঘুমের সময় তবু সব শেষে,—তার আগে পৃথিবীতে জেগে প্রতীক্ষার
অনেক সময় থাকে,—অনেক আড়ষ্ট রাত তার আগে মাঠে পড়ে রয় !

তার আগে আকাশের কাছে ঢের প্রশ্ন থাকে,—নক্ষত্রের সাথে কত কথা
থেকে যায়,—পৃথিবীর পথে-পথে মিছেমিছি হাঁটিবার কত অবসর
পড়ে থাকে ;—তার আগে মৃত্যু নয়,—কেবল মৃত্যুর মতো এক নিঃশব্দতা
আপনার স্থল খুঁজে চেপে থাকে পথিকের হৃদয়ের পর ;
যতদিন জেগে আছি পৃথিবীতে তুমি তবু আসিলে না কেন বল তো তা,—
তুমি বলিলে না কিছু,—প্রশ্ন করি,—আকাশের নক্ষত্রও দিল না উত্তর !

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

সমুদ্রের পারে এই

সমুদ্রের পারে এই নক্ষত্রের তলে যদি আজ আমি শেষ হয়ে যাই,—
ঘুমাবার আগে তবু মনে রবে পৃথিবীতে কোথায় আমার ছিল স্থল ;
আমি এখানের নই,—এই তারা, আর এই বিদেশের সমুদ্রের জল,—
তোমাদের কাছে এসে এইখানে যদি আজ অন্তরের সকল হারাই ;
যাহাদের ভালোবেসে গেছি আমি একদিন পৃথিবীতে—সেই বোনভাই

জেগে আছে,—জড়ায়ে রয়েছে আজ অন্ধকারে অন্য এক নক্ষত্রের তল,
ঘুমায়েছে—তারার আলোয় আজ হয়ে গেছে তাহাদের হৃদয় শীতল
হয়তো বা ;—তারা যাহা জানিয়াছে—বুঝিয়াছে—জানিয়াছি আমিও তাহাই ;
আমি সেই বাংলার,—সেইখানে চোখ মেলে একদিন দেখিয়াছি ঘাস
উঠেছে সবুজ হয়ে,—হৃদয়ের শান্ত আকাঙ্ক্ষার মতো ঢুলে কাছে এসে
মাঠে-পথে ধুলোমাটি সেইখানে একদিন নিজেদের করেছে বিকাশ
আমার বুকের কাছে,—তাহাদের আরও ঢের কথা ছিল থেমে গিয়ে শেষে !
পরিচ্ছন্ন আলো লয়ে ভোরবেলা দেখা দিয়ে গেছে সেই দেশের আকাশ,—
আমি সেই বাংলার,—তাহার মাটির মতো ঘ্রাণ লয়ে ফলেছি যে দেশে— ।

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

যেদিন ফুরাব আমি

যেদিন ফুরাব আমি পৃথিবীতে,—ঘুম থেকে জেগে উঠে ঘুমাব আবার,—
তখন হয়তো সেই আকাশের বুক থেকে শেষ রোদ লয়নি বিদায়,—
চোখ মেলে দেখিব তা ;—আমার এ শরীরের চারিপাশে সবজির গান শোনা যায়
কান পেতে শুনিব তা ;—সেদিনও সবুজ দেহ,—তার 'পরে সবুজ পাতার
ছায়া এসে পড়িয়াছে হয়তো বা ;—সেইদিন কোনো এক শাখা এসে তার
হৃদয়ের সবটুকু সচ্ছলতা নুয়ে পড়ে একবার আমারে জানায়
হয়তো বা ;—ঘাসের উপরে শুয়ে সেইদিন জীবনের শেষ স্বাদ পায়
এ হৃদয়,—চোখ মেলে রুধিরের সচ্ছলতা বুঝিয়া নিতেছি শেষবার

সেইদিন ;—যতদূর দেখা যায় জেগে আছে বাংলার বিস্তৃত আকাশ,
দিনের সকল শেষ রৌদ্র লয়ে আমার চোখের দিকে রয়েছে তাকায়ে,—
চোখ মেলে দেখি যদি ;—যদি চোখ বুজে ফেলি তবু এই রহিবে আশ্বাস ;
বাংলার মাঠে শুয়ে ঘুমায়েছি,—তাহার দিনের আলো লাগিয়াছে গায়ে,

তাহার সবুজ পাতা শাখা রোদ পাখি এসে শেষ ঘুম গিয়েছে পাড়ায়ে,
ফুরায়ে গিয়েছি তার নক্ষত্রের তলে,—তার ঘাসে আমি হয়ে গেছি ঘাস— ।

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

পৃথিবীর যেই পারে থাকি

পৃথিবীর যেই পারে থাকি আমি এই কথা আমার তবুও মনে রবে :
সেই এক সমুদ্রের ধারে আমি তোমারে এসেছি ফেলে,—আমি এক-জনা
একদিন বিদেশের এই আকাশের তলে আমি ক্লান্ত হয়ে আর রহিব না ;
একদিন আমার সে আকাশের পরিচিত নক্ষত্রের তলে যেতে হবে !
সেখানে শীতল রাত্রি জেগে থেকে পরিষ্কার শিশিরের জলে ধুয়ে লবে
তখন আমারে ;—অনেক আকাশে ফিরে হৃদয়ে জাগিয়া গেছে যেই উত্তেজনা
শান্ত করে দেবে সব ;—(দেশের সবুজ মাঠ হয়তো তবুও সেই ব্যথা জানিত না,
বালকের মতো আমি পথ থেকে স্খলে গিয়ে সেই ব্যথা শিখেছি যে কবে !—
জানিব না ;)—আলো আর অন্ধকারে আশ্বাসে রয়েছে ভরে তবুও হৃদয়,
অনেক ভিড়ের থেকে ফিরে এসে পৃথিবীর পথ থেকে ছুটি লয়ে আমি
ফুরায়ে ফেলিব এক শেষ সাধ,—করে লব এক শেষ আকাঙ্ক্ষার ক্ষয় ;
শীতের নদীর মতো এক শেষ ঢেউ তুলে যাব আমি থামি
এই বাংলার পথে,—ছড়ায়ে ফেলিব আমি অন্তরের সকল বিষয়
এইখানে,—যখন সকল পথ দেশের মাঠের পথে এসে শেষ হয়— ।

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

যদি আমি গেয়ে থাকি

যদি আমি গেয়ে থাকি বাংলার আবিষ্কার আকাশের নক্ষত্রের গান,—
সবুজ শাখার গন্ধ—তাহার পাতার ছায়া—এই তার মাঠের আস্বাদ,

তাহার নদীর জল—ফসল শিশিরে ভেজা—কাস্তের মতো তার চাঁদ
হেমন্তের হাত ধরে সন্ধ্যার অন্ধকারে আসিতেছে যখন অঘ্রান
মাঠে-মাঠে,—যখন আঘাত পেয়ে হলুদ পাতার সাথে খসে পড়ে ধান
এক ক্ষেতে,—তারপর অন্য-এক ক্ষেতে পেঁচা উড়িতেছে যখন অবাধ,
আমাদের আকাশের এইসব নিঃসঙ্গতা—নিঃশব্দতা—আঘ্রাণের সাধ
সব্‌জির পরিপূর্ণ ভাঁড়ারের মতো আজ ভরে ফেলে যদি এই প্রাণ,—

তাহলে লেগেছে ভালো এই মাঠ, এই নদী—এই নিষ্ক্রিয়তার কথা
সবচেয়ে লাগিয়াছে ভালো আজ ;—আজ ঐ পরিশুদ্ধ আকাশের দিকে
চেয়ে আছি,—পবিত্র শিশির এই—নক্ষত্রের এই বিশুদ্ধতা
হৃদয়ের শান্তি—স্বপ্ন—অবসর, যাহা শুধু বেঁচে থাকে—যাহা থাকে টিকে
তাহাদের লয়ে আমি শান্ত হয়ে জেগে আছি ; এই ভোর-পথের স্তব্ধতা
ইহাদের কাছ থেকে কোনো এক নিশ্চয়তা আজ আমি লইতেছি শিখে— ।

রচনা : ‘রূপসী-বাংলা’র কাল (?)
বিভাব । জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

ডুবারির ছেলেগুলো শঙ্খ লয়ে

ডুবারির ছেলেগুলো শঙ্খ লয়ে সমুদ্রের ধারে আজ করিতেছে খেলা
যেইখানে,—একদিন—কত আগে—আমাদের পৃথিবীর স্বচ্ছ এক ভোরে
এই হৃষ্ট শিশুদের মতো এই সাগরের পাশে এসে কোলাহল করে
পৃথিবীর প্রথম মানুষ এক নীল সমুদ্রের সাথে কাটায়েছে বেলা ;
প্রথম আকাশ তারে দেখিয়াছে,—হৃদয়ের কাছে তারে পেয়েছে একেলা
প্রথম উষার রোদ,—যখন সে এসেছিল প্রথম বিস্তৃত পথ ধরে
আমাদের পৃথিবীর,—সহজ ফেনার মতো যখন সে প্রথম সাগরে
উথলিয়া উঠেছিল,—হৃদয় সেদিন তার জেনেছিল এক অবহেলা !

অনায়াস ইচ্ছা কোনো বুকে তার সেইদিন স্ফীত হয়ে উঠেছিল জেগে,

জাগিয়া রহিয়াছিল সেদিন সে এই তৃণতরুদের সচ্ছলতা লয়ে,
আমাদের আজিকার পৃথিবীর কোনো স্রোত—প্রতিরোধ যায় নাই লেগে
সেইদিন বুকে তার ;—যেই আলো আর যেই অন্ধকার পড়িতেছে ক্ষয়ে
আকাশের বুক থেকে—তাহাদের মতো হয়ে—তাহাদের সাথে এক হয়ে
সেদিন সে জেগেছিল সবুজ পৃথিবী—নীল আকাশের মতন আবেগে— ।

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

সে এক বালক আছে

সে এক বালক আছে কুড়ায় ঝিনুক নুড়ি একাকী সিন্ধুর পারে বসে
হাওয়াই দ্বীপের পারে, কিংবা ফিলিপাইন দ্বীপে,—কিংবা দূরে আরও !
সেখানে আকাশ নীল,—আকাশের চেয়ে সেই সমুদ্রের নীল আরও গাঢ় !
আকাশের বুকে আজও সেইখানে লেগে আছে পৃথিবীর প্রথম আলো সে !
সেই বালকের বুক ভরে আছে মানুষের হৃদয়ের প্রথম সাহসে,
প্রথম সে মানুষের আকাঙ্ক্ষা আহ্লাদ আজও বুকে জেগে রহিয়াছে তারও !
তেমন সমুদ্র এক রহিত আমার যদি,—দ্বীপ এক রহিত আমারও
সাগরের পারে যদি ;—আজিকার জীবনের ফাঁস যদি পড়ে যেত ধ্বসে

আমিও বালক হয়ে তবে সেই দূর দ্বীপে ঢের দূর সমুদ্রের পারে
এখানের পৃথিবীর বুক থেকে স্খলে গিয়ে শিখিতাম বিস্ময়ের ভয় !
যখন দিনের আলো আকাশের বুক সাঁতারিয়া মিশে যায় অন্ধকারে,
অথবা নক্ষত্র সব সরে গেলে যখন হতেছে অন্য আলোর উদয়,
আবিষ্কৃত আকাশের পার ছেড়ে সন্তর্পণে চোখ মেলে দেখিতাম তারে
সাগরের পারে গিয়ে দূর দ্বীপে একবার পথ ভুলে যা দেখিতে হয় !

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

শুধু এক সত্য আছে পৃথিবীতে

শুধু এক সত্য আছে পৃথিবীতে,—এক আলো,—রহিয়াছে সে এক সুন্দর
আকাশে-বাতাসে-জলে-অন্ধকারে আমাদের সব আলোড়ন আয়োজনে
দেখা দেয় ;—তাহার ছায়ার মতো আমরা চলিতে চাই তাহার পিছনে !
জল-ধনুকের মতো আকাশের উচ্ছৃঙ্খল মেঘ আর বিদ্যুতের পর
আমরা দেখেছি তারে ;—যখন হতাশা সব আমাদের বুকের ভিতর
পুড়ে গেছে—অপেক্ষায় চোখ মেলে—পলাতক বালকের মতো সন্তর্পণে
আমরা দেখেছি তারে ;—অধীর বিস্ময় এক জাগিয়াছে আমাদের মনে
তারে দেখে ;—পশ্চিম মেঘের দিকে ছুটে যায় বিকালের আলোক যেমন
দিন ক্লান্ত হয়ে গেলে,—যেমন নক্ষত্র সব খুঁজে লয় আকাশের তল
পৃথিবীতে রাত্রি এলে,—অশান্ত আকাঙ্ক্ষা লয়ে আমরা তেমন
তাহারে খুঁজিয়া পাই ;—তখন সরিয়া যায় পৃথিবীর সমুদ্রের জল
স্তব্ধ হয়ে ;—ভয় পেয়ে চলে যায় প্রতিহত অজগর সাপের মতন
পৃথিবীর সব অবসাদ—সাধ,—হৃদয়ের বিহ্বলতা—গহ্বর সকল !

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

অনেক শতাব্দী ঝরে

অনেক শতাব্দী ঝরে চলে গেছে,—তবু সেই পৃথিবীর পুরানো সে পথ
রয়ে গেছে ;—মাথার উপর আজও রয়ে গেছে সেদিনের বিস্তৃত আকাশ !
যদিও অনেক তৃণ ঝরে গেছে,—তবুও মাটির থেকে যে সবুজ ঘাস
ফলে ওঠে তার গন্ধে স্থির হয়ে জেগে আছে আজও সেই পুরানো জগৎ !
খুঁজেছি নতুন আলো আমরা আরেক বার,—মনীষার নব-নব মত
খুঁজে দেখিয়াছি সব ;—তবু যেন মনে হয় সেই শস্য হয়ে গেছে চাষ
তারপর ঝরে গেছে,—ক্ষেতে-মাঠে হইতেছে যেন তার আবার বিকাশ !

তাহার অঙ্কুর লয়ে কাজ করিতেছে এই পৃথিবীর সমুদ্র-পর্বত— ।

সময়ের হাতে তুমি হাত ধরে জেগে আছ পৃথিবীর ওগো পুরাতন,
ভবিষ্যৎ-বর্তমান স্খলে গিয়ে ভরে ফেলিতেছে সেই অতীতের স্থল ;
যদিও মশাল লয়ে আঁধারের আবিষ্কারে চলিতেছে মানুষের মন,
যদিও নতুন দিনে জন্মিয়াছি,—কাঁধে করে আনিয়াছি নতুন লাঙল,
অব্যর্থ অতীত তবু হৃদয়ের পিণ্ডে আজও তুলিতেছে সেই শিহরণ,—
তার ক্রীতদাস হয়ে শুধু আমাদের অন্তরের রক্ত আজও হয়ে যায় জল !

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

আলো আর আঁধারের পানে

আলো আর আঁধারের পানে চেয়ে যদিও গাহিতে পারি সে অনেক গান,
যদিও বীণার তারে বেঁধে নিতে পারি সুর উচ্ছৃঙ্খল মনের মতন,
আজ তবু এক সুর জানি শুধু,—এক গান জানে শুধু মন ;
ঢেউয়ের পিছনে ঢেউ ফেনা তুলে ফুলে উঠে করে যে আহ্বান,
আগুন যে ক্ষুধা লয়ে বুকে তুলে নিতে চায় একবার স্ফুলিঙ্গের ঘ্রাণ,
তোমার পিছনে চলে তোমারে বুকের 'পরে তুলে নিতে চেয়েছি তেমন !
তুমি স্খলে চলে গেছ,—আজ তাই পৃথিবীতে চলিবার করি আয়োজন ;
এক পথ চিনি আজ,—এক সত্য—এক আলো—ধরে আছি সে এক নিশান
অনেক পতাকা ছেড়ে ;—অনেক আশ্বাস শান্তি সান্ত্বনার পথ থেকে ফিরে
ড্রাগনের দাঁত দিয়ে বীজ বুনে চলিতেছি আজ এই পৃথিবীর 'পর,
চলিতেছি পথ খুঁজে সে অনেক বেদনার—সে অনেক চিলদের ভিড়ে !
তোমার আমার মাঝে অনেক পাহাড় আছে,—রহিয়াছে অনেক সাগর ;
বাহির হবে না তুমি যতদিন তোমারে খুঁজিয়া আমি রহিব বাহিরে,
যদিও কবরে তুমি পড়ে থাক,—যদিও নক্ষত্রে তুমি বেঁধে থাক ঘর !

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

সমুদ্র

সবুজ মাটির পথে বসে আমি দেখিতে চেয়েছি জল,—জলের নিঃশ্বাস
হৃদয়ের রক্তে আমি মিশাতে চেয়েছি এই মাটির ধুলোর পথে বসে ;
অনেক আকাশ দেখে যেই জল জেগে আছে আকাশের মতন সাহসে,
তাহার হৃদয় থেকে যেই জল খুলে ফেলে গেছে এই পৃথিবীর ফাঁস,
পূর্বের সমুদ্র থেকে যেই জল চলিতেছে পশ্চিমের সমুদ্রের পানে,
উত্তর সিন্ধুর থেকে যেই জল ছুটিতেছে দক্ষিণের সিন্ধুর আহ্বানে,
পৃথিবীর সব শক্তি শেষ হলে তবুও হৃদয়ে যার রহিবে ক্ষমতা,
নক্ষত্রে উজ্জ্বল হয়ে যেইজন অন্ধকারে নক্ষত্রের সাথে কয় কথা,
আলো আর অন্ধকারে আবিষ্কৃত দ্বীপ—অন্তরীপ ভরে গেছে যার গানে !

যেই দ্বীপ দেখি নাই,—যেই অন্তরীপে গিয়ে কোনোদিন পৃথিবীর কেউ
অন্ধ বাতাসের খেদ শোনে নাই সমুদ্রের পারে ভিজা পাহাড়ের পরে,
পৃথিবীর ছায়া গিয়ে পড়ে নাই যেইখানে অন্ধকার ছায়ার গহ্বরে,
সিন্ধুর সাপের মতো ফুলে উঠে সেইখানে তুমি গিয়ে তুলিয়াছ ঢেউ !
বৈকালের অন্ধকারে তীক্ষ্ণ হয়ে ফিরিয়াছ তুমি ভিজে বাতাসের সাথে !
মানুষের মতো কাঁদে একা-একা যে পাহাড় বৈকালের হাওয়ার আঘাতে
তারে তুমি কাঁদায়েছ ;—তাহার বুকের পরে ফোঁপায়েছে শিশুর মতন
তোমার বুকের ঢেউ ;—একা-একা মানুষের মতো সেই সমুদ্রের মন
নিঃশ্বাসের মতো ভেসে ফিরিয়াছে পাহাড়ের পাশে-পাশে অন্ধকার রাতে—

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

সেখানে জন্মেছে ব্যথা

সেখানে জন্মেছে ব্যথা,—বুঝেছ তা,—সেইখানে তবু এক জন্মেছে বিস্ময় !
সেই এক দূর দিকে—অন্ধকারে—পৃথিবীর মানুষের অনাহত পথে
এইসব আকাশের পিছে আরও,—অন্য সব নক্ষত্রের সে এক জগতে
বিস্ময় লয়েছে জন্ম সেইখানে ;—সেইখানে জন্মিয়াছে বিস্ময়ের ভয় !
কোনো গ্রীক নাবিকেরা অসময়ে অন্ধকারে সমুদ্রের পথে পথ ভুলে
সেইখানে গিয়েছে কি ? চক্ষুর কোটর থেকে মানুষের মতো চোখ তুলে
অদ্ভুত সমুদ্র এক দেখিয়াছে হয়তো বা পাতালের গহ্বরের পারে !
অবিশ্বাসে চোখ তুলে সেই সব যুবকেরা হয়তো বা দেখেছে তোমারে !
তাহাদের মৃতদেহ ভরে গেছে তারপর সমুদ্রের ফুলে—ফেনাফুলে— !

অথবা সিন্ধুর পথে স্বাদ পেয়ে তাহারাও সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন
ফিরিয়াছে ;—গ্রীক তারা,—সমুদ্রের মতো ঢের ক্ষুধা—ঢের পিপাসার ধার
তাহাদের বুকে ছিল ;—সব নক্ষত্রের শেষে করে গেছে তারা আবিষ্কার
নতুন নক্ষত্র আরও ;—পূর্বের সমুদ্র এসে সেইখানে করে আলোড়ন
পশ্চিম সিন্ধুর বুকে,—দক্ষিণ সমুদ্র গিয়ে সেইখানে উত্তর সাগরে
মানুষের মতো ব্যথা-আহ্লাদের আলোড়ন করে,
সেখানে গিয়েছে তারা ;—সমুদ্রের যেই জল পৃথিবীর ঘ্রাণ নিতে আসে,
নিঃশ্বাস মিশায় গিয়ে যেই জল আকাশের নক্ষত্রের শীতল নিঃশ্বাসে,
সেখানে গিয়েছে তারা,—তাহাদের সাথে সিন্ধু ভেসে গেছে পশ্চিমে-উত্তরে !—

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

ডেকে নিয়ে গিয়েছিল

ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তাহাদের সূর্যের প্রবল আলো,—বিস্তৃত আকাশ

ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তাহাদের এক পথ হতে দূর অন্য এক পথে
শীতের প্রথম হাওয়া যখন এসেছে ভেসে,—কাঁদিয়াছে প্রথম পর্বতে
যখন শীতের হাওয়া,—যখন শিশির এসে করে গেছে গ্রাস
পাহাড়ের দেবদারু,—কুয়াশার খোঁচা খেয়ে যখন বুজেছে ভিজে শাখা,
সন্ধ্যার পাখির মতো যখন গুটায়ে গেছে অন্ধকার পর্বতের পাখা,—
সিন্ধুর পাখির মতো তখন শুনেছে তারা তাহাদের সমুদ্রের কথা !
রক্তের মতন তাপ যেই ঢেউয়ে,—যেই সমুদ্রের ঢেউয়ে রক্তের তীক্ষ্ণতা,
ঘূর্ণির মতো করে ঘুরায়েছে তারা সেই সমুদ্রের তরঙ্গের চাকা— !

টাইটানের মতো তারা,—প্রথম করেছে এসে সাগরের ফেনার আস্বাদ !
উষ্ণ সমুদ্রের ডাকে দল বেঁধে চলে গেছে,—প্রথম ছাড়িয়া গেছে স্থল !
আহত পাখির মতো ব্যথা পেয়ে কেঁদে ওঠে যেইখানে সমুদ্রের জল
ভাঙা পাহাড়ের বুকে ; যেইখানে ধ্বসে পড়ে পাহাড়ের পাথরের বাঁধ,—
নষ্ট হয়ে পড়ে যায় পুরাতন দেবতার উপেক্ষিত আসনের মতো ;
সমুদ্রের বুকে এসে যেইখানে পৃথিবীর সমুদ্রেরা হতেছে আহত ;
বাতাসের বুকে এসে যেইখানে ঝড় তোলে পৃথিবীর সকল বাতাস ;
যেখানে সমুদ্র এসে আকাশেরে গ্রাস করে ;—যেখানে আকাশ করে গ্রাস
সমুদ্রেরে ;—তবুও সমুদ্র তবু আকাশ সিন্ধুর পিছে জেগে ওঠে যত !

রচনা : ‘রূপসী-বাংলা’র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

অদ্ভুত সিন্ধুর ঘ্রাণ

অদ্ভুত সিন্ধুর ঘ্রাণ বুকে লয়ে নামিয়া গিয়েছে তারা আশ্চর্য সাগরে,
উপদ্বীপ হতে দ্বীপে—এক দ্বীপ ছেড়ে দিয়ে অন্য এক দূর উপদ্বীপে !—
যেখানে অনেক রৌদ্রে ভরিয়া গিয়েছে দ্বীপ,—যেখানে বিস্তৃত অন্তরীপে
সমুদ্র ভরিয়া গেছে ;—যেইখানে সিন্ধু শুধু সমুদ্রের বুকে এসে পড়ে,

দৈত্যের হাতের মতো হাত তার তুলে দেয় অন্য এক দানবের হাতে ;
যেখানে প্রবল সিন্ধু পরিচ্ছন্ন ভোরবেলা কিংবা এক অন্ধকার রাতে ;
জীবন্ত সিন্ধুর ঢেউ মৃত্যুর বিছানা পাতে যেইখানে সমুদ্রের জলে ;
নেক্‌ড়ের মতো কাঁদে যেইখানে রুষ্ট হাওয়া ব্যথা পেয়ে নক্ষত্রের তলে ;
সমুদ্র কেবল চলে,—একদিন চলেছিল তারা সেই সমুদ্রের সাথে— ।

বিপদ জড়াতে তারা গিয়েছিল,—বিপদের বুকে যেই রয়েছে বিস্ময়
তাহার আস্বাদ পেতে খুঁজেছিল দূর মধ্য সমুদ্রের জলের গহ্বর !
যেই নক্ষত্রের খোঁজে সমুদ্র ভাঙিয়া পড়ে অন্য এক সমুদ্রের ’পর ;
আকাশের সব নক্ষত্রের শেষে তবু যেই নক্ষত্রের স্থল পড়ে রয় ;
সবচেয়ে দূর নক্ষত্রের চোখে যেই এক স্বপ্ন ভেসে আসে
আরও দূর নক্ষত্রের ;—সব আকাশের শেষে কোনো এক পশ্চিম আকাশে
যে নক্ষত্র জেগে আছে ;—সব সমুদ্রের শেষে কোনো এক পশ্চিম সাগরে
যেখানে দিনের আলো নিভে যায় ;—যেখানে সন্ধ্যায় নক্ষত্র স্নান করে
পূর্ব সমুদ্রের মতো তারা ভেসে যেতে চেয়েছিল সেই দূর পশ্চিমের সমুদ্রের পাশে—

রচনা : ‘রূপসী-বাংলা’র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

টাইটানের মতো তারা

টাইটানের মতো তারা ;—টাইটান্ মায়ের মতো হে তুমি সাগর,
প্রথম সে পৃথিবীর প্রথম সে আকাশের নক্ষত্রের মাঝখানে এসে
সেইদিন দাঁড়ায়েছ ;—টাইটান্ মায়ের মতো টাইটান সন্তান ভালোবেসে
বিস্তৃত ফেনার জটা এলায়েছ চরে-চরে তাহাদের শরীরের ’পর !
গ্রীসের পাহাড় সব,—কালো কুয়াশায় ভিজা পর্বতের দেওদার শাখা—
কাঁপিয়া উঠেছে তাই ;—পিছনে রয়েছে পড়ে তাহাদের এথেন্স-ইথাকা !
পুরোনো বনের গন্ধ—পুরোনো সিন্ধুর গন্ধ-ভরা এক মৃত পৃথিবীতে
তোমার জরায়ু থেকে হে সমুদ্র, সেই সব সন্তানের জন্ম তুমি দিতে !

সন্ধ্যার পাখিরে তুমি দিয়েছিলে হে সমুদ্র, সিন্ধুর পাখির মতো পাখা— !

শীতল সমুদ্র ছেড়ে, পাহাড়ের শীত হাওয়া পিছে ফেলে রেখে
এলায়ে দিছিল ডানা তাই তারা আরও গাঢ় সমুদ্রের দিকে !—
যেখানে সূর্যের আলো স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে সমুদ্রের ফেনার স্ফটিকে,
যেখানে মেঘের ফেনা সমুদ্রের মতো নীল আকাশেরে রাখিতেছে ঢেকে,
আফ্রিকার কাছাকাছি—হয়তো বা সমতল এশিয়ার পারাপারে এসে
দুরন্ত সাগরে দূরে সমুদ্র-চিলের মতো সেদিন গেছিল তারা ভেসে !
'লেস্‌বিয়ান্‌ প্রোমোন্টরি' পিছে ফেলে,—পিছনের হতাশার—কান্নার স্বর
ভুলে গিয়ে,—অন্য এক সমুদ্রের কুহকের বুকে তারা করেছে নির্ভর
সেইদিন ;—সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢুকে কৌতূহলে নামিয়াছে পাতালের দেশে— !

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

চোখের জলের মতো

চোখের জলের মতো যেখানে সমুদ্র ডাকে অন্ধকার গহ্বরের তলে !
সিন্ধুর ঢেউয়ের শ্বাস সেইখানে মৃতদের নিঃশ্বাসের মতো মনে হয় !
সেখানে সময় নাই,—ফুরায়েছে সেইখানে পৃথিবীর পথের সময় !
এক সুড়ঙ্গের জল মিশিয়া যেতেছে শুধু অন্য এক সুড়ঙ্গের জলে,
বাতাস অন্ধের মতো ফিরে যায় গহ্বরের থেকে আরও দূরের গহ্বরে,
অসুস্থ আগুন শুধু নিভে-নিভে জ্বলে ওঠে যেইখানে গন্ধকের 'পরে
মৃতের ইচ্ছার মতো ;—সেইখানে,—পৃথিবীর সব মৃত আকাঙ্ক্ষার দেশে
পৃথিবীর সিন্ধু সব পথ ভুলে সেইখানে—পাতালে সমুদ্রে গিয়ে মেশে ;
সেই অন্ধকারে তারা নেমেছিল একদিন হাতে হাত বেঁধে পরস্পরে— ।

সেখানে গোপন ব্যথা গুমরিয়া ফিরে যায়,—তবুও পিপাসা জন্ম লয়

অদ্ভুত জলের পারে ;—হৃদয়ের সাধ সব সেইখানে রাত্রি জেগে থাকে,—
সান্ত্বনা আসে না তবু ;—নরকের প্রহরীরা ফেরে শুধু গহ্বরের ফাঁকে !—
পৃথিবীতে যেই ধ্বনি বেজে ওঠে সেইখানে শুধু তার প্রতিধ্বনি হয় ;
অসংখ্য আকাঙ্ক্ষা তবু সেইখানে বিষের লতার মতো আজও বেঁচে আছে
তাদের বুকের রক্তে ;—অদ্ভুত জলের কাছে—অন্ধকার গহ্বরের কাছে
হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার সকল অঙ্গার—সব পিপাসার বিনষ্ট ফসল
অস্পষ্ট সিন্ধুর জলে সেইখানে একবার খুঁজিতেছে আশ্বাসের স্থল !
ঢেউয়ের ছায়ার মতো সেখানে জলের ’পরে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে— ।

রচনা : ‘রূপসী-বাংলা’র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

সেই দূর পাতালের

সেই দূর পাতালের সাগরের সুরে এই পৃথিবীর সমুদ্রের বীণা
যেইখানে মিশে যায়,—পথ খুঁজে সেইখানে গিয়েছিল তারা একবার !
তাদের হৃদির রক্তে মিশে গিয়েছিল সব সমুদ্রের জোয়ারের ধার ;
নরকের অন্ধকারে ব্যথা পেয়ে সেখানে বসেছে ‘প্রসারপিনা’—
সবুজ শাখার মতো,—গহ্বরের অন্ধকারে পৃথিবীর নিঃশ্বাসের মতো
জেগে আছে ;—বধির নরক তার অন্ধ চোখ দিয়ে তারে করেছে আহত !
সেসব জেনেছে তারা,—নরকের রাত্রে এসে ;—উপরের পৃথিবীর পানে
চোখ তুলে তাই তারা—পাতালের সিন্ধু ছেড়ে ফিরে গেছে সূর্যের আহ্বানে !
সিন্ধুর সাপের মতো ছুটে গেছে সমুদ্র সাপের মতো ছুটে গেছে যত— !

টাইটান্ মায়ের মতো জেগে তুমি হে সমুদ্র,—প্রথম টাইটান্ !
উত্তর আকাশে তুমি বহে নিয়ে চলে যাও দক্ষিণের বায়ুর আহ্লাদ,
পূর্বের বাতাসে তুমি মিলায়ে দিতেছ গিয়ে পশ্চিমের বাতাসের স্বাদ !
সিন্ধুর জলের গন্ধে মিশায়ে নিতেছ তুমি আকাশের নক্ষত্রের ঘ্রাণ !

বীজের রক্তের মতো শক্তি লয়ে ঝরে পড়িতেছ তুমি পৃথিবীর পথে !
সিন্ধুর বাতাস লয়ে জল-ঈগলের মতো সমুদ্রের পারের পর্বতে
তীক্ষ্ণ হয়ে উঠিতেছ,—তীরের মতন ফলে উঠিতেছ আকাশে-আকাশে !
পৃথিবীর পালকের পাখিদের হৃদয় ভরিয়া ওঠে ত্রাসে,—
সমুদ্রের ঢেউ-পাখা বেজে ওঠে যুদ্ধের রাতের নহবতে— !

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

টাইটান্-মায়ের মতো

টাইটান্-মায়ের মতো সিন্ধু তুমি,—সমুদ্রের গর্ভ হতে অব্যর্থ সন্তান
জন্মিয়াছি ;—পৃথিবীর সকল সমুদ্র-উপসাগরের জলের নিঃশ্বাসে
সিন্ধুর হাওয়ার মতো আমার নিঃশ্বাস গিয়ে ভাসে !
সিন্ধুর শৈলের মতো সমুদ্রের পারে আমি বাছিয়াছি জীবনের স্থান !
সেখানে ভরিবে মাথা রাত্রিদিন সমুদ্রের তরঙ্গের অসংখ্য সংগীতে !
গীতের দেবতা হয়ে যে গান গাহিছে সিন্ধু—সময়ের বুকে ছন্দ দিতে,
সিন্ধুর বুকের পরে গানের দেবতা হয়ে যেখানে নক্ষত্র গায় গান,—
পৃথিবীর সেই সিন্ধু আর সেই আকাশের নক্ষত্রের ছন্দের আহ্বান
স্ফুলিঙ্গের মতো রক্তে জ্বলে-জ্বলে কোনোদিন পারিবে কি আঁধারে নিভিতে !

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

সন্ধ্যার প্রথম তারা

সন্ধ্যার প্রথম তারা চিনিয়াছে তারে,—
পশ্চিমের সমুদ্রের পারে
সেই এক দেশ আছে ;

যখন দিনের শেষ আলো এসে পড়ে
এক সমুদ্রের বুকে,—তারপর,—আর এক সাগরে

পশ্চিমের আকাশের তলে
যখন একটি তারা—প্রথম এসেছে তার স্থলে ;
সেই এক দেশ ওঠে জেগে
সকল মেঘের শেষে পশ্চিমের মেঘে !

সূর্যের অস্তের রঙে ঘেরা,
আকাশের সবচেয়ে দূর নক্ষত্রেরা
দেখিয়াছে তারে ;
তখন দিনের আলো শাদা হরিণের মত গহ্বরের আঁধারের পারে—
(প্রথম আঁধারে)
মিশিতেছে ;
পৃথিবীর সব হাত তখন সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়,
পৃথিবীর সকল হৃদয়
তখন হয়েছে শান্ত ;—
দূর সমুদ্রের ঢেউ নিজ মনে করে আলোড়ন
মাছিদের গানের মতন !

সেই সুর ভেসে ওঠে তখন আকাশে,
হৃদয়ে তখন ঘুম আসে,
হৃদয়ে তখন স্বপ্ন আসে ;

মনে হয়,—
পশ্চিম সিন্ধুর পারে সেই এক দেশ জেগে রয় ;—
পৃথিবীর সাথে কবে জন্মেছিল
নক্ষত্রের মতো হয়ে নক্ষত্রের সাথে
জন্মিয়াছে ;
সারাদিন কোলাহল করে সিন্ধু—তারপর—চেয়েছে ঘুমাতে
সেইখানে ;

অবসন্ন হয়ে গেছে যাহাদের মন
পৃথিবীর দিকে-দিকে সিন্ধুর মতন
ধ্বনি তুলে ;—
যাহারা সন্তান হয়ে এসেছিল একদিন
(পৃথিবীর সমুদ্রের কূলে) ;
ভালোবেসে গেছে যারা,—যাহাদের জন্মেছে সন্তান ;
এই পৃথিবীর মাটি—সমুদ্রের ঘ্রাণ
যাহারা পেয়েছে সব ;—শরীরের স্বাদ
যাহারা বুঝেছে সব ;—পৃথিবীর বেদনা আহ্লাদ
যাহারা জেনেছে সব ;

যাহারা তাদের আয়ু ফুরায়েছে ধীরে
ক্রমে-ক্রমে ক্লান্ত করে গেছে যারা এই পৃথিবীরে ;
সুস্থির বাতির মতো হয়ে
সব তেল শেষ করে উজ্জ্বল আলোর স্বাদ লয়ে
যাহারা বুজিয়া গেছে ;—পরিচ্ছন্ন জীবনের যশ
যাহারা পেয়েছে সব ;—মানুষের সকল বয়স
তৃপ্ত করে গেছে যারা ;—তাই যাহাদের বুকে ঘুমের মতন
সহজে এসেছে মৃত্যু ;—
সকল স্বাদের পরে তাহাদের মন
পশ্চিম মেঘের পারে অই দূর সমুদ্রের ’পর
খুঁজিয়াছে অবসন্ন মানুষের মতো অবসর ;—

তাহাদের মতো এই পৃথিবীতে জেগে থেকে
স্থির—স্থির হয়ে
উল্কার মতন নয়—নক্ষত্রের মত আলো লয়ে
জাগিয়া থাকিতে হবে এই পথে এই পৃথিবীতে !

সন্তানের মতো জন্মে—হবে জন্ম দিতে
সন্তানের ;

ভালোবাসা বোধ অশ্রু—বেদনা—আহ্লাদ,—
পৃথিবীর মাটি—তার সমুদ্রের স্বাদ
পেতে হবে ;
পৃথিবীর অন্ধকার—আলো—আলোড়ন
সমুদ্রের সাপের মতন
সময়ের সাগরের 'পরে
নাচিবে অনেক দিন,—অন্ধকার আলোর গহ্বরে
সরীসৃপদের মতো দুলিবে হৃদয় ;

আসিবে যখন ক্ষয়
অনেক দিনের পরে—তারপর শেষে,
সহজ ঘুমের মতো বুকে মৃত্যু এসে
সব অবসাদ
তখন মুছিয়া লবে ;—পশ্চিম মেঘের সাধ
হৃদয়ে উঠিবে জেগে সেদিন আমার।

সহজ ঘুমের মতো মৃত্যু এসে তার
সব অবসর
দিয়ে যাবে,
নিয়ে যাবে পশ্চিমের সমুদ্রের পর।

রচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

সমুদ্র

আমার লেগেছে ভালো তবু অই সমুদ্রের শ্বাস,
পুরোনো সিন্ধুর গন্ধে যেইখানে ভরেছে বাতাস
এ নতুন পৃথিবীর ;—পাইনের শাখার মতন
যেখানে সিন্ধুর গন্ধ,—যেখানে জলের আলোড়ন
সুস্থ বাতাসের মতো পাহাড়ের-পাইনের বনে ;
যেখানে ফেনার ফুলে—যেখানে ফেনার আলোড়নে
অনেক পুরোনো ভিজে পাহাড়ের শিশিরের স্বাদ
জেগে ওঠে ;—যেখানে অবাধ
পবিত্র শীতল ঢেউ—পুরোহিত—যুবাদের মতো
পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের তলে ইতস্তত
চলিতেছে ; কোনো উৎসবের রাত—বিবাহের গান
তাহাদের ডাকে নাকো ;—নীড়ের মতন কোনো স্থান
পৃথিবীর পাখিদের যখন হৃদয়ে তুলে লয়
সব পাহাড়ের শেষে সমুদ্রের পারে জেগে রয়
যে পাহাড়,—যেইখানে অন্ধকারে যে শিশির পড়ে
সন্ধ্যার আঁধারে সেই পাহাড়ের শিশিরের তরে
তাহারা চলিয়া যায় ; তাহাদের আকাঙ্ক্ষা, সাহস
খোঁজে নাকো পৃথিবীর মানুষের মতো কোনো যশ,—
ভালোবেসে—মানুষের মতো এক ভালোবাসা চেয়ে ;
সন্তানের জন্ম দিয়ে—সন্তানের স্বাদ বুকে পেয়ে ;

পৃথিবীর কোলাহলে বেড়ে উঠে,—আলোড়ন করে
মউমাছিদের মতো নরম মোমের মধু গড়ে
দিনের আলোর ঢেউয়ে ;—কাঁচা শাখা পাতার সবুজে
জেগে থেকে ;—মশালের আগুনের থেকে আলো খুঁজে
অন্ধকারে ;—পৃথিবীর মানুষের মতন জীবন

বহে নাকো সিন্ধু অই,—কিন্তু অই সমুদ্রের মন
ভোরের কুয়াশা খুঁজে—সব দূর তুষারের পথে
পুরোনো বনের গন্ধে ভরা এক জলের জগতে
ঢের দূরে—কোনো এক শীত সুস্থ বাতাসের দেশে
অন্য এক সমুদ্রের আলো-অন্ধকারে গিয়ে মেশে ;

কিন্তু অই সমুদ্রের ফেনা শাদা পাখিদের মত
সিন্ধু-পাখিদের পিছে পাখা মেলে চলে অবিরত ;
তারপর—পাখিদের—মাঝপথে—পিছে ফেলে রেখে
আকাশে মেঘের মতো শাদা হয়ে মেশে একে-একে !

পিছের আকাশ লয়ে লড়ে থাকে পৃথিবীর স্থূল,
দূর মধ্য-আকাশের বুক থেকে ঝরে পড়ে জল
পরিচ্ছন্ন শিশিরের স্বাদ লয়ে সমুদ্রের 'পরে ;
পরিষ্কার নক্ষত্রেরা অন্ধকারে এসে স্নান করে
পুরোহিতদের মতো সিন্ধুর পবিত্র জলে নেমে ;
পাইনের বনে ঘেরা ভিজে এক পাহাড়ের প্রেমে
বাতাস হয়েছে মুগ্ধ ;—বাতাসের পিছনে সাগর
চলিতেছে ;—স্নিগ্ধ করিতেছে গিয়ে হৃদয়ের জ্বর
শুদ্ধ শাদা বরফের কোনো এক শীতল পাহাড়ে !

নেক্‌ড়েরা দল বেঁধে নামে না সে পর্বতের ধারে,
অন্ধকারে শেয়ালেরা সেখানে ওঠে না কেঁদে আর,
তীরের ফলার মতো পৃথিবীর আলো-অন্ধকার
সেইখানে বেঁধে নাকো পাইনের পাতাদের বুক
হিম রাতে !—কিন্তু সেই পাহাড়ের শিশিরের শীতে
ফলেছে সবুজ শাখা—সেইখানে ফলেছে নিভৃতে

কাঁচা পাতা ;—জ্বর ছেড়ে গেছে তার ;—নক্ষত্র শীতল
সেইখানে ;—নক্ষত্রের মতো সুস্থ সমুদ্রের জল— !

রূচনা : 'রূপসী-বাংলা'র কাল (?)
বিভাব। জীবনানন্দ সংখ্যা ১৪০৫

মৃত মাংস

ডানা ভেঙে ঘুরে-ঘুরে পড়ে গেল ঘাসের উপরে ;
কে তার ভেঙেছে ডানা জানে না সে ; আকাশের ঘরে

কোনো দিন—কোনো দিন আর তার হবে না প্রবেশ ?
জানে না সে ; কোনো-এক অন্ধকার হিম নিরুদ্দেশ
ঘনায়ে এসেছে তার ? জানে না সে, আহা,
সে যে আর পাখি নয়—রঙ নয়—খেলা নয়—তাহা

জানে না সে ; ঈর্ষা নয়—হিংসা নয়—বেদনা নিয়েছে তারে কেড়ে।
সাধ নয়—স্বপ্ন নয়—একবার দুই ডানা ঝেড়ে

বেদনারে মুছে ফেলে দিতে চায় ; রুপালি বৃষ্টির গান, রৌদ্রের আস্বাদ
মুছে যায় শুধু তার, মুছে যায় বেদনারে মুছিবার সাধ।

নদী

বঁইচির ঝোপ শুধু—শাঁইবাবলার ঝাড়—আর জাম হিজলের বন—
কোথাও অর্জুন গাছ—তাহার সমস্ত ছায়া এদের নিকটে টেনে নিয়ে
কোন্ কথা সারাদিন কহিতেছে অই নদী ?—এ নদী কে ?—ইহার জীবন

হৃদয়ে চমক আনে ; যেখানে মানুষ নাই—নদী শুধু—যেইখানে গিয়ে

শব্দ শুনি তাই আমি—আমি শুনি—দুপুরের জলপিপি শুনেছে এমন
এই শব্দ কত দিন ; আমিও শুনেছি ঢের বটের পাতার পথ দিয়ে

হেঁটে যেতে—ব্যথা পেয়ে ; দুপুরে জলের গন্ধে একবার স্তব্ধ হয় মন ;
মনে হয় কোন্ শিশু মরে গেছে, আমারই হৃদয় যেন ছিল শিশু সেই ;
আলো আর আকাশের থেকে নদী যতখানি আশা করে—আমিও তেমন

একদিন করি নি কি ? শুধু একদিন তবু ? কারা এসে বলে গেল, 'নেই—
গাছ নেই—রোদ নেই—মেঘ নেই—তারা নেই—আকাশ তোমার তরে নয় !'—
হাজার বছর ধরে নদী তবু পায় কেন এইসব ? শিশুর প্রাণেই
নদী কেন বেঁচে থাকে ?—এক দিন এই নদী শব্দ করে হৃদয়ে বিস্ময়
আনতে পারে না আর ; মানুষের মন থেকে নদীরা হারায়—শেষ হয়।

১৯৩৬

সময়ের পথে পথে ঘুরে ফেরে সারাদিন—তবু—তারপর—
ঘুমের সময় আসে অন্ধকারে নদীদের ঢেউয়ের ভিতর

অনেক মাছের প্রাণে ; চারিদিকে চেয়ে থাকে অগণন ঘাস
ধূসর পাখির মতো থেকে থাকে নক্ষত্রের নির্লিপ্ত আকাশ ;

বাঁশের বনের পিছে মশার বিন্দুর ভিড়ে জেগে ওঠে চাঁদ।
মনে হয় সমস্ত থামিয়ে দিয়ে যেন এক মায়াবীর ফাঁদ

তারপর রয়ে গেছে ; রূপ প্রেম : সবই অন্ধকার ;
সবই দীর্ঘ নিস্তব্ধতা ; কঙ্কাল হবার—শূন্যে মিলিয়ে যাবার।

সমুদ্রচিল

সমুদ্রচিলের সাথে আজ এই রৌদ্রের প্রভাতে
কথা ব'লে দেখিয়াছি আমি ;
একবার পাহাড়ের কাছে আসে,
চকিতে সিন্ধুর দিকে যেতেছে সে নামি ;
হামাগুড়ি দিয়ে ভাসে ফেনার উপরে
মুছে যায় তরঙ্গের ঝড়ে।
দাঁড়ায়েছি শতাব্দীর ধুলো কাঁচ হাতে ॥

তরঙ্গের তাড়া খেয়ে চলে যায় আরো দূর তরঙ্গের পানে—
ফেনার কান্তারে,
সৃষ্টির প্রথম রোদ যেইখানে
তাহার সোনালি ডানা ঝাড়ে ;
যেখানে আকাশ নীল কোলাহলময়,
সমুদ্র করিছে দূর সমুদ্র সঞ্চয়,
দিগন্ত হারায়ে যায় দিগন্তের প্রাণে ॥
চঞ্চল ধবল বুকে নাচিতেছে ফেনার আঙুল ;
ধানের শিষের মত দু পায়ের শিরা
নাচিছে স্পানিশ টাঙ্গো নীল ঢেউয়ে ;
হৃদয় করিছে পান মালাবার হাওয়ার মদিরা ;
ট্রম্ ট্রম্ ট্রাম্ ট্রাম্—ড্রামের মতন
শৈলে শৈলে সমুদ্রের রুক্ষ আন্দোলন ;
রৌদ্রে রৌদ্রে ঝলসায় ঝিনুকের ফুল ॥

বিজ্ঞান কি মস্তিষ্কের বাক্সের মতন একাকী ?
তোমার শরীরে জল—দ্রাক্ষার আঘ্রাণ ;

তোমার হৃদয়ে পেকে ঝরিতেছে রৌদ্রের ক্ষেত,
জাগিতেছে নব নব শস্যের সন্তান ;
আমরা বন্দরে ফিরি—জনতায়—ঘূর্ণিস্রোতে কুকুরের মুণ্ডে
লোল আঁখি
পাবে নাকি লেজ তার ? হো হো—পাবে নাকি !
পাবেনাকি লেজ খুঁজে কুকুরের মত লোল আঁখি ॥

ছেড়ে দিয়ে উত্তরের বাতাসের প্রাণে
জন্মেছে তোমার ডানা—জেগেছে হৃদয় ;
সহস্র শতাব্দী-গিঁট কাটায়েছি পথ আর ঘরের আঘ্রাণে—
আনন্দের পাই নিকো তবু পরিচয় ;
জন্মে নি ধবল ডানা বিজ্ঞানের অগ্রসর চিরি ;
ভেঙে গেছে আকাশের—নক্ষত্রের সিঁড়ি,
উৎসব খুঁজেছি রাতবিরেতের গানে ॥

পৃথিবীর দিকে-দিকে ছড়ায়েছি মনোবীজ, আহা,
আকাঙ্ক্ষার নিঃসঙ্গ সন্তান ;
অথবা ঘাসের দেহে শুয়ে শুয়ে কুয়াশায়
শুনেছি ঝরিতে আছে ধান ;
অথবা সন্ধ্যার নীল জানালায়
অদৃশ্য কোকিল এসে গায়
এই সব বেদনার কর্কট-রেডিয়ামে মারে নাকো তাহা ॥

মাঝে-মাঝে একবার ধরা দেই নক্ষত্রের হাতে
চলে আসি সমুদ্রের পাশে ;
যে ক্ষেত ফুরাতে আছে—ফুরাইয়ে গেছে
তার তৃষ্ণা মিটিছে আকাশে ;

চেয়ে দেখি সেই নীল আকাশের ছবি :
সমুদ্রের অজান্তব জানালার গল্পের সুরভি ;
রৌদ্রের ডানায় ভেসে সেইখানে পৃথিবী হারাতে
চাই আমি ; সমুদ্রচিলের খেলা তুলে নিয়ে হাতে ॥

২

রঙিন বিস্তৃত রৌদ্রে প্রাণ তার করিছে বিলাস ;
কোনো দিন ধানক্ষেতে পৃথিবীর কৃষকের প্রাণ
এই রৌদ্র পায় নাই ;—জলপাই পল্লবের ফল,
জ্যৈষ্ঠের দুপুরে মাছি যে উল্লাসে গেয়ে গেছে গান,
কুমারী কোমল ঘাড় নুয়ে চুপে যেই পক্ব রৌদ্রে বেণী করেছে বিন্যাস
নীল হয়ে বিছায়েছে পৃথিবীর মধুকূপী ঘাস,
তরমুজ ক্ষেতে শুয়ে স্বপন দেখেছে চৈত্রমাস,
তার চেয়ে আরো দামি গাঢ় মদে প্রাণ তার করিছে বিলাস ॥

পৃথিবীতে যেই রূপ কোনো দিন দেখে নাই কেউ :
সিংহলের হীরা রত্ন নারী লুটে নাবিকের দল
ভারতসমুদ্রে নেমে নক্ষত্রের রজনীতে
তারপর ভোরবেলা দেখেছিল স্ফটিকের মতো যেই জল ;
তরঙ্গের পরে ঘন তরঙ্গের মধু আর দুধ,
মেঘের গোলাপী মুখ—রৌদ্রের বুদ্‌বুদ ;
তবু তারা দেখে নাই পুরুভুজ-বিছানায় নূপুর বাজায়ে নাচে ঢেউ
বারুণীর জানালায় ; সিন্ধুচিল—মক্ষিকারা ছাড়া তাহা জানে নাকো কেউ ॥

ধ্বনিত ঢেউয়ের অগ্নি বয়ঃসন্ধি-দিবসের স্তন হয়ে রক্তে নেমে আসে !
তরঙ্গের উষ্ণ নীল তরমুজ ক্ষেতে
আমারে খুঁজিয়া পায় মৃত্যু যেন ;

বিস্মৃতির পথে যেতে যেতে
সমস্ত পৃথিবী যেন মিশে যায় রৌদ্রের সাগরে ;
সিন্ধুচিল আর তার বনিতা যেখানে খেলা করে ;
মরণ আমারে যেন পায় সেই দারুচিনি হাওয়ার আকাশে ॥

হঠাৎ-মৃত

অজস্র বুনো হাঁস পাখা মেলে উড়ে চলেছে জ্যোৎস্নার ভিতর
কাউকে মৃত্যু ফেলে দিল
নীচে—অন্ধকারের অচল অভ্যাসের ভিতর।
রূপসী প্রথম প্রেমের আস্বাদ পেতে যাচ্ছিল :
শোনো—গলার ভিতরে তার মৃত্যুর গোঙরানি ;
সে নিজেও মৃত্যু যেন,
বিবেক নেই আর তার।

কবি চোখ মেলে বলেছিল :
আমার হৃদয়ের ভিতর ইন্দ্রধনুর মতো কত বুদ্‌বুদ্‌,
হিম মৃত্যু এসে চোখ অন্ধকার করে ফেলল তার।

এই সব হঠাৎ-মৃত্যু
এই সব হঠাৎ-মৃত
আজ এই শীতের রাতের অরণ্যের কিনারে
বিক্ষুব্ধ বাঘের মতো গর্জন করে উঠছে যেন।
গর্জন করে উঠছে আমার হৃদয়ের অরণ্যে।

রূপ—প্রেম—খ্যাতি—সুপক্ব রৌদ্রের ভিতর
দাঁতের এনামেল ঝিকমিক করে ওঠে

পবিত্র সমুদ্রের মতো—
চিরন্তন।

হায়, সোনালি বাঘ-প্রেত,
তোমাদের জন্য শুয়ারের মাংস
শুয়ারের মাংস শুধু ;
মৃত্যু তোমাদের ফেলে দিয়েছে
অন্ধকারের অচল অভ্যাসের ভিতর।

বিস্ময়

নবতর ভিড় আসে—সহসা বিস্মিত হয়ে ভাবি :
এ কি সেই পরিচিত ধূসর উচ্ছ্বাস :
টাকা, কাজ, ক্ষুধা, অন্ন, বিলুপ্তির তরে ?
মনের মতন করে এক দিন গড়িতে চেয়েছি যেই সময়ের ধূম্র আকৃতিরে ?
—বাতাস যেমন করে চায় গড়িবারে
কোনো ক্লান্ত গরীয়সী গণিকার
বিপন্ন বিস্ময়টিরে—মুহূর্তের ;
তারপর গূঢ় তামাসায় যেন চলে যায় পাখিদের ডানার পিছনে ;
সে জানে বিচ্ছিন্ন বীজ রয়েছে এ শতাব্দীতে
চারিদিকে মননের অধিপতি সব
তাহাদের জন্ম দিল :
তাহারা উঠিছে ফুঁড়ে জলের আনন আর বাতাসের প্রতিভারে
হেসে—দূরে ঠেলে—
অনেক নিরন্ন বীজ রয়েছে এ শতাব্দীতে—ছিল আর
প্রস্তরের ভিত্তির থেকে,

তাহারা উঠিছে স্ফুরে—তাহারা উঠিছে স্ফুরে—যেন কোনো,
বিস্ফোরক তরঙ্গের ধ্বনি
পীবর দেহের গন্ধ যেন কোন্ পীতবর্ণ তটিনীর— যেন কোনো
রক্তবর্ণ সমুদ্রের।

নবতর ভিড় আসে—প্রত্যুষের স্ফূর্তির মতন,
বিরাট আকাশ ভরা সমস্ত উষার মতো অদ্ভুত প্রয়াস :
বাতাস যেমন করে চায় ভাঙিবারে নব নব নাগার্জুন-কীর্তি-কিরীটেরে,
নিরঙ্কুশ অক্লান্তির পীত দেবতারে ;
তারপর গূঢ় তামাসায় যেন চলে যায় পাখিদের ডানার পিছনে।

জীবনসংগীত

স্ট্রেচারের 'পরে শুয়ে কুয়াশা ঘিরিছে বুঝি তোমার দু চোখ :
ভয় নেই, মৃত্যু নয় কোনো এক অপদার্থ অন্যায় আলোক ;
তা হলে কি এত লোক মরে যেত মশালের লালসায়—মাছির মতন ?
অমৃতের সিঁড়ি বলে মানুষেরা গড়িত কি এত শাদা শ্লোক।

আজ মৃত্যু ; এর আগে ম্যাটেডরদের মৃত্যু ছিল নাকি স্পেনে ?
লড়েছে বীরের মতো, রাঙা রৌদ্রে আপনারে সবচেয়ে হামবড়া জেনে
খেয়েছে আঁধার রাত্রি অকস্মাৎ। তবু এক হরিয়াল : বাংলার পাখি
শিকারীর-গুলি-সার-নীলাকাশ ভেবে নেয় মরণকে মেনে।

তবু মোরা দিবালোক উত্থাপন করি রোজ শৌণ্ডিকের মতো ;
গেলাস ভরিয়া দেই ;—মনে হয় কম্পাস্, সিন্ধু, রৌদ্র,—জীবন ফলত
ধীমান মৃত্যুর চেয়ে। মরে গেছে : ভূস্তরের অন্ধকারে চূর্ণ তারা।
কিন্তু আমাদের আয়ু সানস্পট গিলে ফেলে সূর্যের মতন ব্যক্তিগত।

পিতৃলোক

পিতৃলোক, তোমরা কি ভস্ম হয়ে গেছ দূরে সিরুলির শ্মশানের পারে ?
অতখানি অগ্নি আর আলোকের কোথাও রয়েছে যেন
নক্ষত্রের মতো ব্যবহার।
মৃত তারকারও থেকে নীহারিকা শূন্য পিঁজে জেগে ওঠে আর-একবার ;
আবার প্রসব হয় বৃহস্পতি নক্ষত্রের ; শেষ ভাঁড় গল্প ব'লে
মিশে গেছে যখন আঁধারে।

আমি জানি তোমরা কোথাও যেন রয়ে গেছ এই উপসাগরের কাছে ;
অথবা জাভার দিকে গভীর মেঘের রাতে চলিতেছে তোমাদের
ক্ষোভের তরণী ;
বোরোবুদুরের কোনো মন্দিরের সংযমে হয়তো পেঁচারা শোনে
তোমাদের ধ্বনি ;
আমারই কানের কাছে অবিশ্বাস্য কৃচ্ছ্রকলরবে যেন কাদের সূচনা
জেগে আছে।

নির্জন রোমশ হাত তোমাদের আজও যেন দেবদারু কাঠ নিয়ে
ছাঁচিতেছে হাঙরের মুখ ;
জীবনের ব্যাকরণ জিনে নেবে যেন তারা কিমাকার সমাসকে ছিঁড়ে ;
যেন তারা তরমুজ—বই—নারী—আত্মা সব নিয়ে যায় বিরুদ্ধ সমীরে ;
গভীর পরানী ছিল তারা এই জীবনের—অনেক আশ্চর্য শাদা
দাড়ির চিবুক

নেপথ্যে নড়িতে আছে ; মৃত শতাব্দীর থেকে আরো অন্ধ বধির শতকে
হাস্যের দস্তানা প'রে প্রভাতের রৌদ্রে তারা চলিতেছে সারসের পাল।
তবুও বিমুখ মোরা ;—যুদ্ধ, রক্ত, জ্যামিতিক ঈশ্বর, মাকড়সা, মশার

জঞ্জাল
আমাদের ঝুলি যেন ভরে দিল ;—ক্লান্ত ইহুদীর মতো জ্যোতির্ময়
চাঁদনীর চকে

চোরাবাজারের থেকে তবু ঠুলি চাই ; না হলে চোখের শিরা
পুড়ে যাবে রঙের বিদ্বেষে
একশো বছর ধরে তোমাদের স্মরণ করেছে এই পৃথিবীর শশকেরা,
গাঢ় পিতৃলোক ?
না না। তবু তোমাদের সসম্ভ্রম প্রাণে ছিল অপার্থিব, অন্যায় আলোক :
আমাদের চোখঠার দিয়ে তারা গৈবী পণ্য নিয়ে যায় অন্য এক
সূর্যের উদ্দেশে।

অগ্নি

আত্মপ্রত্যয়ের অগ্নি, হে সন্তান, প্রথম জ্বলুক তব ঘরে।
জানো না কি রাত্রি এসে ঘিরিতেছে আরো-এক দীর্ঘতর বৃত্তে রোজ
মানুষের জীবনকে।
যে সব সৌন্দর্য রচে গিয়েছিল একদিন মেধাবীরা
আজ এই রজনীর অবরোধে মনে হয়
তাহাদের জ্যোতি যেন বিস্ফোরক বাষ্প হয়ে জ্বলে
সহসা আকাশপথে দিক্‌হস্তিদের মতো,—অদ্ভুত—অভীক্ষ্ণ মদকলে ;
কোনো আমলকী নাই আজ আর শিল্পীর নির্জর করতলে।
এখানে দাঁড়ায়ে থেকে ন্যুব্জ ছবি চোখে পড়ে পৃথিবীর :
বিবর্ণ পাথরে পড়া প্রান্তরের পীঠে এক ধর্মমন্দিরের ;
আশি বছরের বুড়ো শীতের কুয়াশা ঠেলে সেইদিকে চলিয়াছে একা :
হয়তো বাজাবে ঘণ্টা, হয়তো সে সারাৎসার বিধাতাকে কাছে পাবে :
আমরা যেমন করে পাই মৃত্তিকাকে, মৃত্যুকে।

পীবর মাটির মতো নিষ্কাশিত হয়ে যেন পৃথিবীর জরায়ুর থেকে
মাঠের কিনারে ব'সে শুষ্ক পাতা পোড়াতেছে কয়েকটি নির্মূল সন্তান ;
তারা খাদ্য চায় ; তবুও অভুক্ত পেটে তরবার হাতে নেবে
যোদ্ধার মতন নয় ; নকল সৈন্যের মতো কলরবে পাঁচালির দেশে।
কৌতুকে—গোলার সব মৃত—পরাহত—ধান থেকে মেড়ে
যদি কেউ অন্যতম আলেয়ার রস এনে দিয়ে যেত তাহাদের।
কেউ দেবে নাকো আজ এই তুণ্ডসমীচীন পৃথিবীতে।
মাথার উপর দিয়ে অনেক সন্ধ্যার কাক
প্রথম ইশারা নিয়ে উড়ে যায় আবির্ভূত গম্বুজের দিকে।

সেই পথে আমাদের যাত্রা নেই, হে সন্তান।
বৃত্তের মতন সূর্য—পশ্চিমের—
মৃত প্রলম্বিত—হাঙরের মতো—
মেঘের ওপার থেকে
প্রতিভার দীর্ঘ বাহু বাড়ায়ে দিয়েছে মেঠো হাঁসের ডানায়,
শস্যহীন ক্ষেতে,
গফুরের শীর্ণ গোলাঘরে, শ্মশানে, কবরে, আমাদের সবের হৃদয়ে।
এই প্রত্যয়ের থেকে গভীর অগ্নির জন্ম হয়।

এক দিন ভাবি নি কি

একদিন ভাবি নি কি আকাশের অনুরাধা নক্ষত্রেরা বোন হবে—বোন
নক্ষত্রের ভাইয়ের—ধ্রুবতারা শুকতারা কোন্ তারা আছে
অই দূর হেমন্তের আকাশের কোন্ তারা জেনেছে তেমন শিহরণ
একদিন জেনেছি যা—সোনালি মেঘের ভোরে জীবন যা সব জানিয়াছে
এক দিন।

উদয়াস্ত

সূর্যের উদয় সহসা সমস্ত নদী
চমকিত করে ফেলে—অকস্মাৎ দেখা দিয়ে—
চলে যায় ;—হাড়ের ভিতরে মেঘেদের
অন্ধকার ;—স্তম্ভিত বন্ধুর মতো ভোর
এইখানে সাধু রাত্রির হাত ধ'রে
তাকে শ্রেয়তর চালানির মূল জেনে
নিখিলের—মৃত মাংসের স্তূপ
চারি দিকে ; তার মাঝে ধন্বন্তরি, কালনেমি
কিছু চায় :
দুস্তর চাদর গায়ে অন্ধ বাতাসের।
সূর্য তবু—সূর্য যেন জ্যোতি :
প্রতিবিম্ব রেখে গেছে তরবারে—ভাঁড়ের হৃদয়ে,
ধর্মাশোকের মনে।

করজোড়ে ভাবে তারা :
ঝলিছে সারস শব ঢের
বৈতরণী তরঙ্গের দিকে ভেসে যেতে যেতে
লোকোত্তর সূর্যের আমোদে।

সুমেরীয়

ক্রমে ধুলো উড়ে যায় বিকেলের অন্তহীন পাটল আকাশে ;
অস্ফুট বৃষ্টির গন্ধ ; প্রকাণ্ড ময়দান জুড়ে একপাল ভেড়া
নিরুত্তর ছবির মতন স্পষ্ট ;

সূর্যের তির্যক গতি
কৃষ্ণাভ মেঘের থেকে তাহাদের শরীরের ’পরে
সুমেরীয় বল্লমের মতো যেন প্রাগৈতিহাসিক তর্কে নড়ে।

অদ্ভুত অমল আলো একবার জ্বলে ওঠে চারি দিকে
সন্ধ্যা আসিবার আগে।
য়ুনানী যুগের স্তম্ভ—মাঠের বাদামি ঘাস—নদী—
ঢের মজুরের মুখ—মনে হয়—সুমেরীয়।
ইহাদের ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে তবে বহু দিন।
কপিশ মাটির গর্ভ খুঁড়িলেই অখণ্ড প্রেমিক প্যারাফিন
এরা সব। এই ভৌতিক আলো চাই নাকো—আমি চাই ক্ষেম।
ইহাদের অরুন্তুদ উৎস তবু সুমেরীয় প্রেম।

মৃত্যু

হাড়ের ভিতর দিয়ে যারা শীত বোধ করে
মাঘ রাতে—তাহারা দুপুরে ব’সে শহরের গ্রিলে
মৃত্যু অনুভব করে আরও গাঢ়—পীন।
রূপসীও মরণকে চেনে
মুকুরের অই পিঠে—পারদের মতো যেন
নিরুত্তর হয়ে আছে। অথবা উড্ডীন
এক-আধটি দৈত্যাকৃতি দেখা যায়
জনতারে চালাতেছে বিকালের বিরাট সভায় ;
নিদারুণ বিশ্বাসের মতো যেন স্থির ;
মৃত্যু নাই—জানে তারা ;—তবুও তাদের মুখ
চকিত আলোয় পূর্ণ ফটোগ্রাফ থেকে
উঠে এসে ভীত হয়
নিজেদের গ্লানিহীন পরিণতি দেখে।

আমিষাশী তরবার

স্মৃতিই মৃত্যুর মতো—ডাকিতেছে প্রতিধ্বনি গম্ভীর আহ্বানে
ভোরের ভিখিরি তাহা সূর্যের দিকে চেয়ে বোঝে।
উঁচু মঞ্চে বিধাতার পরিত্যক্ত সন্তানেরা জানে ;
পাণ্ডুলিপি, যব আর সোনার ভিতরে তারা খোঁজে

অবহিত প্রতীককে। কে দিয়েছে স্মৃতি এই বিকীর্ণ হৃদয়ে :
কোনো কিছু অবলুপ্ত পিপাসার অন্ত্যজ ধারণা ?
বৈশালীর থেকে বায়ু জাহাজের মুখে আজও বহে ;
প্রকৃত নাবিকাধমও মাস্তুলের পিঠ ঘেঁষে দুপুরের রৌদ্রে অন্যমনা

চেয়ে থাকে। চারি দিকে নবীন যদুর বংশ ধ্ব'সে
কেবলই পড়িতে আছে ; সংগীতের নতুনত্ব সংক্রামক ধুয়া
নষ্ট করে দিয়ে যায় ;
স্মৃতির ভিতর থেকে জন্ম লয় এই সব গভীর অসূয়া।

জেনেছে বরুণ, অগ্নি, নরনারী : কর্মক্ষম জীবনের শেষে
এক পাল ভেড়া লয়ে হেমন্তের মাঠে
শান্তি সারাৎসার নয়—আলো জ্বেলে শকুনিমামার সাথে হেসে
নগরীর রাত্রি চলে—আমিষাশী তরবার হয়ে তার প্রভাতকে কাটে।

দানবীয়

মেঘের কিনারে শুয়ে একবার নক্ষত্রের রাতে
আমি এক আত্মা নাকি—প্রেত নাকি শুধু ?

একবার দেখে নিই জনহীন সমুদ্রের জ্যোৎস্নায়
বাতাসের শাদা অস্থি উড়িতেছে বালুকার মতো যেন ধু ধু ;
একবার দেখে নিই প্রান্তরের 'পর
দৈত্য এক দাঁড়ায়েছে ;—
এ পৃথিবী যেন তার ক্রীড়ার গহ্বর।

তারপর তারকার থেকে দূর তারকার পানে
মুখ তুলে হৃদয়ের জ্ঞানের অজ্ঞানে
স্তব্ধ হয়ে থাকি আমি ;—
হেমন্তের কোন্-এক জ্যোৎস্নাশীর্ষ রাতে
শেয়ালেরা খরগোশ শিকারে বেড়াতে
বেড়াতে বেড়াতে যদি মানুষের মতো খেদ পায়
তা হলে যেমন তারা কেঁপে ওঠে রোমকূপে
চাঁদ আর অরণ্যের অবিকল দানবীয়তায়।

কালাতিপাত

সমুদ্রের প্রতিধ্বনিময় এক
আঁকাবাঁকা গুহার আঁধারে
প্রবেশ করিতে গিয়ে বোঝা গেল সুর ভাসে :
এই কুরুবর্ষ—এই কন্যাকুমারিকা
অতীতের কুয়াশার পারে।

প্রকাণ্ড ধীমান এক দেবদারু-বিবরের থেকে
প্রশান্ত বায়ুর শব্দ নড়ে ;

‘হে মানুষ’ বলে সে ডাকে না কোনো জনগণদের।
আমি ক্লান্ত প্রাণ আজ প্রলাপপাণ্ডুর পৃথিবীতে ;
হৃদয়ের কাছে ঢের যুক্তি ছুঁড়ে
যখন মস্তিষ্ক গেল জিতে
শরণ নিলাম আমি সূচিমুখ জ্বেলে দিয়ে—স্তব্ধতায়—
বৃশ্চিক-গ্রথিত আঁধারের।
শুনি আমি আরো শব্দ—যত দূর চলে যাই তত ;
ওরা সব আমারই মতন :
দুশ্চর সমুদ্র ঘিরে বধির বদ্বীপ—ইতস্ততঃ—
নিস্পৃহ ভূখণ্ড নিয়ে
এক-এক জন।

আজ এই পৃথিবীর
স্তূপীকৃত—অন্ধ—নির্বান্ধব—
লোহার শকট ভরা আবিষ্ট মানব।
কিংবা আরো অশ্লীল তাহাদের শব :
কতখানি নেত্র আর নাসিকার তরে,
কতখানি মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের অক্ষুণ্ন সঞ্চয় :
ভাবিছে প্রতিভূ একা শীর্ণ জাদুঘরে
অদ্ভুত অঙ্গন তার জ্যোৎস্না আর তরুদের সঞ্চারণময়।
অদ্ভুত অঙ্গন তার
জ্যোৎস্না আর রক্ত, বালুকার।
মোরা সব সন্তানের সন্ততি তাহার।
সময় গণনা আর করে নাকো তাহার মিশ্রিত মৃত্যু বুকে নিয়ে
কখন সে আপেক্ষিক তরঙ্গে হারিয়ে
হয়ে গেছে প্লিওসিন যুগের পাহাড়।

হেমন্ত

আজ রাতে মনে হয়
সর্ব কর্মক্লান্তি অবশেষে কোনো এক অর্থ শুষে গেছে।
আমাদের সব পাপ—যদি জীব কোনো পাপ করে থাকে পরস্পর
কিংবা দূর নক্ষত্রের গুল্ম, গ্যাস, জীবাণুর কাছে—
গিয়েছে ক্ষয়িত হয়ে।
বৃত্ত যেন শুদ্ধতায় নিরুত্তর কেন্দ্রে ফিরে এল
এই শান্ত অঘ্রানের রাতে।

যতদূর চোখ যায় বিকোষিত প্রান্তরের কুয়াশার ব্যাস
শাদা চাদরের মতো কুয়াশার নীচে শুয়ে।
হরীতকী অরণ্যের থেকে চুপে সঞ্চারিত হয়ে
নিশীথের ছায়া যেন মেধাবী প্রশান্তি এক রেখে গেছে
প্রতিধ্বনিহীন, হিম পৃথিবীর পিঠে।
সুষুপ্ত হরিণ—লোষ্ট্র ; মৃত আজ ; ব্যাঘ্র মৃত ; মৃত্যুর ভিতরে অমায়িক।
জলের উপর দিয়ে চলে যায় তারা ; তবু জল
স্পর্শ করে নাকো, সিংহদুয়ারের মতো জেগে উঠে ইন্দ্রধনু
তাহাদের যেতে দেয় ; অদ্ভুত বধির চোখে তবু তারা
অভ্যর্থনা করে নাকো আজ আর আলোর বর্বর জননীকে।
বাংলার শস্যহীন ক্ষেতের শিয়রে
মৃত, বড়ো, গোল চাঁদ ;
গভীর অঘ্রাণ এসে দাঁড়ায়েছে।
অনন্য যোদ্ধার মতো এসেছে সে কত বার
দিনের ওপারে সন্ধ্যা—ঋতুর ভিতরে প্লাবী হেমন্তকে
দৃষ্ট প্রত্যঙ্গের মতো এই স্ফীত পৃথিবীতে
ছুরির ফলার মতো টেনে নিয়ে।

বেবিলন থেকে বিলম্বিত এস্‌প্লানেডে
বিদীর্ণ চীনের থেকে এই শীর্ণ এককড়িপুরে
মানুষের অরুন্তুদ চেষ্টার ভিতরে।

নিঃসরণ

দুর্গের গৌরবে বসে প্রাংশু আত্মা ভাবিতেছে ঢের পূর্বপুরুষের কথা :
যারা তাদের জজ্ঞা দিল,—তবু আজ তরবার পরিত্যাগ করার ক্ষমতা
যারা দিল ;—প্রাচীন পাথর তারা এনেছিল পর্বতের থেকে
স্থির কিছু গড়িবার প্রয়োজনে ; তারপর ধূসর কাপড়ে মুখ ঢেকে
চলে গেছে ;—পিছন পেঁচা যে ওড়ে জ্যোৎস্নায়—সেইখানে তাদের মমতা

ঘুরিতেছে—ঘুরিতেছে—শুক্র মঙ্গলের মতো ;—আমার এ শাদা শার্টিনের
শেমিজও পেতেছে সেই মনস্বিনী শৃঙ্খলাকে টের।
এই দুর্গ আজও তাই—ক্রিয়াবান সপ্তমীর চাঁদের শিঙের নীচে হিম
লোল—বক্র—নিরুত্তর ; আজই রাতে আমার মৃত্যুর পর নতুন রক্তিম
সূর্য এসে প্রয়োজন মেগে নেবে এইখানে লোকশ্রুত ভূমিকম্পের।

পূর্বসূরিদের ইচ্ছা অনুশাসনের মতো করিতেছে কাজ।
প্রাচীন লেখের থেকে অন্ধকারে বিক্ষুব্ধ সমাজ
করতালি দিয়ে হাসে ; দূরবীনে দেখা যায় যেইসব জ্যোতির্ময় কণা
অনন্ত মোমের তেজ নিয়ে নাচে—সেই সব উচ্চতর রসিক দ্যোতনা
মৃত্যুকে বামনের করতলে হরীতকী অনন্ত করে দিক আজ।

উদয়াস্ত

পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থেকে যখন হয়েছে পূর্ণ সময়ের অভিপ্রায়—
আগাগোড়া জীবনের দিক চেয়ে কে আবার আয়ু চায় ?

যদিও চোখের ঘুম ভুলে গিয়ে মননের অহংকারে চর্বি জ্বালায়

অপ্রেমিক ; কোনো কিছু শেষ সত্য জিনে নেবে বিষয়ের থেকে।
তবু কোনো জাদুকর পুরানো স্ফটিক তার যায় নাই রেখে।
সময় কাটাতে হয় ব্যবহৃত হস্তাক্ষরে চীবরের ছায়াপাত দেখে।

অথবা উদ্রিক্ত যারা হয় নাকো—চিরকাল থাকে সমীচীন,—
তাহাদের মুণ্ড যেন কালো হাঁড়ি—মাচার উপরে সমাসীন ;
মৃত্যু নাই তাহাদের—জানে সব দেবী, পরী, জিন।

আর যারা বহুদিন পৃথিবীতে মেধে—মনে—ছিল কর্মক্ষম ;
তারপর বুড়ো হয়ে স্মরণ করিতে চায় অবলুপ্ত মলয়াচলম্ :
তাদের হৃদয়ে ঢের মেঘ আছে—নাই কোনো শুভ্রঘ্রাণ গম।

পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থেকে যখন হয়েছে পূর্ণ সময়ের অভিপ্রায়—
আগাগোড়া জীবনের দিকে চেয়ে কে আবার আয়ু চায় ?
কন্যা তুলা কর্কটের বৃশ্চিকের আবার ঘটুক সমবায়।

অনুভব

নিঃশব্দ পাখার আছে প্রাণ,
    রয়েছে প্রবাদ।
আমি স্পর্শ করিতেই
    হল তার উড়িবার সাধ।

তবে সে ধূসর প্রজাপতি :
এতক্ষণ রয়েছিল পাথরের কোলে ;

ঘাসের তরঙ্গ বেয়ে হয়তো পাথরই ধীরে
মাঠের ওপারে গেল চলে।

এমন ঘুমের মতো তারা,
এমন অনন্য জগতের,
পাথর কি প্রজাপতি
মরণেও পাব না তা টের।

মৃত মানুষ

সমস্ত শরীর তার জড়ানো রয়েছে ফিট যুদ্ধের শোভায় ;
যেন কেউ ঈশ্বরের চেয়ে কিছু কম গরিমায়
তাহার প্রত্যঙ্গে আছে পরিপূর্ণ হয়ে ;
সঞ্চারণ করিলেই উঠিবে সে জেগে।

নীল আকাশের নীচে অনন্ত জলের নদী—প্রণয়ের চেয়ে
দায়িত্ব বিশিষ্টতর ছিল তার ?
বিলোল বায়ুর চেয়ে ছিল ঢের কৃতী শৃঙ্খলার :
বহু শতাব্দীর পরে মানুষের মতো স্বর পেয়ে ?
এইসব প্রশ্ন তবু নয় আর মানবিকতার।
এখন গিয়েছে সব অস্ফুট বায়ুর মতো হয়ে।

সন্ধিহীন, স্বাক্ষরবিহীন

কোথায় সূর্যের যেন নব নব জন্ম ঘিরে
মরণ উড়িতে আছে শ্বেত পারাবত ;
কোথাও নক্ষত্রহীন নিরাবিল রাত্রি নিয়ে

জীবন কি বৈতরণী-তরীর নাবিক ?
পারাবত, পারাবত, তোমার হৃদয়ে শুধু রক্তবর্ণ ক্ষুধা !
যেইখানে বর্ণহীন নিস্তব্ধতা, তরঙ্গের প্রাণে কোনো অঙ্কুরের সুধা
ক্ষরিবে না কোনো দিন—সব প্রীত ভ্রমণকে শান্তি দিয়ে।
চিত্ত যার শুদ্ধ অশ্রুহীনতায় সৎ,
আমাদের জীবনের নব-নব সূর্যগুলো কপোতকে দান ক'রে
আমরাও স্থির মেরুনিশীথের নাবিকের মতন মহৎ
সততার দেখা পাব—সন্ধিহীন, স্বাক্ষরবিহীন।

শান্তি

জীবন কি নীরক্ত সম্রাট এক সুধাখোর :
কূট ব্যবসায়ী নীল পার্শ্বচরগুলো তার মৃত্যুর উৎসব ?
মানুষের তরে তবে কোন্ পথ :
কোন্ অন্তরীক্ষে তারে নিয়ে যাবে আসন্ন সময় ?
সেইখানে বালুঘড়ি, বলো, তবে স্তব্ধতার মতো :
এক দিন বাতাসের সাথে ঢের ধ্বনিবিনিময়
করেছিল ;—তারপর হয়ে গেছে আঁখিহীন—চুপ।
প্রান্তরের শুষ্ক ঘাসে যে সবুজ বাতাসের আশা
এক দিন বলেছিল 'আবার করিব আমি অমৃত সঞ্চয়'—
শত শত মেষশাবকের আঁখিতারকাও পেল যেন ভয়।
শান্তি, শান্তি—
উত্তেজিত শপথের উৎসারণ প্লীহা ঘিরে থাকে না সতত,
বালুঘড়ি হয়ে থাকে চিরদিন স্তব্ধতার মতো।

হে হৃদয়

হে হৃদয়, একদিন ছিলে তুমি নদী ;
পারাপারহীন এক মোহানায় তরণীর ভিজে কাঠ
খুঁজিতেছে অন্ধকার স্তব্ধ মহোদধি।
তোমার নির্জন পাল থেকে যদি মরণের জন্ম হয়,
হে তরণী,
কোনো দূর পীত পৃথিবীর বুকে ফাল্গুনিক তবে
ঝরনার জল আজও ঢালুক নীরবে ;
বিশীর্ণেরা আঁজলায় ভরে নিক সলিলের মুক্তা আর মণি ;
অন্ধকার সাগরের মরণকে নিষ্ঠা দিয়ে—উষালোকে মাইক্রোফোনের মতো রবে।

আমি হাত প্রসারিত করে দেই

আমি হাত প্রসারিত করে দেই বায়ুর ভিতরে,
অনেক জীবাণু এসে রোমকূপে জমে—
এই এক আলোড়ন রয়ে গেছে পৃথিবীতে।
মানুষের অন্তরেও এরকম ;
কোনো এক রমণীকে দেখে প্রীতি,
কোনো জননায়কের অবয়ব দেখে বিস্ময়,
কোনো এক বিষয়ীর জানুর উপরে হাত রেখে দিয়ে আশা।

এই সব অনুভব তবু আজ কীলক লিপির ’পরে ভোরের আলোয়
অতীত রাত্রির পরিভাষা।
কেন না মানুষ—বায়ু, রোমকূপ, জীবাণুর মতো নয় !
ইহাদের সরলতা শিশুর মতন।
মানুষ অনেক দিন পৃথিবীতে বেঁচে থেকে

ক্রমশই হয়ে যায় বিশদ অতল।

এই সব ইতিহাসপরম্পরা বুঝে
আমার হৃদয় থেকে বিচূর্ণ কাচের খণ্ড খুঁজে
বুঝে গেছি মরণ কী। অথবা জীবন কেন অধিক বিশদ নিয়ন্ত্রণ।

সকল রঙের শিখা একসাথে মিলে গিয়ে হয়ে যায় শাদা।
একটি জমাট ঢিলে বহুতর বিরোধের বাধা
অনেক আবহ তার বুকের ভিতরে ধরে রেখে
মানুষ ও ব্রহ্মাণ্ডের পরমায়ু নিমীল বাতাসে
লাঙুল ঘুরায়ে নিয়ে অগ্নির অক্ষরে ফেলে এঁকে।

১৩৩৬-৩৮ স্মরণে

অনেক চিন্তার সূত্র সমবায়ে একটি মহৎ দিন
এখানে গঠন করে যেতেছিল কয়েকটি স্থির সমীচীন
যুবা এসে ;—কোথাও বিদ্যুৎ নেই—তবুও আগুন যেন ধীরে
জ্বলেছিল এই হরীতকীকুঞ্জে মাঘের তিমিরে ;
ভোর এল ; ভারুই পাখির মতো কেউ তবু হয় নিকো আকাশে উড্ডীন।

উড়িবার কাজ সব আগন্তুক বৃহৎ চিলের তরে রেখে
অনেক আশ্চর্য শ্লোক খোঁজা হল ভারতীয় মনীষার থেকে ;
যেন সব অমেয় সুদূর বৃক্ষে বাতাসের সংগীতের মতো :
আমাদের সচেতন তাড়নায় প্রাণ পেয়ে জেগেছে ফলত ;—
চোখ ক্লান্ত হয় তবু নখের ভিতরে হিম, নিরুত্তর দর্পণকে দেখে।

তবু সেই অপার্থিব সুর কেউ ভুলে যেতে পারে?

দুই কানে মোম ঢেলে শুনিতে চাই নি যাহা মধ্যসমুদ্রের অন্ধকারে
আমাদের কাছে ছিল সেদিন তা জাঞ্জিবার সমুদ্রের অই পারে—কাম ;
তাহারে এড়াতে গিয়ে করেছি অদ্ভুত প্রাণায়াম ;
যেমন প্রবীণ তার যৌবনের প্রেম ঢেকে রাখে চোখঠারে।

এখানে হলুদ ঘাসে—কাঁকরের রাস্তায়—নোনাধরা দেয়ালের ঘরে
হৃদয়ে গঞ্জনা এক জেগেছিল বৃশ্চিকের মতন কামড়ে
এ পৃথিবী পাক খায়—তবু কেউ কনুয়ের 'পরে রাখে ভর
যেন স্পষ্ট সৌরজগতের এক সুশৃঙ্খল কেন্দ্রের ভিতর
রয়েছে সে ; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন সন্ধ্যার হাঁসের মতো ফিরে আসে ঘরে।
ঘরের হরিণ পারে অনায়াসে চলে যেতে গৃহস্থের গোধূম মাড়িয়ে।
সেই পথ থেকে তবু সরে গিয়ে অন্য-এক অহংকার নিয়ে
কয়েকটি যুবা, নারী—সমাহৃত হয়ে গিয়ে ছুরির ফলায়
এখানে বাটের দিকে চেয়েছিল ;—কার যেন স্থির মুষ্টি টের পাওয়া যায় :
যেন সব নাসপাতি পৃষ্ঠব্রণ হয় তার নিটোল ব্লেডের মুখে গিয়ে।

আজ জানি সমবায়ে উদয়ন, নাগার্জুন, পুষ্পসেনী ছাড়া
কী রয়েছে এইসব নাম ছাড়া ?—সুনিপুণ ভাবনার ধারা
কে বুঝেছে সব নয় ?—জনতার হৃদয়ের ভীতি
মেধা নয়—সেবা চায় ; তাই ভেঙে ধ্বসে গেল অমোঘ সমিতি ;
অন্বীক্ষার উচ্চারণে রয় কি হাঁসের ডিম মৃত্তিকায় খাড়া ?

আকাশরেখার পারে তবুও যাহারা এই পথে এসে আবার দাঁড়াবে—
প্রকম্পিত কম্পাসের সূচিমুখ খানিক স্থিরতা যেন পাবে
তাদের ছোঁয়াচে এসে ; যদিও পাথরগুলো হয়ে গেছে আবার প্রাচীন
নিওলিথ পৃথিবীর,—এই সব ঘাস, হরীতকী, সূর্য মনে হয় যেন প্লিওসিন
হাড়গোড় পড়ে আছে নিরুত্তেজ মানুষের প্রেমের অভাবে।

এই ঘর অবিকল

এই ঘর অবিকল পারম্পর্য বুঝে লয়ে তবু
স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল সারাদিন আজ
তারপর রাত্রি এল হেমন্তের নিস্তব্ধতা নিয়ে
আমিও এলাম চলে—ধূলিধূসরিত কোনো মিউজিয়মের
দরোয়ান যখন লাগাবে তালা—ক্লিক্ শব্দ হয়
অথবা হবার আগে যখন পিছল তালা নড়ে ওঠে
শিশিরে উজ্জ্বল কোনো অমায়িক পাখির মতন
আমি আসি ; আমারে আসিতে হয় রোজ
টালিগঞ্জ থেকে ট্রাম—অথবা ট্রামের
রাঙা-নীল-আলো-ঈপ্সা
    রাত এগারোটা এলে শহরের
নিরুত্তর—নিবিড়—বিদেশী মুখ
পড়ে পাওয়া পথগুলো—খড়ির স্বাক্ষরহীন
সুদীর্ঘ জানালা সব—(কোনো ক্রুশচিহ্নহীন)
নিরুদ্ধ দরজাগুলো—(অননুমেয়ের মতো)
অন্ধকার গলি—
    গ্যাসের স্বর্গীয় আলো
(অননুভূতের মতো)—আমারে তোমার দিকে ডাকে।
প্রায়ই দেখা হয়—তবু—মনে হয়
বহুদিন মরেছিলে তুমি
এই দেশ থেকে দূরে—উত্তর-পশ্চিম দিকে
যেইখানে জুতো আঁটা পায়ের মতন নেমে—ভূমধ্যসাগরে
কোন এক দেশ ছিল হয়তো বা—
    আজও তার ল্যাম্পের কাছে

ভৌগোলিক বালকেরা অক্ষুণ্ন কৌতুকে চেয়ে
টের পায় নিমীল আলোয়
মানচিত্র ভেসে গেছে বেগুনি রঙের এক সমুদ্রের রোলে
সেই দেশে—কোনো এক নিচু আকাশের খোপে
আরো ক্ষুদ্রতর স্রোতে অদ্ভুত অসুস্থ এক মিউনিসিপালিটির
জন্মেছিল কয়েকটি ধূসর দেয়াল—রাত্রি—দরিদ্রতা
প্যারাফিন আলো—রুক্ষ ভাজা মাছ—ছবি—মাস—তুমি
অন্ধকার তাকে ছিল আরক ও বৃশ্চিকের মৃতদেহে মেলানো শিশির
সমধিক নীরবতা—
তবুও জানালা দিয়ে আকাশের তুস্থ কুকুরীকে
দেখা যেত ব্রহ্মহৃদয়—বলা যেত ঐ বৃষ—ঐ মৃগশিরা—
আর্দ্রা—অগ্নি—সরমা—রোহিণী—বানরাজা—
শহরের মেয়রের চেয়ে কিছু বড়ো ওরা হয়তো বা
নড়ে যায় টি-পার্টিতে—কিংবা অন্য চিক্কন চিপ্‌টেনে
ময়দানের সমুজ্জ্বল বিমুক্তিতে ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ ক্লবে
(মুখোমুখি পুরুষ-নারীর নীল নিট্‌ ক্লোজ-অপে)
এসে যেত হিম হাওয়া। অস্পষ্ট দৈত্যের মতো একা
তিন বার তিন ধনু দূর থেকে পাহাড়ের চূড়া
থেমে যেত—থেমেছে হঠাৎ যেন ; বরাবরই থেমে রবে ব'লে।

আমরাও থেমে গেছি—ডালমুট খেতে গিয়ে
হিম পকেটের থেকে হঠাৎ কমলালেবু
আধেক তুলিতে গিয়ে—
আমি যে শিশুর পিতা—আরো ঢের দূরে
ছোটো হেতু হেঁয়ালির মধ্য-নরকের ফাঁকে—হেত্বাভাসে থাকি
অনেক বীজাণু ধুলো কৃকলাসদের মতো এসে বিছানার 'পরে
আগাগোড়া খেয়ে ফেলে তবু যেই শিশুর মায়ের

হৃদয়যন্ত্রকে ফেলে রেখে গেছে সময়ঘড়ির মুখে, ভুলে—
তাকে নিয়ে ঘর করি—
    নির্জন শীতের রাতে দম্পতির বিছানায় তাই
অনুকম্পা পা গলিয়ে বলে যায় : 'খেলনার রঙিন দোকানে
সেলুলয়েডের মতো প্রেম হত ; তবু—তোমাদের—
রুধিরে জন্তুরও লিপ্সা নেই—'

সেই সব জান তুমি ? সেদিনও জানিতে তুমি ? তুমি
কী করে জন্ম নিলে—কী করে জন্ম দেয় জীবনকে নারী
সেইসব প্রণালীর থেকে ঢের দূরে স'রে একা
তবুও রাত্রি এলে নেউলের শরীরের মতন ধূসর
বিছানা রাখিবে পেতে—আঞ্জির শাখার মতো অন্ধকারে তুমি।
(আগাগোড়া নগরীর ভাঁড় আর মাতালের সংঘকে
মোলায়েম করে দিতে ভাঁড়ারের পনিরের মতো।)
দুই জন যুবকের জন্যে শুধু। 'তুমি একজন' ?
তাই মৃত্যু হল তার হাতে (সেই) তুষের রঙের মতো ম্লান
বিছানার। গাটাপার্চা পুতুলের হে চিকুর জননী, তোমার—
তোমার সে বৃশ্চিক—দেয়াল—লেবু—মাছ—প্যারাফিন—
থুতনিতে হিম হাওয়া—বিকেলের কুয়াশায়
অকস্মাৎ আগন্তুক জেঠিমার মতো সেই পাহাড়ের
    শেষ হল।
(রোজই দেখা যায়—তবু মনে হয়
ঢের দিন বিদেশের অন্ধকারে মরে ছিলে তুমি।)

সমুদ্রের ওই পারে নদী আছে—নদীর ওপারে
বাটা মাছ ভাজে তারা জলপাই তেলে
সেই ঘ্রাণ নিয়ে রাত্রি যেখানে উঠেছে জেগে

চেয়ারম্যানের মুখ—দরিদ্রতা—গোল শহরের
ম্লান আলো—ধূসর দেয়াল—
ক্বাথ—কুজ্ঝটিকা—অন্ধকার ঘিরে
তবুও তুমিও ছিলে সেইখানে—মৃত্যু হল সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে তবু,
অপারগ ধাত্রীর হাতে। অথবা কী করে তার মৃত্যু হল—
ধোঁয়াটে কাহিনী এক—আজ রাতে মনে নেই কিছু ;
আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কারু কিছু মনে নেই।

গতিবিধি

সর্বদাই প্রবেশের পথ রয়ে গেছে ;
এবং প্রবেশ করে পুনরায় বাহির হবার—
অরণ্যের অন্ধকার থেকে এক প্রান্তরের আলোকের পথে ;
প্রান্তরের আলো থেকে পুনরায় রাত্রির আঁধারে ;
অথবা গৃহের তৃপ্তি ছেড়ে দিয়ে নারী, ভাঁড়, মক্ষিকার বারে।
এইসব শরীরের বিচরণ।
ঘুমায়ে সে যেতে পারে।
(সচেতন যাত্রার পথ তবু আরো প্রসারিত।
আলো অন্ধকার তার কাছে কিছু নয়।)
উটপাখি সারা দিন দিবারৌদ্রে ফিরে
বালির ভিতরে মাথা রেখে দিয়ে আপনার অন্ধ পরিচয়
হয়তো বা নিয়ে যায়— তা, পাখির বিনয়।

কোনো এক রমণীকে ভালোবেসে,
কোনো এক মড়কের দেশে গিয়ে জোর পেয়ে,
কোনো এক গ্রন্থ প'ড়ে প্রিয় সত্য পেয়ে গেছি ভেবে,
অথবা আরেক সত্য সকলকে দিতে গিয়ে অভিভূত হয়ে,

শরতের পরিষ্কার রাত পেয়ে সবচেয়ে পোশাকী, উজ্জ্বল—
চিন্তা তবু বর্ষারাতে দ্বার থেকে দ্বারে
ভিজে কুকুরের মত গাত্রদাহ ঝাড়ে।
সমাধির ঢের নীচে—নদীর নিকটে সব
উঁচু-উঁচু গাছের শিকড় গিয়ে নড়ে।
সেইখানে দার্শনিকদের দাঁত ক্বাথ পান করে
পরিত্যক্ত মিঠে আলু, মরামাস, ইঁদুরের শবের ভিতরে—
জেনে নিয়ে আমরা প্রস্তুত করে নেই নিজেদের ;
কেননা ভূমিকা ঢের রয়ে গেছে,
বোঝা যাবে (কিছুটা বিনয় যদি থেকে থাকে চোখে)—
সুশ্রী ময়ূরও কেন উটপাখি সৃষ্টি করেছিল
টানাপোড়েনের সুরে—সূর্যের সপ্তকে।

নির্দেশ

জীর্ণ শীর্ণ মাকু নিয়ে এখন বাতাসে
তামাসা চালাতে আছে পুনরায় সময় একাকী।
তবুও সে ভোরবেলা হরিয়াল পাখি
ধূসর চিতলমাছে—নির্ঝরের ফাঁসে
খেলা করে কাকে দিয়েছিল তবে ফাঁকি ?
বসন্তবউরী দুটো এই ব'লে হা-হা করে হাসে।
সেই হাসি জ্বলে ওঠে নির্ঝরের 'পরে ;
গড়ায়ে গড়ায়ে গোল নুড়ি
উজ্জ্বল মাছের সাথে ভোরের নির্ঝরে
সময়ের মাকুটাকে করে দিল উড়ুখুড়ুখুড়ি।
বিরক্ত সময় তাই খুঁজে নিতে গেল কোনো বিষয়ান্তরে
নিজের নিয়মাধীন হৃদয়ের জুড়ি।

আলো যদি নিভে যায় সময়ের ফুঁয়ে
তা হলে কাহার ক্ষতি—তা হলে কাহার ক্ষতি হবে।
এই কথা ভেবে যায় কালো পাথরের ’পরে নুয়ে
মৈত্রেয়ী—নাগার্জুন—কৌটিল্য নীরবে।
তিন হয়, চার হয়, পাঁচ হয় তবুও তো দুয়ে আর দুয়ে।
হেঁয়ালি ও নিরসন নির্ঝরের নিক্বণের মতো বেঁচে রবে।

প্যারাডিম

সময়ের সুতো নিয়ে কেটে গেছে ঢের দিন
এক-আধবার শুধু নিশিত ক্ষমতা
এসেছিল,—তারপর নিভে—মিশে গেছে ;
হৃদয় কাটাল কাল।
বালুঘড়ি বলে গেল : সময় রয়েছে ঢের
সেই সুর দূর এক আশ্চর্য যক্ষের
চোখের ভিতরে গিয়ে স্বর্ণ দীনারের
অমোঘ বৃত্তের মতো রূপ নিয়ে নড়ে।

বালুঘড়ি বলে যায় : সময় রয়েছে ঢের
সময় রয়েছে ঢের ইহাদের—উহাদের ;
সমুদ্রের বালি আর আকাশের তারার ভিতরে
চলেছে গাধার পিঠে—সিংহ, মেষ, বিদূষক,
মূর্খ আর রূপসীর বিবাহে ঘটক,
ক্রীতদাস কাফরি তেল বয়ে আনে।
সময় রয়েছে ঢের—সময় রয়েছে ঢের
সরবরাহের সব অগণন গণিকারা জানে।

চারি দিকে মৃগয়ার কলরব—সময়ের বীজ।
অনেক শিকারী আজ নেমেছে আলোকে।
আমিও সূর্যের তেজ দেখে গেছি বহুক্ষণ
ভারুই পাখির মতো চোখে ;
ঘুরুনো আলোয় ঘুরে সংস্কারে ;—উড়িবার হেতু
যদিও নেইকো কিছু ক্ষিতিজ রেখার পথে আর।
বহু আগে রণ করে গিয়েছিল বুদ্ধ আর মার ;
অগ্নির অক্ষরে তবু গঠিত হতেছে আজও সেতু।
ব্রহ্মার ডিমের মাঝে একসাথে জন্মেছিল যারা ভালোবেসে
সেই স্বর্গ-নরককে আবার ক্ষালন করে—প্রামাণিক দেশে
তারাই তো রেখে দেবে—
        মাঝখানে যদিও রয়েছে আজ বিরক্ত সাগর,
বিশ্ববাসীরা চোখ বুঝে বয়ে নেয় মুণ্ড আর কঙ্কালের কেতু।

সম্রাটের সৈনিকেরা পথে পথে চ'রে
খুঁজে ফেরে কোনো এক শুভলাঞ্ছন ;
সফেন কাজের ঢেউয়ে মৃত্যু আছে—জানে ;
তারও আগে রয়ে গেছে জীবন-মৃত্যুর অমিলন ;
যেন কোনো নরকের কর্নিশের থেকে ধীরে উঠে
কোনো এক নিম্নতর আঁধারের বিজৃম্ভিত কাক
আবার সাজাতে পারে দু-মুহূর্ত ময়ূরের মতন পোশাক—
সৈকতে বালির কণা নক্ষত্রের রোলে যদি একসাথে জুটে
আবছায়া, অগ্নিভয়, অন্ধকার—সময়ের হাতে ঠেলে ফেলে
অনাবিল অন্তঃসার নিতে দেয় খুঁটে।

সৈনিকের সম্রাটেরা স্থিরতর—তবু ;

চারিদিকে মাতালের সাবলীল কাজ শেষ হলে
প্রতিধ্বনিও আর থাকে নাকো যখন আকাশে
জলের উপরে হেঁটে মায়াবীর মতো যায় চলে।
(গভীর সৌকর্য দেখে মানবীয় আত্মা জাগে জন্তুদের ভিড়ে ;)
অবিস্মরণীয় সব ইতিহাসপর্যায়ের দিকে
চেয়ে দেখে সর্বদাই পৃথিবীর প্রবীণ জ্ঞানীকে
ডেকে আনে তারা নিত্য নতুন তিমিরে ;
'নিপুণ ছেলের হাতে লাটিমের মতো ঘোরে' দ্বৈপায়ন বলে
ঘুরায়ে নিবিড় সেই প্যারাডিমটিরে।

*

'যখন চিনির দাম বেড়ে গেছে ভয়ঙ্কর
তারা খায় স্বেচ্ছায় নুনের পরিজ।
সমস্ত ভণ্ডুল হয়ে গেলে সব পৃথিবীর,
মসৃণ টেবিলে বসে খেলে যায় ব্রিজ।
জীবনকে স্বাভাবিক নিঃশ্বাসের মতো মেনে নিয়ে
মঞ্চে বক্তৃতা দেয় কর গুণে—কুকুর ক্ষেপিয়ে।'
ব'লে গেল অত্যন্ত অদ্ভুত এক টুপিব্যবসায়ী নেমে এসে ;
যেখানে সম্ভ্রম করা সমুচিত সেখানে ভাঁড়ের মতো হেসে।

'সমস্ত সভার মাঝে তারপর
দম আর থাকে নাকো কোনো কুকুরের ;
একটি মাছিও আর বসে নাকো বক্তার নাকে
একটি মশাও তাকে পায় নাকো টের ;
এবং পায়ের নীচে পৃথিবীরও মাটি আর নেই
তবু সবই পাওয়া যাবে চালানির মাল ছাড়লেই।'
ব'লে গেল অত্যন্ত অদ্ভুত এক টুপিব্যবসায়ী নেমে এসে ;
যেখানে সম্ভ্রম করা সমুচিত সেখানে ভাঁড়ের মতো হেসে।

‘আমরা সকলে জানি বানরাজা নক্ষত্রের থেকে
সে জাহাজ এসে গেছে মৃগশিরা তারকার দিকে ;
হয়তো সরমা তাকে তুলে ধরে সারমেয়দের
নিকটে পাঠায়ে দেবে নির্জন তারিখে।
সম্প্রতি রুটিন তবে শেষ করে—ঘুমাবার পরে
আবার সে দেখা দেবে আমাদের স্বাভাবিক সুবিধার তরে।’
বলে গেল অত্যন্ত অদ্ভুত এক টুপিব্যবসায়ী নেমে এসে ;
যেখানে সম্ভ্রম করা সমুচিত সেখানে ভাঁড়ের মতো হেসে।

রাত্রি

অইখানে কিছু আগে—বিরাট প্রাসাদে—এক কোণে
জ্বলে যেতেছিল ধীরে এক্‌সটেন্‌শন্ লেক্‌চারের আলো।
এখন দেয়ালে রাত—তেমন ততটা কিছু নয় ;
পথে পথে গ্যাসলাইটে রয়েছে ঝাঁঝালো
এখনও সূর্যের তেজ উপসংহারের মতো জেগে।
এখনও টঙ্গে চড়ে উপরের শেলফের থেকে
বই কি বিবর্ণ কীট—ধুলো—মাকড়সা বার হবে
দোকানের সেল্‌স্‌ম্যান চুপে ভেবে দেখে।
এখনও নামে নি সেই নির্জন রিক্‌শগুলো—নিয়ন্তার মতো,
সমূহ ভিড়ের চাপে রয়েছে হারায়ে।
অজস্র গলির পথে একটি মানুষ
যুগপৎ রয়েছে দাঁড়ায়ে ;
পৃথিবীর সকলের হৃদয়ের প্রতীকের মতো ;
এই রাত থেকে আরো অধিক গভীরতর রাতে
কলুটোলা—পাথুরিয়াঘাটা—মির্জাপুরে

এস্‌প্লানেডের ফুটপাতে
মালাঙ্গা লেনের পথে—ক্রিক রো-তে
কক্‌বার্ন লেনের ভিতর
একজোড়া শিঙ যদি দেখা দেয় লোকটার টাকে—
পরচুলা চুরি করে নিয়ে গেছে তবে জাদুকর।
এখানে রাত্রির পারে তোমার নিকট থেকে আমি
চলে গেলে
চলে যাব ;
পৃথিবীর কাছ থেকে নয় ;
রাত্রি এই সারারাত জীবনের সকল বিষয়
হয়ে আছে।
তিত্তিরাজ গাছ থেকে শিশির নীরবে
ঝরে যায় ;—
ডানার আঘাত যায় কাকদম্পতির :
হলুদ খড়ের ’পরে ঝরে পড়ে আবার শিশির
হাওয়ার গুঁড়ির মতো।
কোথায় হারায়ে তুমি গিয়েছ কখন।
মাথার উপরে সব নক্ষত্রেরা ছুরির মতন বিচক্ষণ
সময়ের সুতো কেটে—অবিরাম সময়ের সুতো কেটে ফেলে ;
আমার চোখের ’পরে রাত্রির প্রাঞ্জলতা ঢেলে ;
কোথাও বাতাবি উষ্ণ হয়ে ওঠে—ঘুরে যায় মাকড়সা পোকার লাটিম ;
ভাঁড় হাসে—সম্রাজ্ঞীর অবয়ব হয়ে থাকে হিম ;
নদীরা শিশুর মতো—শিশুরা নদীর মতো দূর ;
স্বর্গের কিনারে গিয়ে ভিড় আর ভিখিরির নীল আলো করে টিমটিম।
শিশুর কপাল থেকে বেজে ওঠে নরকের বিচিত্র ডিণ্ডিম।

রবীন্দ্রনাথ

অনেক সময় পাড়ি দিয়ে আমি অবশেষে কোনো এক বলয়িত পথে
মানুষের হৃদয়ের প্রীতির মতন এক বিভা
দেখেছি রাত্রির রঙে বিভাসিত হয়ে থেকে আপনার প্রাণের প্রতিভা
বিচ্ছুরিত করে দেয় সংগীতের মতো কণ্ঠস্বরে।
হৃদয়ে নিমীল হয়ে অনুধ্যান করে
ময়দানবের দ্বীপ ভেঙে ফেলে স্বভাবসূর্যের গরিমাকে।
চিন্তার তরঙ্গ তুলে যখন তাহাকে
ডেকে যায় আমাদের রাত্রির উপরে—
পঙ্কিল ইঙ্গিত এক ভেসে ওঠে নেপথ্যের অন্ধকারে :
আধো ভূত আধেক মানব
আধেক শরীর—তবু—অধিক গভীরতরভাবে এক শব।

নিজের কেন্দ্রিক গুণে সঞ্চারিত হয়ে উঠে আপনার নিরালোকে ঘোরে
আচ্ছন্ন কুহক, ছায়া, কুবাতাস—আধো চিনে আপনার জাদু চিনে নিতে
ফুরাতেছে—দাঁড়াতেছে।—তুমি তাকে স্থির প্রেমিকের মতো অবয়ব দিতে
সেই ক্লীব বিভূতিকে ডেকে গেলে নিরাময় অদিতির ক্রোড়ে।
অনন্ত আকাশবোধে ভরে গেলে কালের দু ফুট মরুভূমি।
অবহিত আগুনের থেকে উঠে যখন দেখেছ সিংহ, মেষ, কন্যা, মীন
ববিনে জড়ানো মমি—মমি দিয়ে জড়ানো ববিন,—
প্রকৃতির পরিবেদনার চেয়ে বেশি প্রামাণিক তুমি
সামান্য পাখি ও পাতা ফুল
মর্মরিত করে তোলে ভয়াবহভাবে সৎ অর্থসংকুল।
যে সব বিস্রস্ত অগ্নি লেলিহান হয়ে ওঠে উনুনের অতলের থেকে
নরকের আগুনের দেয়ালকে গড়ে,
তারাও মহৎ হয়ে অবশেষে শতাব্দীর মনের ভিতরে
দেয়ালে অঙ্গার, রক্ত, একুয়ামেরিন আলো এঁকে

নিজেদের সংগঠিত প্রাচীরকে ধূলিসাৎ করে
আধেক শবের মতো স্থির ;
তবুও শবের চেয়ে বিশেষ অধীর :
প্রসারিত হতে চায় ব্রহ্মাণ্ডের ভোরে ;
সেই সব মোটা আশা, ফিকে রঙ, ইতর ফানুস,
ক্লীবকৈবল্যের দিকে যুগে যুগে যাদের পাঠাল দরায়ুস।

সে সবের বুক থেকে নিরুত্তেজ শব্দ নেমে গিয়ে
প্রশ্ন করে যেতেছিল সে সময়ে নাবিকের কাছে :
সিন্ধু ভেঙে কত দূর নরকের সিঁড়ি নেমে আছে ?
ততদূর সোপানের মতো তুমি পাতালের প্রতিভা সেঁধিয়ে
অবারিতভাবে শাদা পাখির মতন সেই ঘুরুনো আধারে
নিজে প্রমাণিত হয়ে অনুভব করেছিলে শোচনার সীমা—
মানুষের আমিষের ভীষণ ম্লানিমা,
বৃহস্পতি ব্যাস শুক্র হোমরের হায়রান হাড়ে
বিমুক্ত হয় না তবু—কী করে বিমুক্ত তবু হয় :
ভেবে তার শুক্ল অস্থি হল অফুরন্ত সূর্যময়।

অতএব আমি আর হৃদয়ের জনপরিজন সবে মিলে
শোকাবহ জাহাজের কানকাটা টিকিটের প্রেসে
রক্তাভ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই অভিজ্ঞের দেশে
প্রবেশ করেছি তার ভূখণ্ডের তিসি ধানে তিলে।
এখানে উজ্জ্বল মাছে ভরে আছে নদী ও সাগর :
নীরক্ত মানুষদের উদ্‌বোধিত করে সব অপরূপ পাখি ;
কেউ কাকে দূরে ফেলে রয় না একাকী।
যে সব কৌটিল্য, কূট, নাগার্জুন কোথাও পায়নি সদুত্তর—
এইখানে সেইসব কৃতদার, ম্লান দার্শনিক

ব্রহ্মাণ্ডের গোল কারুকার্য আজ রুপালি, সোনালি মোজায়িক।

একবার মানুষের শরীরের ফাঁস থেকে বার হয়ে তুমি :
(সে শরীর ঈশ্বরের চেয়ে কিছু কম গরীয়ান)
যে-কোনো বস্তুর থেকে পেতেছে সস্মিত সম্মান ;
যে-কোনো সোনার বর্ণ সিংহদম্পতির মরুভূমি,
অথবা ভারতী শিল্পী এক দিন যেই নিরাময়
গরুড় পাখির মূর্তি গড়েছিল হাতির ধূসরতর দাঁতে,
অথবা যে মহীয়সী মহিলারা তাকাতে তাকাতে
নীলিমার গরিমার থেকে এক গুরুতর ভয়
ভেঙে ফেলে দীর্ঘ ছন্দে ছায়া ফেলে পৃথিবীর 'পরে—
কবিতার গাঢ় এনামেল আজ সেইসব জ্যোতির ভিতরে।

গরিমা

সহসা ঝড়ের দিনে লুণ্ঠনের ঊর্ধ্বে উঠে চিল
আমারই এ হৃদয়ের মতো
হয়তো বা নীলিমাকে চায়।
তবুও দৈত্যের কাছে প্রেমিকেরা হবে পরাহত ;
পরিহাস করে যায় বিরক্ত নিখিল ?

কখন সে পড়ে গেছে আমাদের পায়ের নিকটে
সোনালি, প্রবীণ এক পাখি ;
জীবনকে আকৃতির মতো বড়ো মনে করেছিল ;
তবুও আজ আকাশের মতো আরো বৃহৎ—একাকী

মৃত ; মৃত্যু—প্রিয় আজ আমি তার হাতে আঁকা পটে।

চারি দিকে অবিকল বিকেলের রাঙা সূর্য জ্বলে ;
নদীর জলের সুর সন্তর্পণে কান পেতে প্রবাহিত হয় ;
আমার হৃদয়ে যেই সুশৃঙ্খলা হয় না গ্রথিত
আকাশ বাতাস নদী তাই নিয়ে তবুও তন্ময়।
এই সব অভিজ্ঞান রয়ে যাবে দু-একটি গরিমার মতো।
অথবা গরিমালোক এই শতাব্দীর হাওয়া এক গাল
পান করে শেষ হয়ে গেলে
ফট্‌কাবাজার সব—সেয়ানে সেয়ানে এসে মেলে।

আবছায়া

ভোরের বেলায় আজ একটি কঠিন অবসাদ
বিকেল বেলায়ও আজ একটি কঠিন
বিষণ্নতা লেগে আছে পৃথিবীর বুকে।
একটি কৃষাণ এসে দুয়ে দুয়ে যোগ করে তিন
লিখে যায় সারা দিন মাঠের ভিতরে।
কোথাও ফলন নেই তার।
ঠাণ্ডা কঙ্কালের কাছে সারারাত গুঁড়িসুড়ি মেরে শুয়ে থাকে ;
কিছুই করে না অস্বীকার।

২

নিমীল জলের ঢেউয়ে নদী চলে যায়।
জল ছাড়া কিছু নেই তার।
কখন সকালবেলা বিকেল হয়েছে
আমাদের চেনা শতাব্দীও চলে গেছে।

চলেছে সে জলপায়রার নীড় খুঁজে।
নদীর কিনারে
বাদামি মাটির ’পরে ঝরে পড়ে পাতা।
এই সব শাদা সাধারণ বিশ্বস্ততা।

আমারও আঙুলে পড়ে থেমে থাকে—যতদিন আছে—
একটি হলুদ পাতা। নিকটের গাছে
কোথাও কোকিল হিম শূন্যতার পানে গান গায়,
পাখিটির ভয়াবহ একাগ্রতার তুলনায়

কেবলই সময়ান্তর এসে প’ড়ে সভ্য পৃথিবীতে ;
বারবার অপরাহ্ণের মৃত্যু হয়।
জানে না কী বস্তু নিয়ে তৃপ্ত হতে হবে
পুরাতন খসড়ায়—অথবা বিপ্লবে।

কুহুলিন

এইখানে অন্ধকার রচনা করেছে তার সপ্রতিভ মুখের পৃথিবী।
এইখানে শীতের বাতাস
মৃদু উষ্ণতার সাথে মিশে কামিনী ফুলের মতো যেন বারো মাস।
মৃত নারীদের সব সমাধিতে—কিছুই লুণ্ঠিত হবে নাকো আর—এমন আভাস।
এখানে শিশির ঝরে দূরবীন-অগোচর কুহুলিন নক্ষত্রের থেকে।
কোথাও নেইকো কোনো পাখি।
মিরুনি নদীর জলে বৃহস্পতি, মঙ্গল, মৃগশিরা ভেসে গেলে বাকি
ইতস্তত তারাগুলো চেয়ে থাকে মৃতদার সারসের মতন একাকী।

সহসা নদীর জলে সূচীমুখ নড়ে ওঠে বলে মনে হয় ;
চেয়ে দেখি নির্জন হাত
আমার চোখের চাওয়া তারকায় না জেগে হয়েছে ধূলিসাৎ :
মেধাবীর ভূয়োদর্শনের মতো রাসভের নিকটে হঠাৎ।

এখানে শিশির ঝরে সময়বিন্দুর মতো কুহুলিন নক্ষত্রের থেকে।
এদেশ মালয়, বালি, শ্যাম, ইন্দোচীন
সমুত্তীর্ণ হয়ে তবু স্বর্গ-নরকের চোখে চিরকাল সমভাবে বিবেচনাধীন ;
লঘুগুরু কুয়াশার আবরণ থেকে চেয়ে দেখেছে অনপনেয় কুহুলিন।

ঘাস

মরণ তাহার দেহ কোঁচকায়ে ফেলে গেল নদীটির পারে।
সফেন আলোক তাকে চেটে গেল দুপুরবেলায়।
সবুজ বাতাস এসে পৃথিবীতে যাহা কোঁচকায়
তাহাকে নিটোল করে নিতে গেল নিজের সঞ্চারে।
উৎসাহে আলাপী জল তাহাকে মসৃণ
করে নিতে গেল—তবু—সময়ের ঋণ
ধীরে ধীরে ডেকে নিয়ে গেল তাকে কুৎসিত, কাঠ নগ্নতায়।
তখন নরক তার অকৃত্রিম প্রাচীন দুয়ার
খুলে দিতে গেল দেখে কানসোনা ঘাসের ভিতরে
সহসা লুকায়ে গেল ঘাসের মতন তার হাড়।
সেই থেকে হাসায় এ পৃথিবীকে ঘাস
ছ-মাস গাধাকে, আর মনীষীকে মিহি ছয় মাস।

সমিতিতে

ঐখানে বিকেলের সমিতিতে অগণন লোক।
উঠেছে বক্তা এক—ষড়যন্ত্রহীনভাবে—দেখে
দশ-বিশ বছরের আগে এক সূর্যের আলোক
সহসা দেখেছে কেউ—যদিও অনেকে
আশীর্বাদ করে ওর সূত্র উষ্ণ হোক ;
আরো অবারিত সুর বার হোক মাইক্রোফোন থেকে।

আরো বিস্তারিত সুর বার হোক—বার হয় যদি।
কেননা যুগের গালে কালি আর চুন।
আমাদের জলের গেলাস তবু হতে পারে নদী ;
গোলকধাঁধার পথ—আকাশে বেলুন।
তাহলে বলুন এই শতাব্দীর সমাপ্তি অবধি—
কী করে একটি চোর সাতজন প্রেমিককে করেছিল খুন।

রবীন্দ্রনাথ

দেয়ালচিত্রের শীর্ষে পৃথিবীর কোনো এক আশ্চর্য প্রাসাদে
একটি গভীর ছবি মানুষ দেখেছে চিরকাল।
কেউ তাকে সূর্য বলে মনে করেছিল ;
কেউ তাকে ভেবেছিল গরুড়ের উড্ডীন কপাল :
যখন সে অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে
উদয় ও অস্তকে এক করে দিতে ভালোবাসে ;

শাদা রাজবিহঙ্গের প্রতিভায় বৈকুণ্ঠের দিকে উড়ে যায়,
হয়তো বা আমাদের মর্তপৃথিবীতে ফিরে আসে।
তাকাতে তাকাতে সেই প্রাসাদের মেধাবী দেয়ালে
আমাদের ইহলোক বলে মনে হয়—তবু সৃষ্টির অনন্ত পরকাল।

তোমার বিভূতি, বাক্-বেদনার থেকে উঠে নীলিমা সংগীতি
আমাদের গরিমার বিকীরণে ডুবে, গড়ে গেছে সব মানুষের প্রাণ :
কী করে কল্যাণকৃৎ অর্থের তরঙ্গে জেগে (মোম নিভে গেলে)
স্বাতী, শুক্রতারকার মতন ধীমান
মহা অবয়বদের থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠে আভা দিতে পারে :
শেয়াল শকুন শনি বানরের সমাজ ও রাষ্ট্রের ’পরে ;
সৃজনের আদি অন্তিমের রাঙা আগুনের মতো গোলাকার
ব্যাপ্ত এক সংগীতের বৃত্তের ভিতরে
পেয়ে যেতে পারে তার তিসি তিলে বিম্বিত ব্রহ্মাণ্ডের মানে ;
সে সুর নিমীল হয়ে, লেলিহান হয়ে, নিমীলিত হতে জানে,

মহান, তোমার গানে ; এই সব বলয়িত করে চিরদিন—
অথবা যখন তুমি আমাদের দেশে সৃষ্টি শেষ করে ফেলে
প্রকৃতির আগুনের উৎস থেকে উঠে এক দিন
নিঃস্বার্থ আগুনে ফিরে গেলে,
পতঞ্জলি, প্লেটো, মনু, ওরিজেন, হোমরের মতো
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি একটি পৃথিবী ভাঙা-গড়া শেষ করে দিয়ে, কবি,—
দানবীয় চিত্রদের অন্তরালে আপনার ভাস্বরতা নিয়ে ;
নিকটে দাঁড়ায়ে আছে নিবিড় দানবী।
অথবা ছবির মতো মনে হয় আমার অন্নপানদোষে ম্লান চোখে :
অল্প আলোকের থেকে পুরাণপুরুষ সব
চলে যায় অনুমেয়, অজ্ঞেয় আলোকে।

কোরাস

গম্ভীর নিপট মূর্তি সমুদ্রের পারে
এখনও দাঁড়ায়ে আছে।
সূর্যের আলোয় সব উদ্ভাসিত পাখি
আসে তার কাছে।
জান না কী চমৎকার !
বলিল মৃতের হাড়, বিদূষক, তরবার,
আর যে বলদ তার ফলার খেয়েছে ঘানিগাছে।

হে চিল, চিলের গান জৈষ্ঠের দুপুরে,
হে মাছি, মাছির গান,
সমুদ্রের পারে এক শব্দহীন মূর্তির বিরাম ;
আর সব শাদা পাখি সূর্যের সন্তান।
জান না কী চমৎকার !
বলিল মৃতের হাড়, বিদূষক, তরবার,
আর যে বলদ তার ফলার খেয়েছে ঘানিগাছে।

আলোর ভিতর দিয়ে হেঁটে চলে যাবার কৌশল
কেবলই আয়ত্ত করে নিতে চায় পৃথিবীর উৎকণ্ঠিত ভিড়।
সৈকতে পাখিদের বরফের মতো শাদা ডানা
সূর্যের পাকস্থলীর।
জান না কী চমৎকার !
বলিল মৃতের হাড়, বিদূষক, তরবার,
আর যে বলদ তার ফলার খেয়েছে ঘানিগাছে।

কেবলই পায়ের নীচে বালির ভিতরে
উঠে আসে পারাপার-প্রত্যাখ্যাত হাড় ;
কালো দস্তানায় যেন সমর্পিত, অব্যক্ত হাত—
তাদের দেখায় কিমাকার।

গম্ভীর নিপট মূর্তি সমুদ্রের পারে
এখনও দাঁড়ায়ে আছে।
সূর্যের আলোয় সব উদ্ভাসিত পাখি
আসে তার কাছে।
জান না কী চমৎকার !
বলিল মৃতের হাড়, বিদূষক, তরবার,
আর যে বলদ তার জুড়িকে চেখেছে ঘানিগাছে।

রবীন্দ্রনাথ

আজ এই পৃথিবীতে অনেকেই কথা ভাবে।
তবুও অনেক বেশি লোক আজ শতাব্দী-সন্ধির অসময়ে
পাপী ও তাপীর শববহনের কাজে উচাটন
হয়ে অমৃত হবে সাগরের বালি, পাতালের কালি ক্ষয়ে ?

কোথাও প্রান্তরে পথে ফুল পাখি ঘাসের ভিতরে
সময় নিজেকে ফাঁকি না দিয়ে হয়তো নিখিল চালাতেছে ;
আড়াই চালের মতো রক্তের চঞ্চল তাল
সেখানে দু-এক মোড় খুলে, স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

নিমিষে আহ্নিকগতি উতরোল হয়ে উঠে ম্যামথের পরে—মানুষের।
কবি ও নিকট লোকের মতো, বড়ো এক প্রিয়—

অন্ধ মরুতে কবে ফা হিয়ান সূর্যের সোনা দেখেছিল—
বিশদ প্রসঙ্গে আজ ততোধিকভাবে স্মরণীয়।

বাতাসের শব্দ এসে

বাতাসের শব্দ এসে কিছুক্ষণ হরীতকী গাছের শাখায়
মিথিরিত হয়ে থেমে যায়, তার মৃত্যু হল বলে।
এক পা দুই পা করে দুই-চার মাইল
প্রান্তরের সাথে আরো পরিচিত হলে
এমনই প্রান্তর থাকে রৌদ্রময়, শব্দবিহীন,
যতক্ষণ অপরাহ্ণ বুকের উপরে পড়ে থাকে
তার ; শালিক পাখিকে আমি নাম ধরে ডাকি ;
ছায়া বা অনলোজ্জ্বল পাখিনীকে ডাকে
তবুও সে ; মানুষের অন্তঃসার অবহেলা করে
　　বিহঙ্গের নিয়মে নির্জন।
উনিশশো চল্লিশের কত গ্রাম, নগর গিয়েছে ;
　　সে সবের জনসাধারণ
উনিশশো বেয়াল্লিশ খৃষ্টাব্দের অপরাহ্ণে নেই।
উনিশশো অনন্তের ভূখণ্ডে, আকাশ
মাঝে মাঝে অনুভব করে নিতে চাই ;
শান্তি নেই ; নীললোহিতের প্রতি শেষ অবিশ্বাস
আছে কি না আছে ভেবে চেয়ে দেখি : পাখি, রৌদ্র, ঘাস।

অনুভব

আমরা আশ্চর্য পথে যাব না কি আর ?
কোথাও দেখার মতো রয়ে গেছে কিছু।

আত্রেয়ীর থেকে বঙ্গসাগরের সীমানা বিপুল ;
ভোরবেলা পশ্চিমের থেকে যাত্রা ক'রে
সায়াহ্নের বাংলার বদ্বীপের মতো উপকূল ;
লবণসমুদ্র তাকে যেমন উজ্জ্বল করে—সূর্য যা সব
রৌদ্র দিয়ে সৃষ্টি করে—
তা ছাড়া নীরব।

বাংলার মাঠের শিয়রে বড়ো চাঁদ
ধীরে এসে থেমে দাঁড়াতেই—
প্রকৃতি নিজের মনে যা দেয় তা ছাড়া
কোথাও বাড়ন্ত জ্যোৎস্না নেই।
মৃতদার হয়ে গেলে তবু তার ছায়ার মতন
এই সব এইখানে মানুষের মন
অধিকার করে থাকে।

এই দেশ সূর্যের, সাগরের আলো থেকে সেঁচা ;
তাম্রকায় মানুষের কাছে কিনে বেচা সব—মূল্যহীন ভাঁড়ারের পেঁচা
না জেনে জ্যোৎস্নায় ওড়ে কী রকম বিভাতির মতো
আজ কিছু শান্তি নয়—সুখ নয়,
ব্যথা নয়—তবে
ভেদাভেদ লোপ করে দিতে গিয়ে অন্তহীন বিভেদ জেগেছে,
ফুরাতেছে—এরকম শ্রেণীস্বার্থহীন অনুভবে।

আলোসাগরের গান

মানুষের ঘনবসতির ঢেউ নিরুত্তেজ রোদের ভিতরে
ছড়ায়ে রয়েছে প্রাচী, অবাচীর, উদীচীর দিকে।
তাদের ওপারে সূর্য উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে

আজ এই বিকেলের আলোর নিরিখে

চুপে-চুপে ডুবে যায়।—উত্তরার ভ্রূণ নষ্ট হলে,
বুদ্ধের মৃত্যুর পরে কোনো একদিন—
লেনিনের লুপ্তি হলে—এরকম ডুবে যেতেছিল।
বাংলার সাগরের আলাপ উড্ডীন

কয়েকটি হরিয়াল পথ খুঁজে পশ্চিমের পানে
কমলালেবুর মতো রঙিয়ান মেঘে
ডুবে গেলে মানুষের আজকের চিন্তার উদ্যম
'অল ক্লিয়ারে'র মতো অস্পষ্ট আবেগে

তিমির রাত্রির ক্রেংকার।
বাংলার হরিয়াল ! পশ্চিমের জাফরান মেঘ !
আমরা মানুষ—আজও—জীবিত ও মৃত—সাগরের,
আলোয় ভুলেছি ডোডো পাখিদের বিলীন বিবেক।

দোয়েল

একটি নীরব লোক মাঠের উপর দিয়ে চুপে
ঈষৎ স্থবিরভাবে হাঁটে।
লাঙল ও বলদের একগাল স্থির ছায়া খেয়ে
তাহার হেমন্তকাল দুই পায়ে ভর দিয়ে কাটে।

নিজের জলের কাছে ভাগীরথী পরমাত্মীয়।
চেয়েও পায় না তাকে কেউ তার সহিষ্ণু নিভৃতে।

লাশকাটা ঘরের ছাদের ’পরে একটি দোয়েল
পৃথিবীর শেষ অপরাহ্নের শীতে

শিস তুলে বিভোর হয়েছে।
কার লাশ ? কেটেছিল কারা ?
সারা পৃথিবীতে আজ রক্ত ঝরে কেন ?
সে সব কোরাসে একতারা।

অপরাহ্নের চাষা ভুল বুঝে হেঁটে যায় উচ্ছলিত রোদে।
নেই, তবু প্রতিভাত হয়ে ওঠে নারী।
মর্গের মৃতদেহ দোয়েলের শিসে মিটে গেলে
আদিম দোয়েল এলে—অনুভব করে নিতে পারি।

পৃথিবীলোক

দূরে কাছে কেবলই নগর, ঘর ভাঙে ;
গ্রামপতনের শব্দ হয় ;
মানুষেরা ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে,
দেয়ালে তাদের ছায়া তবু
ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়,
বিহ্বলতা বলে মনে হয়।

এ সব শূন্যতা ছাড়া কোনো দিকে আজ
কিছু নেই সময়ের তীরে।
তবু ব্যর্থ মানুষের গ্লানি ভুল চিন্তা সংকল্পের
অবিরল মরুভূমি ঘিরে
বিচিত্র বৃক্ষের শব্দে স্নিগ্ধ এক দেশ
এ পৃথিবী, এই প্রেম, জ্ঞান, আর হৃদয়ের এই নির্দেশ।

নিরীহ, ক্লান্ত ও মর্মান্বেষীদের গান

আমরা বিশেষ কিছুই চাই না এবার।
আমাদের অন্ধকার আলো
এনেছে অনেক কিছু অবিশেষ, অকিঞ্চিৎকর।
এমন অনেক দিন কেটেছে এমনভাবে,—তবে
আবার অনেক দিন তবুও কাটাতে চাই এরকমই।
হেমন্তে আশ্চর্য শাঁস ফলে গেছে কালো জলে,
পানিফলে, জাউয়ের ভিতরে ;
অথবা ফলেনি কিছু ;
ভাসুর পীড়িত হয়ে অতএব ভাদ্রবৌকে দেখে বকে ;
চোখ মেলে, চোখ বুজে দেখেছি অনেকবার সে রকম রুগ্ন দুর্ভিক্ষকে ;
সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা খুব বেড়ে গেলে অবশেষে ঘরে
চলে গেছি ;—হেমন্তের নীরবতা এরকমভাবে
আবার আসুক তবু—
আকাশের নক্ষত্রেরা যেমন নিরীহভাবে ঘুরে যায়
বিচ্ছেদ, মরণ, ভয় কলের চাকার মতো তেমনি ঘুরাবে
আমাদের সকলকে—আমাদের সকলকে নিয়ে ;
তেমনি নীরবে ;
শাদাসিদে ভাবে।
আমরা জলুস, জোর, কুকুর বা সিংহের সুরে
বাধা পাই ;
পেঁচা যে খড়ের চালে নেমে আসে পৌষের রাত্রির দুপুরে
সেই সুরে শান্তি আছে—শেষ আছে—মৃত্যু আছে জানি,
তবু সেই সুর ভালো।
উনিশতিরিশ থেকে উনিশচল্লিশ সাল তবু ভালো ছিল ;

আজ একচল্লিশে পৌষ মাসে কেমন অসাধ যেন।
মশা মেরে, ধান ভেনে, ইঁদুর তাড়িয়ে
মহাজনদের কাছে ঋণ নিয়ে—ঋণ খেয়ে—ঋণ ভুলে গিয়ে,
হাতুড়ের কাছে গিয়ে শিশিরের মতো শাদা শিশি—
যা সবের কাছে যা নেবার আছে—নিয়ে যাব ;
যা সবের কাছে যা দেবার আছে দিয়ে যাব ;
ক্রমাগত পায়ে হেঁটে আমাদের সন্তান ও সন্তানের সন্তানকে পৃথিবী হাঁটাব।

সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা খুব বেড়ে গেলে হত্তেল ঘুঘুদের ঘরে
অথবা ভিটেয় যেই গুণোপেত একটি বা দুটো ঘুঘু চরে—
সেইখানে অসংসর্গ অনুভব করে যাব—হেমন্তের নীরবতা এরকমভাবে
আবার আসুক তবু।
আকাশের নক্ষত্রেরা যেমন নিরীহভাবে ঘুরে যায়—
বিচ্ছেদ মরণ ভয় কলের চাকার মতো তেমন ঘুরাবে
আমাদের সকলকে—আমাদের সকলকে নিয়ে।

এখানে বিশেষ কিছু হয়নি অনেকদিন।
ক্রমাগত মানুষের মরণ হয়েছে।
গরিব, বেচারা, বুড়ো, বিকলাঙ্গ, মহৎ পার্ষদ সব
কী করে কেবলই খসে ধুলোসাৎ হয়ে যায়
দেখেছি উদাস, ক্লান্ত—অন্তরঙ্গভাবে ;
দেখে দেখে ঘরে ফিরে অন্ধকারে বিকল হতাম—
যদি না রাত্রির শেষে ভোর, সূর্য, সময়ের পরিস্রুত হাত
মুছে ফেলে দিয়ে যেত সব।
এই সব ছাড়া
এখানে বিশেষ কিছু হয় নি অনেক দিন।
সমুদ্রের বুদ্বুদের মতো অগণন সমুচ্ছ্বাস

তেমনই প্রবল কিছু চেয়ে গেছে,—পেয়ে গেছে ?—রাতে
ফিরেছে বিবিক্তভাবে সুতমিতরমণীর সমাজ জুড়াতে ;
ফেরে নি কি ?
আমরাও ঘুরে গেছি : আমাদের হৃদয়ের রুচি
আমাদের জীবনের উতরোল অপপ্রতিভাকে
ঘাইহরিণীর মতো যে রকম সৃষ্টির জ্যোৎস্নায়
যেমন সহিষ্ণুভাবে ডেকে গেছে,
যেমন নিবিড়ভাবে ডাকে—
সেই সুরে সাড়া দিয়ে।

কখন নদীর জলে অদলবদল করে ভেসে গেছে মেঘ, রাজহাঁস
পুনরপি মেঘগুলো—জলগুলো—আশ্বিনের মাস ;
ডুবে গিয়েছিল সব—নেই বলে মনে হয়েছিল :
সুরের ছোঁয়াচে সুর যে রকম হয়ে যেতে চায় অর্থহীনভাবে অনুপ্রাস।
কখনও ধানের ক্ষেতে ধান নেই।
কখনও ধানের ক্ষেতে কৃষাণের হাসি কোলাহল ;
গোলায়-গোলায় গঞ্জে ইঁদুরের বৌকাঁটকীর মতো কলরব ;
        বন্দর বেতার তার টের পায় সব।
কখনো পাটের ক্ষেত লক্‌লক্‌ করে ওঠে বাসুকির মতো ;
        আল কেউটেরা সব কৃষককে কাটে ইতস্তত ;
কখনও পাটের জমি চিত্রগুপ্ত বুঝে নিয়ে গেছে ;
একটি মূলেও কোনো ভুল নেই, আহা।
তবুও চড়কপূজা, ভাদুপূজা—কত না গাজন গান এল গেল ;
কত চাঁদ বড়ো হয়ে চালার পিছনে রাতে তারপর ছোটো হয়ে এল ;
গৃহস্থ, কৃষাণ মিলে ধোঁয়াটে জলের শ্যাম পানফল—
পোষলার পিঠে আর মিঠে তাড়ি খেল।
এ সব উৎসব তবু মৃত ইতিহাস ;

এ সব উৎসব কিছু নয়
সর্বদা উৎকণ্ঠা এক জেগে আছে সকল ঘনায়মান পার্বণের মাঝে,
মৃত্যুর উদ্‌বেগ ছেপে—আরও বেশি কূট ;
যে যার নিজের স্থানে উঠে চ'লে ব'সে
কেবলই জীবন, যৌন, নিরাশা, রিরংসা, অর্থ, দশ কথা ভেবে
তবুও একটি কথা ভাবে তারপর
নিজের মনের মুদ্রাদোষে।
পৌঢ়েরা এখন আরো বুড়ো,
যুবকেরা প্রৌঢ় হয়ে গেছে,
বালকেরা এখন যুবক ;
নারীর দেশের থেকে ঢের নারী হারায়ে যেতেছে ;
সকলই ভৃত্যের দেশ।
এই সব স্বাভাবিক—সাধারণ কথা ;
এখন মানুষ তবু স্বাভাবিকভাবে কথা ভেবে নিতে গিয়ে
কোথায় পেয়েছে সফলতা ?
আজ এই চতুঃসীমানার মুখে আমাদের প্রাণে যদি আত্মপ্রত্যয় থেকে থাকে
ঘাইহরিণীর মতো জীবনের হরিণকে তবে সে জ্যোৎস্নার পানে—
প্রেতজ্যোৎস্নার পানে ডাকে।
ডাকে না কি ?
নিতান্তই কোনো কিছু ভয়াবহ ভয় যদি আমাদের দিকে
ক্রমে-ক্রমে চলে আসে আজ,
তবুও তা ভয় বলে মনে হতে দেরি—
যত দিন দেরি হয়—ততদিন ভালো।
আমরা সকালবেলা পেয়ে গেছি সূর্যের আলো,
আমরা রাত্রিবেলা পেয়ে গেছি বাতি ;
গণেশ যে সব কূট শ্লোক নিয়ে একদিন বিবেচনা করে গিয়েছিল,
সহজ স্ফূর্তির মতো সে সব তোমার প্রাণে জন্মেছিল, ব্যাস,

স্বভাবসুখের মতো রাত্রির ফুটপাতে একদিন অগনি গ্যাস
জ্বলেছিল—মনে হয়েছিল—
আমরা সকলে
যে যার নিবিষ্ট জন্ম, প্রসন্নতা, মরণের কাজে
অজানিতে ঘুরে গেছি ; কথা
বলে বলে হয়রান মলিন জনতা
হয়ে গেছি ;
কেউ তবু হাড়ে হাড়ে আমাদের অল্পপ্রাণতাকে
চিনে জেনে নিতে গিয়ে ব্যথিত করেনি।
কি এক সম্পূর্ণ ঈর্ষা কেবলই নিকটে নেমে আসে তবু আজ ;
কখনও ধানের ক্ষেতে—কখনও নদীর ভুয়ো জলে
নিরন্ন বছর নামে ;
বর্গাদার—মহাজন—প্রজার মহলে
হুলুস্থূল পড়ে যায় ;
এখানে ভাগচাষ—শহরের হুণ্ডি—ঠিকাদার
ভূশণ্ডির মাঠ—ঘাঁটি—বারভূঞাদের ভূত—ব্যবচ্ছেদাগার—শব—
হাতুড়ে ডাক্তার—
ফিসফিস ষড়যন্ত্র—রাস্তার কানাচ—
এই সব সূর্যের চেয়েও বেশি বালুকার-আঁচ ;
এরা সব হুলুস্থূল করে যায়।
কোনো কোনো প্রৌঢ় এসে অত্যাচার করে ;
অগণন যুবকের ভিড়ে কোনো কাজ নেই—চিন্তার কুশল রয়ে গেছে ;
চারি দিকে সর্বগ্রাসী দরিদ্রতা ;
জনমানবের মুখে নিজ নিজ শোকাবহ গোপনীয় কথা ;
নিজেরই ঘরের জন্যে ঘরন্তী শক্তির নির্মমতা ;
মূর্খ দেশ, মেয়ে দেশ, প্রভু দেশ, ভৃত্য দেশ, পাগলের দেশ রয়ে গেছে,
রয়েছে বালির দেশ ;

দার্শনিকদের দ্বিধা—মনীষীর হৃদয়ের প্রেম
সে সব বালির ’পরে দাগ কেটে অন্তহীন স্বপ্নসৌধ গড়ে :
হৃদয়বিহীনভাবে ধূর্ত সমুদ্রের কাছে,
প্লোভারের, পায়রার বিষ্ঠার ভিতরে।
সবেরই স্বতন্ত্র বেদনা রয়ে গেছে।
এক বেদনার মাইল মাইল জুড়ে তিল
ধারণের স্থান আছে—আছে কিনা অপর ব্যথার ?
আমাদের সকলের বেদনা কি মিলেমিশে যেতে চেয়েছিল—
অথবা যে যার প্রাণে চেয়েছে কি—পেয়েছে কি ভীষণ স্বাধীন অন্ধকার ?
দেখি না—জানি না—তবু অনুভব ক’রে কোনো সূর্যালোকে অতিমৃত্যু পেলে
পুনরায় উষালোক হয়তো বা জীবনে পেতাম ;
আমরা পেতাম না কি ?
তবুও অনেক উষা এসে গেছে ইতিহাসে,—উষা সব নয় ;
জনসাধারণভাবে আজ আমাদের একাকী হৃদয়
অনেক জেনেছে—তবু অমেয় বিপ্লব শুরু শেষ হয়ে গেলে
রুটিনের সৌন্দর্য ও আত্মপ্রত্যয়
মানবজাতির কাছ থেকে চেয়ে নিখিলের মানবেরা পাবে ;
না হলে মানুষ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সন্দেহের দিব্যতায় কোথায় দাঁড়াবে।

মানুষ চারিয়ে

এবার তৃতীয়বার চলে যাব বিদেশভ্রমণে ;
এবার তৃতীয়বার হবে।
—স্ট্রান্ডের পথে ফিরে হাতুড়ে কামিন
এরকমভাবে অনুভবে
বিদেশভ্রমণে ক্রমে অগ্রসর হয় ;
চোখে তার সাধারণ নিপীড়িত মানুষের মতন বিনয়।

মৌসুমী মেঘের দিকে মুখ রেখে জাহাজের চোঙা
লবেজান অনেক জাহাজ
যদিও জীবিত, যুক্ত, পরিদৃশ্যমান
পৃথিবীর মতো জাঁহাবাজ—
হাভাতে বিড়াল এক ধোঁয়াটে রঙের এক শিকে
চিরদিন খেলা করে জন্ম দিয়েছিল তবু শ্রমজীবীটিকে।

তাই সে বিড়ালটাকে অবশেষে লেজে ধরে নিয়ে
লট্‌কায়ে শিকের মতন
দেখেছে নীচেয় শিকে থাবার উপরে ওৎ পেতে
বিড়ালের মতো মোতায়েন।
তবু এক দূর—আরো দূর দেশে আমদানি-রপ্তানি চলে
গাধার গড়ানে পিঠে বিড়াল ও শিকের বদলে।

সেইখানে সারেঙের মাসি, আর খালাসির কানামামা, খোঁড়া লস্কর—
তিনজনে ঝানু কামিনের সাথে মিলে
সকলেই যে যাহার জামিনে খালাস থেকে থেকে
সমুদ্রের পারে বসে একটি পাতিলে
মাছের সালুন খায় কোণ ঠেসে—কড়া পাকে জ্বাল ;
কেঁপে ওঠে বমারের কলরবে সারা দিন সমুদ্রের পারে বংশাল।

*

কোনো এক ভিখিরিকে শেষ রাতে হাওয়া এসে ডাক দিয়ে গেল
কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাতে ;
কৃকলাস কৃশ হয়ে গিয়ে তবু ফুরোবার আগে
গেঁটে বাত, সন্ধি বাত, অবশেষে ভিখিরির বাতে
ধরা পড়ে গিয়েছিল লোকটার আগাপাছতলা ভরা গায়ে ;

যখন ভিখিরি তবু জেগে গেল ভোরবেলা চোখ রগড়ায়ে,
পা ছড়ায়ে বসে আছে তখন ভীষণ রোদে ভিখিরিনী—দুই গালে আব,
‘যেখানে পুরুষ থাকে সেইখানে মেয়েদের ঘেঁষার স্বভাব’—
বলে গেল কলেজ স্ট্রিটের ’পরে ফুটপাতে একটি ভিখিরি।

এক ঝুড়ি ছাই এনে কে এক ফিকিরে
পাল্লায় মেপে নিতেছিল সেই ভিখিরির দাড়ি ;
তবুও ভুষির চেয়ে বুড়ো ইয়ারের
মিয়োনো মুড়ির মতো লোমগুলো ভারী।
হারামি ছোকরাদের এইসব সাউখুড়ি—সব—
লুটে গেলে পরে তবু জাঁদরেল পাথরের মতন নীরব
পা ছড়ায়ে বসে আছে তখন ভীষণ রোদে ভিখিরিনী—দুই গালে আব,
‘যেখানে পুরুষ থাকে সেইখানে মেয়েদের ঘেঁষার স্বভাব’—
বলে গেল কলেজ স্ট্রিটের ’পরে ফুটপাতে একটি ভিখিরি।

*

‘হাজার বছর গেল নিজের মনের ছকে মানুষ চারিয়ে
গাছের পাতার ফাঁকে উড়ে গেছে বলা যেত যদি,
জ্যোৎস্নার প্রান্তরে তারা ঘোড়ার মতন যদি অনেক শিশির, ঘাস খেত
পরীর চুলের মতো লেজ দিয়ে মাছি মশা এঁটিলি তাড়িয়ে,
তবে এই শতাব্দীর অগণন সূর্য অস্ত গেলে
গণিকা, অধ্যক্ষ, ভাঁড়, ব্যাঙ্কার চুঁইয়ে যে ডিভিডেন্ট পেত,
সে সব আঙুলে গুনে চুমো দিয়ে ঢেলে দেওয়া যেত।’
ভিখিরিরা মিশে গেল অন্ধকারে এই কথা বলে।

এই শতাব্দী সন্ধিতে মৃত্যু

(অগণন সাধারণের)

সে এক বিচ্ছিন্ন দিনে আমাদের জন্ম হয়েছিল
 তেতোধিক অসুস্থ সময়ে
 আমাদের মৃত্যু হয়ে যায়।
দূরে কাছে শাদা উঁচু দেয়ালের ছায়া দেখে ভয়ে
মনে করে গেছি তাকে—ভালোভাবে মনে করে নিলে—
 এইখানে জ্ঞান হতে বেদনার শুরু—
অথবা জ্ঞানের থেকে ছুটি নিয়ে সান্ত্বনার হিমহ্রদে একাকী লুকালে
নির্জন স্ফটিকস্তম্ভ খুলে ফেলে মানুষের অভিভূত উরু
 ভেঙে যাবে কোনো এক রম্য যোদ্ধা এসে।
নরকেও মৃত্যু নেই—প্রীতি নেই স্বর্গের ভিতরে ;
মর্তে সেই স্বর্গ-নরকের প্রতি সৎ অবিশ্বাস
নিস্তেজ প্রতীতি নিয়ে মনীষীরা প্রচারিত করে।

শতাব্দী শেষ

সূর্যগরিমার নীচে মানুষের উচ্ছ্রিত জীবন
 শুরু হল—যখন সে শিশুর মতন ;
নদীর জলের মতো আশা দিয়ে উচ্চারিত হয়ে—
 তবুও সে মানুষের মন।
রঙিন খেলনা, ঘোড়া, জাপানি লাটিম,
 আরব্যোপন্যাসের সেই পরী জিন উড্ডীন বক
 নিয়ে খেলে বিবেচনা করে হয়ে যায়
 ক্রমেই নিঃস্বার্থ বিবেচক।

অপরাবিদ্যার দিন ছাত্রের,
কলেজিয়ানের পুরস্কার,
অধ্যয়নবিলাসীর
দু-চারটে পেপারকাটার

পড়ে থাকে তারপর মলিন টেবিলে ;
মানুষ নিজেকে নিজে চিনে
চলে যায় জীবনের চেয়ে আরো বড়ো
বাজেটের কমিটি মিটিঙে—

ভুলের ভিতর থেকে ভুলে—
গরিমার থেকে আরও গরিমার পানে—
যেখানে আসন্ন কাল চিরকাল আগামীপ্রসবা :
আজও যা হয় নি সেই চরিত্রের পানে।

কার্তিকের ভোর ১৩৫০

চারি দিকে ভাঙনের বড়ো শব্দ,
পৃথিবী ভাঙার কোলাহল ;
তবুও তাকালে সূর্য পশ্চিমের দিকে
অস্ত গেলে...চাঁদের ফসল
পুবের আকাশে
হৃদয়বিহীনভাবে আন্তরিকতা ভালোবাসে।

তেরোশো পঞ্চাশ সালে কার্তিকের ভোর ;
সূর্যালোকিত সব স্থান

যদিও লঙ্গরখানা,
যদিও শ্মশান,
তবুও কল্কির ঘোড়া সরায়ে মেয়েটি তার যুবকের কাছে
সূর্যালোকিত হয়ে আছে।

শীতের রাতের কবিতা

গভীর শীতের রাত এই সব, তবু
চারি দিকে যুবাদের হৃদয়ের জীবনের কথা
মৃত্যুর উপর দিয়ে সাঁকোর মতন
চেয়ে দেখে মরণের অপ্রমেয়তা
সেতুর ছবির মতো মিলে গিয়ে জলের ভিতরে
জীবনের জয়—
আর মরণের স্তব্ধতাকে অনুভব করে।

অনুভব করে এই জীবনই মহৎ,
মরণের চেয়ে বড়ো জীবনের সুর ;
যদিও অন্ন আজ ভূমা নয়—তবুও মৈত্রেয়ী
অন্নলোভাতুর ;
হৃদয়বিহীনভাবে—দশ বিশ শত কোটি টন
চলে আজ পঙ্গপাল—নিজেকে উজাড় করে ; জেনে
জীবন হতাশ নয় বলেই জীবন।

শ্রুতি-স্মৃতি

আলোর চেয়েও তার সহোদরা আঁধারের পথে বারবার জন্ম নিয়ে
যোদ্ধা জয়ী অবক্ষয়ী কলঙ্কী হয়েছি।
কোনো কিছু শুভ্র আভা—কোনো ভালোবাসার আকাশ পেতে গিয়ে

আয়ু ফুরাবার আগে মরে গেছি।
ইতিহাসে শেষে হয়ে গিয়ে তবু অজর অনড় চোখ মেলে দেখে গেছি
আমাদের হৃদয়ের আশা
নদীর জলের মতো মিশরের, দিল্লীর, মাদ্রিদের, লন্ডনের পথে নেই বলে
নেই-নেই—মেটেনি পিপাসা।
তবুও প্রাণের আলোড়নে এসে নবতর নবীনেরা বারবার ক্লান্ত
শতাব্দীকে বলে গেছে :
মৃত সূর্য-তপতী কি তুমি !
তাদের আশার ভোর তবুও সূর্যের চেয়ে বালির উত্তেজে বড়ো হয়ে
হয়েছে হত্তেল মরুভূমি—
অগণন অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফ্ট্ গান, সার্চলাই্ট ঘুরায়ে ঘুরায়ে দেখা যায়।
বুদ্ধ, খৃস্ট, এঞ্জেলোর মোম
মহৎ বস্তুর মতো, নিভে, তবু ব্যাপ্ত হয়ে আছে—সব জেনে—আধো জেনে
চুংকিং, কলকাতা, দিল্লী, মস্কৌ, রোম
অধিক প্রাণের দিকে চলে যায়—নিপট, কপট, শঠ, কর্মী, মর্মগ্রাহী
মানব নিঃশেষ হবে জেনে তবু ভালো
মানবিক কলরবে অন্নপূর্ণা মরীচিকা খোঁজ করে চলেছে—চলেছে—
হে কঠিন, সহজাত সূর্যের আলো।

সমুদ্র পায়রা

কেমন ছড়ানো লম্বা ডানাগুলো সারাদিন সমুদ্রপাখির।
যত দূর চোখ যায় সাগরের গাঢ় নীলিমায়
নিজেকে উজোতে গিয়ে চোখের নিমেষে
সকালবেলার রোদ পাখি হয়ে যায়।

কোথায় আফ্রিকা আলুলায়িত শ্বেতাঙ্গ-নীল চোখে—
এ পৃথিবী কবলিত হয়—

কোথায় চড়ুই দেখে বেড়ালের নির্জন চোখের
নীলিমা কি জীবন—কি মৃত্যুর বিস্ময়—

অনুভব ক'রে প্রিয় মনে হয় জীবনই গভীর,—
মদির মৃত্যুর সাথে ঐতিহাসিক কাল খেলে ;
সৈকতে বাজারে মৃত পম্‌ফ্রেটের অমা যামিনীর
নক্ষত্রে সূর্যের মতো পাখি তুমি এলে।

অনিবার

যেখানে রয়েছে আলো পাহাড় জলের সমবায়—
তবুও সেখানে যদি আবিষ্কার করি প্যারাফিন
অনেক মাটির নীচে,—অথবা সেখানে যদি সংগ্রামবিলীন
অজস্র অস্পষ্ট মুণ্ড অনুকম্পা হৃদয়ে জাগায়,
তাহলে প্রভাত এলে মনিয়া পাখির পিছে কী করে বালক
ভেসে যাবে উজ্জ্বল জলবিম্বের মতো হেসে ?
কী করে বা নাগরিক নিজের নারীকে ভালোবেসে
জেনে নেবে হেমন্তের সন্ধ্যার আলোক
গ্যাস আর নক্ষত্রের লিপ্সা থেকে জেগে
যারা চায় তাহাদের কাছে তবু স্মিত সমন্বয় ?
মৃতদের উপেক্ষিত পীত দেহ—বলো—ক্ষমাময়।
বৃত্তের মতন—এসো, ঘুরি মোরা বঙ্কিম আবেগে।

সোনালি অগ্নির মতো

সোনালি অগ্নির মতো আকাশ জ্বলছে স্থির নীল পিলসুজে ;
পৃথিবীর শেষ রৌদ্র খুঁজে
কেউ কি পেয়েছে কিছু কোনো দিকে ? পায় নি তো কেউ।

তারপর বাদুড়ের কালো-কালো ঢেউ
উড়ায়ে শঙ্খচিল কোথায় ডুবল চোখ বুজে।

অনেক রক্তাক্ত সোনা লুফে নিয়ে চলে গেছে নগরীর পানে
মানুষেরা রক্তের সন্ধানে।
বাদুড়েরা তারপর ছক কেটে আঁধার আকাশে
জীবনের অন্য-এক মানে ভালোবাসে :
হয়তো বা সূর্যের ওপিঠের মানে।

চিন্তার ইচ্ছার শান্তি চার দিকে নামছে নীরবে :
যত কাল লাল সূর্য পিছু ফিরে রবে।
বাদুড় যেখানে দূর—আরো দূর আকাশ-কালোয় গিয়ে মেশে।
সে গাহনে একদিন মানুষও নিঃশেষে
নিভে গেলে বুঝি তার শেষ হিরোশিমা শান্ত হবে।

সৌর চেতনা

এইখানে অন্ধকার সমুদ্রের জলে
একটি আলোক স্তম্ভ আছে ;
তবুও তা আলো বলে বোধ হয় যদি
ঝঞ্ঝায় শংকিত সব নাবিকের কাছে
অন্ধ প্রহরী তার ঘরে
আপনার অন্ধকার নিয়ে খেলা করে।

মৃত পিতৃপুরুষের বিবর্ণ দেয়ালে
অধিক বিবর্ণতর তরবার দেখে
প্রয়োগ পটুয়াদের সাধ জেগে গেল
হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে ;

মদির উল্লাসে তারা আত্মকর্মক্ষম
চেয়েছে কি ঠিকই এ রকম।

কণ্ঠস্থ গ্রন্থের শব্দ উচ্চারণ করে
মোমের নিকট বসে মানুষের চোখ
হারায়ে ফেলেছে গ্রন্থ,
হারায়েছে মোমের আলোক,
হারায়ে ফেলেছে এই শতাব্দীকে আজ
গোধূলির সুত মিত রমণী সমাজ।
এই জীবনের পথে জিনিসের মতো
অপরের সমীচীন দৃষ্টির নির্দেশে
অচেতন জলের লোহের থেকে জলে
চলেছি বিম্বের মতো ভেসে।
শুনেছি কোথাও এক শতাব্দীর মিতব্যয়ী মন
জানে নাকো অপ্রস্তুত হতে ;
শুনেছি চলেছি লোক-পরিচিত প্রমাণের বলে।
জনমত,—অন্ধকার লোক মতামতে
চলেছি দৈবের দিকে ?

যে আকাশ জনতার নিরাশায় পিছে
পড়ে আছে—অথবা মৃত্যুর পরে যেখানে শান্তিতে বসবাস
করা যায়,—অথবা যাদের আমি
প্রতিহত করে যাই আজ,
অথবা যেসব জ্ঞান জ্ঞানময় বলে মনে হয়
অথবা যে সব আশা, আশা বলে মনে হয় আজ
সকলই তন্দ্রার মতো।
জ্ঞানপাপী হয়ে তবু যাকে আমি বধ করি আজ

যাকে আমি ভালোবাসি বলে মনে হয়,
যাকে আমি অবহেলা করি,
সকলই রিরংসালীন পেংগুইন।
তবুও সত্যের পরিচয়
নিজের নিপট গুণে ভেদ করে যদি এই মোহান্ধতাকে,
তবে সে তা করে যায়। বিনয়ের অবসান হলে
তবুও বিনয়ী হয়ে ওরা কাল ভোরবেলা হয়তো বা
পেয়ে যাবে তাকে।

অনন্ত বাহির

ভোরের প্রথম রোদ প্রান্তরের দু-চারটে শালিকের মতো
পৃথিবীতে এত দিন যত লোক মরে গেছে—সব
এমন আকাশ পেলে তারাও নীলিমা হয়ে যেত ;
তবুও কোথাও তারা নেই বলে এমন নীরব ?
সে কবে ভোরের রোদ মেয়েটির মুখে প'ড়ে তবু
দেয়ালে সিঁড়িতে মাঠে পড়েছিল বলে
সমস্ত পৃথিবী মেঘ জ্যোতির্ময় সাগরের মতো মনে হয়
এখনও কখনও ভোর হলে।

সেই নারী হয়তো বা এক দিন দূরে যেতে পারে,
জীবনের থেকে সরে যাবে এই ভয়ে—
নারীকে না পেয়ে আজ—পেয়ে আজ—বহিরাশ্রিতা
অফুরন্ত রৌদ্রে ভোর হয়েছে হৃদয়ে।

অনির্বাণ

সর্বদাই এরকম নয়, তবু
মাঝে মাঝে মনে হয় কোনো দূর
উত্তর সাগরে কোনো ঢেউ
নেই ;
তুমি আর আমি ছাড়া কেউ
সেখানে ঢোকার পথ হারায়ে ফেলেছে।

নেই
নীলকণ্ঠ পাখিদের ডানা-গুঞ্জরণ
ভালোবেসে আমাদের পৃথিবীর এই রৌদ্র ;
কলকাতার আকাশে চৈত্রের ভোরে যেই
নীলিমা হঠাৎ এসে দেখা দেয় মিলাবার আগে
এইখানে সে আকাশ নেই ;
রাতে নক্ষত্রেরা সে রকম
আলোর গুঁড়ির মতো অন্ধকার অন্তহীন নয়।

তবুও আকাশ আছে :
অনেক দূরের থেকে নির্নিমেষ হয়ে
নক্ষত্র দু-একজন চেয়ে থাকে ;

চেয়ে থাকে আমাদের দিকে—
যেন টের পায়
পৃথিবীর কাছে আমাদের
সব কথা—সব কথা বলা
ডাভেন্ট্রি ডোমেই টাসে স্টেফানিতে
যুদ্ধ শান্তি বিরতির নিয়তির ফাঁদে চিরদিন

বেধে গিয়ে ব্যাহত রণনে
শব্দের অপরিমেয় অচল বালির—
মরুভূমি সৃষ্টি করে গেছে ;
—কোন কথা, কোনো গান
কাউকেই বলে নাই ;
কোনো গান
পাখিরাও গায় নাই। তাই
এই পাখিহীন নীলিমাবিহীন শাদা স্তব্ধতার দেশে
তুমি আর আমি দুই বিভিন্ন রাত্রির দিক থেকে
যাত্রা ক'রে উত্তরের সাগরের দীপ্তির ভিতরে
এখন মিশেছি।

এখানে বাতাস নেই—তবু
শুধু বাতাসের শব্দ হয়
বাতাসের মতো সময়ের।
কোনো রৌদ্র নেই, তবু আছে।
কোনো পাখি নেই, তবু রৌদ্রে সারাদিন
হংসের আলোর কণ্ঠ রয়ে গেছে,
কোনো রানী নেই—তবু হংসীর আশার কণ্ঠ
এইখানে সাগরের রৌদ্রে সারাদিন।

'ওয়র্ডস্ওয়র্থ ইন্ ট্রপিক্স্' প'ড়ে

নক্ষত্র আকাশ নদী পাহাড়ের বধির গরিমা
দূরে যায়, কাছে এসে করে যায় ভাব ;
নিজেকে শত্রুর মতো মনে করে চিরদিন যদি
নষ্ট করে দেওয়া যেত তাহাদের মিথ্যা প্রভাব ;
নিজেকে বন্ধুর মতো মনে করি যদি অপলক

অনুভব করা যেত তাহাদের অবহিত মন—
অনেক চতুরানন মরে গেছে এই সব ভেবে
জেনে হো হো করে হাসে একজন চতুর আনন।

হেমন্ত-কুয়াশায়

সকাল-সন্ধ্যাবেলা আমি সেই নারীকে দেখেছি
জেনেছি অনেক দিন—তারপর তবুও ভেবেছি।
তারপর ঢের দিন পৃথিবীর সেই শাদা সাধারণ কথা
ছোটো বড়ো জিনিসের বিস্মরণে ক্রমে ভুলে গেছি।
আকাশ আমাকে বলে : 'সে না তুমি আত্মসমাহিতি ?'
পৃথিবী আমাকে দেখে ভেবে যায় : 'এর প্রাণে, আহা,
লাখেরাজ হয়ে পড়ে রয়েছে সততা ;'
যে নারীকে নদীর কিনারে জল ভালোবেসেছিল
সময়ের সুবাতাস মুখ ছুঁয়ে চলে গেলে যদি তার কথা
ভুরু কোঁচকায়ে ভেবে নিতে হয়, মানবহৃদয় তবে সে কোন্ রকম।
হেমন্তের কুয়াশায় বেড়াতে বেড়াতে কারু দাবি
অমল ঋণের মতো গ্রহণ করেছি আমি নিতে ভুলে গিয়ে ;
তার ভালোবাসা পেয়ে ভয়াবহভাবে সৎ হয়ে আছি—ভাবি।

চেতনা-লিখন

শতাব্দীর এই ধূসর পথে এরা ওরা যে যার প্রতিহারী।
আলো-অন্ধকারের ক্ষণে যে যার মনে সময়সাগরের
ক্লান্তিবিহীন শব্দ শোনে ;
অথবা তা নাড়ীর রক্তস্রোতের মতন ধ্বনি
না শুনে শোনা যায়।

সময়গতির শব্দময়তাকে তবু ধীরে ধীরে যথাস্থানে রেখে
ট্রামের রোলে আরেক ভোরের সাড়া পেয়ে কেউ বা এখন শিশু,
কেউ বা যুবা, নটী, নাগর, দক্ষকন্যা, অজের মুণ্ড, অখল পোলিটিশ্যান্।
এদের হাতেই দিনের আলো নিজের সার্থকতা
খুঁজে বেড়ায়।

চার দিকেতে শিশুরা সব অন্ধ এঁদো গলির অপার পরলোকে আজ
জগৎশিশুর প্রাণের আকাশ ভেবে
জানে না কবে নীলিমাকে হারিয়ে ফেলেছে।
শিশু-অমঙ্গলের সকল জনিতারা এই পৃথিবীর সকল নগরীর
আবছায়াতে ক্লান্তি-কলকাকলিময় প্রেতের পরিভাষা
ছড়িয়ে কবে ফুরিয়ে আবার সহজ মানবকণ্ঠে কথা কবে ?
আকাশমর্ত্যে মহাজাতক সূর্যগ্রহণ ছাড়া
কোথাও কোনো তিলেক বেশি আলো
রয়েছে জানে না কি ?
তবুও সবাই তারা
অন্ধকারের ভিতর থেকে ক্রমে ক্রমে বার হয়ে কি আসছে আরো
বিশাল আলোতে ?

কোথায় ট্রাম উধাও হয়ে চলেছে আলোকে।
কয়লা গ্যাসের নিরেস ঘ্রাণ ছড়িয়ে আলোকে
কোথায় এত বিমূঢ় প্রাণজন্তু নিয়ে অনন্ত বাস্-কার্
এমন দ্রুত আবেগে চলেছে।

কোথায় দূরে দেবতাত্মা পাহাড় রয়েছে কি ?
ইতিহাসের ধারণাতীত সাগরনীলিমা ?
চেনা জানা নকল আলোর আকাশ ছেড়ে সহজ সূর্য আছে।

নব নবীন নগর মেশিন প্রাণের বন্দর—
জলের বীথি আকাশী নীল রৌদ্রকণ্ঠী পাখি ?
সেখানে প্রেমের বিচারসহ চোখের আলোয় গোলকধাঁধার থেকে
মুক্ত মানুষ নতুন সূর্য-তারার পথের জ্যোতিধূলি-ধূসর হাসি দেখে
কি দীন, সহৃদয় ?
জ্ঞান সেখানে অফুরন্ত প্যারাগ্রাফে ক্লান্তিহীন শব্দযোজনায়
কিছুই নেই প্রমাণ ক'রে শূন্যতাকে কুড়ায় নাকো তবে ?

পরস্পরের দাবির কাছে অন্তরঙ্গ আত্মনিবেদনে
নবীন করে পরিচিত হওয়ার পরে নতুন পৃথিবী
রয়েছে জেনে আজকে ওরা চলার পরে ইতিহাসের চরম চেতনা—
মানব নামের কঠিন হিসাব হয়তো মেলাতেছে
কী এক নতুন জ্যোতির্দেশী সমাজ সময় শান্তি গড়ার নীল সাগরের তীরে

চোখে যাদের চলতে দেখি তারা অনেক দেরি করে অনাথ মরুসাগর ঘুরে চলে ;
মনের প্রয়াণ মোড় ঘুরে কি দেখেছে সরণি—
সাহস আলো প্রাণ যেখানে সবার তরে শুভ—
এই পৃথিবী ঘরনী।

জার্মানির রাত্রিপথে : ১৯৪৫

সে এক দেশ অনেক আগের শিশুলোকের থেকে
সাগরগামী নদীর মতো স্বরে
আমার মনের ঘুঘু মরালস্রংসী ঝাউয়ের বনে
আধো আলোছায়াচ্ছন্নভাবে মনে পড়ে
টিউটনের গল্পে-ছড়ায়-সাগায় সূর্যালোকে
থেকে থেকে আভাস দিয়ে যেত—
গ্রিমের থেকে হীগেল শিলার সানুজ দানবীয়

গ্যেটের সে দেশ সূর্য অনিকেত ?

মাঝে মাঝে আমার দেশের শিপ্রা, পদ্মা, রেবা, ঝিলম, জলশ্রীকে আমি
সর্পী বোনের মতন কোথাও পাহাড় অবধি
অথবা নীল ভূকল্লোলে সাগর সুভাষিত
করতে গিয়ে শুনেছিলাম রাইনের মতো নদী
কী এক গভীর হ্বাইমারী মেঘ সূর্য বাতাস নিয়ে
নরনারী নগর গ্রামীণতায় ব্যাপ্ত রীতি
লক্ষ্য করেই সবিতাসাধ জানিয়েছিল—তিন দশকের পরে
এসব স্বপ্নমিশেল কী এক শূন্য অনুমিতি।

যদিও আমি আজও বেশি সূর্য ভালোবাসি
তবুও যারা মনের নীহারিকার পথে ঠাণ্ডা অমল দিন
জাগিয়ে সূর্যপ্রতিম আকাশ সমাজ নিয়ে যাত্রা করেছিল
সে সব হৃদয়গ্রাহী টোলার রিলকে হ্যোল্ডার্‌লিন্‌
সবংশে কি হারিয়ে গেছে রাইখ্‌শরীরের থেকে ?—
ব্যক্তিস্বাধীনতায় ঘুরে অনাথ মানবতার লেনদেন
শুধতে ভুলে গিয়ে কি ভয় রক্ত গ্লানি রিরংসা ফুঁপিয়ে
রেখে গেছে অমোঘ বর্বরতার বেল্‌জেন্‌ ?
          বর্বরতা কোথায় তবু নেই ?—তবু এই প্রশ্ন-আতুর মনে
গভীরতর হৃদয়ব্যাধির ঈষৎ সমাধান
আজকে ভীষণ নিরুদ্দেশের অন্ধকারে রয়েছে টিউটন ?
রোন্‌কে চিনি—ইউরোপের হৃদয়ে রাইন্‌যান্‌
সহোদরার মতন রৌদ্র আকাশ মাটি যব গোধূমের পাশে
যুগে-যুগে উত্তরণের লক্ষ্যে প্রবেশ ক'রে
এনেছিল কান্ট কাথিড্রাল দৈবতদের
          উষাপ্রদোষ অখল ভাগনেরের

অভিনিবেশ-বলয়িত গ্যেটের সূর্যকরে।

যদিও তা ব্যক্তিকতার মায়ার মৃগতৃষ্ণাতীত,—তবু,
চমৎকৃত হয়েছিল ইউরোপের ভাবনাধূসর মন ;
সৌরকরভ্রমে ঊনবিংশ শতকীরা
হয়তো তাকে ঘরের বহিরাশ্রয়িত দিব্য বাতায়ন—
বাতায়নের বাইরে মেঘের সূর্য ভেবেছিল ;
আমরা আজও অনেক জেনে এর বেশি কি ভাবি ?
ইতিহাসের ভূমায় সীমাস্বল্পতাকে যাচাই করার রীতি
গ্যেটের ছিল—তবুও সীমার কী ভয়ঙ্কর বৈনাশিকী দাবি !
সেই তো পায়ের নীচে রাখে পরমপ্রসাদগভীর তনিমাকে
সময়পুরুষ বলে : 'তুমি নিজের কালের ভার
বয়েছিলে লীলায়িত সৌরতেজে—এ যুগ তবু অন্য সকলের ;
আরেক রকম ব্যতিক্রমের,—হে কবি, হ্বাইমার !'
সময় এখন জ্যোতির্ময়ী অমেয়তার প্রবাস থেকে ফিরে
নিরিখ পেয়ে গেছে নিজের নিঃশ্রেয়সের পথে :
সেইখানে কাল লোকাতীত হতে গিয়ে কোথাও থেমে যায়
ক্রান্তি-আলোর বয়স বেড়ে গেলে কঠিন রীতির জগতে
নবজাতক অর্থনীতি সমাজনীতি কলের কণ্ঠে কি প্রাণকাকলি ?
এই পৃথিবীর আদিগন্ত ব্যক্তিশবের শেষে
দেখা দেবে হয়তো নতুন সুপরিসর নাগর সভ্যতায়
মানবতার নামে নবীন ব্যক্তিহীনতাকে ভালোবেসে ;
হয়ত নগর রাষ্ট্র সফল হয়ে গেলে নাগরিকের মন
হৃদয়প্রেমিক হয়ে যাবে সবার তরে—উচিত অনুপাতে ;
জড় রীতির—অর্থনীতির সনির্বচন মেসিন ভেনে এসব যদি হয়
তা হলে তা অমিয় হোক আন্তরিকতাতে।

আজ বিকেলের ধূসর আলোয়

আজ বিকেলের ধূসর আলোয়
　　তোমার সাথে দেখা
এতটা দিন পথ চলেছি—শেষে
কালো মেঘের কেয়াবনের জলহিজলের দেশে
আমি তোমার পাতা শিশির
　　হাতের তুলির রেখা

বেতের ফলের মতন আমার ম্লান
চোখে তুমি হাজার বছর রয়ে গেছ, আহা
সময় তোমার হাড়ের স্রোতে লেখা
সকল দারা-সুতের শিয়র ছেড়ে আমি একা

আকাশ আলো পাহাড় শিশির
　　সে কত পৃথিবীর
তোমাকে শেখা যে কত রমণীর
　　সে কত রজনীর
আঁধার অবচেতন থেকে শেখা।

রাতের আঁধারে নীল নীরব সাগরে

রাতের আঁধারে নীল নীরব সাগরে
আমাদের এ জীবন জনহীন বলয়ে আকাশে
সাগরের দূরগামী জাহাজের মতো
　　কী করে কখন

অতি দূর থেকে ভেসে আসে।
কোথায় সে ছিল কবে ভুল তারকায়
সাগরের রাঙা নীল জলকাকলিতে
ঢের মৃত—ঢের অনৃতে
কুহুলীন দ্বীপের আভাসে
হে নাবিক, হে মানব রজনীর,
এ আঁধার বন্দিনী জানি, তবু
যুগে যুগে কেউ
জেনেছ কি সাগরের ঢেউ
শঙ্খরেখায় ঘুরে আঁধারে-আঁধারে
দূর দিক্‌মাধুরীর পারে
আরো আশা আলো ভালোবাসে।

সারাদিন আমি কোথায় ছিলাম

সারাদিন আমি কোথায় ছিলাম, আলো
এই জীবনের ইতিহাসে আমি আগে
তোমাকে কখনও দেখিনি, তবুও দেখেছি
সূর্যে যখন আকাশি গ্রহণ লাগে
পৃথিবী মলিন হয়
হৃদয়ে গ্রহণ নয়
আলোর অশোক ঝর্নার মতো কাঁপে
সব মুখে সব শোকে সব পরিতাপে
তোমার শরীর সমাসূর্যের ধারা
আঙিনা ছড়ানো ম্লান পায়রারা
আলো হয়ে ওঠে ঘুম—
ঘুমনগরীর রাজার কুমারী জাগে।

পৃথিবীতে যত ইতিহাসে যত ক্ষয়

পৃথিবীতে যত ইতিহাসে যত ক্ষয়
মানবের সাথে মানবের প্রাণবিনিময়ে অবিনয়
যত গ্লানি ব্যথা ধূসরতা ভুল ভয়
সকল সরায়ে ঘুমোনো নগরী
ঘুমনগরীর রাজকুমারী কি জাগে।
নিখিলের শাদা চাতকের মতো প্রাণ
তোমার আমার হৃদয়ে করে কি গান
(করে আহ্বান, করে করে আহ্বান)
অপার অসীম সূর্যশালিনী
মহাপৃথিবীর অনুরাগে।

অন্ধকারের ঘুমসাগরের রাতে

অন্ধকারের ঘুমসাগরের রাতে
দূর আকাশের তারা,
নীল নিখিলের নীরবতা
নেই কিছু এ ছাড়া,
অকূল অলখ থেকে হাওয়া
কোন্ দিকে তার চলে যাওয়া
মৃত্যু-স্বাতীর থেকে এসে
কী মৃত্যু-ফোয়ারা !

একটি জাহাজ, একটি সাগর, একটি অনিমেষ,
আগুন আলো জ্যোতিষ্কদের দেশ,
ঘুমের মাঝে তবুও যেন অপর বন্দিনী

আরেক আলোক জানালা দিয়ে দিয়েছিল সাড়া।
এই জীবনের দিক্-শরণের গভীর রাতে আমি
তোমায় ছেড়ে দিক্-অচেনা ক্রান্তিসাগরগামী,
সৃষ্টি কি নীলকণ্ঠ পাখির অধরা আকাশে
উড়ে যাওয়ার অপরিসীম সাগরধ্বনিধারা।

রচনা : আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

আজ সকালের এই পৃথিবীর আলো

আজ সকালের এই পৃথিবীর আলো
চকোর ঘুঘুর ঝলকানিতে অপার নীলিমা
আলোয়—গভীর আলোয় মিশে গিয়ে
উড়ো গাঁয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে
নগরীদের মিনার জ্বালাল।
ভাঙা খিলান মৃত দেয়াল
অন্ধকারের খাত—
নরনারীর চোখে অকূল রাত,
অন্তবিহীন প্রেম-বেদনায়
নিষ্ফলতার কালো।
এসো, অফুরন্ত সূর্য
আলোর ঈগল
জ্যোতির্ময়ী ফণা,
ইতিহাসের চেয়ে মানবইতিহাসের
আলোর প্রার্থনা,
সকল বিরাট নৃপতিদের ধূলির চেয়ে ভালো
এসো আলো—

রচনা : আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

আমরা যেন মেঘের আলোর ভিতর

আমরা যেন মেঘের আলোর ভিতর থেকে এসে
নগরী দিনের মতন কলরবে
এই জীবনের পথে চলে তবু
জানি শুধু এখনও যেতে হবে
তবুও দেখি সকলই ঘুমে ঘেরা
সাগরতীরে শঙ্খবালকেরা
সে উতরোল রোলের ধু-ধু নীল
দেখেছে কিছু—ভেবেছে কিছু
খেলেছে ঝিলমিল
(আলোর জিব্রাইল)
শাদা আলোর, শাদা পাখির মতো
সহজ ঘুমে ডুবেছে নীরবে
ঘুমের ভিতর যে ঘুম আছে
সে দিক পানে চলে
ঘুমিয়ে জেগে আছি
অসীমারই ওপরে তুমি স্বাতী
ভেবেছি প্রতিপদের কাছাকাছি
চিত্রাতারার মতন (তবু তুমিও) জেগে রবে।

রচনা : আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

ঘুমের হাওয়া, ঘুমের আলো

ঘুমের হাওয়া, ঘুমের আলো
ঘুমের দেশের প্রেম (কী তোমার নাম ?)

অইখানেতে শঙ্খনদীর তীরে তুমি দাঁড়িয়েছিলে নাকি
আমিও এলাম।
আমায় তুমি মেঘের গভীর থেকে ভেবেছিলে
এখনও সেই মেঘ
তোমায় আমায় জড়িয়ে আছে, তবু
এই কি জীবন ? জেগে ওঠা ?
ভোর ? হৃদয়াবেগ ?
এই কি তোমার শরীরতীরে পেলাম।

গভীর ঘুমে হৃদয় ছেয়ে আসে
মিনার বাড়ি নগরী রোল যুদ্ধ জনগণ।
পাথর ধোঁয়া ধুলো খড়ের মতো
এখন অচেতন
এই কি জীবন ? জেগে থাকা ?
অমৃতেরই হাওয়া ?
জ্যোতিষ্কদের ঘুম ভাঙানো ?
নারীর দেখা পাওয়া ?

রচনা : আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

দেশ-সময়ের ক্রান্তি রাতে আজ

দেশ-সময়ের ক্রান্তি রাতে আজ এ পৃথিবীর
এই নগরীর হৃদয় দেখা যায়
পথে-ঘাটে মেঘে মনের বর্তিকাতে
সেই কি মিলাল
সব পৃথিবীর হারিয়ে যাওয়া আলো ?

সে সব নারী নগরীরা চলে গেছে
পুনরুদ্‌যাপনের তারায় জ্বলে গেছে,
যারা স্ফীত অবহিত ছায়ার মায়ায় অকথিত
সকলে আজ নতুন করে জেগে।
জলের কলরোলে রাত্রি-সংক্রান্তি হাওয়ায়
অপার ব্যথা অসীম প্রয়াস আশা ভালোবাসা
অশোক সাধনায়
নতুন সময় সৃষ্টি যন্ত্রগিরি জ্বালাল কি?
মৃত সূর্য অমর করে জ্বালিয়ে নিতে চায়?

ভাঙা দেয়াল বস্তি ব্যথা ধূসর মিনার
নিভে যাওয়া ইতিহাসের ঊষর কিনার
নিভে গেছে—নিভে গেছে—
ভোরের চাতক চিলের সাগর একক এখন
ইতিহাসের জ্যোতির কল্পনায়।
অপার ব্যথা, অসীম প্রয়াস ইত্যাদি...

রচনা : আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

কাউকে ভালোবেসেছিলাম জানি

কাউকে ভালোবেসেছিলাম জানি
তবুও ভালোবাসা,
দুপুরবেলার সূর্যে ভোরের
শিশির নেমে আসা,
ভোরের দিকে হৃদয় ফেরাই
যাই চলে যাই—

নীল সকালে যাই চলে যাই—
একটি নদী একটি অরুণ
শিউলি শিশির পাখি—
‘আমরা মায়ার মনের জিনিস
মায়াবিনীর বেলায় শুধু জাগি’
বলছে সে কোন্ ত্রিকোণ থেকে
ছায়ার পরিভাষা।
কাউকে ভালোবেসেছিলাম, জানি,
তবুও ভালোবাসা।
সে কোন্ সুদূর মরুর মনে চলে গেছ
হায়, যাযাবর তুমি,
সেইখানে কি মিলবে বনহংসী বাঁধা বাসা !

হায় বলিভুক্, কখন ভেবেছিলে
মাটি ছেড়ে দূর আকাশের নীলে
ধূসর ডানার অগ্নি ছেড়ে দিলে
মিটে যাবে মায়াময়ী মাটির পিপাসা।

রচনা : আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

তোমার সাথে আমার ভালোবাসা

(তোমার সাথে আমার ভালোবাসা
চলো কেবল সুমুখপানে চলো
সূর্যডানায়—ঈগল পুরুষ জ্বলো
সময়সাগর শুকিয়ে গেলে সেই সোনালি বালির
মরুভূমির সঙ্গে কথা বল।)

তোমার সাথে এই তো ভালোবাসা
নরনারীর অঙ্গ প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদলে আমার প্রেম
হে মীনকেতন, তোমার নারী ভালো—ভালো
দিকের থেকে দিগন্তরে এই তো আমি এলাম
হে প্রেম, তুমি গৃহবলিভুকের শান্ত কাতর ডানা ধরে
মহান যাযাবরের নিজের সূর্যে ফিরে আসা
হে মীনকেতন, তোমার নারী অমর জানি (আমি),
অমরতর (তবুও) আরও বলয় আকাশ আরও
আলোর পিপাসা—

রচনা : আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

ভোরের বেলায় তুমি আমি—

ভোরের বেলায় তুমি আমি—
নীল আকাশের ভরতপাখির গানে
কবে যে এই ধুলোমাটির পৃথিবীতে
প্রথম দেখেছিলাম
কেন এসেছিলাম এ সব আলোর অভিযানে
আজকে আবার সকাল এলে সেই কথা কি তুমি
পাখির গানের আলোর সিঁড়ি-সূর্যে উঠে ভাবো
(এই সৃষ্টির) অলখ আলোর থেকে এসেছিলাম
আবার কবে আলোয় মিশে যাব
অন্ধকারের এ ছাড়া কি নেইকো কোনো মানে ?
ইতিহাসে ভায়ের-বুকে-ভাই
গল্প ছবি প্রেম—কি শুধু জ্বলন্ত মিথ্যাই
সকলই ছাই করে দিয়ে আঁধার সসম্মানে

বসেছে কি তোমার আমার—
ভোরের সাগরকণ্ঠী পাখির গানে ?

হয়তো বা তাই হবে—তবু আজকে আলোয় আমি
এই পৃথিবীর প্রথম ভোরের
সূর্য পাখি নারী
দেখে কি তার আদিম আঁধার ভেবে নিতে পারি
যদিও গহিন থেকে এলাম—গহন আমায় টানে।

রচনা : আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

ধ্বনি পাখির আলো নদীর স্মরণে

ধ্বনি পাখির আলো নদীর স্মরণে এসেছি
আবার তুমি আমি
ভেবেছিলাম আমরা দুজন
মিশরীয় মামি
ঘুমিয়ে আছি সকাল বিকাল
ভোরের হাওয়া সবুজ পাতার নড়া
আমলকীডাল শাল
রুপালি বৃষ্টি পড়া
হয়ে গিয়েছিলাম তুমি আমি।

আমরা কত নগরী হাটে জলে
রক্ত আগুন আবছা অবক্ষয়ে
অসময়ের অন্ধকারে মরেছি বারবার
তবুও আলো সাহস প্রাণ চেয়েছি হৃদয়ে
দূর ইতিহাসযানী।

কোথাও নীড় বেঁধেছিলাম
ভেঙে গেলে কেঁদেছিলাম
ফেনার শীর্ষে হেসেছিলাম
জীবন ভালোবেসেছিলাম
আলো—আরও আলোর প্রয়াণী।

আজকে মানুষ চলে গেলে তবু
মানব রয়ে যাবে,
পাতা শিশির ইতিহাসের বেলা
হয়ে যাবে গভীরতরভাবে
নরনারীর নিজের রাজধানী।

রচনা : আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

মকরসংক্রান্তি প্রাণে

মকরসংক্রান্তি প্রাণে
তুমি আমার মনে এলে।
বালুঘড়ি বিকল রাতের বেলা।
থেকে-থেকে পড়ছে মনে
সে কোন্ ধূসর বেবিলনে
কবের গ্রীসের অলিভবনে
তোমার সাথে সূর্যতীরে।
হয়েছিল খেলা।

জানি সবই ফুরিয়ে গেল অতল সনাতনে
থেকে-থেকে তাঁরা নদীর জলের উৎসারণে

জলদেবীর মতন জেগে জানিয়ে গেছ তুমি
চম্পা কনকবতী এখন সুধার মরুভূমি
মরুভূমি—মরীচিকা—মায়ামৃগের মেলা।

তবুও আবার সূর্য নিয়ে এল রজনী
আমার—তোমার—আধুনিকের
        শতঘ্নী আঘাত
জননটের মতন নেচে—কবে
কী হারাল সে কার মনে রবে
তোমার—আমার—
        সে কার অবহেলা।

রচনা : আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

মনে পড়ে আমি ছিলাম

মনে পড়ে আমি ছিলাম বেবিলনের রাজা
    তুমি ছিলে আমার ক্রীতদাসী,
রাতের মিনার শুকতারকায় জ্যোৎস্নামলিন ছিল
    দিনের প্রাসাদ পায়রা ঘেরা—সুনীল আকাশি
ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে গেল কবে,
তোমার সাথে আবার দেখা হবে
তবুও আমার জানা ছিল—কালের কুহর থেকে
    হাজার-হাজার বছর তোমায় ডেকে
শুনেছি তুমি বলেছ, 'আসি—আসি—'।

আজকে আবার গৃহবলিভুকের সকাল এলে
    তাকিয়ে দেখি মিশর-নীলিমায়

সে সব চেনা দুধের মতো শাদা
পাখিরা উড়ে যায়—
আমি আমার মনকে বলি, 'আমি ভালোবাসি'।

হাজার-হাজার বছর আগে হারিয়েছিলাম যাকে
এখন সে তার প্রতীক নিয়ে হেতুর পারাবারে
খেলা করে ফেনার শীর্ষে কেঁপে ওঠে শুনি,
আমি আমার নির্বলতায় বেবিলনের বাঁশি
বাজিয়ে তাকে নীল অতিবেল অন্ধকারের থেকে
আলো—আরও আলোর পানে
আসছি না কি ডেকে।
এ সব কারা মহিলারা আমার পাশাপাশি
চোখে চুলে হাতের নির্জনতার স্রোতে এসে
আধেক মনে পড়িয়ে হারায় কোথায় অনিমেষে
(হারায় রাতে) হঠাৎ জাগা শিশুর মতো :
ঘুমের পিয়াসী।

রচনা : আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

এই কি সিন্ধুর হাওয়া

এই কি সিন্ধুর হাওয়া ?—রোদ আলো বনানীর বুকের বাতাস
কোথায় গভীর থেকে আসে !
অগণন পাখি উড়ে চলে গেলে তবু নীলাকাশ
কথা বলে নিজের বাতাসে।
রাঙা মেঘ—আদি সূর্য—স্বাভাবিক সামাজিক ব্যবহার সব
ফুরিয়ে গিয়েছে কত দূরে।
সে অনেক মানবীয় কাল ভেঙে এখন বিপ্লব

নতুন মানব-উৎস কোথাও রয়েছে এই সুরে

যাযাবর ইতিহাসসহ পথ চিনে নিতে চায়।
অনেক ফ্যাক্টরি ফোর্ট ব্যাঙ্কারেরও আত্মস্থ মনের
অমার ভিতরে অমা রজনীর ভূকম্পনে কথা বলে যায় :
আলো নেই তবু তার অভিগমনের।

ক্রান্তি। শারদীয় ১৩৫৩

নবপ্রস্থান

শীতের কুয়াশা মাঠে ; অন্ধকারে এইখানে আমি।
আগত ও অনাগত দিন যেন নক্ষত্রবিশাল শূন্যতার
এই দিক—অথবা অপর দিক ; দুয়েরই প্রাণের
বিচিত্র বিষয়জ্ঞানে মিলে গেছে ;—তবুও প্রেমের
অমর সম্মতিক্রমে। পৃথিবীর যে কোনো মানব
দেশকাল যে কোনো অপর দেশ সময় ও মানুষের তরে
সেবা জ্ঞান শৃঙ্খলার অবতার হয়ে সব বাধাব্যথাহারা
নবীন ভূগোললোকে মিশে গেছে ;—দিকভ্রান্তিহীন
সারসের মতো,—নীল আকাশকে ঈষৎ ক্রেংকারে
খুলে ফেলে। যা হয়েছে যা হয়নি সবই ঐ নক্ষত্রবীথির
একজন অথবা অপরজন ;—নিজেদের হৃদয়যন্ত্রের
নিকটে সত্যের মতো প্রতিভাত হয়ে উঠে তারা
অনন্ত অমার পটভূমির ভিতরে
অনিমেষ সময়ের মত জ্বলে ;—মনে হয় আশা
অথবা নিরাশা যদি শতাব্দীর জীবনকে খেয়ে শেষ করে
পবিত্রতায় তবু দিক ও সময় মিলে একজন অমলিন তারা
অমিলের ঊর্ণা ধোঁয়া ছায়া কেটে মিলনের পথে

জ্বলে যায় ; যায় না কি ?—নিভু-নিভু হয়ে শীতকালের দেয়ালে
ফুটে ওঠে ; কথায় কারণে কামে অগণন ক্লেদে কনফারেন্‌সে
বাতির অভাব হলে পৃথিবীর মানচিত্রে অন্ধকারে পথ
দেখাবার মতো কোনো কাউকে না পেলে ঐ তারাবলী তারা
প্রাণের ভিতরে জড় মূল্যের অধিক ব্যাপ্তি ;—চারিদিকে এই
অবিচ্ছিন্ন পাতা ছায়া শিশিরের নগরের হৃদয়কম্পনে বসে আমি
তোমাকে জাগায়ে দিয়ে, প্রিয়, সব কালীন জনীন
মানুষের এক জাতি এক দেশ এক মৃত্যু একটি জীবন এক
গহন আলোকে দেখি না কি ? প্রেতের রোলের ভিতরে বাঙালির
ঘর ভেঙে ঝরে গেলে জেনিভার অমেয় প্রাসাদ
মরে যায় ;—ফ্ল্যান্ডাস, ভাডুন, ভিমি রিজ, উক্রেইন
হোয়াংহো নীপার রাইন চিনদুইনের পরে সব শব
কলকাতা হাওড়া মেদিনীপুর ডায়মনহারবারে বাংলায়
অগণন মানবের মৃতদেহ প্রমাণিত হয়ে
কিরকম শুক্ল সৌভ্রাত্রের মতো, চেয়ে দেখ, ছড়ায়ে রয়েছে।
নতুন মৃত্যুর বীজ নয়—ওরা নতুন নেশন—
বীজ—নতুন বঞ্চনা-ধ্বংস-মৃগতৃষ্ণাবীজ নয় ; নব-নব প্রাণনের
সংযমে পৃথিবী গড়ে সফলতা পাবে মনে হয়—
মানুষের ইতিহাসভণিতার দিন শেষ করে তার স্থির
প্রকৃতিস্থ আত্মার আলোর বাতায়নে।

আমার ব্যাহত ঘরে এ ছাড়া অপর কোনো বাতি
নেই আর, আমার হৃদয়ে নেই, এইখানে মৃত পোল্যান্ডের
সীমানা রাইনের রোলে মিশে গিয়ে মরণকর্কশ জার্মেনির
হৃদয়ের পরে হিমধূমোজ্জ্বল অলিভ-বনের
আন্দোলনে এম্পিডোক্লেসের স্মৃতি বারবার জয় করে নিয়ে
নবীন লক্ষ্যের গ্রিস্ নতুন প্রাণের চীন আফ্রিক্ ভারত প্যালেস্টাইন।

পৃথিবীর ভয়াবহ রাষ্ট্রকূট অন্ধকারে অন্তহীন বিদ্যুৎ-বৃষ্টির
জ্যোতির্ময় ব্রেজিল পাথরে আমি নবীন ভূগোল
এরকম মানবীয় হয়ে যেতে দেখি ;—ইতিহাস
মানবিক হয়ে ওঠে ;—যাযাবর শ্রীজ্ঞানের মতো
এখন অকুতোভয় উদাত্ত আবেগে
সঞ্চারিত হয়ে যাওয়া অর্বাচীন জেনে নিয়ে তবু
নতুন প্রাণের নব উদ্দেশের অভিসারী হতে
চায় না কি—চায় না কি জনসাধারণ পৃথিবীর ?
দেয়ালে ট্রামের পথে নর্দমায় ট্রাকের বিঘোরে হনিতের
অস্ফুট সিংহের শব্দে সবিস্ময় উত্তরচরিত্রে
ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে যেতে পারে বাংলার লোকশ্রুত বিবর্ণ চরিত।
আমার চোখের পথে আবর্তিত পৃথিবীর আঁকাবাঁকা রেখা
যতদূর চলে গেছে : কলকাতা নতুন দিল্লি ইয়াংকি আফ্রিক্
দান্তের ইটালি শেক্স্পীরিয় ইংল্যান্ড মেঘ-পাতাল মর্ত্যের গল্পের
বিভিন্ন পর্বের থেকে উঠে এসে রবীন্দ্র লেনিন মার্কস ফ্রয়েড রোলাঁয়
আলোকিত হয়ে ওঠে ; মুমুক্ষার অবতার বুদ্ধের চেয়েও
সমুৎসুক চোখ মেলে আপামর মানবীয় ঋণ—
রিরংসা-অন্যায়-মৃত্যু-আঁধারে উজ্জ্বল
পথিকৃত সাঁকোর মতন সব শতকের ভগ্নাংশকে শেষ
করে দিয়ে পবিত্র সময় পথে মিশে গেছে,—সব অতীতের
মথিত বিষের মতো শুদ্ধ হয়ে সহজ কঠিন দক্ষিণ-ভবিষ্যতে
মিলে গিয়ে মানবের হৃদয়ের গভীর অশোক
ধ্বনিময়তার মতো তুমি হে জীবন, আজ রাতে অন্ধকারে আনন্দসূর্যের
আলোড়নে আলোকিত বলেই তো মানব চলেছে।

যুগান্তর। শারদীয় ১৩৫৩

দাও-দাও সূর্যকে

দাও-দাও সূর্যকে জাগিয়ে দাও :
হে দিন, জ্বালাও তুমি আলো।
যখন নির্বাণ ছিল—কোনো দিকে জ্যোতিষ্ক ছিল না,
যখন শূন্যের সাথে শূন্যের চুম্বনে গাঢ় নীল
নীহারিকা শিখা, সাধ জেগে উঠেছিল,
যখন উদ্দেশ্যহীন আর্ত অন্ধ রোদসীকে চোখে রেখে তবু
অগ্নির বর্ণের মতো আমাদের এই পৃথিবীর জন্ম হল,—
সে আবেগ সেই দিন সে আলোকে জেগে
কী যেন অনবতুল আভা চেয়েছিল ;
বহে চলা—সূর্যকণ্ঠে কথা বলা—প্রাণ
জন্ম দেওয়া।
চেয়েছিল।
আজ এক কোটি শতাব্দীর পরে অনন্তের কারুকার্যে নীল
মানুষের সংকল্পের সংঘর্ষে সুন্দর
রাত্রি হয়ে যাক সূর্য ; মৈত্রী হোক সফল নির্মল ;
নক্ষত্র মৃত্তিকা হোক ; প্রেমের প্রতিভা হোক উজ্জ্বল, বিনত—
ব্রহ্মাণ্ড রচনা হলে তার ঘাসে এক ফোঁটা শিশিরের মতো।

একক [?] ১৩৫০

পটভূমি বিসার

কবের সে বেবিলন থেকে আজ শতাব্দীর পরমায়ু শেষ
কি এক নিমেষ শুধু মানুষের অন্তহীন সহিষ্ণুতায় ?—
নক্ষত্রের একরাত্রি—একটি ধানের গুচ্ছ—একবেলা সূর্যের মতো ?
কেবলই মুষলপর্ব শেষ করে নব শান্তিবাচনের পথে

মানবের অভিজ্ঞতা বেড়ে মানুষেরই দোষে হতাহত

কলঙ্কিনী-সংখ্যা বাড়ে। অতীতের স্মরণীয় ইতিহাস থেকে
যা কিছু জানার আছে, না জানার আছে যত শ্লোক
সবাকে দেখাতে গিয়ে বারবার অন্ধকার বেশি করে দেখে।
তবু এই স্বভাবের প্রতিশোধে আগামীর সমাজ অশোক

হয়তো বা হতে পারে। হে তুমি গভীর ইতিহাস
আমরা মধ্যম পথে ; তোমাকে সকল করে দিতে
ব্যক্তি বিসর্জন দিয়ে মানবের প্রাণনের সাগরে চলেছি ;
মহানির্বাণের দিকে কিশাগোতমীর অজানিতে

আমরা চলেছি নাকি ? তা নয়তো। আজকের চেয়ে বেশি ভালো
প্রাণসূর্য উদয় হয়েছে কবে ? এ রকম অশোক গভীর
শিশিরে উজ্জ্বল দেখে ভুল বলে প্রকৃতিকে আজও মনে হলে
মনের বিজ্ঞানে তবে শুভ্র হোক মানবীয় নিখিল ও নীড়।

মেঘনা। বৈশাখ ১৩৫৪

মৃত্যু, সূর্য, সংকল্প

সর্বদাই অন্ধকারে মৃত্যু এক চিন্তার মতন :
আমাদের এই শতাব্দীর সাধ, স্বপ্ন, কাজ, প্রাণ
আচ্ছাদন করে দিতে আসে।
ভোরের নিশ্চিন্ত মন কেমন সাহসে অনায়াসে
আলো হয়—সূর্য হয়—দেখ ;
নদী—মেঘ—দিগন্তের পাহাড়ের নীল

বিচ্ছুরিত হয়ে ওঠে কেমন নিঃশব্দ অনাবিল।

আমরা প্রেমের কথা—জ্ঞান মুক্তি প্রগতির দিন
ঢের আগে শুরু করে এখনও ব্রহ্মাণ্ড-অন্তর্লীন
সুরের ভিতরে সুর-অগ্নি হতে গিয়ে
বারবার অঙ্গারের অন্ধকারে সমাজ নিভিয়ে
মানুষের ইতিহাস-ঊর্ণা হয়ে আছি।
হে আকাশ, হে প্রতিভা, হে বিচিত্র উচ্ছ্রিত সূর্যের উজ্জ্বলন,
আমাদের রোগ, পাপ, বয়সের রূঢ় মরুভূমি
শেষ করে সৃজনের অনাদির দীপ্তিকে আদিম
চুম্বনে বিজ্ঞান, প্রেম, প্রেমাগ্নি-উড্ডীন কর তুমি।

৯ই আগস্ট সংকলন। শ্রাবণ ১৩৫৪

রাত্রি ও ভোর

শীতের রাতের এই সীমাহীন নিস্পন্দ গহ্বরে
জীবন কি বেঁচে আছে তবে !
ডানা-ভাঙা নক্ষত্রের মতন উৎসবে
আঁধারের ভিতরে কি ঝরে

কেবলই স্ফুলিঙ্গ অন্ধ সংক্রান্তির মতো ?
বহুদিন ক্ষমাহীন সময়ের ভিতরে সে অনেক জ্বলেছে।
আছে, তবু তুমি নেই, তাইতো দাহন ভেঙে গেছে।
মৃত নক্ষত্রের গন্ধ ক্রমেই হতেছে পরিণত

অন্ধকার সনাতনে—সৃষ্টির প্রথম উৎসারিত পটভূমি

তারই অন্তিমের কথা ? অন্তহীন মোজেইকে আলোকের গোলকধাঁধায়
কেউ প্রিয়া—কেউ তার অনির্বাণ প্রিয় হতে চায় ;
ঝরে যায়—দূর মৃগতৃষ্ণিকার মতো দীপ্ত তুমি।

এখন ভোরের বেলা মনে হয় তুমি শাদা যূথিকার মতো।
তেমনই পবিত্র স্বাদ তোমার শরীর শিখা ঘিরে।
কোথাও বিষয় খুঁজে তোমাকে দেখেছি রৌদ্রে লুকানো শিশিরে ;
সৃষ্টির প্রথম ভোর থেকে অবশেষে আজ এই পরিণত
শেষ ভোর, শেষ রোদ, শেষ ফুল, অন্তিম শিশির।
মীনকেতনের দিন জন্মান্তরে কেটে গেছে,—আজ প্রতিসারী
আরেক প্রয়াণে উৎস ;—একটি মেঘের মতো চলে এসে তারই
নীলিমায় মিশে যেতে-যেতে—থেমে—শুনেছি, বলেছ তুমি, 'স্থির

মেঘশান্তি প্রকৃতির—মানুষ তা হারায়ে ফেলেছে।'
চারিদিকে সময়ের সকল বিশাল মরুভূমি
বলয়িত নগরীর সমাজের সভ্যতার কলঙ্কসুন্দর
মৃগতৃষ্ণায় লয় পেয়ে গেলে স্থির তুমি—স্থিরতর তুমি।

দিগন্ত। শ্রাবণ ১৩৫৪

এই পথ দিয়ে

এই পথ দিয়ে কেউ চলে যেত জানি
এই ঘাস
নীলাকাশ—
এ সব শালিক সোনালি ধান নরনারীদের
ছায়া-কাটাকুটি কালো রোদে

সে তার নিজের ছায়া ফেলে উবে যেত ;
আসন্ন রাত্রির দিকে সহসা দিনের আলো নষ্ট হয়ে গেলে
কোথাও নতুন ভোর রয়ে গেছে জেনে
সে তার নিজের সাধ রৌদ্র স্বর্ণ সৃষ্টি করেছিল।

তবুও রাত্রির দিকে চোখ তার পড়েছিল বলে
হে আকাশ, হে সময়, তোমার আলোকবর্ষব্যাপ্তি শেষ হলে
যখন আমার মৃত্যু হবে
সময়ের বঞ্চনায় বিরচিত সে এক নারীর
অবোলা রাত্রির মতো চোখ মনে রবে।

ক্রান্তি। আশ্বিন ১৩৫৪

কার্তিক-অঘ্রান ১৯৪৬

পাহাড়, আকাশ, জল, অনন্ত প্রান্তর :
সৃজনের কী ভীষণ উৎস থেকে জেগে
কেমন নীরব হয়ে রয়েছে আবেগে ;
যেন বজ্রবাতাসের ঝড়
ছবির ভিতরে স্থির—ছবির ভিতর আরও স্থির।
কোথাও উজ্জ্বল সূর্য আসে ;
জ্যোতিষ্কেরা জ্বলে ওঠে সপ্রতিভ রাতে
আদি ধাতু অনাদির ধাতুর আঘাতে
নারীশিখা হত যদি পুরুষের পাশে :
আকাশ প্রান্তর নীল পাহাড়ের মতো
নক্ষত্র সূর্যের মতো বিশ্ব-অন্তর্লীন ;
উজ্জ্বল শান্তির মতো আমাদের রাত্রি আর দিন

হবে না কি ব্রহ্মাণ্ডের লীন কারুকার্যে পরিণত।

দেশ। শারদীয় ১৩৫৪

ভোর ও ছয়টি বমার : ১৯৪২

কোথাও বাইরে গিয়ে চেয়ে দেখি দু-চারটে পাখি।
ঘাসের উপরে রোদে শিশির শুকায়।
নিজেদের ক্ষেতে ধানে—চার-পাঁচজন লোক
মানবের মতন একাকী।
মাটিরও তরঙ্গ স্বর্গীয় জ্যামিতির প্রত্যাশায়
মিশে গেছে অতীত ও আজকের সমস্ত আকাশে।

দিগন্তে কি ধর্মঘট ?—চিমনি…পাখির মতন অনায়াসে
নীলিমায় ছড়ায়েছে। এখানে নদীর স্থির কাকচক্ষু জলে
ঘুরুনো সিঁড়ির মতো আকাশ পর্যন্ত মেঘ সব
উঠে গেছে—অনুভব করে প্রকৃতির সাথে মিলিত হতেই,

অমিলনের সূর্যরোলে জ্যোতির্ময় এলুমিনিয়ম অনুভব
করে আমি দুই তিন চার পাঁচ ছয়টি এরোপ্লেন গুনে
নীলিমা দেখার ছলে শতাব্দীর প্রেতাত্মাকে দেখেছি অরুণে।

সওগাত। কার্তিক ১৩৫৪

পৃথিবী ও সময়

সময়ের উপকণ্ঠে রাত্রি প্রায় হয়ে এলে আজ
সূর্যকে পশ্চিমে দেখি সারা শতাব্দীর

অক্লান্ত রক্তের বোঝা গুছায়ে একাকী
তবুও আশার মতো মেঘে-মেঘে বলয়িত হয়ে
শেষ আলো ঢেলে যায় ; জ্যোতিঃপ্রাণধর্মী সূর্য অই ;
একদিন অ্যামিবার উৎসারণ এনেছিল ;
জীবনের ফেনশীর্ষ সিন্ধুর কল্লোলে একদিন
মানুষকে পেয়েছিল ;—না-ধর্মী মানুষ সেইদিন
ভয় পেত, গুহায় লুকাত, তবু সূর্যকরোজ্জ্বল
সোনালি মানবী তাকে 'হাঁ' বলাল—নীল
আকাশ নগরীরেখা দেখা দিল ; শঙ্খ আমলকী
সাগর অলিভবন চেনা গেল রৌদ্রের ভিতরে ;
শ্বেতাশ্বতর-প্লেটো-আলোকিত পৃথিবীর রূপ
অনাদির দায়ভাগে উৎসারিত রক্তের নদীর
শিয়রে আশার মতো জেগে উৎসাহিত সূর্যকরে
সহসা নতুন হিংসা রক্ত গ্লানিমার কাছে প্রতিহত হয়ে
ধীরে-ধীরে নিঃশেষে ফুরায়ে গেল তবু।

ভাই-বোন-স্মৃতি-শান্তি হননের ঘোরে উদ্বেলিত
বহতা নদীর মতো আজও এই পৃথিবী চলেছে।
তবুও তো সেই উদ্‌ঘাতিনী
নদীরমণীর শব্দ কানে নিয়ে—প্রাণে
আকাশে জ্যোতিষ্ক জ্বলে হস্তা অভিজিৎ,
অনুরাধা শতভিষা লুব্ধক স্বাতী ;
পৃথিবীতে—হৃদয়েরও গতিপথে বর্ণালির আভা
সম্পূর্ণ দীপ্তির মতো আলোকিত—ক্রমে আলোকিত হতে চায়।

লন্ডন রুশিয়া গ্রীসদ্বীপপুঞ্জ কলকাতা চীন,
অগণন কন্‌ফারেন্‌সে বিকীর্ণ য়ুরোপা,

আমেরিকা—যেন বীতবর্ষণের কৃষ্ণমেঘ নক্ষত্রের পথে ;
ক্ষণিক উজ্জ্বল হয়ে ক্লান্তি ক্লেদ ভয় অন্ধকার হতে চায়
এখুনি আবার তবু। প্রকৃতিতে সূর্য আসে, অস্তের আকাশে
চলে যায় ; অস্তগতিহীন শুভ্র জনহৃদয়ের
সূর্যনগরীর দিকে যেতে হবে চেতনায় মানুষের সময় চলেছে।

ক্রান্তি। কার্তিক ১৩৫৪

অনেক মৃত বিপ্লবী স্মরণে

তারা সব মৃত।
ইতিহাসে তবুও তাদের
কেবলই বাঁচার প্রয়োজন বলে
তাদের উত্তর-অধিকার
কোনো-কোনো মানবের হাতে আসে।
তারা মরে গেছে।
সবারই জীবনে আলো প্রয়োজন জেনে
সকলের জন্যে স্পষ্ট পরিমিত সূর্য পেতে গিয়ে
তবুও বিলোল অন্ধকারে—
তারা আজ পৃথিবীর নিয়মে নীরব।

এই অই ব্যক্তির জীবনে
সুসময় শুভ অর্থ পরিচ্ছন্নতার
প্রয়োজন রয়ে গেছে জেনে নিয়ে তারা,
তবুও ব্যক্তির চেয়ে ঢের বেশি গহন স্বভাবে উৎসারিত
জীবনবিসারী ক্ষুব্ধ জনতাসমুদ্র দেখেছিল।
সেইখানে একদিন মানুষের কাহিনী জন্মেছে ;

বেড়ে গেছে ;
কাহিনীর মৃত্যু হয় নাই ;
কাহিনী ক্রমেই ইতিহাস।
জীবনধারণে—জানি—তবু—
জীবনকে ভালো করে অর্থময় করে নিতে গিয়ে
ইতিহাস কেবলই আয়ত হয়ে আলো পেতে চায়।
নিজেদের আবছা ব্যক্তির মতো মনে করে তারা,
ইতিহাস স্পষ্ট করে দিতে গিয়ে তবু,
আজ এই শতকের শূন্য হাতে শূন্যতার চেয়ে বেশি দান
দিয়েছিল হয়তো বা।
দেয়নি কি ?
আজ এই হেমন্তের অন্ধকার রাতে
আমরা বিহ্বল ব্যক্তি,—তুমি—আমি—আরও ঢের লোক ;
মানুষসমুদ্রে ঠেকে অন্ধকার বিশ্বের মতন
তবুও সবার আগে নিজের আকাশ
নিজের সাহস স্বপ্ন মকরকেতন
আপনার মননশীলতা
গণনার প্রিয় জিনিসের মতো মনে ভেবে নিয়ে
অন্য সকলের কথা ভুলে যাই।

সকলের জীবনের শুভ উদ্‌যাপনের চেষ্টায়
সূর্যের সুনাম আরও বড়ো করে দিতে গিয়ে তারা
নিজেদের বিষণ্ন সূর্যের কথা ভুলে গিয়েছিল।
মানবের কথা বিরচিত হয়ে চলে—
সেইসব দূর আতুর ভঙ্গুর সুমেরীয় দিন থেকে আজ
জেনিভায়—মস্কৌ—ইংল্যান্ড—আত্‌লান্তিক চার্টারে,
ইউ. এন. ওয়ের ক্লান্ত প্রৌঢ়তায়—সতর্কতায়,

চীন—ভারতের—সব শীত-পৃথিবীর
নিরাশ্রয় মানবের আত্মার ধিক্কার—অন্তর্দানে।
হেমন্তের রাত আজ ক্ষুব্ধতায়—জনতায়—নর্দমায়—ক্লেদে
লোভাতুর ক্রূর রাষ্ট্রসমাজের রচিত নৈরাজ্যে
অসম্ভব অন্ধ মৃত্যুতে
ফুরোনো ধানের ক্ষেতে তবু
মৃত পঙ্গপালদের ভিড়ে
নরকের নিরাশার প্রয়োজন রয়ে গেছে জেনে, তবু বলে :
'গভীর—গভীরতর তবুও জীবন—
নিজেদের দীনাত্মা ব্যক্তির মতো মনে করে ওরা
সকলের জন্যে সময়ের
সুন্দর সীমিত আলো সঞ্চারিত করে দিতে গিয়ে
প্রাণ দিয়েছিল।

জীবনধারণে, তবু জীবনের আরও বর্ণনীয়
ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে আরও সুস্থ—আরও প্রিয়তর
ধারণায় ইতিহাস,—ইঙ্গিতের আরও স্পষ্টতায় ;
তবে তা উজ্জ্বল হলে জীবন তবুও
নিরালোক হয়ে রবে কত দিন ?
কত দিন হতে পারে !'

ইঙ্গিত পৌষ ১৩৫৪

মহাত্মাজি

সফল উজ্জ্বল ভোর পৃথিবীতে আসে,
তারপর অন্ধকার ভাঙনের রাত ;
এ রকম টানাপোড়েনের বেগে মানুষের সময় চলেছে।

একদিন পৃথিবীর হিংসাব্যথা শেষ হবে, সেই অনিবার
আনন্দের চিন্তার মতন প্রেম আলো
মাথার ওপরকার প্রসারিত নীলিমার মতো
সবের ওপরে সত্য হয়ে আছে, আছে মনে হয়।

বসন্তের বায়ু আসে পাখিদের কলরব নিয়ে ;
সূর্য জ্বলে ওঠে নিজ মহিমার স্থলে ;
জ্যোতির নিঃসৃত নিজ কন্যার মতন
সমুদ্র সমস্ত দিন কল্লোলিত হয় ;
পৃথিবীতে, আমাদের সমাজেও এ রকম সুদীপ্ত সময়
অনুভব করে সব মানুষেরা মৃত অপসৃত শতাব্দীর
গ্লানির কলঙ্ক থেকে উঠে এসে তনু মন প্রাণ
করায় কী অন্তহীন অমলিন আলোসূর্যে স্নান !
মানুষের অবিরল রাত্রি দিনে যেই ভুল, লোভ
হননের ইচ্ছা, রক্ত, অন্ধকার, ক্ষয় :
তিরোহিত হল না তো সেইসব আজও ;
তবুও কল্যাণকৃৎ মহাত্মার মাধুরীর এটুকু সময়
আর সেই মধুরতা কি করে নিহত হল, তবু
সংরক্ষণ করে রাখে নিজের অমিয় ;
সৃষ্টির অক্ষয় অন্ধ সবিতার কাছে
মানুষ, এ সূর্য তুমি নিও।

ক্রান্তি। মাঘ ১৩৫৪

মহাত্মা

আলোর মতন ব্যাপ্ত অন্তরাত্মা নিয়ে
বিশ্বের অগ্নির উৎস থেকে

মাঝে-মাঝে একজন অবিস্মরণীয়
কল্যাণকৃতের জন্ম হয় ;
অমর সে নয়—কোনো অন্তহীন অমেয় সময়
তার হাতে নেই ;—তবু মৃত্যু এসে চোখে
চুম্বন দেবার আগে সবচেয়ে সাত্ত্বিক আলোকে
আমাদের এই অন্ধ ক্লান্ত শতাব্দীকে
স্নিগ্ধ করে চলে গেছে সেই যুবা প্রৌঢ় ও স্থবির ;
বলেছে : মানুষ সত্য, তবু সত্য মানুষের চেয়েও গভীর।

একক। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫

পৃথিবীগ্রহবাসী

বিকেলবেলা গড়িয়ে গেলে অনেক মেঘের ভিড়
কয়েক ফলা দীর্ঘতম সূর্যকিরণ বুকে
জাগিয়ে তুলে হলুদ নীল কমলা রঙের আলোয়
জ্বলে উঠে ঝরে গেল অন্ধকারের মুখে।
যুবারা সব যে যার ঢেউয়ে
    মেয়েরা সব যে যার প্রিয়ের সাথে
কোথায় আছে জানি না তো ;
কোথায় সমাজ, অর্থনীতি, স্বর্গগামী সিঁড়ি
ভেঙে গিয়ে পায়ের নিচে রক্তনদীর মতো ;
মানব ক্রমপরিণতির পথে লিঙ্গশরীরী
হয়ে কি আজ চারিদিকে গণনাহীন ধূসর দেয়ালে
ছড়িয়ে আছে যে যার দ্বৈপসাগর দখল করে !
পুরাণপুরুষ, গণমানুষ, নারীপুরুষ, মানবতা, অসংখ্য বিপ্লব
অর্থবিহীন হয়ে গেলে, তবু আরেক নবীনতর ভোরে
সার্থকতা পাওয়া যাবে ভেবে মানুষ সঞ্চারিত হয়ে

পথে-পথে সবের শুভ নিকেতনের সমাজ বানিয়ে
তবুও কেবল দ্বীপ বানাল যে যার নিজের অবক্ষয়ের জলে।
প্রাচীন কথা নতুন করে এই পৃথিবীর অনন্ত বোনভায়ে
ভাবছে একা-একা বসে
যুদ্ধ রক্ত রিরংসা ভয় কলরোলের ফাঁকে :
ফ্রয়ড মার্ক্স গান্ধী লেনিন আইনস্টাইনের ক্রন্দসীতে আজ
যে দোর কঠিন ; নেই মনে হয়—সে দ্বার খুলে তবে
মানব, তোমায় সত্য, সুজন পৃথিবীগ্রহবাসী হতে হবে।

চতুরঙ্গ। আশ্বিন ১৩৫৫

চেতনা-সবিতা

সূর্য কখন পশ্চিমে ঢলে মশালের মতো ভেঙে
লাল হয়ে উঠে সমুদ্দুরের ভিতরে নিভছে গিয়ে ;
সে যে রোজ নেভে সকলেই জানে, তবু
আজও ঢুবে যায় সময়মতন সকলের অজানিতে।
নারী সাপ যখ বণিক ভিখিরি পিশাচ সকলে মিলে
ভোরবেলা থেকে মনের সূর্যনগরীর আলো খুঁজে
পথের প্রমাণ সূর্যের ধ্বকে রক্তে ঘুরেছে কী যে।
শিশুর মতন বানানের ভুলে মহাজীবনের ভাষা
আধো শিখে আধো শেখার প্রয়াসে পরস্পরকে তারা
দেখেছে কঠিন সিঁড়িকাটা পথে—নরকের থেকে সিঁড়ি
এঁকেবেঁকে ঘুরে বীতবর্ষণ কৃষ্ণ মেঘের মতো
নীলিমায় দূরে কোথায় মিশেছে। মানবহৃদয় তাকে
পেতে চায় প্রেমে আর অনুমানে ; ধুলো হাড় উর্ণায়
ডাঙা বন্দরে চোরা নগরের রক্তনদীর ঢেউয়ে

জেনে নিতে চায় কী সে ইতিহাসঠাসা বেদনার থেকে
এ সিঁড়ি জেগেছে—কোথায় গিয়েছে—এত কঙ্কাল খুলি
এত আবছায়া ফেনিল সাগর—জ্ঞান প্রেম প্রাণ একে
ঘিরে আছে কেন ; নরনারীদের নিরাশাসূচক মুখে
কেন তবু আসে ভালো প্রভাতের মতন বিচ্ছুরণ ?
মুখে ভুল ভাষা পুরুষ নারীর ; হৃদয়ের কোলাহলে
কি কাম কারণ কর্দম ? তবু আলোনদী হতে চায়।
বোনভাইদের হননে তবুও নদীর রক্ত জল।
সময় এখন মরুভূমি ; সীমা : মৃগতৃষ্ণার মতো,
পান্থ বানাল মানুষ তোমাকে—তোমার সাধনা গতি প্রাণনার ঢের
হাড়গোড় ভেঙে পড়ে থাকে, তবু, মানবেতিহাস মানে
আরও আলোকিত চেতনার স্বাদ—মনের সূর্যনগরী জ্ঞানের কাছে
প্রেমের নিজের নিবেদন—তাই মহা অঘটনে কালো
ইতিহাসরাত গ্রহণমুক্ত সূর্যের মতো আলো।

যুগান্তর। শারদীয় ১৩৫৫

এই চেতনা

হলুদ কমলা ধূসর, মেঘের ফাঁক দিয়ে
কিরণের সব বর্শাফলক দীর্ঘ ছন্দে উঠে
উপরের নীল আকাশের দিকে নির্জনতার মতো
চলে গেছে ;—আর বাকি সব শাদা সূর্যরশ্মি পৃথিবীর
চোরা গলি ভাঙা দরদালানের দিকে
শুভ্র সুসমাচারের মতন—পৃথিবীর নরনারী নগরীর
নিরুদ্দেশের সীমানায় ঠেকে স্থির হয়ে আছে—দেখ।
এখন বিকেল—গাঁ শহর নটী বণিক ভিখিরি পলিটিশ্যানরা সব
ক্রমেই অধিক স্তিমিত সুরের ধূসর পৃথিবী বেয়ে

নিভু-নিভু শেষ রোদের কিনারে ত্রস্ত মাছির মতো
দেখে আলো নেই ;—জীবমৃত্যুর তবে অন্তিমযুগ ?
(চেয়ে দেখে আলো নিভে যায় যেন হেমন্ত-ব্ল্যাকআউটে)
প্রান্তর থেকে নগরের থেকে জীবনের থেকে সবই
ঢের দিনকার অনাদায়ী তহশিলের মতন শূন্যে কেঁপে
সূর্যের সাথে হারিয়ে যেতেছে কোথায় কামাতলান্তে।
আরও এক দিন কেটে গেল তবে অনুপম মৃগতৃষ্ণার
মতন সূর্যকিরণ জ্বালায়ে সমাজ-জাতির চোখে।
দিনভোর সব বড়ো বেবিলন আমাদের সিঁড়ি বেয়ে
নক্‌শি উল্কি নারী ভালোবেসে, আত্মবিচারে ধীরে
অলিভের বনে আথেন্স দেখেছে ;—সূর্যের আগে অণু—
সূর্যের মতো উপনিষদের শীত আলো
ভালো করে পেতে-না-পেতেই রোম—দ্বিতীয় সূর্য নিজে
শাসন করেছে যুদ্ধ করেছে ;—আমরা যুদ্ধ করি,
সুশাসন করি গণনাবিহীন রক্তনদীর পারে
নকল সূর্যে শুক্ল সুপথে পতিত অন্ধকারে।
জানি না প্রাণের সূর্য কোথায়।
আজকে এখন দিন, শতাব্দী পৃথিবী সৃষ্টি চুপে
বিকালের আলো নেভাতেছে ; শত নগরীর ভবনের
সিঁড়ির অপার গোলকধাঁধায় মৃত-জীবিতেরা মিলে
প্রকৃতি প্রণয় সমাজ পৃথিবী জীবনের মানে খুঁজে
খাঁচার ভিতরে অনেক রঙিন পাখির মতন—কেমন সন্দীপনী !
যার-যার দ্বৈপ আত্মা মুক্ত করে দিয়ে
আত্মঘাতী নেলনের ক্লান্তি লয় করে
দিতে চায় ; প্রেম ও হৃদয় জ্ঞান বিনিময় রয়েছে তাদের ;
আলো চায়—অনাদি অনন্ত সূর্য খোঁজে।

সাহিত্যপত্র। কার্তিক ১৩৫৫

বিপাশা

অনেক বছর হল সে কোথায় পৃথিবীর মনে মিশে আছে।
জেগে থেকে কথা বলে অন্য নারীমুখ দেখে কেউ কোনোমতে
কেবলই কঠিন ঋণ দীর্ঘকাল আপামর পৃথিবীর কাছে
চেয়ে নিয়ে তারপর পাশ কেটে, মেয়েটির ঘুমের জগতে
দেনা শোক করে দিতে ভালোবাসে, আহা।

আকাশে রৌদ্রের রোল, নদী, মাঠ, পথের বাতাস
সেই স্বার্থ বুকে নিয়ে নিরুপম উজ্জ্বলতা হল ;
শূন্যের সংঘর্ষ থেকে অনুপম হল নীলাকাশ ;

তবুও স্বাতীর আলো—শিশিরের মতো তার অপরূপ চোখ
নিজের শরীর মন প্রাণশিল্পী আর
না জাগায়ে প্রেমিকের ঋতু পরিবর্তনের মতো ;
নারী আজ সময়ের নিজের আধার।

মৌসুমী। বৈশাখ ১৩৫৬

আলোকপত্র

হে নদী আকাশ মেঘ পাহাড় বনানী,
সৃজনের অন্ধকার অনির্দেশ উৎসের মতন
আজ এই পৃথিবীতে মানুষের মন
মনে হয় অধঃপতিত এক প্রাণী।

প্রেম তার সবচেয়ে ছায়া, নিরাধার

নিঃস্বতায়—অকৃত্রিম আগুনের মতো
নিজেকে না চিনে আজ রক্তে পরিণত
হে আগুন, কবে পাব জ্যোতিঃদীপাধার।
মানুষের জ্ঞানালোক সীমাহীন শক্তিপরিধির
ভিতরে নিঃসীম ;
ক্ষমতায় লালসায় অহেতুক বস্তুপুঞ্জে হিম ;
সূর্য নয়—তারা নয়—ধোঁয়ার শরীর

এ অঙ্গার অগ্নি হোক, এই অগ্নি ধ্যানালোক হোক
জ্ঞান হোক প্রেম—প্রেম শোকাবহ জ্ঞান
হৃদয়ে ধারণ করে সমাজের প্রাণ
অধিক উজ্জ্বল অর্থে করেনিকো অশোক আলোক।

কৃষক। শারদীয় ১৩৫৬ [?]

স্বাতীতারা

স্বাতীতারা, কবে তোমায় দেখেছিলাম কলকাতাতে আমি
দশ-পনেরো বছর আগে ;—সময় তখন তোমার চুলে কালো
মেঘের মতন লুকিয়ে থেকে বিদ্যুৎ জ্বালাল,
তোমার নিশিত নারীমুখের ;—জানোতো অন্তর্যামী।
তোমার মুখ : চারিদিকে অন্ধকারে জলের কোলাহল।
কোথাও কোনো বেলাভূমের নিয়ন্তা নেই—গভীর বাতাসে
তবুও সব রণক্লান্ত অবসন্ন নাবিক ফিরে আসে।
তারা যুবা, তারা মৃত ; মৃত্যু অনেক পরিশ্রমের ফল।
সময় কোথাও নিবারিত হয় না, তবু, তোমার মুখের পথে
আজও তাকে থামিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছো, নারি—

হয়তো ভোরে আমরা সবাই মানুষ ছিলাম, তারই
নিদর্শনের সূর্যবলয় আজকের এই অন্ধ জগতে।
চারিদিকে অলীক সাগর—জ্যাসন ওডিসিয়ুস ফিনিশিয়
সার্থবাহের অধীর আলো—ধর্মাশোকের নিজের তো নয়, আপতিত কাল
আমরা আজও বহন করে, সকল কঠিন সমুদ্রে প্রবাল
লুটে তোমার চোখের বিষাদ ভর্ৎসনা...প্রেম নিভিয়ে দিলাম প্রিয়।

আনন্দবাজার পত্রিকা। শারদীয় ১৩৫৬

আলোকপাত

আকাশ দিয়ে উড়ে গেল শাদা হাঁসের ভিড়।
এইখানেতে আজ পৃথিবীর অনেক মলিন অন্তেবাসী ভাবে ;
দূর উপরের নীল আকাশের রোদের বিচ্ছুরণে
ও সব পাখি রূপশালি ধান ? কোথায় উড়ে যাবে ?
হৃদয় থেকে বাহির হয়ে প্রেম বলেছে : ঐ
নীলাকাশের আজি-কাজিডাঙায় যে সব চোরা গলি থাকে
যে সব বাতাস দেয়ালা ছায়া নখ পাখশাট পাপের থেকে আসে
তারই ভিতর মৃত্যুফেনশীর্ষে ওরা পরস্পরকে ডাকে।
ওরা জানে ; সব কুয়াশা পেরুনো এক অব্যর্থ নির্দেশ
ওদের বুকে ;—শুধু ডানার পিস্‌টনে তা নয় ;
প্রেমই ওদের দিক চিনিয়ে সাগরবলয় কল্লোলে পৌঁছায়।
হৃদয়, এ সব স্বপ্ন-পরিভাষা মনে হয়।
তবুও ঠিক। আমিও যুগের অকূল কিনারা ভেঙে
অনেক দিনের অনুষঙ্গে চেনা সে এক অমেয় নারীর পানে
যেতে-যেতে আসছে এসে-যাওয়া যুগের অবসাদে ঐ পাখিদের প্রেম—
স্বীকার করি ; আমাদেরও প্রেমে কিছু আলোকপাত আনে।

যুগান্তর। শারদীয় ১৩৫৬

দিনরাত্রি

সমস্ত দিন
সমস্ত পৃথিবীই যেন আকাশ।
চারিদিকে রৌদ্রের ভিতর রয়ে গেছে নির্মল জলের অনুভূতি ;
জল আকাশ ও আগুনের থেকে এইসব রাত্রির জন্ম হয় ;
অন্তহীন শুভ্র বিবেকী নক্ষত্রের ;
এইসব স্থায়ী জিনিস চল-বিশ্বলোকের ;
মানবজীবনের ; এদের অনবচ্ছিন্ন উজ্জ্বল প্রবাহে ধৌত হয়ে
সমস্ত গৃহযুদ্ধের গৃহবলিভুকদের রক্তের
শেষ বিন্দুও খুঁজে পাবে না কোথাও,
কোথাও থাকবে না আন্তর্জাতিক অন্যায়ের ছায়া আর।

দেখা যাবে দিন সূর্যশরীরী ;
যাযাবর হাঁসকে নিয়ে চলেছে মেঘের
ফেনা-ওড়ানো দূরতর নীলিমায় ;
জেগে উঠবে বিকেলের শিয়রে
সাগরের বাতাস যেন—দূর ময়দানের ;
অন্তহীন নক্ষত্রের চলাফেরার দেশে পাওয়া যায় তাকে ;
ঐ ঝাউ-গাছের আঁধারের ভিতরেও ;
বন্দরে-নগরে
মানুষের হিংস্র বেড়ালের মতো গর্জনকে বিনমিত করে
করুণার রাত্রিঋতুর মতো
পাওয়া যায় তাকে—পাওয়া যায় তাকে।
আজকের মলিনতা রক্ত কোথায় লীন হয়ে যাচ্ছে
সময়ের মনে—নিরবচ্ছিন্ন বিসরণে—

দিন ও রাত্রির অন্তহীন
জলঝর্নার শুশ্রূষার শব্দের ভিতর।

পূর্বাশা। ফাল্গুন ১৩৫৬

সূর্যকরোজ্জ্বলা

আমরা কিছু চেয়েছিলাম প্রিয় ;
নক্ষত্র মেঘ আশা আলোর ঘরে
ঐ পৃথিবীর সূর্যসাগরে
দেখেছিলাম ফেনশীর্ষ আলোড়নের পথে
মানুষ তাহার ছায়ান্ধকার নিজের জগতে
জন্ম নিল—এগিয়ে গেল ;—
কত আগুন কত তুষার যুগ
শেষ করে সে আলোর লক্ষ্যে চলার কোনো শেষ
হবে না আর জেনে নিয়ে নির্মল নির্দেশ
পেয়ে যাবে গভীর জ্ঞানের,—ভেবেছিলাম,
পেয়ে যাবে প্রেমের স্পষ্ট গতি
সত্য সূর্যালোকের মতন ;—বলে গেল মৃত
অন্ধকারের জীবিতদের প্রতি।

জীবিত, মানে আজ সময়ের পথে
বালি শিশির ধুলোর মতন কণা
মিলিয়ে তাদের প্রাণের প্রেরণা
ক্রমেই চরিতার্থ হতে চায়।
চারদিকে নীল অপার্থিবতায়
সোনার মতন চিলের ডানায় কোনো
খাদ মেশানো নেই, তবু তার প্রাণে
কোটি বছর পরে কোনো মানে

বার করেছে মন কি প্রকৃতির ?
মানুষ তবু পাখির চেয়ে ঢের
অমৃতলোক হাতের কাছে পেয়ে
তবু কি অমৃতের ?

মানুষ আমি,—মানুষ আমার পাশে ;
হৃদয়ে তার হৃদয় মেশালেও
ব্যক্তি আমি, ব্যক্তিপুরুষ সে-ও ;
দ্বীপের মতন একা আমি তুমি ;
অনন্ত সব পৃথক দ্বীপের একক মরুভূমি ;
যে যার পরিপূর্ণ অবিশ্বাসে
রয়ে গেছে ;—সেখানে থেকে ব্যাজস্তুতি, কপট প্রণয় ভয়
দেখ কেমন উৎসারিত হয় ;
প্রাণের প্রয়াস রয়েছে তবু, তাই
দেখেছি মানুষ অনর্গল অন্ধকারে মরে
মানবকে তার প্রতিনিধি রেখে গেছে—
হয়তো এক দিন
সফলতা গেয়ে যাবে ইতিহাসের ভোরে।

চারদিকেতে সব মানুষের ব্যথা মধুরতা
নির্মলতার সাগরসূর্যে ঝরে।
বন্ধু আমার ভোরে এলে দেয়ালে ছায়া পড়ে
তবুও কি আজ ম্যামথ-পৃথিবীর ?
সে কোন যুগের সরীসৃপের অব্যক্ত শরীর
কামনা ভুল কুজ্ঝটিকায় যে সব অসংগতি
এনেছিল—তাদের তুমি সহিষ্ণুতায় শুদ্ধ করে নিয়ে
ইতিহাসের অন্ধকারে প্রথম শিশু মানুষ জাগিয়ে

চলছ আজও একটি সূর্য হঠাৎ হারিয়ে ফেলার ভয়ে ;
হয়তো মানুষ নিজেই স্বাধীন, অথবা তার দায়ভাগিনী তুমি ;
ওরা আসে, লীন হয়ে যায় ; হে মহাপৃথিবী,
সূর্যকরোজ্জ্বল মানুষের প্রেম চেতনার ভূমি।

মাসিক বসুমতী। ফাল্গুন ১৩৫৬

আশা-ভরসা

ইতিহাসপথ বেয়ে অবশেষে এই
শতাব্দীতে মানুষের কাজ
আশায় আলোয় শুরু হয়েছিল বুঝি—শুভ্র কথা
বলা হতেছিল ;—রৌদ্রে জলে ভালো লেগেছিল
শরীরকে—জীবনকে।

কিন্তু তবু সবই প্রিয় মানুষের হাতে
অপ্রিয় প্রহার হয়ে মূল্যহীন মানুষের গায়ে
আশ্চর্য মৃত্যুর মতো মূল্য হয়—হিম হয়।
মানুষের সভ্যতার বয়ঃসন্ধিদোষ
হয়তো কাটেনি আজও, তাই
এরকমই হতে হবে আরও রাত্রি দিন ;—
নক্ষত্র সূর্যের সাথে সঞ্চালিত হয়ে তবু আলোকের পথে
মৃত ম্যামথের কাছে কুহেলির ঋণ
শেষ করে মানুষ সফল হতে পারে
উৎসাহ সংকল্প প্রেমে মূল্যের অক্ষুণ্ন সংস্কারে ;
আশা করা যাক।

সুধীরাও সেই কথা ভাবে,
আপ্রাণ নির্দেশ দান করে।

ইতিহাসে ঘুরপথ ভুলপথ গ্লানি হিংসা অন্ধকার ভয়
আরও ঢের আছে, তবু মানুষকে সেতু থেকে সেতুলোক পার হতে হয়।

দ্বন্দ্ব। আষাঢ় ১৩৫৭

ক্রান্তিবলয়

মৃত্যু আর সূর্যকরোজ্জ্বল এই পৃথিবীর বুকের ভিতরে
সময়ের মহাসমুদ্রের পারে বালির কণার মতো ঘরে
নক্ষত্রের প্রতিশ্রুতি—দিনমান প্রামাণিক মৃত্তিকার ধুলো
গড়ে গেছে মানুষের জীবনের চলোচ্ছল বাসনার—এই শিশু বৎসরগুলো।
কোথাও পৌঁছুতে হবে মনে মেনে নিয়ে
চলেছে সে ;
দেখেছে ভূস্তরে মহাসরীসৃপ অচেতনভাবে ব্যথা দিয়ে
অচেতন প্রকৃতিকে অন্ধকারে গিয়েছে হারিয়ে।
তবুও প্রকৃতি তার মূল্যের নির্ণয় নিয়ে দিনরাত্রি সহিষ্ণু, অশোক ;
চারিদিকে শীত রাত্রি অগ্নির বলয় বড়ো ব্রহ্মাণ্ডের কারুশিল্পলোক
মানুষের পৃথিবীর অণুকণিকার মতো পরিসর ঘিরে।

ফেনা রৌদ্র সাগরের কল্লোলে কুয়াশায় পতঙ্গে শিশিরে
নিজেকে উজ্জ্বলভাবে চরিতার্থ মনে করে নিয়ে
মানুষের রাত্রিদিন শুরু হয়েছিল ;
তারপর কবে—
শেষ হয়ে গেলে শ্যাম পৃথিবী ও নীলিমার বলয়ে জিজ্ঞাসা হয়ে রবে ;
রবে বুঝি,
গ্লানি ব্যথা রক্তের অক্ষর আজও শিশুসূর্যের মতো হাসে
অপ্রেমের রঙে কৃষ্ণ মানুষের জ্ঞান ও গতির ইতিহাসে।

এতদিন ধরে তবু মানুষ চিনেছে
অন্তরঙ্গভাবে তার সময়কে—এ পৃথিবীটিকে
ভূগর্ভের অশ্ম থেকে ভিন্ন হয়ে অন্য এক আলোকের দিকে
যেতে হবে জানে ;
নীলকণ্ঠ পাখি রৌদ্রে উড়ে এলে যাযাবর সময়ের মানে
ধরা পড়ে যেন স্থাণু কণিকার কাছে।
মানুষের কাহিনীতে আরও কত ক্লান্তি রক্ত—
তবু প্রেম ক্ষেম প্রেমক্ষেমহীন রাত্রির উৎসারণ আছে ;
তবু এই শতকের সময়ের লোভ ভয় মৃত্যু রণ আত্মসমাহিতি ছেড়ে দিয়ে
আরও স্পষ্ট আকাশের পদার্থের আলোকের মৃত্যু-অমৃতের অনুভবে
মানুষকে শুভ স্থির স্থিরতর বিষয়ের দিকে যেতে হবে ;
যদিও সে স্থিরতার ধারণায় কিংবা তার হিসেবের দোষে
সত্যকে আচ্ছন্ন বলে মনে হয়—যেতে হবে আরও দূর দূরতর কূলে
তা হলে সমাজ সীমা সময়ের সত্যের সূর্যের মর্মমূলে।

আনন্দবাজার পত্রিকা। শারদীয় ১৩৫৭

আজ

অন্ধ সাগরের বেগে উৎসারিত রাত্রির মতন
আলোড়নে মানুষের প্রিয়তর দিকনির্ণয়ের
পথ আজ প্রতিহত ; তবুও কোথাও
নির্মল সন্ততি দেশ সময়ের নব-নব তীর—
   পেতে পারে হয়তো বা মানবহৃদয় ;
মহাপতনের দিনে আজ অবহিত হয়ে নিতে হয়।
যদিও অধীর লক্ষ্যে অন্ধকারে মানুষ চলেছে
ধ্বংস আশা বেদনায়
বন্য মরালের মতো চেতনার নীল কুয়াশায়—

কুহেলি সরিয়ে তবু মানুষের কাহিনীর পথে
ভাস্বরতা এসে পড়ে মাঝে-মাঝে—
   স্বচ্ছ ক্রান্তিবলয়ের মতন জগতে।
মনে হয় মহানিশীথের স্তন্যপায়ী
মানুষ তবুও শিশুসূর্যের সন্তান,
স্থিরতর বিষয়ী সে—
   যদিও হৃদয়ে রক্তে আজও ভুল অকূলের গান।

নির্ণয়। শারদীয় ১৩৫৭

পৃথিবী আজ

প্রকৃতি থেকে ফসল জল নীলকণ্ঠ এল :
সময়পাপচক্র থেকে বাহির হল ব্যথিত নিঃসহায়।
সবের পথে শতাব্দীর এই রাত্রি ব্যাপকতা
প্রশান্তি নয়—ক্রমেই বেশি স্পষ্টতা জাগায়।
সময় এখন চারদিকেতে ঘনান্ধকার দেখে
বলছে : 'নগর নরক ব্যাধি সন্ধি ফলাফল
জীবনের এই ত্যক্ত সন্ততিদের প্রলাপ আলাপে পরিণত
হল কি প্রায় ?—নক্ষত্র নির্মল ?'

হয়তো হল :—অন্তত আজ রাত্রি একা অল্প সময়ের
ভিতরে শুভ অনুধ্যায়ী সময়দেবীর মতো
প্রাণের প্রয়াস দেখাতে গিয়ে চলতি ছেদে ব্যর্থতায়
হয়নি নিহত ?

নদী পাখি প্রহরী জ্ঞান-বিজ্ঞানীরা সব
প্রেমিক ? তবু সারাটা রাত অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি

শব কুড়িয়ে ফিরছে অন্ধকারে ;
চন্দ্রে সূর্যে রক্ত তরবারি ?

মানব কেমন স্বভাবত
এই কথা কি ঠিক
দেশ-সময়ের মানুষমনের সহজ প্রকাশে
করুণা স্বাভাবিক ?

আমার চোখে ভেসে ওঠে করুণা এক নারী :
হাত দুটো তার ঠাণ্ডা শাদা—তবুও উষ্ণতা
প্রিয়ের মতন। কাম তবু আজ প্রিয়তর নিরিখ পৃথিবীর :
স্থূল প্রগল্‌ভ বিষয় ব্যবহার ও কথা

সবের চেয়ে সুখের বিষয় ভেবে
রন্ধ্রে ঋণে উন্মাদনায় পুরুষার্থ লভি ;
জীবনে আরেক গভীরতরভাবে
ঢুকেও তো আজ তা অ-প্রেমই স্বভাব।

পিরামিড ও অ্যাটম আগুন অধীর প্রাণনার
উৎসারিত রাষ্ট্র সমাজ শক্তি রচনায়
প্ল্যান কমিশন কন্‌ফারেন্সের বৃহৎ প্রাসাদে
হঠাৎ মহাসরীসৃপকে দেখা যায়।

সত্যযুগ। শারদীয়। ১৩৫৭

রাত্রি, মন, মানবপৃথিবী

এ অন্ধকার জলের মতো ; এই পৃথিবীর সকল কিনার ঘিরে
নরক নগর তাপী পাপীর শান্ত শুশ্রূষায়

কোথার থেকে এসে কোথায় লক্ষ্যে চলে যায় ;
সকল উত্তেজনায় আসে স্নিগ্ধ শরীরে।

কে ব্যাহত পাখির মতো প্রাণাকাশে ওড়ার পথে সময়শায়কে ;
কারা কোথায় আলোককণার মতন, সূর্য হতে
জন্ম পেয়েই হারিয়ে গেছে অন্ধ রক্তস্রোতে ;
বুদ্ধিজীবী নষ্ট হল কোথায় মনের গোলকধাঁধার ছকে ;—

সবের কাছে নিরভিমান রাত্রি এসে নমিত হতে বলে ;
কথা ভাবায় ; কথা ভাবার সর্বনাশে শান্তি কোথায় আছে ?
তবু এসো অনেক কাজের ’পরে অন্তরাশ্রয়িতার কাছে ;
মৃত্যু ঘুমের অতীত ব্যথা ক্ষয় পাবে কি সহজ সরলে ?

এখানে কোনো আকাশসারী ইন্দ্রজাল নেই ;
এখানে কালের সিঁড়ির ’পরে মধ্যপথে অগম সিঁড়ির দিকে
তাকিয়ে বিষয় ভেবে নিতে হয়েছে নতুন যানের প্রতীকে ;
মৃত্যু নেই, মায়া নেই, ইতিহাস অমোঘ তবু ঠিক এ কারণেই

ক্লান্তি নেই ; মনোনদীর দু-পার ঘিরে ছাউনি পড়েছে।
এপারে এরা জীবনপ্রেমিক : ঘোষণা করে বলে ;
ওপারে ওরা এই পৃথিবীর নিষ্পেষিত নরনারীর দলে ;
সিদ্ধি চায় : গণনাহীন মৃত্যুসেনা হাজির করেছে।

অনেক বিনাশ সাঙ্গ হলে অন্ধকারের নতুন জাতক, ঢল
তবুও অনেক প্রাণের প্রয়াস ঝরনা প্রেম সহিষ্ণুতা আলো
দেখেছে আবার নবনবীন নৈরাশ্যে হারাল :
নাবিক ক্লান্ত : নদী কী নিষ্ফল ?

অন্ধকারে হৃদয় এখন নিজের কাছে থেমে
আশা আলো হারিয়ে যতই শ্লেষ পরিহাস শক্তিতে কঠিন
হয়ে সন্ততিদের কাছে পিতৃলোকের ঋণ
আঁধার জলাঞ্জলি ভাবে—ততই নদী জনমানব প্রেমে

নিহিত হয়ে নতুন জলকণিকারাশি বানিয়ে নিতে চায়।
আবার কি তা রক্তকণা হয়ে গেল ? ক্ষালন করে অন্ধকারে জ্ঞানী
হয়ে সে দেখছে ইতিহাসের বিরাট হয়রানি
নবীন বীজের মতো আজও মানবতার বিবর্ণ আত্মার।

সত্যযুগ। শারদীয় ১৩৫৭

আশা, অনুমিতি

সূর্যের আকাশের মতো মানুষেরা অনুভাবনায় স্থির
এক আশ্বাস রয়ে গেছে পৃথিবীতে,
রয়ে গেছে আমাদের হৃদয়ে যে এই
ইতিহাস পৃথিবীর রক্তাক্ত নদীর কেবলই আয়ত
উৎসারণ অন্ধকারে নিজেরে প্রচুর করে তবু
স্তিমিত হয়ে পড়ে ;
নতুন নির্মল জলকণিকারা আসে
নক্ষত্রের সূর্যের নীলিমার মানবহৃদয়ের
আশ্চর্য রেবার হিল্লোলের মতো।

সময় যা আচ্ছন্ন করেছিল তাকে সময়সংক্রান্তির পারে
মৃত্যু যা নিশ্চিহ্ন করেছিল তাকে উজ্জ্বল বস্তুপুঞ্জে
জাগিয়ে তুলবার জন্যে দেখ

সচেতন হয়ে জেগে উঠে মানব :
চারিদিকে উন্মুক্ত সূর্যের
অন্তরালে সূর্যের
আলোর নক্ষত্রের রাত্রির নগরীর জ্ঞানের
অন্তহীন পরিচ্ছন্ন পবিত্রের ভিতর।

একক। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮

মহাগ্রহণ

অনেক সংকল্প আশা নিভে মুছে গেল ;
হয়তো এমনই শুধু হবে।
আজকের অবস্থান ফুরিয়ে যাবে কি।
নতুন ব্যাপ্তির অনুভবে ?
মানুষ এ পৃথিবীতে ঢের দিন আছে ;
সময়ের পথে ছায়া লীন
হয়নি এখনও তার, তবুও সে মরুর ভিতরে
একটি বৃক্ষের মতো যেন যুক্তিহীন ;

সফলতা অন্বেষণ করে
হারিয়ে ফেলেছে প্রাণ, নিকেতন, জল ;
প্রেম নেই, শূন্যলোকে সত্য লাভ তার
অর্ধসত্য অসত্যের মতন নিষ্ফল।
ভুলের ভিতর থেকে ভুলে
গ্লানির ভিতর থেকে গ্লানির ভিতরে
মানুষ যে গ্রহণের সূর্যে চলেছে
তা তবে শাশ্বত গ্রহণ সৃষ্টি করে !

চতুরঙ্গ। আশ্বিন ১৩৫৮

অন্ধকারে

অন্ধকারে থেকে-থেকে হাওয়ার আঘাত মাঠের ওপর দিয়ে
    স্মরণ করায় আজকে কারা মৃত ;
তাদের স্মৃতিবার্ষিকী আজ নদী পাথর ঘাস পৃথিবীর মনে
    ধীরে-ধীরে হতেছে বিবৃত।
এ সুর ভালো ;—পৃথিবীতে তবুও এক প্রেম রয়েছে তার
    সুসমাচার ছায়াপথের নক্ষত্রদের মতো,
নারী ও তার পুরুষ নিয়ে,—ইতিহাসের রাত্রি নিভিয়ে,
    আকাশআশার শীর্ষে ওরা হয় না আহত।

তবুও আঁধার চুপে-চুপে সকলই গ্রাস করে ফেলে, নারি,
    সে শীত শুধু সেন্টিগ্রেডের নয় ;
সে অন্তিমতা সে শূন্যতা কে জানে কোন্ অর্থপ্রবীণ সময়প্রকৃতির :
    তুমি জান, তোমার মুখে তাকিয়ে মনে হয়।
প্রকৃতি তখন তোমার নাভির ভিতরে আমি লীন
    হয়ে আছি দেখে
অন্তবিহীন অন্ধকারের জন্মদান করে
    অমৃতযোগ অন্ধকারের থেকে।

সূর্যে অনেক কাজ হয়েছে সারাটা দিন ; অনেক প্রেম-জীবনজয় আলোর প্রেরণা
    বধ করেছি। সুদীর্ঘকাল জেগে
অনেক শনি শেয়াল শকুন জ্যোতির্ময় ঘোষণা করা গেছে।
    আবার সকল মুছে ফেলে বিঘূর্ণনের বেগে
যযাতিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়ে গেছে জীবনরাজ্য থেকে।
    অসূয়া অসারতা দ্বিধা ঘুচিয়ে নতুন দিন
জাগাতে চেয়ে নানা স্কুলের গণনাহীন ক্যাম্প খুলেছে যারা—

তাদের হয়ে ত্রিশঙ্কুকে বিঁধিয়েছি বড়্‌কিন্‌।

দেখে গেছি শতাব্দীময় রক্তনদীরাশির দুরত্যয়
আত্মপ্রসাদ ভেঙে দিতে প্রাণের নদী এসে
পড়ি-পড়ি করে নিখিল আত্মীয়তায় পড়ল ঝরে প্রায় ;
দেখে গেছি করুণ ইতিহাসকে ভালোবেসে
আসি-আসি করে প্রাণের সাহস সূর্য সকাল এল প্রায় ;
কিছুই তবু এলনাকো ;—সময়কে যা দেবার সবই দিয়ে
কোটি আলোকবর্ষ পরে আকাশ, তোমার মনের কথা আজ
পেয়েছি অনাথ আমায় সুদর্শনাকে বুকে নিয়ে।

পূর্বাশা। আশ্বিন ১৩৫৮

অমৃতযোগ

জন্মেছিল—চেয়েছিল—ভালোবেসেছিল
কম বেশি প্রাণকল্যাণে
মানুষ এ পৃথিবীর মানুষকে ; তবু
মৃত্যুরই পূর্ণতর মানে।

তাহলে সময় আজ তুমি।
সময়সিন্ধুর মতো রূপে
এখানে শিশির থেমে আছে
ঘাসের বুকের ’পরে চুপে।

আমিও অনেক শূন্য অনুশীলনের
ধাঁধার ভিতর থেকে উঠে
হংসের ডানার মতো আজ

নীড়ের হংসীর পক্ষপুটে।

এখানে মরণশীল হংস নেই আর ;
আর পাখপাখালির নীড় নেই গাছে ;
এখানে পৃথিবী নেই, সৃষ্টি নেই, তুমি
আমি আর অনন্ত রাত্রির বৃক্ষ আছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা। শারদীয় ১৩৫৮

তিমির সূর্যে

বাহিরের থেকে ফিরে এসো
তবুও বাহিরে থেকে যাও ;
হৃদয়ের ভিতরে ঢুকেও
তবুও দাঁড়াও
সেইখানে নগরীর শূন্যে সূর্য এসে
মানুষকে প্রত্যহের উপাদান নিতে
ডেকে নেয় সম্ভাবনার পৃথিবীতে
তিমির সূর্যের মতো রোজ।

ঢের পথ চলে গেছে মনে হয়েছিল
হিসেবে সঠিক মূল স্বর্গের পানে ;
অতীতের কুয়াশায় এরকম বোধ হত, তবু
আজকে ভাবছি এই মরুভূমি প্রাণকল্যাণে
স্নিগ্ধ হবে ? হে শতাব্দী, হে নিবিড় মরুবৃক্ষ, জেগে ওঠো তুমি
শরীরের সময়ের শেষ নিরন্তর অগ্রসরে ;
ফিরে এসো প্রেম-যুক্তিপ্রেমের ভিতরে ;
স্বপ্নের ভিতরে যাও : বস্তুর ভিতরে।

দেশ। শারদীয় ১৩৫৮

মহাপতনের ভোরে

কেবলই স্বপ্নের ক্ষয় হয় ;
তার কোনো ক্ষয় নেই, চারিদিকে চলেছে সময় :
বন্দরের কুয়াশায় কোলাহলে,
পৃথিবীর কোল থেকে অবিরাম উৎসারিত জলে,
এরিয়েলে ধ্বনির প্রবাহে,
অন্ধকারে অন্তহীন মানুষ বা মাছির পতনে,
কন্‌ফারেন্স প্ল্যান কমিশনে।
নগরীর শক্তি নষ্ট হয়ে যায় চারিদিকে,—
কেবলই গ্রামের ধ্বংস হয় ;
ফুটপাথে-পাটাতনে ছোটো বড়ো মাঝারি অগণ্য পরিসরে
সৃষ্টির ও পৃথিবীর ভয়াবহ শূন্যের ভিতরে
প্রেম আছে, ভাবে ওরা, বুঝি সব অপ্রেমের বীজ নষ্ট করে !
কিন্তু তবু কোথাও এখনও শেষ যতি
ছেদ করে মন্তব্যে মননে স্থির গতিপ্রেম আছে ?
মানুষের ইচ্ছা চিন্তা সংকল্পের আঁধার আলোর সেতু ঘিরে
ক্লান্তি ব্যথা কুজ্‌ঝটিকা ঢের
সত্যের ও মৃতসত্যের ;
ইতিহাসে পর্ব শেষ হয়ে গেলে সেই মহা দায়ভাগ প্রাণে
নিয়ে ছোটো আকাশের মতো বড়ো নীলিমা সন্ধানে
চলে যায় মানুষেরা ইতস্তত বলয়ের দিকে ;
অসত্যের থেকে সত্যে ?—
আশার স্পন্দন ঘিরে রেখেছে এখনও পৃথিবীকে।

যুগান্তর। শারদীয় ১৩৫৮

পৃথিবী, জীবন, সময়

কোথায় সে যে রয়েছিলাম ;—

আজকে মনে হয়
সাগর দেখে আরও বৃহৎ আলো
দেখেছিলাম,—ঠিক তা সাগর নয়।

প্রশান্ত না কৃষ্ণ বেরিং ভূমধ্যলীন ভারত মেরুসাগর তাকে বলে
সেইখানেতে ভোরের হাওয়ায় শাদা ঘোড়ার ভিড়ে
একটি ঘোড়া সূর্য হয়ে জ্বলে
নীল আকাশের এপার থেকে ওপার যাবার পথে ;
সুদর্শনা, সেই নীলিমা তোমার আকাশ ছিল ;
মনে পড়ে মাছের ঝাঁকে গহন সাগরজল,
ফেনার হাওয়ায় ফসকে শাদা পাখিগুলো দুরন্ত উজ্জ্বল
নীল কি রৌদ্র ? রৌদ্র কি নীল জলের কোলাহল !

গভীর স্বনন ; কান পেতে সেই সুর
মনে হত এই পৃথিবীর অনেক পরের যেন
জাতক পৃথিবীটির মতন দূর ;—
আজকে তোমার ইচ্ছা চিন্তা শপথ আর-এক রকম সুদর্শনা,
ধুলোকণা এখন আমি—কালের জলকল্লোলে জলকণা।

মনে পড়ে সেই কবেকার গভীর সাগর কী এক নিখিল বৃক্ষ থেকে ঝরে,
অন্ধকে চোখ দান করে রোদ ক্রন্দসীতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে ;
দুপুরবেলা সূর্যালোকের থেকে নেমে অতিথিদের মতো
অসংখ্য সব শাদা পাখি সহসা ঘুম ভেঙে
দিয়েছে বলে মনে হত ;—

সাগর আলো পাখি নীরব চারিদিকে—বৃক্ষে নির্জনতা ;
কে যেন ডেকে নিত আমায়
কে যেন ডেকে নিত তোমার কাছে,
সে যেন ডানা টিউব-ট্রেন রাডার-প্লেন টেলিপ্যাথির গতি
ছাড়িয়ে নীল আকাশে এসে নীল আকাশের নিজের পরিণতি।

মাঝে-মাঝে পাখির মতন
শিশির ঝরার শব্দ—বিকেল ;
আলোও নিজে কেমন যেন অন্ধকারের মতো।
সময় এসে আমার কাছে একটি কথা জানতে চেয়েছিল,
তোমার কাছে একটি কথার মানে ;
আমরা দুজন দু-দৃষ্টিকোণ দিতাম তাকে হেসে
একটি শরীর হতাম পরস্পরকে ভালোবেসে।

এসব অনেক আগের কথা—অনেক চিহ্ন চিন্তা রীতির ক্ষয়
হয়ে গেছে তারপরেতে—মানুষকে সব বুঝে নিতে হয়।
কোথায় এখন সে সব আকাশ নক্ষত্র রোদ সত্য উজ্জ্বলতা :
পাখির সাথে মহাপ্রাণের বৃক্ষে পাখির কথা !

এসো জাগো হৃদয়, তুমি বিষয় জেনেছিলে ;
গিয়েছিলে অনেক দূরে স্থির বিষয়ের দিকে ;
সে সব আলোয় গ্রহণ করো আরেকরকম ব্যবহারের মানবপৃথিবীকে।

গণবার্তা। শারদীয় ১৩৫৮

নিজেকে নিয়মে ক্ষয়

নিজেকে নিয়মে ক্ষয় করে ফেলে রোজই

চলেছে সময় ;
তবুও স্থিরতা এক রয়ে গেছে,
সময় ক্ষয়ের মতো নয়।

অঘ্রানের সকালের আবছা আভার
মতন অসংখ্য কুয়াশায়,
আশ্বিনে আকাশ রোদ মাঠের ভিতরে,
নদীর বিস্তীর্ণ জলে, অথবা ঝড়ের বড়ো ভোরে,
শীতকালে সুস্থির বিকেলে,
মনে হয় আজ
পৃথিবী অনেক মূল্য, সত্য ভুলে গেছে ;
সত্যে স্থির হয়ে আছে টের পাই তবু :
তোমার আমার নীড় প্রকৃতির পর্দার থেকে ভেসে চোখে
একটি অমেয় মূল্যে যতদিন আলো ক্ষয় হতেছে আলোকে।

একক। শারদীয় ১৩৫৮

জীবনবেদ

অনেক বছর কেটে গেছে,
আরও কিছু দিন চলে যাবে ;
ফুরিয়ে ফেলেছি নীড় শিশির অনেক,
আরও রৌদ্র আকাশ ফুরাবে,
অনেক চিহ্নিত গাছ মাঠ স্তম্ভ জনতা বন্দর
আছে, তবু কাছে নেই আর ;
মনন-আভার মতো ঘিরে
রেখেছে সে সব অন্ধকার।

শরীরের থেকে শক্তি ক্ষয়ে
গলিত মোমের মতো যাবে
ক্রমে আরও ক্ষমাহীন অগ্নির ভিতরে ;
বিষয়ের থেকে দূর বিষয়ে হারাবে

মানুষের ক্ষুধাতুর মন ;
প্রেমের বিষয়ে তবু স্থির
হয়ে থেকে ভয়াবহ ইতিহাস কিছু স্নিগ্ধ করে
নিভে যাবে মনন শরীর।

দেশ। ২৬ মাঘ ১৩৫৮

শত শতাব্দীর

মানুষ অনেক দূর চলে যায়—চলে যেতে চায়
নক্ষত্রের আকাশ-অগ্নির মতো জ্বলে ;
তবু কেউ অভিজিৎ ধ্রুব স্বাতী লুব্ধক নয় ;
মানুষের সেইসব সাধ শান্ত হলে
ঘিরে থাকে সঙ্গী দায়ভাগিনী পৃথিবী ;
কিছু তার বরফের গন্ধে স্নিগ্ধ হয়,
কিছু সূর্যকরোজ্জ্বল ক্রান্তিবলয়,
সমুদ্রের ফেনশীর্য নীল কল্লোল।

ইতিহাস কত প্রাণবত্তার কথা
ভেবেছিল ; সময়ের অন্ধকারে আজও রোজ ভাবে।
সৃষ্টির প্রাণের উৎস যেন
রয়ে গেছে মানুষের সহজ স্বভাবে :
কখনও এঞ্জিন ডাইনামো প্রপেলারের উদ্রেকে মনে হয়।

তবু চোখ খুলে রেখে আশ্চর্য সংজ্ঞানে
ভয় থেকে আরও ভয় ভুল থেকে ভুলে
ছিন্ন বন্যমরালের মতন সে উড়ছে অকূলে।
মনে হয় মানুষের তবু এই শেষ
পরিণতি হয়তো বা নয় ;
যদিও ধর্ম ত্যাগ করেছে অনেক দিন আগে
তার সেই অতীতের মুদ্রার অভয়,
সমাজ স্বতোৎসার হারিয়ে নতুন
অনুশীলনের শক্তি ক্ষয় করে ফেলে
অন্ধ তৎপরতার শূন্য লাভ করে আজ
লক্ষ্যহীন ব্যক্তি আর জাতির সমাজ।

চারিদিকে মানুষ চলেছে সব গ্লানি
অন্ধকার তাপ ভয় দুঃখের আকাশে ;
সময় ও বিষয়ের সহিত সংঘর্ষে
মরণ ও জীবনের যে দ্বয় মূর্তি ইতিহাসে
জাগে তারা মানুষকে জেনে নিতে বলে ;
আত্মসমাহিত হয়ে নিতে ;
কোথাও স্বর্গে নয়—এ নিরভিমান পৃথিবীতে ;
যেতে বলে গতি ও জ্ঞানের মর্মস্থলে।

পূর্বাশা। বৈশাখ ১৩৫৯

সমস্ত দিন অন্ধকারে

সমস্ত দিন অন্ধকারে রৌদ্র ঢেলে অই
পশ্চিমে নীল হলদে মেঘে সূর্য এখন জ্যোতি,
ম্লান হয়ে যায় ; নদী অবোধ, তবুও অনেক দ্যোতনা তার মর্মস্পর্শী ঠিক

পাখিও ঠিক তেমন অবুঝ আন্তরিকতায় ;
এখন তারা শেষ সোনালি রোদের বিচ্ছুরণে
কিছুই তেমন বলেনাকো—শুধু বলে : ‘অধঃপতিত
মানবতা আজকে, তার আত্মবিচার তবু কি সচেতন ?
আমরা সবাই পটভূমির ছবির মতো, আধেক বুঝেছি তার মন।’

ঊষা। [?]

চারিদিকে নীল হয়ে আকাশ ছড়িয়ে আছে

চারিদিকে নীল হয়ে আকাশ ছড়িয়ে আছে দেখে
সাগর ও অরণ্যের সুর শুনে-শুনে
মানুষের জন্ম হয়েছিল প্রসবিনী পৃথিবীর
অন্ধকার নিরক্ষর প্রাণের আগুনে
বিহ্বল শীতের রাতে কবে।
তারপর কত দিনরাত্রির ক্ষয়
হয়ে গেল ; অপ্রসর হৃদয়ের অপ্রসর নয়
প্রেম-অপ্রেমের মতো, আমাদের জ্ঞানরুচিহীন।

ঊষা। [?]

মনবিহঙ্গম

ঢের যুগ নিষ্ফল হয়েছে ;
এরকম কেবলই কি হবে ?
ইতিহাস কেবলই কি অন্ধ পরীক্ষার
অন্ধকারের অনুভবে ?
আশার সঞ্চারে সূর্য আলো,
আকাশের পারাপার নীল
হলেও অজ্ঞান নিয়মের
চাকায় কি ঘুরছে নিখিল ?

শাদা আর কালো রঙে মাখা পৃথিবীর
কোলে আজ মানুষের স্থান
পুড়ে কি ছাইয়ের মতো কালিমা হয়েছে ?
কোথায় প্রাণের বৃক্ষ তবু, আহা, মরুকল্যাণ ?
ধূসরতা স্নিগ্ধ করে জল ?
সময় ও সময়ের আত্মা চাতক
সূর্যের অনলে বাষ্পে ক্ষয়
পেলে কি অমিয় হবে অগ্নিবলয়।

কারা কবে কথা বলেছিল,
ভালোবেসে এসেছিল কাছে ;
তারা নেই, তাদের প্রতীক হয়ে তবু
কয়েকটি পুরোনো গাছ আছে ;
নক্ষত্রেরা রয়ে গেছে নদীর ওপরে ;
চারিদিকে প্রান্তর ও ঘাস,
দু-চারটে ঘর বাড়ি নীল ও শিশির,
কূলে-কুলে একলা আকাশ।
যারা ছিল তারা কেউ নেই ;
জীবন তবুও এক শান্ত বিপ্লবী,
স্থির আগুনের মতো অবিরল আলোক দিতেছে ;
সে আগুনে আলো ছাড়া দহে যায় সবই।
নিশ্চিত মৃত্যুর শূন্য আঁধারের আগে
হে নিঃসঙ্গ বৃক্ষে মনবিহঙ্গম তুমি,
দেখেছিলে জেনেছিলে ভালোবেসেছিলে
দ্রুত পরিবর্তনের মতো পটভূমি
পৃথিবীতে মানুষের আসাযাওয়া তবু ;

শীগগিরই এ মাটির নিজের স্বভাবে
মিশে সব লোভপ্রেমযুক্তিহীন ধুলো হয়ে যাবে
প্রকৃতির কত শত অনন্ত অমিয়ে।

পূর্বাশা। আশ্বিন ১৩৫৯

নিবিড়তর

হৃদয়ে যে স্রোত আছে অন্ধকারে লীন
হয়ে আছে ভেবে মন উড়ে যায় যেন নভোহাঁস ;
শাদা-বালিরঙা ডানা অনন্ত রোদ্দুরে
মেলে দিয়ে হতে চায় আকাশে আকাশ।

হয়ে যাক একরাশি অগ্নি আর নীল,
কোনো দিকে নেই কোনো বাধা ;
হয়ে যাক দুপুরের সূর্যপুরুষের
মতো অগ্নি—অন্তহীন অগ্নিজন্মদাতা।

শীত সমীচীনতায় ঘর বেঁধে, তবু
সময়ের অন্ধকার গ্রন্থি খুলে ফেলে
নব-নব ক্রান্তিবলয়ে কি উজ্জ্বল প্রাণ ?
অথবা কি মৃত্যু তার সূর্যে শূন্যে শেলে ?

রাত্রির আঁধার ভেঙে তবুও প্রাণের এই বিদ্যুৎ গতির
শব্দই নিবিড়তর শব্দ ইতিহাসে :
মৃত্যু আছে, তবু সেই মৃত্যু ভেদ করে উড়ে যাওয়া,
সূর্য নেই, তবু সেই অয়নের সূর্যের বিশ্বাসে।

দেশ। শারদীয় ১৩৫৯

নদী

এক অন্ধকার থেকে এসে
অন্য-এক আঁধারের দিকে
মুখ ফেরাবার আগে—
কয়েক মুহূর্ত কাজ কথা চিন্তা রয়েছে এ জীবনের।
দেখেছি সূর্যের আলো, নিয়ন বাতির বিচ্ছুরণ,
অন্ধকার অজন্মা প্রান্তর, মৃত অর্ধমৃত নগর বন্দর,
শোকাবহ আলো শব্দ শেল,
ক্রান্তিহীন ক্রেন, এরিয়েল।

হেমন্তের মধ্যরাতে
দক্ষিণ সাগরগামী হরিয়াল বুনোহাঁসদের
রাশি-রাশি কালো বিদ্যুতের বিন্দু
ডানার ঝাপসা গুঞ্জরন
দেখেছি—জেনেছি অনেক দিন।

মানুষের সাথে
মিলন বা অমিলের অন্তিম রহস্যসুতো নিয়ে
সময়ের অজ্ঞেয় সাগরতীরে গিয়ে ধীরে হৃদয়ের ক্ষয়
দেখেছি মানবদের বিবরণে বারবার হয়।

মনে হয় যেন মানুষের মন তবু
দুই কালো বালুতীর ভেদ করে ফেলে
চলেছে নদীর মতো—
চারিদিকে জনতার সকাতর কোলাহল, ঘর বাড়ি সাঁকো
জন্তুর ও মানুষের করুণ পায়ের চিহ্ন প্রশ্নের চিহ্ন সব

পরিতৃপ্ত করে দিতে গিয়ে রূঢ় ইতিহাসধারাকে করেছে অনুভব।
চলতির চোরাবালি ভেদ করে পাতালের সূর্যালোকে মানুষের মন
আলো ভালোবাসা চেয়ে ভুল করে ঘোরে কি এখন ?—
পাখির সংগীত এক মুক্ত সমুদ্রের শব্দ দীপ্ত সূর্য কাছে
আছে তবু সে নদীর যত দিন না থেমে চলার শক্তি আছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা। শারদীয় ১৩৫৯

রশ্মি এসে পড়ে

রশ্মি এসে পড়ে—ভোর হয়,
ঝেঁজে ওঠে পাপীতাপীদের গালাগালি ;
চারিদিকে মানুষের মৃত্যু হয় মাছির মতন ;
মনে হয় অন্তরীক্ষে সৃষ্টির মরালী
হয়ে যেতে—তুমি যদি সে রকম আশ্বাসের দেশে
রয়ে যেতে ; কিন্তু তুমি আমি
আজকের চেতনার ইতিহাসবহনের পথে
রক্তাক্ত নদীর অনুগামী
নদীর ভেতরে অন্য স্বচ্ছতার যে অনুশীলন
মাঝে-মাঝে দেখেছি তা ইতিহাসে প্রেমিকের মন।

শতভিষা। শরৎ ১৩৫৯

যাত্রা

কতদিন হয়ে গেল—
কতবার কাঁচা ধান কার্তিকের সূর্যে গেল পেকে ;
পউষের চাঁদে পড়ে ঝরে গেল,
খড় শুধু পৃথিবীর মুখখানা ঢেকে
রয়ে গেল ; আবার খড়ের দিন এল ;

অঘ্রান চাঁদের শাদা ঠাণ্ডা শরীর
আবার দাঁড়াল এসে এই পৃথিবীর
শূন্য প্রান্তরের পাশে।
চোখ না চাইতে বিশ-পঁচিশ বছর
হয়ে গেল ; মহান বলয় নেই, নেই বলয়ান্তর ;
কিছু নেই ; কত পাখি ছেড়ে গেছে এই শিশু জামরুল বন ;
আজকের ঘুঘু ফিঙে নীলকণ্ঠ পাখি—তবু সেইসব অন্তর্হিত পাখির মতন
তাদের ভিতরে যেন কবেকার আলোকের দৌত্য আর নেই ;
কোথায় হারাল সব—মননের মুহূর্তের বাতি নেভাতেই
পঁচিশ বছর আগে পৃথিবীতে ;
প্রতিশ্রুতি একদিন ছিল। তবু চারিদিকে অন্য সূচনার
অস্পষ্ট গ্লানির শব্দ শোনা যায় আজ ;
নির্বিচারে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে ফেলে তবুও আবার ইঁটপাথরের ঢিবি
গড়ে ওরা বন্দরের নগরের ;
একদিন ধানক্ষেত মাঠ চাঁদ এঞ্জিন ডাইনামো প্রপেলারের পৃথিবী
আরেক রকম যেন পরিণতি চেয়েছিল এই :
চিল হরিয়াল ভোররাত্রির যাত্রীর এয়ারোপ্লেন মেঘে
ঘর বাড়ি সাঁকো স্তম্ভ মানুষের আসাযাওয়া সারাদিন জেগে
কাজ করে গেলে ব্যাপ্ত সময়কে সব
নীরবে গোছাতে দিয়ে তবু যা সত্য হয়ে ফলে
হৃদয়ে জ্ঞানের দেশে—সে প্রতিভা আভা প্রেম আশা ;
নষ্ট হয়েছে ; আছে যাত্রা—যাত্রা—এখনও যাত্রার ভালোবাসা।

উত্তরসূরি। আশ্বিন ১৩৫৯

সূর্য নিভে গেলে

সূর্য, মাছরাঙা, আমি

উত্তীর্ণ হয়েছে পাখি নদী সূর্যে অন্ধ আবেগের

দু-মুহূর্ত আনন্দের পরীক্ষায় বুঝি।
তারপর লাল নীল কমলা পালকের পরে ঠিকরিয়ে রোদ
নিভে গেছে ; আমি কেন তবু সূর্য খুঁজি।

তুমি

জানি না কোথায় তুমি—সূর্য নিভে গেছে ;
তোমার মননে আজ স্থির
সন্ধ্যার কুমোর পোকা—বাঁশের ছ্যাঁদায় ঘুণ—
শাদা বেতফলের শিশির।

আছে

'নেই—নেই—' মনে হয়েছিল কবে—চারিদিকে উঁচু-উঁচু গাছে,
বাতাস ? না সময় বলছে ; 'আছে, আছে।'

অঘ্রাণ রাত

অনেক-অনেক দিনের পরে আজ
অন্ধকারে সময়পরিক্রমা
করতে গিয়ে আবছা স্মৃতির বইয়ের
পাতার থেকে জমা—
খরচ সবই মুছে ফেলে দিয়ে
দানের আয়োজনে নেমে এল,
চেয়ে দেখি নারী কেমন নিখুঁতভাবে কৃতি ;
ডানা নড়ে, শিশির শব্দ করে
বাহিরে ঐ অঘ্রান রাত থেকে ;
এ সব ঋতু আমার হৃদয়ে
কী এক নিমেষনিহত সমাহিতি

নিয়ে আসে ; ভিতরে আরও প্রবেশ করে প্রাণ
একটি বৃক্ষে সময় মরুভূমি
লীন দেখেছে, গভীর পাখি গভীর বৃক্ষ তুমি।

একক। শারদীয় ১৩৫৯

যাত্রী

মানুষের জীবনের ঢের গল্প শেষ
হয়ে গেলে রয়ে যায় চারিদিক ঘিরে এই দেশ ;
নদীমাঠ পাখিদের ওড়াউড়ি গাছের শিয়রে
কমলা রঙের ঢেউয়ে এসে কিছুক্ষণ খেলা করে।

মনে হয় কোথাও চিহ্নিত এই রৌদ্র ছিল কবে ;
মানুষ সার্থক নয়—তবুও সার্থকতর হবে :
মনে হত কাজ করে কথা বলে গ্রন্থ মিলিয়ে,
মননের তীর থেকে আরও দূর তীরতটে গিয়ে।

সময় নিজেই তবু সবচেয়ে গভীর বিপ্লবী
ফুরিয়ে ফেলেছে সেই দিনরাত্রি সেরা সত্য উদ্‌ঘাটন সবই,
সেদিনের হৃদয়ের উষ্ণ উত্তেজিত রক্ত স্থির
করে ফেলে অন্য নব কলেবরে গড়েছে শরীর।

বাহিরে ভিতরে লীন হয়ে থাকে মন,
শান্ত—আরও শান্ত হয় অন্তঃকরণ ;
পুরোনো দিনের স্তম্ভ দু-চারটে পশ্চিমের আঁধারের কাছে ;
নব সূর্যে সম্মেলন-যাত্রা—যাত্রা-যাত্রা-যাত্রা আছে।

কবিতা। চৈত্র ১৩৫৯

হৃদয় তুমি

হৃদয় তুমি সেই নারীকে ভালোবাস তাই
আকাশের ঐ অগ্নিবলয় ভোরের বেলা এসে
প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে অমেয় কাল হৃদয়সূর্য হবে
তোমার চেয়েও বেশি সেই নারীকে ভালোবেসে।
বাসুক—তবু সবের চেয়ে আলোর কথা এই :
আমি তাকে সময়পরিক্রমার পথে আবছায়াতে দেখে
নিজের মূল্যে রয়ে গেছে বলেই ভালোবাসি।
শরীর ঘেঁষে ভালোবাসে তবু তো অনেকে।

কাজ-অকাজের ঠাসবুনোনির ফাঁকের থেকে আমি
দেখেছি আমায়, দেখেছি যেন বিকেলবেলার জলে
থমকে ভাসা মেঘের মতো নীলাকাশের পথে
থেমে আছে ; অথবা থেমে চলে
জানি না মেঘ ; ভালোবেসে অথবা কুতূহলে
জানি না নারীসূর্য আমায় আলোকিত করে
নিজের অস্তকক্ষে নেমে সূর্যপ্রক্রিয়ায়
চলে গেছে কাদের ভিতরে।

যে যার নিজের বিহিত কাজে। সকলই ঠিক—এইরকমভাবে
সারাটি দিন আমার হৃদয় ব্যাপ্ত করে রাখে।
স্বতই আমি যে গাল তিল যে হাত ভালোবাসি
রাত্রি হলে সে হাত—সেই সুদূর হাত এখনও আমাকে
জানি না বিশ্বশৃঙ্খলাকে আঘাত করে ভালোবাসে কিনা ;
সীমা সময় প্রকৃতি তাতে চূর্ণ হয়ে যেত ;

সকলই তবু স্থির রয়েছে—এই স্থিরতা তবু
তোমার আমার অজাত সব শিশুরও অভিপ্রেত।

কবিতা। চৈত্র ১৩৫৯

এই পৃথিবীর

এই পৃথিবীর বুকের ভিতর কোথাও শান্তি আছে ;
অঘ্রান মাস রাত্রি হলে অনেক বিষয়বিষের সমাধান
মাঠে জলে পাখির নীড়ে নক্ষত্রেতে থাকে ;
অমেয় গোলকধাঁধায় ঘুরে প্রাণ
চেষ্টা করে সমাজ জাতি সময় সৃষ্টি সঠিক বুঝে নিতে।
সকল প্রয়াণ সফল হবে গ্লাশিয়ারের দীপ্তি আসার আগে ;
এখন রৌদ্রে আজন্মকাল অনুষ্ঠানের দিন ;
সফল হতে ইতিহাসের অনেক দিন লাগে।

সে সফলতা এই পৃথিবী—হয়তো সৃষ্টি চূর্ণ হলে হবে ;
আমি অনেক দূরের থেকে তাহার কারণধ্বনি
নীল আকাশে জ্যোতিষ্কদের একে-একে নিভে যেতে দেখে
সমাজ জাতি ধ্বংস হয়ে যেতেছে বলে—শুনি।
জানি নতুন নক্ষত্রেরা আবার ফিরে আসে,
নতুন সমাজ শুদ্ধ ভাষা মানুষ সৃষ্টি হয় ;
অসংখ্য কাল কেটে গেলে বোঝা যাবে হয়তো প্রেমের মানে
সেন্টিগ্রেডের ধারণাতীত হিমের ভিতর নয়।

এসব তবু হেমন্তেতে স্তব্ধ হয়ে থেকে
সময়সেতু পেরিয়ে কথা ভাবা।

আজকে তবু খণ্ডকালের শিশু আমি ;—নারি,
তোমার কাছে জানিয়েছিলাম দাবি ;
মহাকালের হাতের স্নিগ্ধতা যে ভালো ক্ষমাময়
অন্ধকারে শিশির পাতায় পালকে নীড়ে ঘাসে
আস্তে সে তা জানিয়ে যায়,—যদিও রাতদিন
অবাধ রক্ত রয়েছে ইতিহাসে ;

হয়তো তা-ই সত্যি, তবু আজকে রাতে আমি যে একা আছি
সে অধোগামী চিন্তাধারা থামিয়ে দিয়ে তুমি
জেনেছি এই নিখিলে শেষ একটি চেতনা ;
অথচ কী ব্যাপ্ত অবচেতন মরুভূমি।
কোথায় তুমি রয়েছ আজ—সে কোন্ নাগর আলোর নিয়নে
আজ সমাজের গলিত নাম তোমার মুখে উচ্চারিত হয় ?
সে কোন্ মৃত উপগ্রহ সসম্ভ্রমে উঠে
আজকে তোমার পদার্থে চিন্ময়।

তবুও অণু-পরমাণু হেতুরীতির কোথাও কোনো স্খলন হয় নাই ;
সকলই ঠিক—তুমিও নিজে স্বাভাবিকতার শীর্ষে দাঁড়িয়ে
নীলকণ্ঠ পাখিকে আজও আকাশ দেখাবে
তোমার নীলাম্বরীতে সব নীলিমা মুছে দিয়ে।
সূর্য জ্বলে—মেঘরা ভাসে—ঝাউ সিসু নিম প্রকম্পিত হয় ;
নদীর জলে সমস্ত দিন ক্রন্দসী উজ্জ্বল ;
তোমায় আমি ভালোবাসি—এই সত্য স্বভাবপৃথিবীর
দানের মতন নিজেরই ফলাফল।

পূর্বাশা। বৈশাখ ১৩৬০

এখন এ পৃথিবীর

'এখন এ পৃথিবীর গোধূলিসময় আর আমাদের হৃদয়ের যেন বেলাশেষ—'
বলে সে তাকাল ; চোখে করুণা রয়েছে তার ;
আকাঙ্ক্ষার সে সব আবেশ
নেই আজ ; বললে, 'কাঁকররাঙা পথ এই—এই পথ গেছে কত দূর ?
শুকনো জামপাতাগুলো পড়ে আছে—এইসব পাতা আমি ভালোবাসি,
অঘ্রান মাসের গন্ধ লেগে আছে এসব পাতায়
মাটি আর সূর্যের।—বাসনায় শুধু ক্লান্তি—আজ মনে হয়— ।'
হাত তার মনে হল ভিজে-হিম এক-আধ মুহূর্তের ছোঁয়ার ভিতর ;
উষ্ণতা নেইকো চোখে—শান্ত আলো—দু-একটা ঝরা পাতা আধো-খসা বিনুনির 'পর
পড়ে আছে ;—
আমাকে সে : 'চলো ঐ ভরা ঘাসে ঐখানে প্রান্তরের পথে ;
কমলা রঙের মেঘে নরম আলোর ঐ নিজের জগতে' ;
আকাশের থেকে যেন ধীরে-ধীরে শান্তি ঝরে—পৃথিবীর বুকে যেন ধীরে ;—
স্বভাবকে অতিক্রম করে ফেলে রক্তের ইঙ্গিত মুখে গালে
নেই আজ ; হৃদয় শান্ত স্থির ;—পৃথিবীতে যেন কোনো কালে
রাত্রি ও ভোরের স্বচ্ছ সত্য যাতায়াত ছাড়া নেই আর কিছু ;
দুজনে মাঠের পথে নেমেছি—হাঁটছি—চেয়ে দেখলাম মুখখানা নিচু ;
দেখছে পথের দূর্বা ধুলো ঢিবি পাতা ঝাউফল ;
তাকাতেই মৃদু হেসে ঘাসের কোলের থেকে লুটোনো আঁচল
তুলে শিশিরের জলে চলল মুছে ধীরে
প্রকৃতির পূর্ণ দানশীলতার মতো তার গভীর শরীরে
পাশাপাশি হাঁটছিল।—তখন নক্ষত্র ঢের এসেছে আকাশে।
আমার হৃদয়ে প্রেম—ধীরে-ধীরে বাসনার নিশ্চয়তা আসে।
হয়তো তা বুঝেছে সে—তবু তার দিক থেকে সে চেতনা সাড়া
পেলে অর্থ পেয়ে যেত মানুষ মৃত্যুর অর্থ ছাড়া
সে প্রেম শরীর থেকে ফুরিয়ে গিয়েছে আজ তার ;

গেছে যে জানে না তা সে ;—এই মাঠ রাত্রি প্রকৃতির স্নিগ্ধতার
চেয়ে কোনো অন্য অপরূপ মূল্যে আলো
বেশি যদি থেকে থাকে তার চেয়ে ভালো
সেই জ্ঞান আমার এ হৃদয়ের নিজের অমতে
তবু মুছে পাশাপাশি হেঁটে চলা নক্ষত্র ও শিশিরের পথে।

চতুরঙ্গ। আষাঢ় ১৩৬০

মৃত্যু আর মাছরাঙা ঝিলমিল

মৃত্যু আর মাছরাঙা ঝিলমিল পৃথিবীর বুকের ভিতরে
চারিদিকে রক্ত ঋণ গ্লানি ধ্বংসকীট নড়েচড়ে।
তবুও শিশির সূর্য নক্ষত্র নিবিড় ঘাস নদী নারী আছে ;
হারিয়ে যেতেছে প্রায় আজ।
মানুষের সাথে মানুষের প্রিয়তর পরিচয়
নেই-নেই আর ;
আলো আছে তবুও—আলোয় ভরে রয়েছে অনন্ত অন্ধকার।

ময়ূখ। আশ্বিন ১৩৬০

কে এসে যেন

কে এসে যেন অন্ধকারে জ্বালিয়ে দিল বাতি,
বললে, 'আমার অপার আকাশবলয় থেকে স্বাতী
তোমার ঘরে এসেছে আজ নেমে ;
তবুও দূরে সরে গিয়ে তুমি
হারিয়ে যেতে চাও কি আত্মপ্রশ্নে ঘুরে-ফিরে ?
অথবা জনগণসেবার ভিতরে শিশিরে
লুপ্ত করে দেবে কি জ্ঞানকামীর মরুভূমি ?
সবের ওপর সত্য আগুন—অমেয় মোম শুধু,

আর সকলই শূন্য আশা, অন্ধ অনুমিতির মতন ধু-ধু।’

শতভিষা। শরৎ ১৩৬০

নদী নক্ষত্র মানুষ

‘এখানে জলের পাশে বসবে কি? জলঝিরি এ নদীর নাম;
অপরূপ; আমি তবু ঝাউবনী বলি একে’—আস্তে বললাম।
নদীর দুপারে ঢের উঁচু-উঁচু ঝাউবন, নীড়—
চুপচাপ ঘাসের ওপরে বসে কিছুক্ষণ তারপরে আমরা দুজনে
কোনো কথা খুঁজে তবু পেলাম না আর যেন—
নদী যেন ঢের দূরে—আমাদের মনে
এ মুহূর্ত এ আকাশ নেই আর আজ;
বিষণ্ণতা: তাও নেই—পাতা ঝরবার
স্বর শুনি, ঢেউ নড়বার শব্দ পাই;
এই পৃথিবীতে যেন কিছু নেই আর।

একদিন—জানি আমি—সম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ছিল আমাদের মনে;
‘নক্ষত্রের নিচে শিশিরের গল্প শোনায়েছি শুনেছি দুজনে
চোখাচোখি বসে থেকে; হাতে হাত নিশ্বাসে নিশ্বাস
না জানতে মিশে গেছে—যেমন মাটির গন্ধ হৃদয়ে ফোটাতে চায় ঘাস,
ধান খই দূর্বাঘাসে যেমন মাটির ইচ্ছা নিজেকে রাখতে চায় ঢেকে
একদিন পৃথিবীর বিলোড়ন রৌদ্র রক্ত আহ্বানের থেকে
দূরে সরে প্রেম আর আকাঙ্ক্ষার ঘরে বসে আমাদের ব্যাপৃত হৃদয়
আকাশ ও এ মাটিকে পেয়েছিল এক তিলে—’ বললাম; আস্তে তখন
সে বললে—‘শেষ সত্য নদী নয়,—মন—’

আমি তাকে: ‘হয়তো নতুন কোনো রূপে

আমাদের ভালোবাসা পথ কেটে নেবে এই পৃথিবীতে ;—
আমরা দুজনে এই বসে আছি আজ—ইচ্ছাহীন ;—
শালিক পায়রা মেঘ পড়ন্তবেলার এই দিন
চারিদিকে ;
এখানে গাছের পাতা যেতেছে হলুদ হয়ে—নিঃশব্দে উল্কার মতো ঝরে
একদিন তুমি এসে তবু এই হলুদ আঁচল রেখে ঘাসের ভিতরে
শান্তি পাবে ; সন্ধ্যার জলের দিকে শূন্য চোখে রবেনাকো তাকিয়ে এমন
অস্পষ্ট সংকটে এসে—মুখে কথা ফুরোবে না—এখন যা গভীর গোপন
প্রাণের চারণা পাবে অন্ধকারে ; ব্যাপ্তি পাবে ; যেইসব কথা
ভুলে গেছ—যে নিয়ম অনুভূতি কবেকার সহজ স্পষ্টতা
হারিয়েছে—নতুন জীবন পাবে তারা সব—' বলে মনে হল কোলাহল
মানুষের শোচনার শব্দ যেন ;—নদীদের অন্ধকার জল
জীবনকে স্থিরভাবে ব্যবহার করে নিতে বলে
প্রেমের নিকটে গিয়ে—কিন্তু অপ্রেমের ফলাফলে
নিজের জ্ঞানের গতির প্রবাহ থেকে চ্যুত হয়ে নয় :
যে রকম এই নদী আর এই নারী নিজ বাস্তবতা নিয়ে তন্ময়।

দেশ। ২ আশ্বিন ১৩৬০

জীবনে অনেক দূর

জীবনে অনেক দূর সময় কাটিয়ে দিয়ে—তারপর তবু
চলার কিছুটা আরও পথ আছে টের পাই ;
সুমুখে বিস্ময়—
দেখেছি সূর্যের আলো, মাঝে-মাঝে জলের কম্পন ;
আশ্বিনের ঘন নীল আশ্চর্য আকাশে
দেখেছি আরোহী হাঁস বাষ্পের ভিতর থেকে আসে
হংসীর অনিমেষ দেহ লক্ষ্য করে,

মিশে যায় খুব স্বচ্ছ আলোর ভিতরে।
কোথায় ফুরিয়ে যায় তারা সব—কেমন সফল।
অগ্নির উৎসের মতো সৃষ্টির নির্ঝর থেকে জেগে
আমারও শরীর মন মিশে যেতে চেয়েছে আবেগে।

ব্রাত্য। আশ্বিন ১৩৬০

নব হরিতের গান

চারদিকেতে হলদে কালো শাদার পৃথিবীর
ব্যসন বাতাস রক্ত কোলাহল
শান্ত করে পথে মাঠে প্রাঙ্গণে ও ঘরে
মহাসরীসৃপের ছায়া পড়ে।
তবুও মাটি সাগর সূর্যে অমৃতস্বাদ আছে
জেনে মানুষ নিজেও হতে চেয়েছে সজ্জন ;
ভাবনা ভাষা আবেগ কথা কাজ
নতুন-নতুন চেতনা ও সত্যে হৃদয়মন

দান করেছে চীন বেবিলন কুরুবর্ষ গ্রিস ;
মহাইয়োরোপের আমেরিকার ক্রান্তি গড়ে
ইতিহাসের অনেক পর্ব ফুরিয়ে গেল, তবু
এখনও সে মরুভূমির ভোরে

দাঁড়িয়ে স্নিগ্ধ একখানা মেঘ চায় ;
হৃদয়ে তার ভালোবাসার মেঘ কি তবু আছে ?
মহাপ্রাণের বৃক্ষ ও তার পাখি তো বারবার
ভস্ম হয়ে জাগছে হরিৎ—নব হরিৎ গাছে।

একক। শারদীয় ১৩৬০

দেশ কাল সন্ততি

চারিদিকে আছে ব্যস্ত নদীদের ক্ষণ
হৃদয়ের আত্মীয় নারীর মতন ;
শঙ্খচিল উড়ে যায়—ঘরে ফিরে আসে ;
ডানার ছায়ার শব্দ ঘাসে।
এক পৃথিবীর ধর্ম নষ্ট হয়ে গেছে,
অন্য পৃথিবীর বুদ্ধি ক্ষয়ের সন্ধানে ;
ইতিহাস কোনো দিনই নির্দোষ নয় ;
কাজ করে চলেছে সজ্ঞানে।

তবু সেই ভয়াবহ সময়ের থেকে
ক্লান্ত ব্যর্থ পৃথিবীর ব্যক্তিদের ডেকে
জীবনের অন্য কোনো স্নিগ্ধ, কোনো স্থিরতর স্থল
পেতে হলে অন্বেষণ হবে কি নিষ্ফল ?

জলের কণায় রৌদ্রে আকাশের মহাসনাতনে
নক্ষত্রে মিলিয়ে নিয়ে চেতনার অন্তঃশীল আলো
হয়তো বেদনা রক্তে জন্মাধীন মানুষের নষ্ট ইতিহাস
হতে পারে—মাঝে-মাঝে হতে পারে ভালো।

উষা। শারদীয় ১৩৬০

দুটি তুরঙ্গম

আকাশে সমস্ত দিন আলো ;
পাতায় পালকে রোদ ঝিকমিক করে ;
জলগুলো চলে গেছে চেনা পথ ধরে

অবিরল আরও দূর জলের ভিতরে।

যদিও গভীরভাবে সময়ের সাগর উজ্জ্বল—
কী এক নিঃশব্দ নিবিড় আবেগে তাকে কালো
দুটি তুরঙ্গম যেন অনন্তের দিকে টেনে নেয় ;
নিরন্তর এ রকম অগ্রসর হয়ে যাওয়া ভালো।

অনেক আঁধার আলো দেখেছি, তবুও
আরও এক বড়ো আলো অন্ধকারের প্রয়োজন
এখন গভীরভাবে বোধ করে মন
আকাশ প্রান্তর পথ নক্ষত্রলোকের দিকে গিয়ে।

সারাদিন এঁকেবেঁকে নদীটির ঢেউ
মিশে যায় শাদা কালো রঙের সাগরে ;
সারাদিন মেঘ পাখি উঁচু-উঁচু গাছ
যেন প্রায় সূর্য স্পর্শ করে।

মৌমাছি রৌদ্র নারী শরীর ও মন
মুহূর্ত ও মহাকাল দুজনের কাছে
বারবার ব্রহ্মাণ্ডের অপরূপ অগ্নিপরিধির
ভিতরে নিবিড় অগ্নিশিল্প হয়ে আছে।

সব শেষ হয়ে গেলে তারপর থাকে
এতদিন যা জেনেছি তার চেয়ে ভালো
সমস্ত দিনের সূর্য—আর সেই সূর্যের বিদায়,
আঁধারের রঙে মাখা নক্ষত্রের আলো।

নগর বন্দর দিক জনতার পথে
ক্ষতি রক্ত ভালোবাসা ব্যথা জ্ঞান লাভ
ভালো, তবু সেইসব স্থিরতর করে নিতে হয় ;
প্রকৃতি মানুষ আর সময়ের নিজের স্বভাব,
জেনে নিতে হয় নদী প্রান্তরের ঘাসে ;
এ ছাড়া আর কী সত্য ইতিহাস জানে ?
কিছু গ্রন্থ রীতি চিন্তা—দু-একটি নক্ষত্র নারীর
দিকে চেয়ে বোঝা যায় জীবন ও মৃত্যুর মানে।

দেশ। ২১ কার্তিক ১৩৬০

নব-নব সূর্যে

মানুষ সার্থক হয় মাঝে-মাঝে, তবু
কত তার নিষ্ফলতারাশি
এখনও উজ্জ্বলতর বলে মনে হয়
মৃত ম্যামথের পাশাপাশি
মানবকে, তবুও নিরবচ্ছিন্ন ব্যক্তির জীবন
চারিদিকে ক্ষয় হয়ে আসে ;
সকালের সম্ভাবনা মানুষকে সচকিত করে ;
আলো ঠিকরালে তবু চোখে এসে পড়ে
শেষ শূন্য—কিছু নেই, বিকেল নিভছে।
যারা আশা করেছিল, কিংবা যারা আশা
করে নাই, যারা প্রাণে ভালোবাসবার
জ্ঞানী পরিভাষা
আয়ত্ত না করে তবু প্রেম
চেয়েছিল প্রিয় নরনারীদের কাছে
যারা শুধু বাঁচবার পথ চেয়েছিল...

শিশিরে নিঃশব্দ হয়ে আছে।

সাধনায় হয়তো বা সত্য শুভ লাভ
হতে পারে—এরা কেউ-কেউ
সেই আভা দেখেছিল, তবু
অন্ধ অন্নসমস্যার ঢেউ
এসে সব মুছে ফেলে গেছে
ঘর বাড়ি সাঁকো মাঠ পথ
একদিন আধ দিন ভাঙাগড়া হতে-না-হতেই
চিহ্ন নেই—সে সব মানুষ কেউ নেই।

জীবনের ঢের কাজ হয়ে গেলে তবু
ভাঙনের নদী এসে সমাজের দুই পার ক্ষয়
করে তার অন্ধকার সমুদ্রের দিকে
ভেসে চলে গেছে মনে হয়।
তবু গঠনের কাজে ফিরে এসে মানুষের মন
আগেকার গ্লানিমার যে নিষ্ফালন
বারবার শেষ করে দিতে চায় তার
সূচনায় আলো তবু ভিতরে গভীর অন্ধকার?

অপ্রেম বেদনা রক্ত ভয়ে ভুলে বিলোড়িত হয়ে
রাত্রিদিন কাজ করে চলেছে লোকের ইতিহাস ;
মানুষ সমাজ দেশ ধ্বংস করে তবু
জ্ঞান শান্তি বাস্তবতা প্রেমের আভাস

মাঝে-মাঝে পাওয়া যায় যেন তার বিদ্যুতের কাছে ;
যদিও আঁধার বড়ো—ইতিহাসে শোকাবহ অন্ধ বেগ আছে ;

সংকল্প প্রেরণা মূল্য উদাসীন শক্তির মতন
ভেঙে—নব-নব সূর্যে আলোকিত করে তোলে মন।

দেশ। ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩৬০

একটি নক্ষত্র আসে

একটি নক্ষত্র আসে ; তারপর একা পায়ে চলে
ঝাউয়ের কিনার ঘেঁষে হেমন্তের তারা ভরা রাতে
সে আসবে মনে হয় ; আমার দুয়ার অন্ধকারে
কখন খুলেছে তার সপ্রতিভ হাতে !
হঠাৎ কখন সন্ধ্যা মেয়েটির হাতের আঘাতে
সকল সমুদ্র সূর্য সত্বর তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাত্রি হতে পারে
সে এসে দেখিয়ে দেয় ;
শিয়রে আকাশ দূর দিকে
উজ্জ্বল ও নিরুজ্জ্বল নক্ষত্রগ্রহের আলোড়নে
অঘ্রানের রাত্রি হয় ;
এ রকম হিরণ্ময় রাত্রি ছাড়া ইতিহাস আর কিছু রেখেছে কি মনে।

শেষ ট্রাম মুছে গেছে, শেষ শব্দ, কলকাতা এখন
জীবনের জগতের প্রকৃতির অন্তিম নিশীথ ;
চারিদিকে ঘর বাড়ি পোড়ো সাঁকো সমাধির ভিড় ;
সে অনেক ক্লান্তি ক্ষয় অবিনশ্বর পথে ফিরে
যেন ঢের মহাসাগরের থেকে এসেছে নারীর
পুরোনো হৃদয় নব নিবিড় শরীরে।

কবিতা। পৌষ ১৩৬০

শতাব্দীর মানবকে

চারিদিকে কঠিন পটভূমি,
তার ভিতরে চলেছ আজও তুমি ;
দু-হাত দিয়ে মরণনদীর জল
সরিয়ে তুমি দেখেছ তার ফল
আবার আদি মরণে গিয়ে মেশে।

তবু সে বিনাশ এখনও দূরে আছে,
ক্রমেই কাছে—ঘনিয়ে আসে কাছে,
যেটুকু সময় রয়েছে তার ফাঁকে
এ দানবীয় অপপ্রতিভাকে
মানুষ ছাড়া ঘোচাবে কে আর এসে।

এরিয়েলের মতন আলোর-কালোর কিনার দিয়ে
কেবলই আশা—গভীর আশার বার্তা জাগিয়ে
নতুন আলো নতুন আকাশভাষা
মহাইতিহাসের ভালোবাসা
আনবে না তার রক্তক্ষয়ের শেষে ?

কালের আলোয় দাঁড়িয়ে আছো ঘুমের চোখেই ;
ইতিহাস বলেনি : ঘুম নেই ?
বিষয় আর হৃদয় শাদা-কালোর সাগরের
অসীম শাদা ? অসীম কালো ? পেলে না কিছু টের ;
চলেছ তাই সকল প্রশ্ন-নির্বাপণের দেশে।

চিহ্ন শেষ করার আগে তবুও একবার
ফুরিয়ে দাও আজ পৃথিবীর মৃত্যুশীলতার

পণ্য গ্লানি নিষ্ফলতা মনে :
মানুষই সত্য বিশালতর আলোর প্রয়োজনে
চারিদিকের অন্ধ নদীর অসীম উন্মেষে।

আনন্দবাজার পত্রিকা। বার্ষিক ১৩৬০

পটভূমি

আকাশ ভরে যেন নিখিল বৃক্ষ ছেয়ে তারা
জেগে আছে কূলের থেকে কূলে ;
মানবজাতির দু-মুহূর্তের সময়-পরিসর
অধীর অবুঝ শিশুর শব্দ তুলে
চেয়ে দেখে পারাপারের ব্যাপ্ত নক্ষত্রেরা
আগুন নিয়ে বিষম, তবু অক্ষম স্থির জীবনে আলোকিত।
ওদের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীন হয়ে তবু
মানুষ আজও স্বাধীনতার মূল্য শেখেনি তো।

মানুষ যেদিন প্রথম এই পৃথিবী পেয়েছিল
সেই সকালের সাগর সূর্য অনমনীয়তা
আমাদের আজ এনেছে যেই বিষম ইতিহাসে—
সেখানে গ্লানি হিংসা উত্তরাধিকারের ব্যথা
মানুষ ও তার পটভূমির হিসেবে গরমিল
রয়েছে বলে কখনো পরিবর্তনীয় নয় ?
মানুষ তবু সময় চায় সিদ্ধকাম হতে :
অনেক দীর্ঘ অসময়—অনেক দুঃসময়।

চারিদিকে সৈন্য বণিক কর্মী সুধী নটীর মিছিল ঘোরে ;
তাদের সবের সহগামীর মতো

ইতিহাসের প্রথম উৎস থেকে
দেখেছি মানুষ কেবলই ব্যাহত
হয়েও তবু ভবিষ্যতের চক্রবালের দিকে
কোথাও সত্য আছে ভেবে চলেছে আপ্রাণ :
পটভূমির থেকে নদীর রক্ত মুছে-মুছে
বিলীন হয় যেমন সেসব পটভূমির স্থান।

ক্রান্তি। ফাল্গুন ১৩৬০

জর্নাল : ১৩৪৬

আজকে অনেকদিন পরে আমি বিকেলবেলায়
তোমাকে পেলাম কাছে ;
শেষ রোদ এখন মাঠের কোলে খেলা করে—নেভে ;
এখন অব্যক্ত ঘুমে ভরে যায় কাচপোকা মাছির হৃদয় ;
নদীর পাড়ের ভিজে মাটি চুপে ক্ষয়
হয়ে যায় অক্ষান্ত ঢেউয়ের বুকে ;

ঘাসে ঘুমে শান্ত হয়ে আসে ঘুঘু শালিকের গতি ;
নিবিড় ছায়ার বুকে ক্রমে-ক্রমে পায় অব্যাহতি
মাঠের সমস্ত রেখা ;
ঝাউফল ঝরে ঘাসে—সান্ত্বনার মতো এসে বাতাসের হাত
অশ্বত্থের বুক থেকে নিভিয়ে ফেলছে খাড়া সূর্যের আঘাত ;
এখুনি সে সরে যাবে পশ্চিমের মেঘে।

গোরুর গাড়িটি কার খড়ের সুসমাচার বুকে
লাল বটফলে থ্যাঁতা মেঠো পথে জারুলছায়ার নিচে নদীর সুমুখে
কতক্ষণ থেমে আছে ; চেয়ে দেখ নদীতে পড়েছে তার ছায়া ;

নিঃশব্দ মেঘের পাশে সমস্ত বিকেল ধরে সেও যেন মেঘ এক, আহা,
শান্ত জলে জুড়োচ্ছে ;

এইসব নিস্তব্ধতা শান্তির ভিতর
তোমাকে পেয়েছি আজ এতদিন পরে এই পৃথিবীর 'পর।
দুজনে হাঁটছি ভরা প্রান্তরের কোল থেকে আরও দূর প্রান্তরের ঘাসে ;
উস্‌খুস্‌ খোঁপা থেকে পয়ের নখটি আজ বিকেলের উৎসাহী বাতাসে
সচেতন হয়ে উঠে আবার নতুন করে চিনে নিতে থাকে
এই ব্যাপ্ত পটভূমি ; মহানিমে কোরালির ডাকে
হঠাৎ বুকের কাছে সব খুঁজে পেয়ে।
'তোমার পায়ের শব্দ', বললে সে, 'যেদিন শুনিনি
মনে হত ব্রহ্মাণ্ডের পরিশ্রম ধুলোর কণার কাছে তবু
কিছু ঋণী ; ঋণী নয় ?
সময় তা বুঝে নেবে...
সেইসব বাসনার দিনগুলো, ঘাস রোদ শিশিরের কণা
তারাও জাগিয়ে গেছে আমাদের শরীরের ভিতরে কামনা
সেই দিন ;
মা-মরা শিশুর মতো আকাঙ্ক্ষার মুখখানা কী যে :
ক্লান্তি আনে, ব্যথা আনে, তবুও বিরল কিছু নিয়ে আসে নিজে।'

স্পষ্ট চোখ তুলে সে সন্ধ্যার দিকে : 'কতদিন অপেক্ষার পরে
আকাশের থেকে আজ শান্তি ঝরে অবসাদ নেই আর শূন্যের ভিতরে।'
রাত্রি হয়ে গেলে তার উৎসারিত অন্ধকার জলের মতন
কী-এক শান্তির মতো স্নিগ্ধ হয়ে আছে এই মহিলার মন।
হেঁটে চলি তার পাশে, আমিও বলি না কিছু, কিছুই বলে না ;
প্রেম ও উদ্‌বেগ ছাড়া অন্য-এক স্থির আলোচনা
তার মনে—আমরা অনেক দূর চলে গেছি প্রান্তরের ঘাসে,

দ্রোণ ফুল লেগে আছে মেরুন শাড়িতে তার—নিম-আমলকীপাতা হালকা বাতাসে
চুলের ওপরে উড়ে-উড়ে পড়ে—মুখে চোখে শরীরের সর্বস্বতা ভরে,
কঠিন এ সামাজিক মেয়েটিকে দ্বিতীয় প্রকৃতি মনে করে।

অন্ধকার থেকে খুঁজে কখন আমার হাত একবার কোলে তুলে নিয়ে
গালে রেখে দিল তার : 'রোগা হয়ে গেছ এত—চাপা পড়ে গেছ যে হারিয়ে
পৃথিবীর ভিড়ে তুমি—' বলে সে খিন্ন হাত ছেড়ে দিল ধীরে ;
শান্ত মুখে—সময়ের মুখপাত্রীর মতো সেই অপূর্ব শরীরে
নদী নেই—হৃদয়ে কামনা ব্যথা শেষ হয়ে গেছে কবে তার ;
নক্ষত্রেরা চুরি করে নিয়ে গেছে, ফিরিয়ে দেবে না তাকে আর।

চতুরঙ্গ। বৈশাখ **১৩৬১**

মৃত্যুসাগর সরিয়ে সূর্যে বেঁচে আছি

মৃত্যুসাগর সরিয়ে শূন্যে বেঁচে আছি, তোমায় ধন্যবাদ।
হে হেমন্ত, মাছি ফড়িঙ রোদের ভিতর দেয়ালি পোকা উড়িয়ে দিয়ে তুমি
এ ওড়া যে আবছা ক্ষণিক, মানুষের সেই কথা ভাবিয়েছ।
ইতিহাসের অনেক স্তরেই মৃত্যু মরুভূমি
রয়ে গেলেও মানুষ বিশাল বয়ঃপ্রাপ্ত অন্ধকারে আজ,
নিজের প্রাণশক্তি সর্বস্বান্ত করে আলো
যেমন চাইছে সময়—মানবমনে সূর্য কেবলই ক্ষয় হয়ে
তবুও নিখিল প্রাণের বৃক্ষ স্নিগ্ধ করে আলো।
পাখি পতঙ্গ জল
খেলছে যে যার সেই সবেরই অবোধ অসীম কালো।

প্রাঙ্গণ। বৈশাখ **১৩৬১**

রবীন্দ্রনাথ

'মানুষের মনে দীপ্তি আছে
তাই রোজ নক্ষত্র ও সূর্য মধুর—'
এ রকম কথা যেন শোনা যেত কোনো একদিন,
আজ সেই বক্তা ঢের দূর

চলে গেছে মনে হয় তবু ;
আমাদের আজকের ইতিহাস হিমে
নিমজ্জিত হয়ে আছে বলে
ওরা ভাবে নীল হয়ে গিয়েছে অন্তিমে

সৃষ্টির প্রথম নাদ—শিব ও সৌন্দর্যের ;
তবুও মূল্য ফিরে আসে
নতুন সময়তীরে সার্বভৌম সত্যের মতন
মানুষের চেতনায় আশায় প্রয়াসে।

উষা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১

কখনো নক্ষত্রহীন

কখনো নক্ষত্রহীন কুয়াশার রাতে
বাইরের ঝড়ের ঝাপসা আলোড়নের
অন্ধকার থেকে পাখি বাতির আলোয় উজ্জ্বল
ঘরের ভিতর ঢুকে দু-মুহূর্ত ব্যথা চিন্তা ভালোবাসা-ভরা
মেঝেয় লক্ষ্মীর আলপনা মেয়েদের
দেয়ালে ফ্রেস্কোর মূল্য বুঝে নিতে চেয়ে
ধুকধুকে বুকের অনন্ত শূন্যে তার

টের পায়—টের পায় যদি
একটি বিদ্যুৎ শুধু মানুষের মতো চেতনার
দেখা দিয়ে মিলোবার আগে
ব্যক্ত করে যায় বুদ্ধ পতঞ্জলি জানেনি যে মানে ;—
আমিও অনেকদিন পরে আজ তেমনই সজ্ঞানে ;
তোমার-আমার—এই পৃথিবীর কারণের দিকে চেয়ে আছি ;
ফল নয়—কোনো নিরসন নয়—দু-জনের খুব কাছাকাছি
আসা নয়,—শুধু সময়ের শাদা-কালোর সাগরে
জল যেন ক্রমে শূন্য অন্ধ হয়ে ঝরে :
তোমাকে-আমাকে স্থির নিঃশব্দ করে।

পূর্বাশা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১

মরুতৃণোজ্জ্বলা

হেঁয়ালি রেখো না কিছু মনে ;
হৃদয় রয়েছে বলে চাতকের মতন আবেগ
হৃদয়ের সত্য উজ্জ্বল কথা নয়,—
যদিও জেগেছে তাতে জলভারানত কোনো মেঘ ;
হে প্রেমিক, আত্মরতিমদির কি তুমি ?
মেঘ : মেঘ, হৃদয় : আর মরুভূমি শুধু মরুভূমি।

এ বিশ্বের এই শুধু ধার্য সমাধান ;
বাকি সব অনিয়ম, শূন্য, অন্ধকার ;
তবু এই সারাৎসার ভেঙে ফেলেছে কি এ নারী !
নিখিলের পাশাপাশি দ্বিতীয় আধার
অন্য-এক নিখিলের—অন্য-এক নিখিলের তুমি ;

মেঘ : মেঘ, হৃদয় : হৃদয়, আর মরুতৃণোজ্জ্বল মরুভূমি।

ক্রান্তি। শ্রাবণ ১৩৬১

জন্মতারকা

মাথার ওপর দিয়ে ভেসে যায় চিল—
ঘুরুনো ডানার ওপরে বড়ো নীল,
সমস্ত আকাশ
আমার পায়ের নিচে পৃথিবীর ঘাস,

আমার চোখের পথে অনন্ত রোদ্দুর
মনে হয় যেন সময়ের অশ্বখুর
হারিয়ে ফেলেছে তার সব কটি নাল,
হয়ে আছে অসীম সকাল।

আমার বুকের কাছে নদী
ছোটো ছিল কবে যেন, এখন এয়োতি
মহিলার মতো কালো চুল ভরা জলে
সময় ও প্রানসাগরের—প্রাণসাগরের কথা বলে।

পেছনে শূন্যে—কোনো শব্দহীন দেশে
ছিলাম আঁধারে শুয়ে জন্মতারকার কোল ঘেঁষে।
এই পৃথিবীর আলো প্রেম চিহ্ন চেনা মুখ কাকে
চেয়ে সূর্যে জেগে চাইনাকো আর মৃত্যুতারকাকে।

কল্পনা। সাহিত্য। ভাদ্র ১৩৬১

সে

আমাকে সে নিয়েছিল ডেকে :
বলেছিল : ‘এ নদীর জল
তোমার চোখের মতো ম্লান বেতফল ;
সব ক্লান্তি বিহ্বলতা থেকে
স্নিগ্ধ রাখছে পটভূমি
এই নদী তুমি।’

‘এর নাম ধানসিড়ি বুঝি ?’
মাছরাঙাদের বললাম ;
গভীর মেয়েটি এসে দিয়েছিল নাম।
আজও আমি মেয়েটিকে খুঁজি ;
জলের অপার সিঁড়ি বেয়ে
কোথায় যে চলে গেছে মেয়ে।

সময়ের অবিরল শাদা আর কালো
বুনোনির ফাঁক থেকে এসে
মাছ আর মন আর মাছরাঙাদের ভালোবেসে
ঢের আগে নারী এক—তবু চোখ-ঝলসানো আলো
ভালোবেসে ষোলো-আনা নাগরিক যদি
না হয়ে বরং হত ধানসিড়ি নদী।

দেশ। ২১ আশ্বিন ১৩৬১

মহাইতিহাস

জীবনে কখনও প্রেম হয়েছিল বুঝি ;
দূরে কাছে মানুষের সঙ্গে সদ্ভাব

হয়েছিল কোনো এক ভোরের আলোয়,
মন স্থির করে কিছু জ্ঞান সত্য লাভ।
সে সব স্বস্তির দিন আজ
গ্রাস করে সংসার সমাজ
বিকেলের অন্ধকারে ক্ষয়
পায়—তবু হৃদয় উন্মুখ মনে হয়।

সে সব মানুষ নারী নদী চিহ্ন সুর
এখন কোথাও নেই আর ;
চারি দিকে কোলাহল ভেদ করে ম্লান স্তম্ভ এক
দাঁড়িয়ে রয়েছে শূন্যতার।
আমিও এ নৈষ্ফল্যের অন্ধ একজন
নির্মাতার দূষণীয় শক্তির মতন
এ যুগের পরিণামবহনের পথে
সত্য পাব ভাবি খণ্ড সত্যের জগতে।

আঁধার দেখেছি, তবু আছে অন্য বড়ো অন্ধকার ;
মৃত্যু জেনেছি, তবু অন্য সম্মুখীন মৃত্যু আছে ;
পেছনের আগাগোড়া ইতিহাস রয়ে গেছে, তবু
যেই মহাইতিহাস এখনও আসে নি—তার কাছে
কাহিনীর অন্য অর্থ, সমুদ্রের অন্য সুর, অন্য আলোড়ন
হৃদয় ও বিষয়ের ; মন এক অন্য দীপ্ত মন।

ক্রান্তি। আশ্বিন ১৩৬১

পৃথিবী ও সময়

সময়ের উপকণ্ঠে রাত্রি প্রায় হয়ে এলে আজ
সূর্যকে পশ্চিমে দেখি সারা শতাব্দীর

অক্লান্ত রক্তের বোঝা গুছায়ে একাকী
তবুও আশার মতো মেঘে মেঘে বলয়িত হয়ে
শেষ আলো ঢেলে যায় ; জ্যোতিঃপ্রাণধর্মী সূর্য অই ;
এক দিন অ্যামিবার উৎসারণ এনেছিল ;
জীবনের ফেনশীর্ষ সিন্ধুর কল্লোলে এক দিন
মানুষকে পেয়ে ; না-মর্মী মানুষ সেই দিন
ভয় পেত, গুহায় লুকাত, তবু সূর্যকরোজ্জ্বল
সোনালি মানবী তাকে 'হাঁ' বলাল—নীল
আকাশ নগরীরেখা দেখা দিল ; শঙ্খ আমলকী
সাগর অলিভবন চেনা গেল রৌদ্রের ভিতরে ;
শ্বেতাশ্বতর-প্লেটো-আলোকিত পৃথিবীর রূপ
অনাদির দায়ভাগে উৎসারিত রক্তের নদীর
শিয়রে আশার মতো জেগে উৎসাহিত সূর্যকরে
সহসা নতুন হিংসা রক্ত গ্লানিমার কাছে প্রতিহত হয়ে
ধীরে ধীরে নিঃশেষে ফুরায়ে গেল তবু।

ভাই-বোন-স্মৃতি-শান্তি হননের ঘোরে উদ্‌বেলিত
বহতা নদীর মতো আজও এই পৃথিবী চলেছে।
তবুও তো সেই উদ্‌ঘাতিনী
নদীরমণীর শব্দ কানে নিয়ে—প্রাণে
আকাশে জ্যোতিষ্ক জ্বলে হস্তা অভিজিৎ,
অনুরাধা শতভিষা লুব্ধক স্বাতী ;
পৃথিবীতে—হৃদয়েরও গতিপথে বর্ণালির আভা
সম্পূর্ণ দীপ্তির মতো আলোকিত—ক্রমে আলোকিত হতে চায়।

লণ্ডন রুশিয়া গ্রীসদ্বীপপুঞ্জ কলকাতা চীন,
অগণন কন্‌ফারেন্‌সে বিকীর্ণ য়ুরোপা,

আমেরিকা—যেন বীতবর্ষণের কৃষ্ণমেঘ নক্ষত্রের পথে ;
ক্ষণিক উজ্জ্বল হয়ে ক্লান্তি ক্লেদ ভয় অনন্ধকার হতে চায়
এখুনি আবার তবু। প্রকৃতিতে সূর্য আসে, অস্তের আকাশে
চলে যায় ; অস্তগতিহীন শুভ্র জনহৃদয়ের
সূর্যনগরীর দিকে যেতে হবে চেতনায় মানুষের সময় চলেছে।

লক্ষ্য

এখানে অর্জুন ঝাউয়ে যদিও সন্ধ্যার চিল ফিরে আসে ঘরে
যেতে আর সাধ নেই পৃথিবীর ঘরের ভেতরে।
একে-একে নক্ষত্রেরা দেখা দেয়—লিচু গাছে পেঁচা নেমে আসে ;
গোরুর গাড়ির ঘুণ্টি সাড়া দিয়ে চলে যায় সন্ধ্যার বাতাসে ;
আস্তে যাচ্ছে গাড়ি আকাশ প্রান্তর ভেঙে মৃদু বাতি নিয়ে—
চুপে চুপে কুয়াশায় যাচ্ছে মিলিয়ে ;
সোনালি খড়ের বোঝা বুকে তার—মুখে তার শান্ত অন্ধকার ;
ভালো ; তবু আরো কিছু চাই আজ পৃথিবীর দুঃসহ ভার
বইবার প্রয়োজনে ; তবুও মানবজাতি রক্তস্রোতে বারবার শক্তিশালী নদী
না হয়ে এ স্নিগ্ধ রাত্রি—শান্তপথ হয়ে যেত যদি।

জয়শ্রী। শারদীয় ১৩৬১

রাত্রিদিন

এক দিন এ পৃথিবী জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষায় বুঝি স্পষ্ট ছিল, আহা ;
কোনো এক উন্মুখ পাহাড়ে
মেঘ আর রৌদ্রের ধারে
ছিলাম গাছের মতো ডানা মেলে—পাশে তুমি রয়েছিলে ছায়া।

এক দিন এ জীবন সত্য ছিল শিশিরের মতো স্বচ্ছতায় ;
কোনো নীল নতুন সাগরে
ছিলাম—তুমিও ছিলে ঝিনুকের ঘরে
সেই জোড়া মুক্তো মিথ্যে বন্দরে বিকিয়ে গেল হায়।

*

অনেক মুহূর্ত আমি ক্ষয়
করে ফেলে বুঝেছি সময়
যদিও অনন্ত, তবু প্রেম সে অনন্ত নিয়ে নয়।
তবুও তোমাকে ভালোবেসে
মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এসে
বুঝেছি অকূলে জেগে রয়
ঘড়ির সময়ে আর মহাকালে যেখানেই রাখি এ হৃদয়।

ময়ূখ। শারদীয় ১৩৬১

তোমাকে

ভেবেছিলাম এ কথা স্থির মেনে নিতে পারি :
নিউট্রন্ ও ইলেকট্রনের অন্ধ সাগরে
ওদেরই জাদুবলে তুমি হয়েছ আজ নারী ;
ওদেরই দয়ার ফলে আমি প্রেমিক তোমার তরে।

তবু এ ভুল হৃদয়ঙ্গম—মহাসৃষ্টির মানে
হয়তো ঠিক এমনভাবে উৎসারিত নয়।
তা যদি হত তবে যেদিন নিজেরই পরামর্শে সজ্ঞানে
আমাকে তুমি দিয়েছিলে অব্যর্থ হৃদয়

সে স্বাদ হয়ে যেত কি আজ হেমন্তে আবার ক্ষয়।
শীতের পড়ি-পড়ি বেলায় ফসল কেটে নিচ্ছে চাষা ঘরে ;

নদীর বুকে প্রকৃতি জল রেখেছে, তবু রক্তের উদয়
এসে সবই আচ্ছাদিত করে।

আজ শতকে মানুষ নারী শূন্য হতে এসে
চলেছে শূন্যে—আঁধার থেকে অপরিসীম আরো
অন্ধকারের ভেতরে গিয়ে মেশে।
এ ছাড়া কোনো সত্য নেই—উপায় নেই কারো।

এরই ভেতর অন্য এক গভীরতর নিরুপায়তা আছে ;
মানুষ ও তার চিরস্থায়ী মানবছায়া ছাড়া
জানে না কেউ ; প্রলম্বিত নীল আকাশের কাছে
কোনো দিনও পৌঁছোবে না সাড়া।

তবু সবই ঠিক হয়েছে ; কবের আদি পৃথিবী থেকে তুমি
কত গ্লানি রক্ত আঁধার বিহ্বলতার থেকে
চলেছ আজও তিলধারণের মতন পটভূমি
দান না ক'রে—নিজেরই গালে সে তিলবিন্দু রেখে।

বর্ধমান। শারদীয় ১৩৬১

কোনো এক নারীকে : যে আমাকে আ-ইতিহাস দেখাতে চায়

কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
বঙ্গোপসাগরের কালো বাতাসের কোলাহলকে
কেটে ফেলতে পারল না আর
পাহাড়ের মতো কালো নীল মেঘের শিঙে গুঁড়ো হয়ে
নক্ষত্রের ঝর্নার মতো ঝরে পড়ল
মৌসুমী সমুদ্রের জমকালো আনন্দের ভিতর
এক মুহূর্তের শৈশব সৃষ্টি করল সে

তারপর ডুবে গেল কোথায়
আমার প্রেম সাহস স্বপ্ন সমারূঢ় কাস্তে চাঁদ
ইতিহাসের হু হু হু হু অন্ধকারের মুখে দাঁড়িয়ে।

কবিপত্র। ৩য় সংকলন ১৩৬১

মানুষ যেদিন

মানুষ যেদিন প্রথম এই পৃথিবী পেয়েছিল—
সেই সকালের সাগর সূর্য অনমনীয়তা
আমাদের আজ এনেছে যেই বিষম ইতিহাসে ;
সেখানে গ্লানি হিংসা উত্তরাধিকারের ব্যথা ;
মানুষ ও তার পটভূমির হিসেবে গরমিল
রয়েছে বলে কখনও পরিবর্তনীয় নয় ?
মানুষ তবু সময় চায় সিদ্ধকাম হতে :
এক নিমেষে আলোকবর্ষে ব্যাপৃত সময়।

সেতু। [?] ১৩৬১

জর্নাল : ১৩৪২

হিজল-ঝাউয়ের ডাল জ্বলছে সূর্যের আলোড়নে,
মেঘের পৃথিবী থেকে ছুটি পেয়ে বয়স্কা রূপসী,
আশ্বিন এসেছে নীলকণ্ঠের পালকে শাড়ি ঘষে,
পদ্মের স্তনে—আর ব্যথাতুর মনে।
মাছি রোদ শেফালি মিষ্টি ধান পায়রার ভিড়
সঙ্গে তার—পশ্চিমে মেঘের পিছে সূর্যের হৃদয়
নদী কাশ চোখা বাঁশপাতা থেকে রৌদ্রের ক্ষয়
করলে শাপলার বনে জেগে ওঠে জ্যোৎস্নার শরীর।

চারি দিকে বাড়ি সাঁকো গাছে নীড় উলুঘাসে ঢেউ ;
নদীটির চলাফেরা মানবীর মতো ;
মনে হয় সৃষ্টির ভেতরে প্রথমত
এ সব জিনিস ছাড়া ছিল নাকো কেউ।
এইখানে চিরদিন রয়ে যাবে সব।
নীলচে ডানার কাক আশ্বিনকে কাছে ডেকে আনে ;
তিন-চার মাইল ক্ষেতে হরিণের প্রাণে
এসেছে অপার ব্যাপ্তির অনুভব।
শূন্য চারি দিকে নীল আকাশের মতো হয়ে আসে ;
ক্রমেই গভীর নীল বলে মনে হয় :
অন্ধ ইলেকট্রন্—তবু অনিশ্চয়তার পরিচয়
নেই তার সনাতন নির্জন প্রকাশে।

ঊষা। শারদীয় ১৩৬১

কার্তিক ভোরে : ১৩৪০

কার্তিকের ভোরবেলা কবে
চোখে মুখে চুলের ওপরে
যে শিশির ঝরল তা
শালিক ঝরাল বলে ঝরে

আমলকী গাছ ছুঁয়ে তিনটি শালিক
কার্তিকের রোদে আজ জলে
আমারই হৃদয় দিয়ে চেনা তিন নারীর মতন ;
সূর্য ? না কি সূর্যের চপ্পলে

পা গলিয়ে পৃথিবীতে এসে

পৃথিবীর থেকে উড়ে যায়
এ জীবনে ঢের শালিক দেখেছি
তবু সেই তিনজন শালিক কোথায়।

শতভিষা। শরৎ সংখ্যা ১৩৬১

তোমাকে ভালোবেসে

আজকে ভোরের আলোয় উজ্জ্বল
এই জীবনের পদ্মপাতার জল ;
তবুও এ জল কোথার থেকে এক নিমেষে এসে
কোথায় চলে যায় ;
বুঝেছি আমি তোমাকে ভালোবেসে
রাত ফুরুলে পদ্মের পাতায়।

আমার মনে অনেক জন্ম ধরে ছিল ব্যথা
বুঝে তুমি এই জন্মে হয়েছ পদ্মপাতা ;
হয়েছ তুমি রাতের শিশির—
শিশির ঝরার স্বর
সারাটি রাত পদ্মপাতার ’পর ;
তবুও পদ্মপত্রে এ জল আটকে রাখা দায়।

নিত্য প্রেমের ইচ্ছা নিয়ে তবুও চঞ্চল
পদ্মপাতায় তোমার জলে মিশে গেলাম জল,
তোমার আলোয় আলো হলাম,
তোমার গুণে গুণ ;
অনন্তকাল স্থায়ী প্রেমের আশ্বাসে করুণ

জীবন ক্ষণস্থায়ী তবু হায়।

এই জীবনের সত্য তবু পেয়েছি এক তিল :
পদ্মপাতায় তোমার আমার মিল।
আকাশ নীল, পৃথিবী এই মিঠে,
রোদ ভেসেছে, ঢেঁকিতে পাড় পড়ে ;
পদ্মপত্র জল নিয়ে তার—জল নিয়ে তার নড়ে ;
পদ্মপত্রে জল ফুরিয়ে যায়।

দেশ। শারদীয় ১৩৬১

মহাজিজ্ঞাসা

ছিলাম কোথায় যেন নীলিমার নীচে ;
সৃষ্টির মনের কথা সেইখানে আবছায় কবে
প্রথম রচিত হতে চেয়েছিল যেন।
সে ভার বহন করে চ'লে
আজ কাল অনন্ত সময়
সেকেন্ডে মিনিটে পলে বারবার ক্ষয়
পেয়েছে ; তবুও এই সময়ের অহরহ ক্ষমাহীন গতি
থামিয়ে এ পৃথিবীতে স্থির কিছু এনেছে কি ?—
যে স্থিরতা বারবার দিয়ে যায় রাত্রির নিয়তি,
পৃথিবীর দিন যে দাহন দেয়—সেইসব ছাড়া
আরও বড় মানে এক—মহাপ্রাণসাগরের সাড়া ?

নিরন্তর বহমান সময়ের থেকে খসে গিয়ে
সময়ের জালে আমি জড়িয়ে পড়েছি ;
যত দূর যেতে চাই এই পটভূমি ছেড়ে দিয়ে—

চিহ্নিত সাগর ছেড়ে অন্য এক সমুদ্রের পানে
ইতিহাস ছেড়ে দিয়ে ইতিহাসহীনতার দিকে—
মনে হয় এই আধ-কণা জল দিয়ে দ্রুত রক্ত নদীটিকে
সচ্ছল অমল জলে পরিণত করতে চেয়েছি।

মানুষের কত দেশ কাল
চিন্তা ব্যথা প্রয়াণের ধূসর হলুদ ফেনা ঘিরে
সংখ্যাহীন শৈবাল জঞ্জাল
সে নদীর আঘাটার জলে
তমসার থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে সময়ের অন্ধ মর্মস্থলে
অন্ধকারে ভাসে।
তবু তারা নীলিমার তপনের অমৃতত্ব বুকের আকাশে
ধরে নিতে চেয়েছিল বুঝি ;—
সাহস সাধনা প্রেম আনন্দের দিক লক্ষ্য ক'রে
আমরাও সূর্য খুঁজে নিতে গিয়ে গ্রহণের সূর্য কি খুঁজি ?

এঁকেবেঁকে প্রজাপতি রৌদ্রে উড়ে যায়—
আলোর সাগর ডানে—আনন্দসমুদ্র তার বাঁয়ে ;
মহাশূন্যে মাছরাঙা আগুনের মতো এসে জ্বলে ;
যেন এই ব্রহ্মাণ্ডের শোকাবহ রক্তে অনলে
মানে খুঁজে পেয়েছে সে অন্তহীন সূর্যের ঋতুর :
জ্ঞানের অগম্য এক অহেতুক উৎসবের সুর
জাগিয়ে বুদ্ধির ধাঁধা দু মুহূর্ত দীপ্ত করে পাখি
মানুষকে ফেলে গেল তবু তার চেতনার ভিতরে একাকী।
শূন্যকে শূন্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে শেষে
কোথায় সে চলে গেল তবে।

কিছু শীত কিছু বায়ু আবছা কিছু আলোর আঘাতে
ক্ষয় পেয়ে চারি দিকে শূন্যের হাতে
নীল নিখিলের কেন্দ্রভার
দান করে অন্তর্হিত হয়ে যেতে হয় ?

শূন্য তবু অন্তহীন শূন্যময়তার রূপ বুঝি ;
ইতিহাস অবিরল শূন্যের গ্রাস ;—
যদি না মানব এসে তিন ফুট জাগতিক কাহিনীতে হৃদয়ের নীলাভ আকাশ
বিছিয়ে অসীম করে রেখে দিয়ে যায় :
অপ্রেমের থেকে প্রেমে গ্লানি থেকে আলোকের মহাজিজ্ঞাসায়।

আনন্দবাজার পত্রিকা। শারদীয় ১৩৬১

অনেক রাত্রিদিন

অনেক রাত্রিদিন ক্ষয় করে ফেলে
এখন এসেছি এক উৎসের ভিতরে ;
মাঠের ওপরে ক্রমে ছায়া নেমে আসে,
দু-চারটে উঁচু গাছ রোদে খেলা করে।
পৃথিবীতে রক্তপাত অশান্তি এখন ;
অর্থময়তা তবু পেতে পারে মন।

কেউ নেই—শুধু এই মননের সহায়তা আছে ;
যা-কিছু বুঝেছি অনেক দিন সে সবের নীতি
দু-চারটে বই ঠাণ্ডা সলতের আলো
নক্ষত্র ও সূর্যে আধো উজ্জ্বল প্রকৃতি
আছে তবে ; পৃথিবীতে হৃদয় যা চেয়েছিল তার

শূন্যতাকে স্নিগ্ধ করে রয়েছে যুক্তির অন্তঃসার।

শরীর নির্বল হয়ে যেতেছে কেবলই ;
ক্রমে আরো ক্ষমাহীন কঠিন সময়
মনকে নিস্তার দিলে দিতে পেরে তবু
শরীরকে করে যাবে ক্ষয় ;
ক্ষয়িত এ শরীরের সঙ্গে মিলন
ভুলে মন হতে চায় সনাতন মন।

দৈনিক বসুমতী। শারদীয় ১৩৬১

প্রেমিক

সময় অনেক চিহ্ন লক্ষ্য ভেঙে ফেলে ;
ছুটেছে দুরন্ত অশ্বখুর ;
একে একে সকলকে নষ্ট করে দেবে—
সময়ের হাতে সবই বিচ্ছিন্ন ভঙ্গুর

হয়ে যায়—জেনেছি অনেক দিন আমি।
তবুও সময় তার সকল ধ্বংসের পটভূমি
দিয়ে আচ্ছাদিত ক'রে অপ্রেম ও প্রেমকে, তবুও
দেখেছে অনাচ্ছাদিত হে প্রেমিক, তুমি।

বন্দেমাতরম। শারদীয় ১৩৬১

অবিনশ্বর

তার সাথে আজ সাত-আট বছর পরে—অঘ্রানে
কলকাতার এই টিউব আলো নিয়নদীপের রাতে

দু-চার মিনিট দেখা হল—কথা বলা হল :
ঘরে ফেরার আগে কিছু সময় কাটাতে।
স্বচ্ছ ধ্রুব সহজ স্বভাবকথা
বলা হলে ভাবছি ভালো হত ;
কথা আরো গভীরভাবে চেতন হত যদি ;
শব্দ কথা ভাষা—সবই সেই নারীকে লক্ষ্য করে ব'লে
সফল হওয়া সহজ—তবু প্রতীক্ষা চাই মৃত্যু অবধি।

*

আজকে রাতে তোমায় আমার কাছে পেলে কথা
বলা যেত ; চারি দিকে হিজল শিরীষ নক্ষত্র কাশ হাওয়ার প্রান্তর।
কিন্তু যেই নিট নিয়মে ভাবনা আবেগ ভাব
বিশুদ্ধ হয় বিষয় ও তার যুক্তির ভিতর ;

আমিও সেই ফলাফলের ভিতরে থেকে গিয়ে
দেখেছি ভারত লন্ডন রোম নিউইয়র্ক চীন
আজকে রাতের ইতিহাস ও মৃত ম্যামথ সব
অটুট নিয়মাধীন।

কোথায় তুমি রয়েছ কোন্ পাশার দান হাতে :
কী কাজ খুঁজে ; সকল অনুশীলন ভালো নয় ;
গভীরভাবে জেনেছি যে-সব মনীষী ভাঁড় প্রেমিক পাপীদের
তারই ভিতর প্রবীণ গল্প নিহিত হয়ে রয়।

*

ক্রমেই বয়স বাড়ে—সবই ছড়িয়ে পড়ে নশ্বরতার দেশে।
বৃষ্টি বাতাস হলুদ পাতা ছাতকুড়ো ঘুণ মাকড়সাজাল এসে
বলছে : 'আরো কঠিন আঁধার নেমে পড়ার আগে
আমরা এলাম ; কোথাও কিছুই নেই ;

একটি শুধু মূর্খ আছে মানব ইতিহাসে
চঙ্গে চড়ে চেয়েছে নীল আকাশ ধরবেই ;
সারাটা দিন শিমুলতুলোর মতন শত সূর্যে উড়ে তুমি
একটি বীজচিহ্ন নিয়ে মাটিরই ক্রীড়াভূমি।'

বললাম আমি : 'শিশির আলো নক্ষত্র জল মনের উদ্দীপন
অন্ধকারের দিকে টানে ইতিহাস ও দার্শনিকের মন,
দেখেছি আমি : তবুও স্বাদ অনেকরকম—দেখেছি মানুষ অসীম রগড়ে
উত্তেজিত হয়ে অপার গোলকধাঁধায় ঘোরে।
তবুও মহাজিজ্ঞাসা ও অপার আশার কালো
অকূলসীমা আলোর মতো—হয় তো সত্য আলো।'

পূর্বাশা। শারদীয় ১৩৬১

আলোপৃথিবী

ঢের দিন বেঁচে থেকে দেখেছি পৃথিবীভরা আলো
তবুও গভীর গ্লানি ছিল কুরুবর্ষে রোমে ট্রয়ে ;
উত্তরাধিকারে ইতিহাসের হৃদয়ে
বেশি পাপ ক্রমেই ঘনালো।

সে গরল মানুষ ও মনীষীরা এসে
হয়তো বা একদিন করে দেবে ক্ষয় ;
আজ তবু কণ্ঠে বিষ রেখে মানবতার হৃদয়
স্পষ্ট হতে পারে পরস্পরকে ভালোবেসে।

কোথাও রয়েছে যেন অবিনশ্বর আলোড়ন :

কোনো এক অন্য পথে—কোন্ পথে নেই পরিচয় ;
এ মাটির কোলে ছাড়া অন্য স্থানে নয় ;
সেখানে মৃত্যুর আগে হয় না মরণ।

আমাদের পৃথিবীর বনঝিরি জলঝিরি নদী
হিজল বাতাবী নিম বাবলায় সেখানেও খেলা
করছে সমস্ত দিন ; হৃদয়কে সেখানে করে না অবহেলা
ফেনিল বুদ্ধির দৌড় ;—আজকের মানবের নিঃসঙ্গতা যদি

সে সব শ্যামল নীল বিস্তারিত পথে
হতে চায় অন্য কোনো আলো কোনো মর্মের সন্ধানী,
মানুষের মন থেকে কাটবে না তা হলে যদিও সব গ্লানি
তবু আলো ঝলকাবে অন্য এক সূর্যের শপথে।

আমাদের পৃথিবীর পাখালি ও নীল ডানা নদী
আমলকী জামরুল বাঁশ ঝাউয়ে সেখানেও খেলা
করছে সমস্ত দিন ; হৃদয়কে সেখানে করে না অবহেলা
বুদ্ধির বিচ্ছিন্ন শক্তি ;—শতকের ম্লান চিহ্ন ছেড়ে দিয়ে যদি

নরনারী নেমে পড়ে প্রকৃতি ও হৃদয়ের মর্মরিত হরিতের পথে—
অশ্রু রক্ত নিষ্ফলতা মরণের খণ্ড খণ্ড গ্লানি
তা হলেও রবে ; তবু আদি ব্যথা হবে কল্যাণী
জীবনের নব নব জলধারা—উজ্জ্বল জগতে।

দেশ। ১৩ কার্তিক ১৩৬১

আজ

কেবলই আরেক পথ খোঁজো তুমি ; আমি আজ খুঁজি নাকো আর ;
পেয়েছি অপার শূন্যে ধরবার মতো কিছু শেষে
আমারই হৃদয়ে মনে : বাংলার ত্রস্ত নীলিমার
নীচে ছোটো খোড়ো ঘর—বনঝিরি নদী চলে ভেসে

তার পাশে ; ঘোলা ফর্সা ঘূর্ণি জল অবিরল চেনা পরিজনের মতন ;
কখনও বা হয়ে আসে স্থির ;
মাঠ ধান পানবন মাছরাঙাদের আলোড়ন
আলিঙ্গন করে বিছিয়েছে তার নারীর শারীর।

ঘরে কোনো লোক নেই—কয়েকটি গ্রন্থ তবু আছে ;
রয়েছে পরম ছবি—চার জন-পাঁচ জন একান্ত শিল্পীর :
ফ্রান্সের ইটালির বাংলার কাঙড়ার ;—নিম জাম নাগেশ্বর গাছে
রয়েছে অগণ্য সব পাখিদের নীড়।

তবুও মনকে ঘিরে মহাজাগতিক আলোড়ন
আর এই পৃথিবীর অন্তহীন দ্বিধা দ্বেষ প্রেম সংগ্রাম
আমাদেরও রক্ত দিয়ে আদি রক্তবীজের নিধন
চেয়েছে—মিটিয়ে দেবে ষোলো আনা দাম।

এই শতকের দিন ক্ষয় হয়ে এল প্রায় আজ ;
নবীন আশার বার্তা নীল নিরালম্ব শূন্যে ভেসে
মানুষ যা চেয়েছিল সেই নারী সেই সূর্য আর সে সমাজ
দেবে—তার আত্মঘাতী রণাঙ্গন একদিন স্তব্ধ হলে শেষে।

আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৪ কার্তিক ১৩৬১

বৃক্ষ

মৃগতৃষ্ণার পিছে ধাবমান হাওয়া নয় আর ;
ইন্দ্রধনু ধরবার মতো মূঢ় মন ;
বিহ্বল আলোর পরে আসে যেই পতিত আঁধার ;
কেবলই অন্ন গ্রাস—শাশ্বত গ্রাসাচ্ছাদন ;—
আস্তে সরিয়ে রেখে, মুখ থেকে রক্তের ফেনা,
পায়ের নীচের থেকে ক্ষমতা-যশের মরুভূমি
ফেলে দিয়ে হে হৃদয়, কখন বসবে
কয়েক মুহূর্ত নীল শ্যামল বৃক্ষের নীচে তুমি ?
চারি দিকে ব্রহ্মাণ্ডের উজ্জ্বল আতপ :
অগ্নির অমৃতভাণ্ড বলে মনে হয় ;
অকূল আগুনে স্নান করে বৃক্ষ শান্ত স্নিগ্ধ সিদ্ধার্থ পল্লব :
হরিৎ সোনালি নীল সৌম্য তন্ময়।
আকাশকে নিরালম্ব করে দিয়ে বোমারু বিমান
উড়ে যায়—পুনরায় প্রাণসাগরের শত ভাষা
মর্মরিত হয়ে ওঠে ; কোনো কথা বলে দূর নীল ?
আর এই হরিতের কী মহাজিজ্ঞাসা।

রক্তাক্ত নদীর তীরে কালো পৃথিবীর
দাঁড়িয়ে রয়েছে মৌন বৃক্ষের একমুঠো আলো ;
সনাতন শূন্যের অন্বেষণে দিন-অনুদিন
যে সঞ্চিত মানবতা আজ প্রায় শূন্যে ফুরাল—
অনুভব ক'রে সব মানুষ তবুও
মৃত্তিকায় মূল রেখে—লক্ষ্য রেখে আদি নীলিমায়
শ্যামল গাছের থেকে অবিনাশ ধর্ম শিখবে
অথবা নশ্বর প্রেম ভালোবেসে বসবে ছায়ায় ?

চারি দিকে দ্রুত অন্ধ সাগরের ঝকঝকে হাসি ;
অনন্ত প্রবহমান রক্তক্ষরা জল ;
জীবনের জয়গান—মরণের যে লাবণ্যরাশি
দুলে ওঠে আকন্যাকুমারী হিমাচল :
সে সব অসত্য নয়, সত্য নয়, ফল নয়, নৈষ্ফল্য নয় ;
যতদিন রয়ে গেছে মানুষ ও মানুষের মন—
নিমিত্তের ভাগী হবে মানবের রক্তাক্ত হৃদয় ;
হরিতের কাছে এসে শুনবে অক্ষয় গুঞ্জরণ।

দেশ। ২৭ কার্তিক ১৩৬১

কুজ্‌ঝটিকায় আকাশ মলিন হয়ে

কুজ্‌ঝটিকায় আকাশ মলিন হয়ে থাকে কী যে !
ঘুচিয়ে দিয়ে দিক্‌নিরূপক সূর্য আসে নিজে,
যা হয়েছে : হয়েছে ; সেই পৃথিবীকে অন্ধকারে পিছন দিকে ফেলে
মানববিমূঢ়তাকে লাল দেশলাইয়েতে জ্বেলে
এসেছে সে আরেক ভোরের পটভূমির দিকে।
সারাটা দিন মাছরাঙা আর জলের ঝিলিকে
সূর্য আছে টের পেয়েছি—সংকল্প সুর তাই
গভীর হল ;
নীলকণ্ঠ পাখির গুঞ্জরণে সর্বদাই
মহাদেবের কণ্ঠজ্বালা ফুরিয়ে গেছে তবে
ভেবেছিলাম ;
কত অশোকস্তম্ভ বুদ্ধ আনল আলো—কত না ইয়োরোপের বিপ্লবে
মানব-আশা ক্ষণিক জেগে বিনিপাতের শ্লেষে
ফুরিয়ে গেল, তবুও সূর্যকরোজ্জ্বলতাকে ভালোবেসে

পৃথিবী তার নতুন নতুন ক্ষয় ব্যথা ভুল ভাণে
পিছন থেকে সারাটা দিন ডোডো পাখির টানে
শূন্য হয়ে যেতে যেতে তবুও সকল সাধারণের তরে
আবার নতুন আশাজনক সমাজ আকাশ গড়ে ;
জেনেছিলাম।
তোমাকে আমি দেখেছিলাম বেবিলনের ছাদে
না দাঁড়াতেই ইন্দ্রপ্রস্থে ভোরের সূর্যস্বাদে
আমার পানে তাকিয়ে আছো।
অনেক দিনের মানবইতিহাসের পটভূমি
শেষ করে এক নিকটতর ভোরের আলোয় তুমি
এখুনি ছিলে ;
নিমেষে তবু নীল আকাশে পালকে পাখি আলোক ঠিকরিয়ে
কখন হঠাৎ চলে গেছে সূর্য সঙ্গে নিয়ে
জানি না কোন্ নিকেতনের দিকে
অন্ধকারে ফেলে গেছে মানবপৃথিবীকে।
ইতিহাসের নতুনতর এ আঁধারে অকূল মরুভূমি
তেমনই আজও ছড়িয়ে আছে—শববহন তেমনই অপার—তুমি
তেমনই অসীম শবের প্রাবরণী খুলে ধীরে
অন্তবিহীন মৃত্যুকে আজ বারে বারে ঢাকছ শিশিরে,
করুণাময় শান্ত মৃত্তিকায়।
মৃত্যু ছাড়া কী আর আসে যায়,
কী আর আছে অপরিসীম শববহন ছাড়া
অন্ধকারে অনন্ত কাল অনুগমন করে গেছে যারা
    মৃতের জগৎ—জীবন পাবে বলে,
    রাতের আকাশ—আলোর অন্বেষণে,
আমরা সে সব প্রবহমান ইতিহাসের মনে
প্রথম সূত্রপাতে জ'ন্মে তবুও চিরদিন

দেখেছি প্রেমিক গণিকাদের নিকট থেকে ঋণ
খাচ্ছে শুধু, অনেক মহৎ মর্ম রীতি প্রতিশ্রুতিক্ষয়
হতে দেখে বুঝেছি তবু সত্য আছে অন্য অর্থময় ;
আশার—ভালোবাসার—সেবার—জানার ;
এ বেদ ছেড়ে ভালো জীবনবেদে—অন্য আলোর স্পন্দনে
চলে যাবার অপার সেতু আছে মানবমনে।

ক্রান্তি। কার্তিক ১৩৬১

অন্য প্রেমিককে

মাছরাঙা চলে গেছে—আজ নয়, কবেকার কথা ;
তারপর বারবার ফিরে এসে দৃশ্যে উজ্জ্বল।
দিতে চেয়ে মানুষের অবহেলা উপেক্ষায় হয়ে গেছে ক্ষয় ;
বেদনা পেয়েছে তবু মানুষের নিজেরও হৃদয়
প্রকৃতির অনির্বচনীয় সব চিহ্ন থেকে দু চোখ ফিরিয়ে ;
বুদ্ধি আর লালসার সাধনাকে সব চেয়ে বড়ো ভেবে নিয়ে।

মাছরাঙা চলে গেছে—আজ নয়, কবেকার কথা ;
তারপর বারবার ফিরে এসে ডানাপালকের উজ্জ্বলতা
ক্ষয় করে তারপর হয়ে গেছে ক্ষয়।
মাছরাঙা মানুষের মতো সূর্য নয় ?
কাজ করে কথা ব'লে চিন্তা করে চলেছে মানব ;
যদিও সে শ্রেষ্ঠ চিন্তা সারাদিন চিন্তানাশা সাগরের জলে
ডুবে গিয়ে নিঃশব্দতা ছাড়া আর অন্য কিছু বলে ?

দেশ। ৯ পৌষ ১৩৬১

অন্য এক প্রেমিককে

মাথার উপর দিয়ে কার্তিকের মেঘ ভেসে যায় ;
দুই-পা স্নিগ্ধ করে প্রান্তরের ঘাস ;
উঁচু উঁচু গাছের অস্পষ্ট কথা কী যেন অন্তিম সূত্র নিয়ে,
বাকিটুকু অবিরল গাছের বাতাস।

চিলের ডানার থেকে ঠিকরিয়ে রোদ
চুমোর মতন চুপে মানুষের চোখে এসে পড়ে ;
শত টুকরোর মতো ভেঙে সূর্য ক্রমে আরো স্থির—
স্থিরতর হতে চায় নদীর ভিতরে।

লাল নীল হলদে শাদা কমলা পালকের
মাছরাঙা চিহ্ন হয়ে চুপে উড়ে এসে
দুই অন্ধ সমুদ্রের মাঝখানে কতটুকু রৌদ্রবিন্দু আছে
দেখাতে চেয়েছে ভালোবেসে।

সমস্ত সন্দেহ থেকে হৃদয়কে সরিয়ে এবার
শান্ত স্থির পরিষ্কার করে
চেয়ে দেখি মাছরাঙা সূর্য নিভে গেছে ;
অন্য প্রেমিককে পাবে অন্য এক ভোরে।

দেশ। ৯ পৌষ ১৩৬১

এক অন্ধকার থেকে এসে

এক অন্ধকার থেকে এসে
অন্য এক আঁধারের দিকে

মুখ ফেরাবার আগে—
কয়েক মুহূর্ত কথা কাজ চিন্তা রয়েছে এ জীবনের
দেখেছি সূর্যের আলো, নিয়নবাতির বিচ্ছুরণ,
অন্ধকার অজন্মা প্রান্তর, মৃত অর্ধমৃত নগর বন্দর,
শোকাবহ আলো শব্দ শেল,
ক্লান্তিহীন ক্রেন্ এরিয়েল,
(নীলিমায় এরোপ্লেন হেলিকোপ্টারের
এঞ্জিনের
অনুরণনের
আর-এক রকম সুর ;)
হেমন্তের মধ্যরাতে
দক্ষিণসাগরগামী হরিয়াল বুনো হাঁসদের
রাশি রাশি কালো বিদ্যুতের বিন্দু,
ডানার ঝাপসা গুঞ্জরণ
—দেখেছি জেনেছি অনেক দিন—
মানুষের সাথে
মিলন বা অমিলের কঠিন রহস্যসুতো নিয়ে
সময়ের অজ্ঞেয় সাগরতীরে গিয়ে
ধীরে ধীরে হৃদয়ের ক্ষয়
দেখেছি মানবদের ইতিহাসে বারবার হয়।
মনে হয় যেন মানুষের মন তবু কোথাকার
দুই কালো বালুতীর ভেদ করে ফেলে
চলেছে নদীর মতো—
চারি দিকে জনতার সকাতর কোলাহল—
ঘর বাড়ি সাঁকো।
পাখির ও মানুষের করুণ পায়ের চিহ্ন
পায়ের কৃচ্ছ্রের চিহ্ন সব—

মুছে ফেলে বুঝি অনাদির শাদা-কালো
নির্দোষ আলো আর অন্ধকার আবার সঞ্চয় ক'রে মন
জ্ঞানপাপ মুছে ফেলে হতে চায় স্নিগ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের মতন।

কবিতা। পৌষ ১৩৬১

তোমায় আমি দেখেছিলাম

তোমায় আমি দেখেছিলাম ঢের
শাদা কালো রঙের সাগরের
কিনারে এক দেশে
রাতের শেষে—দিনের বেলার শেষে।

এখন তোমায় দেখি না তবু আর
সাতটি সাগর তেরো নদীর পার
যেখানে আছে পাঁচটি মরুভূমি
তার ওপারে গেছ কি চ'লে তুমি
ঘাসের শান্তি শিশির ভালোবেসে !

বটের পাতায় কে কার নাম লিখে
(গভীরভাবে) ভালোবেসেছিল সে নামটিকে
হরির নাম নয় সে আমি জানি,
জল ভাসে আর সময় ভাসে—বটের পাতাখানি
আর সে নারী কোথায় গেছে ভেসে।

কবিতা। পৌষ ১৩৬১

ঘড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত ধীরে

ঘড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত ধীরে
আমাদের দু জনকে নিতে চায় যেই শব্দহীন মাটি ঘাসে
সাহস সংকল্প প্রেম আমাদের কোনোদিন সেদিকে যাবে না
তবুও পায়ের চিহ্ন সেদিকেই চলে যায় কী গভীর সহজ অভ্যাসে।

কবিতা। পৌষ ১৩৬১

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সব চেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা ;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই, প্রীতি নেই, করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজও মানুষের প্রতি,
এখনও যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

কবিতা। পৌষ ১৩৬১

দু দিকে ছড়িয়ে আছে দুই কালো সাগরের ঢেউ

দু দিকে ছড়িয়ে আছে দুই কালো সাগরের ঢেউ
মাঝখানে আজ এই সময়ের ক্ষণিকের আলো,
যে নারীর মতো এই পৃথিবীতে কোনোদিন কেউ
নেই আর—সে এসে মনকে নীল—রৌদ্রনীল শ্যামলে ছড়াল।

ভুলে গেছি পটভূমি—ভুলে গেছি কে যে সেই নারী—
আজকে হারিয়ে গেছে সব ;
চারিদিকে গুঞ্জরিত হয়েছিল কী সব গভীর পল্লব
যখনই আমার আত্মা বৃক্ষ আর আগুনের মতো নভোচারী
হয়ে ওঠে—মনে হয় যেন কোন্ হরিতের—নব হরিতের
সংগীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে মানুষের ভাষা
হৃদয়ের আরো দূর জন্ম-জন্মান্তরে মুখোমুখি ফিরে এসে অনাদি আলোর
ভালোবাসা
সামাজিক অন্তহীন আকাশের নীচে
জ্বালিয়ে শ্যামলনীল ব্যথা হতে চায়।
আমি সেই মহাতরু—লাবণ্যসাগর থেকে নিজে
জাগিয়েছ তুমি অনাদির সূর্যনীলিমায়
পৃথিবীর ভয়াবহ কোলাহল ভেদ করে অবিনাশ স্বর
আনন্দের আলোকের অন্ধকার বিহ্বলতায়
অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্যসাগর।

কবিতা। পৌষ ১৩৬১

রক্ত নদীর তীরে

রক্ত নদীর তীরে কালো পৃথিবীর
দাঁড়িয়ে রয়েছে মৌন বৃক্ষের একমুঠো আলো
সনাতন শূন্যের অন্বেষণে দিন অনুদিন
মানুষের যে সঞ্চিত মানবতা আজ প্রায় শূন্যে ফুরালো।
অনুভব করে সব মানুষ...
মৃত্তিকায় মূল রেখে—লক্ষ্য রেখে আদি নীলিমায়
সহজ গাছের স্থির প্রতিচ্ছবি হবে—
শ্যামল গাছের থেকে অবিনাশ ধর্ম শিখবে

অথবা নশ্বর ধর্ম ভালোবেসে বসবে ছায়ায় ?
চারি দিকে অন্ধ দ্রুত সাগরের উজ্জ্বল হাসি
অনন্ত প্রবহমান রক্ত আর জল
জীবনের জয়গান—মরণের যে লাবণ্যরাশি
দুলে ওঠে আকন্যাকুমারীহিমাচল
সেসব অসত্য নয় সত্য নয়—ফল নয় নৈষ্ফল্য নয়—
যতদিন রয়ে গেছে মানব ও মানবের মন
নিমিত্তের ভাগী হয়ে মানুষের রক্তাক্ত হৃদয়
হরিতের কাছে এসে শিখবে অক্ষয় গুঞ্জরণ।

কবিতা। পৌষ ১৩৬১

কেন মিছে নক্ষত্রেরা

কেন মিছে নক্ষত্রেরা আসে আর ? কেন মিছে জেগে ওঠে নীলাভ আকাশ ?
কেন চাঁদ ভেসে ওঠে : সোনার ময়ূরপঙ্খী অশ্বত্থের শাখার পিছনে ?
কেন ধুলো সোঁদা গন্ধে ভরে ওঠে শিশিরের চুমো খেয়ে—গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটে ওঠে কাশ ?
খঞ্জনারা কেন নাচে ? বুলবুলি দুর্গাটুনটুনি কেন ওড়াউড়ি করে বনে বনে ?
আমরা যে কমিশন নিয়ে ব্যস্ত—ঘাঁটি বাঁধি—ভালোবাসি নগর ও বন্দরের শ্বাস—
ঘাস যে বুটের নীচে ঘাস শুধু—আর কিছু নয় আহা—মোটর যে
সব চেয়ে বড়ো এই মানবজীবনে—
খঞ্জনারা নাচে কেন তবে আর—ফিঙা বুলবুলি কেন ওড়াউড়ি করে বনে বনে ?

আনন্দবাজার পত্রিকা। বার্ষিক সংখ্যা ১৩৬১

উপলব্ধি

যা পেয়েছি সে সবের চেয়ে আরো স্থির দিন পৃথিবীতে আসে ;
আসে না কি ?
চারি দিকে হিংসা দ্বেষ কলহ রয়েছে ;

সময়ের হাত এসে সে সবের অমলিন, মলিন প্রেরণা
তবুও তো মুছে দিয়ে যেতে পারে—ভাবি।
সেই আদিকাল থেকে আজকের মুহূর্ত অবধি
মানুষের কাহিনীর যত দূর অগ্রসর হয়ে গেছে তাতে
প্রান্তে ঠেলে দেখেছি কেবলই :
মলিন বালির দান নিয়ে তার মরুভূমি সূর্যের কিরণে দাঁড়াতে
শিখেছে অনেক দিন ;
তবুও তো
মানুষের কাছে মানুষের দাবি রয়ে গেছে মনে ভেবে হৃদয়ে কুয়াশা
করুণ প্রশ্নের মতো লেখা করে গেছে ঢের দিন।
আমাদের পায়ে চলা পথ ঘিরে অব্যক্ত ব্যথার
কবেকার নচিকেতা—আজকের মানুষের হাড়
প্রাণের সমুদ্রে সুরে ফেনশীর্ষ ঢেউয়ের উপরে
সূর্যের দিগন্তে দেশে আমাদের তুলে নিতে চায় ;
নিঃসহায় ডুবুরির মতো ডুবে মরে ;
সমুদ্রপাখির শাদা, বিরহীর মতন ডানায়
সেই শূন্য অন্ধকার দিকের ভিতরে
আমাদের ইতিহাস পিরামিড ভেঙে ফেলে—
লন্ডন—ক্রেমলিন গড়ে।

কেবলই আশঙ্কা, ব্যথা নিরাশার সম্মুখীন হয়ে
মানুষের মরণের সমুদ্রের ঢেউ
রূপান্তরিত করে নিতে চেয়ে মানুষের জীবনের সুর
জেনেছে কোথাও ভয় নেই—নেই—নেই।
তবুও কোথাও ধর্মমন্দিরের অভয়পাণির সফলতা
আবার ভোরের সূর্যে সমুখে রবে না কোনো দিন।

কবের প্রথম অবপ্রাণনায় জেগে
শাদা পাতা খুলেছিল যারা,
গল্প লিখে গিয়েছিল ঢের,
আদি রৌদ্র দেখেছিল,
সিন্ধুর কল্লোল শুনে গিয়েছিল ঢের, দিয়ে গিয়েছিল,
আকাশের মুখোমুখি অন্য-এক আকাশের মতো যারা নীল হয়ে
রাত্রি হয়ে নক্ষত্রের মতো হয়ে মিশে গিয়েছিল :
তারা আর তাদের মরণ আজ আমাদের
পায়ের পথের নীচে যতদূর ভুল
তাহাদের অস্তসূর্য ততদূর আমাদের উদয়ের মতন অরুণ ;
শ্বেতাশ্বতর থেকে দীপঙ্কর অবধি সবই সাদা স্বাভাবিক
মনে হয় বলে মৃত স্বভাবের মতন করুণ।
বিকেলের ক্ষয়ের ভিতরে এসে আজ তবে আমাদের দিন
অনিবার ইতিহাস-অঙ্গারের প্রতিভাকে সঞ্চরের মতো মনে ভেবে
মরণকে যা দেবার—জীবনকে যা দেবার সব
কঠিন উৎসবে—দীন অন্তঃকরণে দিয়ে দেবে।

উত্তরসূরি। পৌষ-ফাল্গুন ১৩৬১

সময় মুছিয়া ফেলে সব এসে

সময় মুছিয়া ফেলে সব এসে,
সময়ের হাত
সৌন্দর্যেরে করে না আঘাত।
মানুষের মনে
যে সৌন্দর্য জন্ম লয়—শুকনো পাতার মতো ঝরে নাকো বনে,
ঝরে নাকো বনে।
নক্ষত্রও মুছে যায়—মুছে যায়—পৃথিবীর পুরাতন পথ

শেষ হয়—কমলার ফুল, বন, বনের পর্বত ;
মানুষের মনে
যে সৌন্দর্য জন্ম লয়—শুকনো পাতার মতো ঝরে নাকো বনে,
ঝরে নাকো বনে।

ময়ূখ। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২

ঐখানে সারা দিন

ঐখানে সারা দিন উঁচু ঝাউবন খেলা করে
হলদে সবুজ নীল রঙ তার বুকে :
পাখি মেঘ রৌদ্রের ;
তবু আজও হৃদয়ের গভীর অসুখে

মানবেরা পড়ে আছে কেন।
আজ অন্ধ শতাব্দীর শতচ্ছিদ্রতার
ভিতরে আলোর খোঁজে যদি চলে যায়
তবুও শাশ্বত হয়ে থাকে অন্ধকার।

নতুন যুগের জন্য তবুও প্রয়াণ করা ভালো।
চিতল হরিণ ঐ শিঙ তুলে ফিঙে জ্যোৎস্নায়
হরিণীকে খুঁজে তবু পাবে না কখনও ;
ব্যাঘ্রযুগে শুধু মৃত হরিণীর মাংস পাওয়া যায়।

ময়ূখ। পৌষ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১-১৩৬২

এল—বৃষ্টি বুঝি এল—

এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
পায়রাগুলো উড়ে যায় কার্নিশের দিকে এলোমেলো।

এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
ছেলেদের খেলা মাঠে মুহূর্তেই সাঙ্গ হয়ে গেল—
এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
ছিপ ফেলে বাথানের দিকে ঐ চলে যায় কেলো—
এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
'জল ধরে গেলে মাসি, তারপর কাঁথাগুলো মেলো—'
এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
'গেল গেল আমসত্ত্ব—পোড়ামুখো বৃষ্টি সব খেল—'
এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
'হরির মা কতগুলো ডাঁটো আম পেল?'
এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
(তবু সে ঘুমায় মাঠে) সমাধির 'পরে তার খড়কুটো ওড়ে এলোমেলো—

ময়ূখ। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২

জানি না কোথায় তুমি

জানি না কোথায় তুমি—শরের ভিতরে সন্ধ্যা যেই আসে—
নদীটি যখন শান্ত হয়,
যখন কাঁদে না আর শঙ্খচিল—(একা চুপে উড়ে যায়)—
ঝিঁঝিঁগুলো চুপ করে রয়,
তখন তোমার মুখ—তোমার মুখের রূপ—আমার হৃদয়ে এসে
ভিজে গন্ধে চাঁপার মতন
ফুটে থাকে; শঙ্খচিল তালবনে ডুবে গেছে—নরম সন্ধ্যার রঙে
নীল হয়ে আছে শরবন।

ময়ূখ। আশ্বিন ১৩৬২

মহাযুদ্ধ শেষ হয়েগেছে

মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে—
তবুও রয়েছে মহাসমরের তিমির
আমাদের আকাশ আলো সমাজ আত্মা আচ্ছন্ন করে।
প্রতিনিয়তই অনুভব করে নিতে হয় আলো : অন্ধকার,
আকাশ : শূন্যতা, সমাজ : অঙ্গার,
জীবন : মৃত্যু, প্রেম : রক্তঝর্না ;—জ্ঞান
এই সবের অপরিমেয় শববাহন শুধু, নিজেকেও বহন করছে।

এসো রাত্রি, আলোর সহোদরা তুমি,
মুমূর্ষু আলোর ভীষণতাকে তোমার শান্তি-নিঃশব্দতার ভিতর গ্রহণ করবার জন্য
শোনো পৃথিবী, এই রাত্রির শীত, সফল বিসরণ ;
এসো মৃত্যু, রাত্রির সহোদরা তুমি,
সময়ের এই অসৎ স্বাক্ষরিত অস্পষ্টতাকে নিঃশেষ করবার জন্যে।
যে আদি আচ্ছন্নতার থেকে এসেছিল—
মিশে যাক সে অনাদির বাষ্পলোকে ;
যে জীবন নয় সে মৃত্যুর নিস্তব্ধ অন্ধকারে
নির্মম পবিত্রতায় লীন হোক, নিত্য হোক, অনিমেষ হয়ে উঠুক ;
হে জীবন, এইসব ভীষণতা অনুভব করে
সূর্য নক্ষত্র কল্যাণে উৎসারিত জলস্ফুলিঙ্গ হয়ে ওঠো তুমি ;
ওপরের সেতু হও,
সেতুলোকে মানব—
সাহস, আলোক, প্রেমপ্রতিভা, প্রাণ।

দেশ। শারদীয় ১৩৬২

পরস্পর

নারী : পুরুষকে

এ আলো নিভে যাবে,
এখুনি রোদ মৌমাছি নীল আকাশ ফুরাবে।
মাছরাঙাদের অবাক ঝিলিমিলি
খুঁজবে কাকে কতক্ষণ আর নদীর জলের মাছে,
মুখের কথা না ফুরতেই মাছরাঙা নেই
সমস্ত দিন শূন্য হয়ে আছে।

পুরুষ : নারীকে

রাতের আলো দিনের আলো—এ আলো ফুরাবে।
ভালো মানুষ খারাপ মানুষ—সকলই মরে যাবে।
সে-ঘুম এলে খারাপ ভালো কে আর কাকে বাছে।
নারি, তোমার চোখে তো সেই ঘুম জড়িয়ে আছে।

কারা কবে

কারা কবে কথা বলেছিল।
ভালোবেসে এসেছিল কাছে,
তারা নেই, তাদের প্রতীক হয়ে তবু
প্রাচীন কয়েকটি গাছ আছে ;

নক্ষত্রেরা রয়ে গেছে নদীর ওপরে
চারি দিকে প্রান্তর ও ঘাস,
দু-চারটে ঘরবাড়ি নীড় ও শিশির
কূলে কূলে একলা আকাশ।

তারা ছিল, তারা কেউ নেই ;
মনে ক'রে জীবন তবুও তার নিবিড় বিনয়ে
নিজেকে আগুনে ক্ষয় ক'রে জেগে থাকে
স্থির, আরো স্থির আলোকের মতো হয়ে।

অধুনা : সংকলন ১৩৬২

শান্তি ভালো

গুলি খেয়ে শূন্যে মৃত্যু হবার আগে পাখি
যেমন তাহার সুস্থ দেহের পাখিনীকে দেখে
কামের পরিতৃপ্তি খুঁজে আকাশে উড়ে যায়
অন্ধকারে পাখিশরীর ছেড়ে দিতে শেখে
অবাধগতি ঢিলের মতন ঘাস-পাথরের পানে ;
তেমনই আলো-অন্ধকারের মরণ-জীবনের
মোহানা থেকে তোমাকে ভালোবেসে
শান্তি ভালো : শান্তি ভালো, উড়েছি আমি ঢের।

অনেক পথ চলা হল—তবুও আমি আজও
পেয়েছি যা, চেয়েছি সেই চক্রবালের রেখা ?
সাত-আট বছর পরে আবার বনচ্ছবির সাথে
শীত সামাজিক রাত্তিরে আজ দেখা।
জীবন আমার সমাহিত অনেক দিনের থেকে ;
নদী মাঠে ঘাসে শিশিরবিন্দুতে উৎসুক
হয়ে হৃদয় সফলতায় দিন বা রাত্রি এলে
বলেছে : এই স্পষ্ট শান্ত প্রবাহ আসুক।

নারীরা আসে, হারিয়ে যায়—ধীর জগতের সাথে
জেগে থেকে পেয়েছি আমি বিষয়স্থিরতা
কিছু ভাষা পৃথিবীকে দেবার—বাকি সবই
নিহিত হয়ে বসে থেকে গ্রহণ করার কথা
নদী শিশির সূর্য বৃক্ষ থেকে,
চারি দিকে আকাশ ভরে হয়েছে উদয়
সকল কালের বার্তাবহ নক্ষত্রদের আভা
ব্যর্থ হয়ে তবুও মানব গল্প স্নিগ্ধ হয়।

আনন্দবাজার পত্রিকা। শারদীয় ১৩৬২

কবি

কবিকে দেখে এলাম,
দেখে এলাম কবিকে
আনন্দের কবিতা একাদিক্রমে লিখে চলেছে
তবুও পয়সা রোজগার করবার দরকার আছে তার
কেউ উইল করে কিছু রেখে যায় নি,
চাকরি নেই
ব্যবসার মারপ্যাঁচ বোঝে না সে
'শেয়ার মার্কেটে নামলে কেমন হয়', জিজ্ঞেস করলে আমাকে,
হায়, আমাকে !
'লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের এজেন্সি নিলে হয় না', শুধায়,
'লটারির টিকিট কিনলে কেমন হয় ? ডার্বি নয় আইরিশ সুইপ
নয়—গোয়ার কিংবা বউবাজারের ?'—এই ব'লে
শীতের সকালে চামসে চাদরখানা ভালো করে জড়িয়ে নেয় গায়,
ঘড়ি ঘড়ি মুখে একবার হাত বুলায়
মাজনহীন হলদে দাঁত কেলিয়ে একবার হাসে,

মাইনাস-এইট্ লেন্সের ভিতর আধমরা চুনো মাছের মতো দুটো চোখ :
     বেঁচে আছে ? না ম'রে ?
কোনো দিন যৌবনের স্বাদ পেয়েছিল ? পায় নি ?
মরুশ্বেত দুটো চুনো মাছ চোখের বদলে কাজ করছে যেন,
মরণোন্মুখ ট্যাংরা,
পৃথিবীর থেকে আনন্দ সংগ্রহ করছে,
সবাইকে ভরসার কথা শোনাচ্ছে,
ভালোবাসার জয়গান করছে—
হলদে দাঁতের ভিতর থেকে পিত্তের দুর্গন্ধ,
বিড়ি হচ্ছে খোরাক,
লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের এজেন্ট কিছুতেই সে হতে পারবে না
একহাজার আরব রজনী ঘুরেও একহাজার টাকার কেস্ সে
     দিতে পারবে না ওরিয়েন্টালকে কিংবা হিন্দুস্থানকে
জীবন এইটুকু চমৎকার টনক রয়েছে তার,
কম নয়।
আনন্দবাজারে একটা কাজ জুটিয়ে দাও তাকে ;
কিন্তু তাতেও সুবিধা হবে কি !
তাকে কেউ কিছু উইল করে গেলে পরেও
তা হলে
চশমার পাথর মুছে নিয়ে
শীতের প্রকোপ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য চামসে চাদর গায়ে জড়িয়ে
নির্বিবাদে কবিতা লিখে যেতে পারত সে
আনন্দের কবিতা,
হয়তো প্রফিল্যাকটিক টুথব্রাশও একটা কিনতে পারত
আর ফরহান্ টুথপেস্ট—
দাঁত ও মাড়ি সুন্দর, শক্ত হত তার,
হ্যালিটোসিস থাকত না

থাকত না ডিস্‌পেপসিয়া
পেটের গ্যাস
স্টেপ্‌টোকোকাস
তেলচিটে ঘেমো ভ্যাপসা চারদটা প্রাণ পেত
কিন্তু থাক—কবিতার সঙ্গে এ সবের কী সম্পর্ক
বিশেষত আনন্দের কবিতার সঙ্গে—
কবিকে দেখে আমরা কী করব ?
পড়ব তার আনন্দের কবিতা—কবিতার বই
আর্ট পেপারে আর্ট প্রেসে ছাপা হয়
অনির্বচনীয় কভার
কখনও বা অন্ধকারিক, নাক্ষত্রিক, কখনও বা প্রান্তরের বটের গুঁড়ির ফাঁকে
জ্যোৎস্নার মতো—জ্যোৎস্নার প্রেতাত্মার মতো ;
ডিমাই সাইজ ; একটার পর একটা বেরোয়
ফী পুজোর মরশুমে
কিংবা বড়োদিনের গুলজারের সময়
হাতে করে গভীর সান্ত্বনা পাই—
অবাক হয়ে ভাবি : কবি কিছু পয়সা পেল ?
পেল না হয়তো
কিন্তু উপন্যাস লিখে পায়—
যাক, এসো আমরা তার কবিতা পড়ি
অজস্র আশাপ্রদ কবিতা
টইটুম্বুর জীবনের স্লট-মেশিনে তৈরি
এক-একটা গোল্ডফ্লেক সিগারেটের মতো।

উত্তরসূরি। কার্তিক-পৌষ ১৩৬২

চারি দিকে পৃথিবীর

চারি দিকে পৃথিবীর উৎসে জল ঝরে ;
রোদ্দুরে শঙ্খচিল মাছি
উড়ে যায়, মনে হয় যেন
নীল আকাশের কাছাকাছি।

যেন এ জীবনে আবছা স্তম্ভ সৃষ্টি আর
ভুল গ্লানি হিংসা চালানির প্রয়োজন
ফুরিয়ে গিয়েছে বলে এ হৃদয় নব জলধারা :
নীলিমার রৌদ্রের মতন।

উজ্জ্বল চিহ্নের মতো উড়ে
হংসী রোদে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার,
সম্মুখে অমেয় শুক্ল শূন্যে রয়েছে
প্রেম আর জল্পনার ডানা ছড়াবার।

আমরা দুজনে যেন সৃষ্টির প্রথম
অন্ধ রাত্রি ছেদ করে শাদা আর কালো
যে-নদী মৃত্যুর গন্ধ বুকে গিয়ে এসেছিল তার
ক্লান্ত তৎপরতার চেয়ে অন্য আলো—অন্য এক আলো।

আনন্দবাজার পত্রিকা। বার্ষিক সংখ্যা ১৩৬২

ভোরের কবি জ্যোতির কবি

ভোরের কবি জ্যোতির কবি গায় :
ভোরের হাওয়া, আলোর হাওয়া
আলোর হাওয়া, আলোর হাওয়া

নারীর মতন প্রেমিককে তার প্রাণের ইশারায়
সূর্যে উৎসারিত চাতক অবিনাশী চিলকে জাগায়,
জাগায়, জাগায় !
শিবের কণ্ঠ নীলকণ্ঠ বিহঙ্গমের অসীম নীলায়
মিলায়, মিলায় !

গাঢ় নীলে রৌদ্রসাগর অগ্নিশাদা ডানায় জ্যোতির্ময়,
নভোনীলের আলোয় মনোনীলিমা জেগে রয়।

ভোরের কবি জ্যোতির কবি গায় :
নতুন দিনের আলোর গতি প্রেমের চেয়েও সাহসিকা,
জ্ঞানের চেয়েও বৃহৎ করুণায় ;
মুক্ত পুরুষ পুরাণপুরুষ সময়পুরুষ—
মানবতার সূর্যপুরুষ চায় !
ইতিহাসের অন্তে নবীন ইতিহাসের ক্রান্তিনীলিমায়
ভোরের কবি জ্যোতির কবি গায়।

চতুরঙ্গ। চৈত্র ১৩৬২

সুন্দরবনের গল্প

ভোরের নদীর জলে হরিণ নামল
কাল সারা রাত বাঘিনী ছিল তার পিছু পিছু
কাল সমস্ত জ্যোৎস্নার রাত সুন্দরী চিতাবাঘিনী এই হরিণের ছায়ার পিছনে ছুটেছে
বাতাসের পায়ের মতো এর ছায়ার পিছনে
ছুটেছে কামনার মতো
গহন রূপের আঘাতে যে রক্তিম কামনার জন্ম হয়
হিংসা নয়—

কাল রাতে চিতাবাঘিনী হরিণের মুখের রূপে ফেনিল হয়ে উঠেছিল
কাল চৈত্রের জ্যোৎস্নায়
রুপালি শিশির বেগুনি ছায়ার দেশে
জাফরিকাটা জানালার রাজ্যে
সবুজ জাফরান রঙের বাতাসের উষ্ণতায়
প্রান্তরে প্রান্তরে চাঁদের আলোর কমলা বর্ণের মদিরার ভিতর
এরা দুজনে অরণ্যের স্বপ্ন তৈরি করেছিল কাল
এই হরিণ—এই চিতা—
জ্যোৎস্নার কোমল স্নায়ু এদের শরীরকে বানিয়েছিল ছবি
অপরূপ নারীর ছবি এঁকেছিল এই বাঘিনীর দেহ দিয়ে
ছুটেছে হাওয়ার মতো তার (ঈপ্সিত) তরুণের পিছে
আঁকাবাঁকা ডালপালা এদের শরীরের উপর চেককাটা কার্পেট বুনে চলেছে
দ্রুত গতিতে
সবুজ পাতার অজস্র দেয়াল
জানালার মতো ফাঁক হয়ে যাচ্ছে
চৈত্রের বাতাসে
অন্ধকার সুড়ঙের মতো নীল হয়ে যাচ্ছে আবার
যেন মেহগিনির গহন ঘন ছায়ায়
হয়ে যাচ্ছে মেহগিনি কাঠের হরিণ
নীল দারুময়ী বাঘিনী
অন্ধকার রাত্রি ঘিরে
নিরাকুল সমুদ্রের মতো
পাহাড়ের গুহায় গুহায় আবেগে স্ফীত হয়ে উঠছে

রুপালি চাঁদের আলোর ফোয়ারায়
হাওয়ার ফোয়ারায়
রাশি-রাশি কাঞ্চন ফুলের মতো ফুটে উঠছে এদের দেহ আরেকবার

ছুটেছে ফিটকিরির ঝর্নার মতো
নীল ছায়ার পর্দার ভিতর হারিয়ে গিয়ে
ছায়ার ভিতর থেকে হীরের মতো জ্যোৎস্নাকে খুঁড়ে বার করে
অন্ধকারকে তম্বুরার মতো বাজিয়ে বাজিয়ে
বাতাসকে তরমুজের মতো ছিঁড়ে ছিঁড়ে
চাঁদকে একবার খুঁজে পেয়েছে এরা
একবার হারিয়ে ফেলেছে।

চতুরঙ্গ। চৈত্র ১৩৬২

আশার আস্থার আধার নিজেই মানুষ

এ পৃথিবী বড়ো, তবু তার চেয়ে ঢের বেশি এই
সময়ের ঢেউগুলো—অনিঃশেষ সমুদ্রের থেকে
অন্তহীন সাগরের অভিমুখে কোথায় চলেছে।
রাত্রি আসে—রাত্রি শেষ হয়ে গেলে আলো ;
আলো আরো মৃদু হলে তার চেয়ে বেশি
স্নিগ্ধ অন্ধকার সব—আকাঙ্ক্ষিত মেয়েটির হাতের মতন
কাছে এসে সংবরণ ক'রে তবু, যেন নেপথ্যের
ওপারের থেকে তার কথা বলে।

অগাধ আয়ুর শিশু এরা সব : এই দিন, এই রাত্রি,
বাতাসের আসাযাওয়া, নীল নক্ষত্রের ফুটে ওঠা,
শিশির ঝরার শব্দ, আশ্চর্য পাখির
ডিম প্রসবের সাড়া, আবার রোদের দিন মাঘ-ফাল্গুনের ;
সহসা বৃষ্টির রাত্রি, হেমন্তের ঠাণ্ডা নিঃশব্দতা ;
কবের আয়ুব শিশু এরা সব—ম্যামথ দেখেছে।

শতাব্দীর সন্ধিপথে আজ মানুষের
আধো-আলো আধো-আশা অপরূপ অধঃপতনের
অন্ধকারে অবহিত অন্তর্যামীদের মতন ভোরের সূর্য ;
দূরতর সমুদ্রের হাওয়া এসে ছুঁয়ে কিছু ভালো বলে যেতে চায় ;
নগরীর বিদগ্ধ লোকেরা কথা ভেবে, ব'লে
প্রেরণা জাগাতে চায় ;
সহজ ত্যাগীরা কাজ করে ;
রক্তে দেশ অন্ধকার হয়ে পড়ে ;
কথা ভাষা স্বপ্ন সাধ সংকল্পের ব্যবহারে
মানুষেরা মানুষের প্রিয়তর না হয়ে শুধু দূরতর হয় ;
হৃদয় মলিন হয়ে যেতে থাকে ;
নিয়ন্ত্রিত জ্ঞানেরও আকাশ ঢেকে কুয়াশা বাড়ছে ;
মুক্ত হতে গিয়ে সুধী কেবলই রোমাঞ্চকর রূঢ় সায়েন্সের
জন্ম দেয় ; চারি দিকে অগণন মানুষের মৃত্যু তার বড়ো কাহিনীর
যবনিকাপতনের প্রাক্কালে ক্লান্তির মতো ;
এখন শতাব্দী অন্ধ—অবসন্ন—ব্যর্থ।—
হয়তো এ পৃথিবীতে মানবের অনন্ত চারণ
লোভ থেকে লোভে শুধু—ব্যথা থেকে ব্যথার ভিতরে,
ভুল থেকে উল্লোল ক্ষমতাময় ভুলের গহ্বরে ;
চাঁদের কুয়াশা থেকে অঘ্রান রাতের
নক্ষত্রের অন্ধকারে ;
তারপর নক্ষত্রেরা নেই।

নবীন প্রয়াণে স্পর্শে মানুষেরা এক দিন চীন-পিরামিড
গড়েছিল ; সূর্যঘড়ি চিনেছিল ; প্রিয়তর উজ্জ্বল সূর্যকে
দিব্য দিয়ে নগরীর ভাঙা হাড়ে কেবলই গড়েছে
নতুন খিলান স্তম্ভ ফ্যাক্টরি এঞ্জিন ক্রেন ;

এ সব বিচিত্র নীড় কুশলতা কল
সময়ের থেকে দূর বড়ো সময়ের কাছে
মানুষের যেই পরিচয় রেখে যায়
তা তার আবেগ বুদ্ধি উৎকণ্ঠার ;
যেন তা কল্যাণ সত্য চায়—তবু অবাধ হিংসার—
রিরংসার পাকে ঘুরে—ঘুরে ঘুরে শূন্য হয়ে যায় ;
অন্ধকার থেকে মৃদু আলোর ভিতরে
আলোর ভিতর থেকে আঁধারের দিকে
জ্ঞানের ভিতর থেকে শোকাবহ আশ্চর্য অজ্ঞানে
বারে বারে আসাযাওয়া শেষ করে।

চিরকাল ইতিহাসবহনের পথে
রক্ত ক্ষয় নাশ ক'রে সে এক জগতে,
মানুষের দিক্‌চিহ্ন মাঝে মাঝে মুক্ত হয়ে পড়ে ;
তা কোনো প্রশান্তি নয়, মৃত্যু নয়, অপ্রেমের মতো নয়,
কোনো হেঁয়ালির শেষ মীমাংসার বার্তা নয়,
অচিহ্নিত সাগরের মতন তা, দূরতর আকাশের মতো ;
পেছনের পার্শ্বের দ্রুতগতি চিহ্ন ও বলয়
অন্তর্হিত হয়ে গেলে কূলহীন পটভূমি জেগে ওঠে ;
ব্যক্তি ও জাতির নাম সময়ের দিগন্তরে শেষ হলে
শূন্য নীল আকাশের—মহাসাগরের শূন্যে মেশে ;
চিনে নিতে পারে তার হৃদয়ের অসীম ভূগোলে
আরো শুদ্ধ আরো গাঢ় অনিবর্চনীয় সম্মিলন
মানুষ ও মানুষের ; চারি দিকে গ্লোবমাস্টারের শব্দে
অন্তহীন অন্ধকারে হাঙর মকর মৃত্যু কুজ্‌ঝটিকায়
মৃত দৃঢ় এরিয়েল ও বেতারের ব্যর্থতায়
যদিও প্রত্যাশা সব সর্বস্বান্ত বলে মনে হয়—

আশার আস্থার আধার তবু নিজেই মানুষ,
মহাকাশ কিংবা মহাসাগরের চিহ্নগুলো নয়।

চতুরঙ্গ। মাঘ-চৈত্র ১৩৬২

হে জননী হে জীবন

হে অগাধ সন্তানের জননী, হে জীবন,
হে অসীম নক্ষত্রের মাতা,
তোমার ইশারায় অনন্ত সমতল—ঘাসে সবুজ হয়ে ওঠে,
সোনালি চিনির ঢেউয়ে নিরবচ্ছিন্ন ক্ষেত হয়ে ওঠে মিষ্টি।
নীহারিকা মিত্র চোখ বুজে ফুরিয়ে গেল—তুমি কোথায় ছিলে মাতা !
আজও তুমি মাছরাঙা ওড়াচ্ছ—স্ফটিকের মতো আলো বুনছ—
হিজল-জামের জানালায় সবুজ বাতাসকে চিলের ডানার মতো উড়িয়ে ঘুরছ—
বিরাট ফলন্ত ভূখণ্ডের মতো সূর্যকে লক্ষ বন্দরের কোলাহলে
    অভিনন্দিত করে হাসছ তুমি,
হাসছ তুমি জননী,
তুমি জেনে থাকতে নীহারিকা মিত্র কী করে হারিয়ে গেল জননী,
    কী করে হারিয়ে গেল ?

অনুক্ত। চৈত্র ১৩৬২

পড়ে গেল একেবারে আমারই ছায়ার কাছে

পড়ে গেল একেবারে আমারই ছায়ার কাছে—ঘাসে
দু মুহূর্ত আগেও যে শাদা নীল রঙের আকাশে

আরো দূর বেগুনি রঙের পানে যেতেছিল উড়ে,
বেতের ফলের মতো টলমল দুই চোখ জুড়ে

নীল আশা ছিল ঢের—আমারই পায়ের কাছে ঘাসে
পড়ে গেল—ভাই বোন আর কেউ অসীম আকাশে

নাই তার ? পেঁপের ফুলের মতো সুন্দর কোমল
শাদা বুক—বুকে রক্ত—রক্ত ঢের—চোখে তবু জল

নাই তার ; পাখনা মেলিতে চায় অসীম সাহসে
আমারই পায়ের কাছে নীল ঘাসে—শিশিরের রসে

এই পাখি এই রঙ—সাহসের আকাঙ্ক্ষার রূপ
অগাধ আঁধারে ধীরে ডুবে যায়—হয়ে যায় পালকের স্তূপ।

কবিতা। চৈত্র ১৩৬২

বরং নতুন এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে

বরং নতুন এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে :
গাছে পাখি দেখিয়াছি—আকাশে আপন মনে

উড়ে যায়...পায়রা তিতির
পুকুরের শাকে ঘাসে বাঁধে কেউ নীড়,

কিন্তু তুমি : নরম ননীর মতো পাখা
ঘাড় ভাঙা, মুখে রক্ত মাখা

শেফালি বোঁটার মতো ফোঁটা ফোঁটা লাল
আধ পোয়া রক্ত তুমি—কচি মেয়ে যেন লাল শাল

পরে আছে—ঘুমাতেছে : আমার হৃদয়
তোমার মায়ের মতো কাছে জেগে রয়।

কবিতা। চৈত্র ১৩৬২

জীবন ভালোবেসে

দেখা হল অনেক রক্ত রৌদ্র কোলাহল ;
চারি দিকে অধোমুখে মানুষেরা শব বহন করে ;
আজকে শতাব্দীতে মৃত্যু প্রথম কথা, তবু
এ সব মৃত অবশেষে ঘুমের ভিতরে
জুড়োয় গিয়ে দূর পৃথিবীর ঘাস শিশিরে জলে ;
এরা নদী সূর্য প্রেমের দিন ফুরিয়ে ফেলে
মাটি, তোমার নিজের মনের কথা হয়ে ধীরে
তোমার সাথে ঘুরছে কেমন অজ্ঞান শরীরে।

এখানে খড়ে ভরে আছে দু-চার মাইল কামিনী ধানের ক্ষেত ;
ঘুঘুর ডাকে আদিম শান্তি আরো অনেকক্ষণ ;
মিছরিগুঁড়ির মতন বৃষ্টি রোদ্দুরে উজ্জ্বল :
আকাশে চাতক : ওর একরাশি আত্মীয়স্বজন ;
এ সব ছাড়া ঐ মৃতদের ফুরিয়ে গেছে সবই ;
সময়ের এই কার্যকলাপ গভীর মনে হয়,
জীবন ভালোবেসে হৃদয় বুঝেছে অনুপম
মূল্য দিয়ে আসছে চুপে মৃত্যুর সময়।

আনন্দবাজার পত্রিকা। শারদীয় ১৩৬৩

সবার ওপর

সবার ওপর তোমার আকাশপ্রতিম মুখে রয়েছে
সফল সকালের রৌদ্র।
মনে হয়, সৃষ্টির অগ্নিমরালী পৃথিবীকে বঞ্চিত করে যদিও,
পৃথিবী মানুষকে,
যুদ্ধের অবিস্মরণীয় প্রতিভা ভাইকে আকর্ষণ করে যদিও
ভাইবোনকে নিঃশেষ করে দেবার জন্যে,
রক্তনদীর ভিতর থেকে ফলে ওঠে শাদা মিনার,
মহৎ দার্শনিকের মুণ্ডচ্ছেদ করে জেগে ওঠে খুলির বাটি,
নির্বোধ প্রণয়ীদের নবান্নরসে উপচে ওঠে কিনারা তার,
মিষ্টি, মলিন, রুক্ষ, ভূকম্পহীন অন্নোৎসবে, জেগে ওঠে বাসনা
কৃষ্ণার শাড়ি টেনে নেয়ার,
সাম্রাজ্য ভেঙে যায়—
হেমন্তের মেঘের মতো মিলিয়ে যায় সম্রাটদের চিৎকার,
তবুও দুর্বার সৃষ্টির কুয়াশা সরিয়ে দেবার জন্যে তুমি
ডান হাত হলে তোমার ;
একটি কালো তিলের নিখুঁত থেকে অপরিমেয় পদ্মের মতো
হলে তুমি তোমার বাম হাত।
সৃষ্টি ও সমাজের বিকেলের অন্ধকারের ভিতর
সকালবেলার প্রথম সূর্য-শিশিরের মতো সেই মুখ ;
জানে না কোথায় ছায়া পড়েছে আমার জীবনে, তার জীবনে,
সমস্ত অমৃতযোগের অন্তরীক্ষে।

দেশ। শারদীয় ১৩৬৩

জীবনের মানে ভালো

এখানে ঘাসের কোলে শুয়ে আছি—পাশে নদী—নদীতে স্টিমার ;

এ দিকে বাবলার সারি বহু দূর চলে গেছে—দূর—আরো দূর—
আজ ভোরে ঝাউবনে মনে হয়েছিল, মন মৃত্যু অমৃত্যুর
সীমার বাইরে এক অফুরন্ত সূর্যের ঋতুর
এখন বিকেলবেলা লাল নীল আলো জ্বেলে ঝাপসা স্টিমার
কোথায় দিগন্তে যায়—কোন্ যাত্রী সঙ্গে আছে তার,
জানি নাকো ; কিন্তু তবু দূর থেকে শান্ত স্নিগ্ধতার
কেমন নরম ছবি, ভেসে ওঠে সন্ধ্যার আঁধারে ;
মুছে যায় কুয়াশার পারে দূর ছ-সাতটি নক্ষত্রের পানে ;
শঙ্খচিল মাদারের ডালে বসে টের পায় শিশিরের ঘ্রাণে
জীবনের মানে ভালো ; আরো ভালো জীবন ও মৃত্যুর মানে

কবিতা। আশ্বিন ১৩৬৩

জোনাকী

অসংখ্য সবুজ শিমে শিমলতা পাতা ভরে আছে ;
শিম পাড়ি ; মেয়েটিও আছে কাছে কাছে ;
চার বছরের ছোটো মেয়ে ;
কাঁপছিল হিমে ;
আঁচল ফেলেছে ভরে শিমে
জায়গা নেই যে এক তিল,
তবু সে বাড়াল হাত—তারপর থেমে গিয়ে নিজ মনে বললে, 'কেমন নীল—
কেমন সুন্দর নীল শিমগুলো—
ঐ শিমগুলো, বাবা, গাছেই থাকুক।'
নদীর মতন টলমল চোখে তাকাল সে—তারপর মুখ
নামিয়ে সে চলে গেল—

বেলা শেষ হলে

শুনলাম ডুবে গেছে পুকুরের জলে।
অনেক গভীর রাতে দেখা গেল জোনাকি পোকার সাথে নক্ষত্রের তলে
শিমগুলো খেলা করে শিশিরের জলে ;
আমাকে দাঁড়াতে দেখে বলে তারা : 'বুঝেছ তো কে এই জোনাকি ?'
'চিনেছ ?' বললে রাতের লক্ষ্মীপাখি।

কবিতা। আশ্বিন ১৩৬৩

প্রতীক

একদিন অবশেষে ভোরবেলা চায়ের টেবিলে
দেখা গেল চিনেমাটি দিয়ে গড়া পেয়ালার 'পর
হেলিওট্রোপের মতো আকাশের থেকে
মানুষ ও মানুষের অলজ্ঘ্য প্রতীক পরস্পর
এক-জোড়া লঘু প্যারাশুট বেয়ে নামে ;
লঘুতর মনে হয় পেয়ালার প্রবীণ পালিশে ;
যেন তারা অনুকূল বাতাসের ভরে
কোনো এক প্রাসাদের বালিকার শিসে
নেমে আসে নদীর সফল গূঢ় জলে
গোধূমের ক্ষেতের ভিতর—
মনে হয়। ভোরের বাগানে যেন বসে
কোনো এক চীনে কারিগর
এই ছবি এঁকে গেছে দুই পল-অনুপল আগে ;
বুদ্‌বুদের মতো উঠে লঘু তামাশায়
ঊর্ণার মতন দুটো প্যারাশুট শূন্যে মাঝপথে
তবুও বৈকুণ্ঠে তারা ; পৃথিবীর রক্তের ঝর্নায়
বৈতরণী তরঙ্গের নীচে তবু তারা
মাছের উজ্জ্বল লঘু শল্কের ভিতরে ;

কোথায় পালাবে তুমি তাহাদের হাত থেকে আজ
অথবা পালাবে কোন্ স্থিরতর বিষয়ের তরে।

উত্তরা। আশ্বিন ১৩৬৩

সে

আলো যেন কমিতেছে—বিস্ময় যেতেছে নিভে আরো।
আকাশ তেমন নীল ? আকাশ তেমন নীল নয়,
মেয়েমানুষের চোখে নাই যেন তেমন বিস্ময়,
মাছরাঙা শিশুদের পাখি আজ, শিশুরাও কারো
রেশমি চুলের শিশু নয় আজ ; ভাবিতে কি পার
প্রেমে সেই রক্ত আছে ? আঘাতে রয়েছে সেই ভয় ?
কুয়াশায় সেই শীত ? কে সাজায়, কে করে সঞ্চয়
আজ আর ! জীবন তবুও যেন হয়েছে প্রগাঢ়।

নতুন সৌন্দর্য এক দেখিয়াছি—সকল অতীত
ঝেড়ে ফেলে—নতুন বসন্ত এক এসেছে জীবনে ;
শালিকেরা কাঁপিতেছে মাঠে-মাঠে—সেইখানে শীত
শীত শুধু—তবুও আমার বুকে হৃদয়ের বনে
কখন অঘ্রান রাত শেষ হল—পৌষ গেল চলে
যাহারে পাই নি রোমে বেবিলনে, সে এসেছে বলে।

উত্তরসূরি। পৌষ ১৩৬৩

আমার জীবনে কোনো ঘুম নাই

আমার জীবনে কোনো ঘুম নাই
মৎস্যনারীদের মাঝে সব চেয়ে রূপসী সে নাকি
এই নিদ্রা ?

গায় তার ক্ষান্ত সমুদ্রের ঘ্রাণ অবসাদ সুখ,
চিন্তার পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন—বিমুখ
প্রাণ তার।

এই দিন এই রাত্রি আসে যায়—কোনো ধ্বনি ঘ্রাণ
বুঝিতে দেয় না তারে কোনো ক্ষুধা—কোনো ইচ্ছা—
পরীরও সোনার চুল হয় যাতে ম্লান
আমাদের পৃথিবীর পরীদের ; জানে না সে ; জীবনের লক্ষ মৃত
নিশ্বাসের স্বর ;

শোনে না সে ; তা হলে ঘুমোত কবে ? সে শুধু সুন্দর,
প্রশ্নহীন অভিজ্ঞতাহীন দূর নক্ষত্রের মতো
সুন্দর অমর শুধু ; দেবতারা করে নি বিক্ষত
ইহাদের ?

এদের অপার রূপ শান্তি সচ্ছলতা
তবুও জানিত যদি আমার এ জীবনের মুহূর্তের কথা
মানুষের জীবনের মুহূর্তের কথা।

দেবতারা করে নি বিক্ষত ইহাদের :
ঘুঘুদের শাদা ডানা—নীল রাত্রি—কমলা রঙের মেঘ—সমুদ্রের ফেনা
রোদ—হরিণের বুকে বেদনার
নীরব আঘাত ;
এরা প্রশ্ন করে নাকো ; ইহারা সুন্দর শান্ত—জীবনের উদ্‌যাপনে
সন্দেহের হাত
ইহারা তোলে না কেউ আঁধারে আকাশে

ইহাদের দ্বিধা নাই—ব্যথা নাই—চোখে ঘুম আসে।

শুনেছে কে ইহাদের মুখে কোনো অন্ধকার কথা ?
সকল সংকল্প চিন্তা রক্ত আনে ব্যথা আনে—মানুষের জীবনের
এই বীভৎসতা

ইহাদের ছোঁয় নাকো ;—ব্যবনিক প্লেনের মতন
সকল আচ্ছন্ন শান্ত স্নিগ্ধতারে নষ্ট করে ফেলিতেছে মানুষের মন।
গোলাপি ধূসর মেঘে পশ্চিমের বিয়োগ সে দেখে না কি ?
প্রজাপতি পাখি মেয়ে করে না কি মানুষের জীবনের ব্যথা আহরণ ?
তবু এরা ব্যথা নয় : ইহারা আবৃত সব—বিচিত্র—নীরব
অবিরল জাদুঘর এরা এক ; এরা রূপ ঘুম শান্তি স্থির
এই মৃত পাখি কীট—প্রজাপতি রাঙা মেঘ—সাপের আঁধার মুখে
ফড়িঙের জোনাকির নীড়
এই সব।

আমি জানি, একদিন আমিও এমন
পতঙ্গের হৃদয়ের ব্যথা হব—সমুদ্রের ফেনা শাদা ফেনায় যেমন
ভেঙে পড়ে—ব্যথা পায়।
মানুষের মন
তবুও রক্তাক্ত হয় কেন এক অন্য বেদনায়
কীট যাহা জানে নাকো—জানেনাকো নদী ফেনা ঘাস রোদ—শিশির
কুয়াশা জ্যোৎস্না :
অম্লান হেলিওট্রোপ হায় !

সৃজনের জাদুঘরে রূপ তারা—শান্তি—ছবি তাহারা ঘুমায়
সৃষ্টি তাই চায়।

ভুলে যাব সেই সাধ যে-সাহস এনেছিল মানুষ কেবল
যাহা শুধু গ্লানি হল—কৃপা হল—নক্ষত্রের ঘৃণা হল—অন্য কোনো স্থল
পেল নাকো।

ধূসর পাণ্ডুলিপি। ফাল্গুন ১৩৬৩

ঘুমায়ে রয়েছ তুমি ক্লান্ত হয়ে

ঘুমায়ে রয়েছ তুমি ক্লান্ত হয়ে, তাই
আজ এই জ্যোৎস্নায় কাহারে জানাই
আমার এ বিস্ময়—বিস্ময়ের ঠাঁই
নক্ষত্রের থেকে এল ; তুমি জেগে নাই,

আমার বুকের 'পরে এই এক পাখি ;
পাখি ? না ফড়িং কীট ? পাখি ? না জোনাকী ?
বাদামি সোনালি নীল রোম তার রোমে-রোমে রেখেছে সে ঢাকি,
এমন শীতের রাতে এসেছে একাকী :

নিস্তব্ধ ঘাসের থেকে কোন্
ধানের ছড়ার থেকে কোথায় কখন,
রেশমের ডিম থেকে এই শিহরণ
পেয়েছে সে এই শিহরণ !

জ্যোৎস্নায়—শীতে
কাহারে সে চাহিয়াছে ? কত দূর চেয়েছে উড়িতে ?
মাঠের নির্জন খড় তারে ব্যথা দিতে
এসেছিল ? কোথায় বেদনা নাই এই পৃথিবীতে !

না—না—তার মুখে স্বপ্ন সাহসের ভর
ব্যথা সে তো জানে নাই—বিচিত্র এ জীবনের 'পর
করেছে নির্ভর ;
রোম—ঠোঁট—পালকের এই তার মুগ্ধ আড়ম্বর।

জ্যোৎস্নায়—শীতে
আমার কঠিন হাতে তবু তারে হল যে আসিতে,
যেই মৃত্যু দিকে দিকে অবিরল—তোমারে তা দিতে
কেন দ্বিধা ? অদৃশ্য কঠিন হাতে আমিও বসেছি পাখি,
আমারেও মুষড়ে ফেলিতে

দ্বিধা কেহ করিবে না ; ভুল করে দেবে নাকো ছেড়ে ;
জানি আমি, তবু আহা রাতের শিশিরে ভেজা এ রঙিন তুলার বলেরে
কোমল আঙুল দিয়ে দেখি আমি চুপে নেড়েচেড়ে,
সোনালি উজ্জ্বল চোখে কোন্ এক ভয় যেন ঘেরে

তবু তার ; এই পাখি—এতটুকু—তবু সব শিখেছে সে—এ এক বিস্ময়
সৃষ্টির কীটেরও বুকে এই ব্যথা ভয় ;
আশা নয়—সাধ নয়—প্রেম-স্বপ্ন নয়
চারি দিকে বিচ্ছেদের ঘ্রাণ লেগে রয়

এই পৃথিবীতে, এই ক্লেশ ইহাদেরও বুকের ভিতর ;
ইহাদেরও ; অজস্র গভীর রঙ পালকের 'পর
তবে কেন ? কেন এ সোনালি চোখ জ্যোৎস্নার সাগর
খুঁজেছিল ? আবার খুঁজিতে গেল কেন দূর সৃষ্ট চরাচর ?

আমি এই অঘ্রানেরে ভালোবাসি

আমি এই অঘ্রানেরে ভালোবাসি—বিকেলের এই রঙ—রঙের শূন্যতা
রোদের নরম রোম—ঢালু মাঠ—বিবর্ণ বাদামি পাখি—হলুদ বিচালি—
পাতা কুড়াবার দিন ঘাসে ঘাসে—কুড়ুনির মুখে তাই নাই কোনো কথা,

ধানের সোনার কাজ ফুরায়েছে—জীবনেরে জেনেছে সে—কুয়াশায় খালি
তাই তার ঘুম পায়—ক্ষেত ছেড়ে দিয়ে যাবে এখনই সে—ক্ষেতের ভিতর
এখনই সে নেই যেন—ঝ'রে পড়ে অঘ্রানে এই শেষ বিষণ্ন সোনালি

তুলিটুকু ; মুছে যায় ; কেউ ছবি আঁকিবে না মাঠে মাঠে যেন তারপর,
আঁকিতে চায় না কেউ—এখন অঘ্রান এসে পৃথিবীর ধরেছে হৃদয় ;
এক দিন নীল ডিম দেখি নি কি ?—দুটো পাখি তাদের নীড়ের মৃদু খড়

সেইখানে চুপে চুপে বিছায়েছে ; তবু নীড়—তবু ডিম—ভালোবাসা সাধ শেষ হয়
তারপর কেউ তাহা চায় নাকো—জীবন অনেক দেয়—তবুও জীবন
আমাদের ছুটি দেয় তারপর—একখানা আধখানা লুকোনো বিস্ময়
অথবা বিস্ময় নয়—শুধু শান্তি—শুধু হিম কোথায় যে রয়েছে গোপন
অঘ্রান খুলেছে তারে—আমার মনের থেকে কুড়ায়ে করেছে আহরণ।

ধূসর পাণ্ডুলিপি। ফাল্গুন ১৩৬৩

আজ রাতে শেষ হয়ে গেল শীত

আজ রাতে শেষ হয়ে গেল শীত—তারপর কে যে এল মাঠে মাঠে খড়ে
হাঁস গাভী শাদা প্লেট আকাশের নীল পথে যেন মৃদু মেঘের মতন
ধানের সোনার ছড়া নাই মাঠে—ইঁদুর তবুও আর যাবে নাকো ঘরে।

তাহার রুপালি রোম জ্যোৎস্নায় একবার সচকিত করে যায় মন,
হৃদয়ে আস্বাদ এল ফড়িঙের—কীটেরও যে—ঘাস থেকে ঘাসে ঘাসে তাই
নির্জন ব্যাঙের মুখে মাকড়ের জালে তারা বরং এ অধীর জীবন

ছেড়ে দেবে—তবু আজ জ্যোৎস্নায় সুখ ছাড়া সাধ ছাড়া আর কিছু নাই ;
আছে নাকি আর কিছু ? পাতা খড় কুটো দিয়ে যে আগুন জ্বেলেছে হৃদয়
গভীর শীতের রাতে—ব্যথা কম পাবে বলে—সেই সমারোহ আর চাই ?

জীবন একাকী আজও—ব্যথা আজও—এখন করি না তবু বিয়োগের ভয়
এখন এসেছে প্রেম ; কার সাথে ? কোন্‌খানে ? জানি নাকো ; তবু সে আমারে
মাঠে মাঠে নিয়ে যায়—তারপর পৃথিবীর ঘাস পাতা ডিম নীড় : সে এক বিস্ময়
এ শরীর রোম নখ মুখ চুল—এ জীবন ইহা যাহা, ইহা যাহা নয় ;
রঙিন কীটের মতো নিজের প্রাণের সাধে এক রাত মাঠে জেগে রয়।

ধূসর পাণ্ডুলিপি। ফাল্গুন ১৩৬৩

বারবার সেই সব কোলাহল

বারবার সেই সব কোলাহল সমারোহ রীতি রক্ত—ক্লান্তি লাগে যেন ;
তাহারা অনেক জানে—এই দূর মাঠে আমি খুঁজি নাকো জীবনের মানে
শুধু এই মাঠ—রাত—আমারে ডেকেছে, আহা—বলেছি, 'যাব না আর'—কেন,

কেন যাব ? এই ধুলো খড় গাভী হাঁস জ্যোৎস্না ছেড়ে আমি যাব কোন্‌খানে,
সেখানে চিন্তার ব্যথা—ব্যথা নাকি ? আজ রাতে শুধু আমি শান্তির আকাশ
চেয়েছি যে—সেই ভালো—কথা কাজ প্রশ্ন শুধু ভুল করে—ব্যথা বহে আনে,

শান্তি ভালো ; বাদামি পাতার ঘ্রাণ ভালো না কি ? পাখির সোনালি চোখ—ঘাস—

কোথায় বিবরে তার মাছরাঙা—তার রঙ তার নীড়—হৃদয়ের সাধ
এই নিয়ে কথা ভাবা এইখানে—ছবি আঁকা—মৃদু ছবি—নরম উচ্ছ্বাস ;

ইঁদুর ধানের শিষ বেয়ে ওঠে : এই ছড়া এই সোনা আকাশের চাঁদ
এরা যেন নীড় তার—আমারও হৃদয় আজ চুপ হয়ে শুধু রঙ ঘ্রাণ
শুধু শান্তি—নিঃশব্দতা—আবিষ্কার ; এইসব এইসব সঞ্চয়ের স্বাদ

জীবনেরে এই বলে জানিতেছে—জ্যোৎস্না আরো শান্ত হয়ে ভরেছে উঠান
রাত্রি আরো ছবি হয়ে রূপ হয়ে ঘাসের কীটের মুখে শুনিতেছে গান।

ধূসর পাণ্ডুলিপি। ফাল্গুন ১৩৬৩

রাত আরো বাড়িতেছে

রাত আরো বাড়িতেছে—এক সারি রাজহাঁস চুপে চুপে চলে যায় তাই,
এই শান্ত রাতের পৃথিবীটিরে ইহাদের পালকের নরম ধবল
তুলি দিয়ে আঁকে এরা—পৃথিবীতে এই বিজনতা যেন কোনোখানে নাই

এই ছবি—এই শান্তি—ঘাসের উপরে আজ আঁধার দেখায় অবিরল
এইসব ; কোথায় উৎসব যেন শুধু রক্ত—শুধু রূঢ় বিবাহের গান—
জীবনেরে অসম্ভ্রম ;—পৃথিবী সম্ভ্রম ভুলে হতেছে না কঠিন চঞ্চল !

সন্ধ্যার মেঘের পথে দাঁড়কাক তবু জানে অন্য এক বিশ্রাম কল্যাণ,
অন্য এক ক্ষমা শান্তি সমারোহ—আমিও শুনেছি সেই পাখিদের স্বর
নরম অধীর যেন—পথ ছেড়ে দূরে থেকে তখন উঠেছে কেঁপে প্রাণ

বিয়োগের কথা ভেবে—মাথার উপরে তারা বিকেলের সোনার ভিতর

হারায়েছে ; কোন্ দিকে ? শালের গলির ফাঁকে মাঠ ছুঁয়ে হামাগুড়ি দিয়ে
উড়েছে রাত্রির পেঁচা—এ জীবন যেন দুটো মৃদু পাখা : তার 'পরে ভর—

জীবনের এই স্তব্ধ ব্যবহার অভিজ্ঞতা আমরা জেনেছি পরস্পর
তারপর : শান্তি এল মাঠে ঘাসে ডানা পাখি পালকের ছবি চোখে নিয়ে।

ধূসর পাণ্ডুলিপি। ফাল্গুন ১৩৬৩

আমাদের অভিজ্ঞতা নষ্ট হয় অন্ধকারে

আমাদের অভিজ্ঞতা নষ্ট হয় অন্ধকারে—তারপর পাণ্ডুলিপি গড়ি
পুরোনো জ্ঞানের খাতা রক্ত ক্লেশ রোমহর্ষ চুপে চুপে করি সঞ্চয়
অন্ধকারে ; অজন্তার ইলোরার রোম আলেকজান্ড্রিয়ার আমরা প্রহরী

মিউজিয়মের ছায়া বিবর্ণতা—চামড়া ও কাগজের বিষণ্ন বিস্ময়
এই কি পৃথিবী নয় আমাদের ? পৃথিবী কি চেয়েছিল এমন জীবন
সোনালি বেগুনি মেঘে যাহা কোনো ফড়িঙের পতঙ্গের পাখিদের নয়

সেই কথা চিন্তা কাজ সমারোহ—স্তব্ধ ক'রে রাখে কেন মানুষের মন—
অই দেখ পায়রারা—এশিরিয়া মিশরেও ইহাদের দেখিয়াছি আমি
হাজার হাজার শীত বসন্তের আগে কবে দিল্লি নিনভে বেবিলন

ইহাদের দেখেছিল—এসেছে ভোরের বেলা উজ্জ্বল বিশাল রোদে নামি
গভীর আকাশ আরো নীল করে দিয়ে গেছে ধবল ডানার ফেনা দিয়ে
এই কি জীবন নয় ? আমাদের ক্লান্তি তবু ক্লান্তি তবু আরো বেশি দামি

জ্ঞান নাই চিন্তা নাই—পায়রারা সেইসব প্রতীক্ষার কথা ভুলে গিয়ে

একদিনও ব্যথা, আহা, পায় না কি শুধু নীল আকাশের রৌদ্র বুকে নিয়ে ?

ধূসর পাণ্ডুলিপি। ফাল্গুন ১৩৬৩

সে কত পুরোনো কথা

সে কত পুরোনো কথা—যেন এই জীবনের ঢের আগে আরেক জীবন
তোমারে সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকারে যখন গেলাম চলে চুপে
তুমিও ফের নি পিছে—তুমিও ডাক নি আর ; আমারও নিবিড় হল মন

যেন এক দেশলাই জ্বলে গেছে—জ্বলিবেই—হালভাঙা জাহাজের স্তূপে
আমার এ জীবনের বন্দরে ; তারপর শান্তি শুধু বেগুনি সাগর—
মেঘের সোনালি চুল—আকাশ উঠেছে ভরে হেলিওট্রোপের মতো রূপে

আমার জীবন এই ; তোমারও জীবন তাই ; এইখানে পৃথিবীর ’পর
এই শান্তি মানুষের ; এই শান্তি। যতদিন ভালোবেসে গিয়েছি তোমারে
কেন যেন লেগুনের মতো আমি অন্ধকারে কোন্ দূর সমুদ্রের ঘর

চেয়েছি—চেয়েছি, আহা...ভালোবেসে না কেঁদে কে পারে।
তবুও সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকারে যখন গেলাম চলে চুপে
তুমিও দেখ নি ফিরে—তুমিও ডাক নি আর—আমিও খুঁজি নি অন্ধকারে

যেন এক দেশলাই জ্বলে গেছে—জ্বলিবেই—হালভাঙা জাহাজের স্তূপে
তোমারে সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকারে যখন গেলাম চলে চুপে।

ধূসর পাণ্ডুলিপি। ফাল্গুন ১৩৬৩

এইখানে এক দিন তুমি এসে বসেছিলে

এইখানে এক দিন তুমি এসে বসেছিলে—তারপর কত দিন আমি
তোমারে রয়েছি ভুলে—এক দিন তুমি এসে বসেছিলে কখন এখানে
মুছেছে জীবন থেকে—ফড়িঙের মতো আমি ধানের ছড়ার ’পরে নামি

জীবনেরে বুঝিয়াছি ; আমি ভালোবাসিয়াছি—সেইসব ভালোবাসা প্রাণে
বেদনা আনে না কোনো—তুমি শুধু একদিন ব্যথা হয়ে এসেছিলে কবে
সেদিকে ফিরি নি আর—চড়ুয়ের মতো আমি ঘাস খড় পাতার আহ্বানে

চলে গেছি ; এ জীবন কবে যেন মাঠে মাঠে ঘাস হয়ে রবে
নীল আকাশের নীচে অঘ্রানের ভোরে এক—এই শান্তি পেয়েছি জীবনে
শীতের ঝাপসা ভোরে এ জীবন ভেলভেট জ্যাকেটের মাছরাঙা হবে

এক দিন—হেমন্তের সারা দিন তবুও বেদনা এল—তুমি এলে মনে
হেমন্তের সারা দিন—অনেক গভীর রাত—অনেক অনেক দিন আরো
তোমার মুখের কথা—ঠোঁট রঙ চোখ চুল—এইসব ব্যথা আহরণে

অনেক মুহূর্ত কেটে গেল, আহা ; তারপর—তবু শেষে শান্তি এল মনে
যখন বেগুনি নীল প্রজাপতি কাঁচপোকা আবার নেমেছে মাঠে বনে।

ধূসর পাণ্ডুলিপি। ফাল্গুন ১৩৬৩

বেগুনি বনের পারে ঝাউ বট হিজলের ডালপালা

বেগুনি বনের পারে ঝাউ বট হিজলের ডালপালা চুপে-চুপে নেড়ে
কে যেন বিছাতে চায় নীড় তার গাছের মাথার ’পরে হাঁসের মতন ;
তারপর দেখা দেয় একবার ; নির্জন বনের এই বিস্মিত হাঁসেরে

দেখি আমি—রুপালি পালকে তার উড়ু উড়ু জামপাতা ছায়া শালবন
পড়িতেছে—কালো কালো শাখা ডাঁট দুলিতেছে ডিমের মতন বুকে তার ;
কোনো পাখি দেখি নাই তাহার সন্ধ্যার নীড়ে চোখ মেলে বসেছে এমন

এমন কোমল স্থির নিরবিলি পালকের রুপা দিয়ে বনের আঁধার
বুনেছিল ; দূর বুনো মোরগের বুকে তাই এই রাতে জেগেছে বিস্ময়—
তাহার অধীর শব্দ শুনি আমি—সোনার তীরের মতো জলপায়রার

বুকে এসে এই জ্যোৎস্না ব্যথা দেয়—সহসা গভীর রাত ব্যস্ত যেন হয়
চাঁদের মুখের 'পরে অনেক মশার পাখা ছোটো ছোটো পাখিদের মতো
উড়েতেছে ; মিষ্টি ব্যথা এইসব—জ্যোৎস্নার মাংস খুঁটে লয় ;

শরের জঙ্গল নদী ছেড়ে দিয়ে বুনো হাঁস উড়ে চলিতেছে ক্রমাগত।
চাঁদ থেকে আরো দূর চাঁদে চাঁদে—কত হাঁস চাঁদ কত কত।

ধূসর পাণ্ডুলিপি। ফাল্গুন **১৩৬৩**

কী যেন কখন আমি অন্ধকারে

কী যেন কখন আমি অন্ধকারে মৃত্যুর কবর থেকে উঠিলাম
আমারে দিয়েছে ছুটি বৈতরণী নদী।
শকুনের মতো কালো ডানা মেলে পৃথিবীর দিকে আমি উড়িলাম
সাত দিন সাত রাত উড়ে গেলে সেই আলো পাওয়া যায় যদি
পৃথিবীর আলো প্রেম ?
আমারে দিয়েছে ছুটি বৈতরণী নদী ?

সাত দিন শেষ হল—তখন গভীর রাত্রি পৃথিবীর পারে
আমারই মতন ক্ষিপ্র ক্লান্ত এক শকুনের পাল
দেখিলাম আসিতেছে চোখ বুজে উড়ে অন্ধকারে,
তাহারা এসেছে দেখে পৃথিবীর সকাল বিকাল
ক্লান্ত ক্লান্ত শকুনের পাল।

শুধালাম, 'তোমাদের দেখেছি যে বৈতরণী পারে
সেইখানে ঘুম শুধু—শুধু রাত্রি—মৃত্যুর নদীর পারে, আহা
পৃথিবীর ঘাস রোদ মাছরাঙা আলোর ব্যস্ততারে
ভালো কি লাগেনি, আহা'—শুধালাম—
শকুনেরা শুনিল না তাহা,
ডুবে গেল অন্ধকারে, আহা !

এক জন রয়ে গেল—বিবর্ণ বিস্তৃত পাখা ঘুরায়ে সে মাঝ-শূন্যে থেমে :
'কোথায় যেতেছ তুমি ? পৃথিবীতে ? সেইখানে কে আছে তোমার ?'
'আমি শুধু নাই, হায়, আর সবই রয়ে গেছে—সকালে এসেছি আমি নেমে
বৈতরণী : তার জলে ; যারা তবু ভালোবাসে—ভালোবাসিবার,
পৃথিবীতে রয়েছে আমার।'

খানিক ভাবিল কী যে সেই প্রাণ—ক্লান্ত হল—তারপর পাখা
কখন দিয়েছে মেলে বৈতরণী নদীটির দিকে ;
বলিলাম : 'ঐ দেখ—দেখা যায় তমালের হিজলের অশথের শাখা
আর ঐ নদীটিরে দেখা যায়—আমার গাঁয়ের নদীটিকে—'
চ'লে গেল তবু সে যে কুয়াশার দিকে !

তারপর সাত দিন সাত রাত কেটে গেল পৃথিবীর আলো-অন্ধকারে
আবার চলেছি উড়ে একা একা শকুনের কালো পাখা মেলে

পৃথিবীতে তাহাদের দেখিয়াছি—আজও তারা মনে করে রেখেছে আমারে,
ভালোবাসে ; রক্তমাংসে থাকিতাম তবু যদি—আমার এ সংসর্গের ভালোবাসা পেলে,
রোজ ভোরে রোজ রাতে আমারে নতুন ক'রে পেলে

তাহারা বাসিত ভালো আরো বেশি—আরো বেশি—এই শুধু—আর কিছু নয়—
সাত দিন-সাত রাত তাহাদের জানালায় পর্দায় উড়ে উড়ে কেবল ভেবেছি এই কথা
আবার পেতাম যদি সে শরীর—সে জীবন—তা হলে প্রণয় প্রেম সত্য হত ; আজ তা বিস্ময়—
আজ তা বিস্ময় শুধু—শুধু স্মৃতি শুধু ভুল—হয়তো কর্তব্য-বিহ্বলতা :
সাত রাত সাত দিন পৃথিবীতে কেবল ভেবেছি এই কথা।

তারপর মৃত্যু তাই চাহিলাম—মৃত্যু ভালো—মৃত্যু তাই আর একবার,
বিবর্ণ বিস্তৃত পাখা মেলে দিয়ে মাঝ-শূন্যে আমি ক্ষিপ্র শকুনের মতো
উড়িতেছি—উড়িতেছি ; ছুটি নয়—খেলা নয়—স্বপ্ন নয়—যেইখানে জলের আঁধারে
বৈতরণী—বৈতরণী—শান্তি দেয়—শান্তি—শান্তি—ঘুম—ঘুম—ঘুম অবিরত
তারই দিকে ছুটিতেছি আমি ক্লান্ত শকুনের মতো।

ধূসর পাণ্ডুলিপি। ফাল্গুন ১৩৬৩

আমার এ ছোটো মেয়ে

আমার এ ছোটো মেয়ে—সব শেষ মেয়ে এই
শুয়ে আছে বিছানার পাশে—
শুয়ে থাকে—উঠে বসে—পাখির মতন কথা কয়
হামাগুড়ি দিয়ে ফেরে
মাঠে মাঠে আকাশে আকাশে...

ভুলে যাই ওর কথা—আমার প্রথম মেয়ে সেই
মেঘ দিয়ে ভেসে আসে যেন

বলে এসে : 'বাবা, তুমি ভালো আছো ? ভালো আছো ?—ভালোবাস ?'
হাতখানা ধরি তার : ধোঁয়া শুধু
কাপড়ের মতো শাদা মুখখানা কেন !

'ব্যথা পাও ? কবে আমি মরে গেছি—আজও মনে কর ?'
দুই হাত চুপে চুপে নাড়ে তাই
আমার চোখের 'পরে, আমার মুখের 'পরে মৃত মেয়ে ;
আমিও তাহার মুখে দু-হাত বুলাই ;
তবু তার মুখ নাই—চোখ চুল নাই।

তবু তারে চাই আমি—তারে শুধু—পৃথিবীতে আর কিছু নয়
রক্ত মাংস চোখ চুল—আমার সে মেয়ে
আমার প্রথম মেয়ে—সেই পাখি—শাদা পাখি—তারে আমি চাই ;
সে যেন বুঝিল সব—নতুন জীবন তাই পেয়ে
হঠাৎ দাঁড়াল কাছে সেই মৃত মেয়ে।

বলিল সে : 'আমারে চেয়েছ, তাই ছোটো বোনটিরে—
তোমার সে ছোটো ছোটো মেয়েটিরে এসেছি ঘাসের নীচে রেখে
সেখানে ছিলাম আমি অন্ধকারে এত দিন
ঘুমাতেছিলাম আমি'—ভয় পেয়ে থেমে গেল
বলিলাম : 'আবার ঘুমাও গিয়ে—
ছোটো বোনটিরে তুমি দিয়ে যাও ডেকে।'

ব্যথা পেল সেই প্রাণ—খানিক দাঁড়াল চুপে—তারপর ধোঁয়া
সব তার ধোঁয়া হয়ে খসে গেল ধীরে ধীরে তাই,
শাদা চাদরের মতো বাতাসেরে জড়াল সে একবার
কখন উঠেছে ডেকে দাঁড়কাক—

চেয়ে দেখি ছোটো মেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে খেলে—আর কেউ নাই।

ধূসর পাণ্ডুলিপি। ফাল্গুন ১৩৬৩

নদী

রাইসর্ষের ক্ষেত সকালে উজ্জ্বল হল—দুপুরে বিবর্ণ হয়ে গেল
তারই পাশে নদী ;

নদী, তুমি কোন্ কথা কও ?

অশথের ডালপালা তোমার বুকের 'পরে পড়েছে যে,
জামের ছায়ায় তুমি নীল হলে,
আরো দূরে চলে যাই
সেই শব্দ পিছে পিছে আসে ;
নদী নাকি ?

নদী, তুমি কোন্ কথা কও ?

তুমি যেন ছোটো মেয়ে—আমার সে ছোটো মেয়ে ;
যত দূর যাই আমি—হামাগুড়ি দিয়ে তুমি পিছে পিছে আস,
তোমার ঢেউয়ের শব্দ শুনি আমি : আমারই নিজের শিশু সারা দিন নিজ মনে কথা কয়।
কথা কয়—কথা কয়—ক্লান্ত হয় নাকো
এই নদী

এক পাল মাছরাঙা নদীর বুকের রামধনু
বকের ডানার সারি শাদা পদ্ম—নিস্তব্ধ পদ্মের দ্বীপ নদীর ভিতরে
মানুষেরা সেই সব দেখে নাই।

তখন আমের বনে চ’লে গেছি
এইখানে কোকিলের ভালোবাসা কোকিলের সাথে,
এখানে হাওয়ায় যেন ভালোবাসা বীজ এক আছে,
নদীর নতুন শব্দ এইখানে : কার যেন ভালোবাসা পুষে রাখে
সোনালি প্রেমের গল্প সারা দিন পাড়ে
সারা দিন পাখি তাহা শোনে ; তবু শোনে সারা দিন ?
পাখিরা তাদের গানে এই শব্দ তবু
পৃথিবীর ক্ষেতে মাঠে ছড়াতে পারে না,
নদীর নিজের সুর এ যে !

নদী, তুমি কোন্ কথা কও ?

গাছ থেকে গাছে—মাঠ থেকে মাঠে রোদ শুধু মরে যায়
সব আলো কোন্ দিকে যায় !
নিজের মুখের থেকে রোদের সোনালি রেণু মুছে ফেলে নদী
শেষ রেণু মুছে ফেলে
সে যেন অনেক বড়ো মেয়ে এক—চুল তার ম্লান—চুল শাদা—
শুধু তার ফুল নিয়ে খেলিবার সাধ—
ফুলের মতন কোন্ ভালেবাসা নিয়ে,
ধানের কঠিন খোসা—খড়—হিম—শুষ্ক সব পাপড়ির মাঝে সেই মেয়ে
ইতস্তত বসে আছে ;

গান গায় ;
নদীর—নদীর শব্দ শুনি আমি।

ধূসর পাণ্ডুলিপি। ফাল্গুন ১৩৬৩

তোমার সৌন্দর্য চোখে নিয়ে আমি চলে যাব

তোমার সৌন্দর্য চোখে নিয়ে আমি চলে যাব পৃথিবীর থেকে ;
রূপ ছেনে এখনও হৃদয়ে কোনো আসে নাই ক্লান্তি—অবসাদ—
এখনও সবুজ এই পৃথিবীরে ভালো লাগে—ভালো লাগে চাঁদ
এই সূর্য নক্ষত্রের ডালপালা ; এখনও তোমারে কাছে ডেকে
মনে হয় যেন শান্ত মালয়ের সমুদ্রেরে পেল পাখি—দেখে
জ্যোৎস্নায় মালয়ালি—নারিকেল ফুল সোনা সৌন্দর্য অবাধ
নরম একাকী হাত—জলে ভেজা মসৃণ ; এই রঙ সাধ
কৃমি হয়—কাদা হয়—তবু, আহা ; চলে যাব তাই মুখ ঢেকে
তোমার সৌন্দর্য চোখে নিয়ে আমি চলে যাব পৃথিবীর থেকে।

ধূসর পাণ্ডুলিপি। ফাল্গুন ১৩৬৩

বেঁচে থেকে হয়তো হৃদয় ক্লান্ত হবে

বেঁচে থেকে হয়তো হৃদয় ক্লান্ত হবে, তাই সব থেকে সরে
যখন ঘুমাব আমি মাটি ঘাসে—সেইখানে একদিন এসে
হয়তো অজ্ঞানে তুমি মাথা নেড়ে বলিবে : 'আমারে ভালোবেসে
ব্যথা পেল ; আমি আজও ভালো আছি—তবুও গিয়েছে, আহা, ঝরে
সেই প্রাণ' ; হয়তো ভাবিবে এই—তবু একবার চুপ করে
ভেবে দেখ সে কী ছিল—এক দিন পৃথিবীতে তোমার আবেশে
যখন আমার মন ভরে ছিল, মনে হত চলিতেছি ভেসে
জ্যোৎস্নার নদীতে এক রাজহাঁস রুপালি ঢেউয়ের পথ ধরে
কোন্-এক চাঁদের দিকে অবিরল—মনে হত, আমি সেই পাখি :
তোমার মুখের রূপ নিয়ে তুমি বেঁচেছিলে তোমার শরীরে
তাই তো মসৃণ তুলি হাতে লয়ে জীবনেরে এঁকেছি এমন

অনেক গভীর রঙে ভরে দিয়ে ; চেয়ে দেখ ঘাসের শোভা কি
লাগে নি সুন্দর আরো একবার তোমার মুখের থেকে ফিরে
যখন দেখেছি ঘাস ঢেউ রোদ মিশে আছে তোমার শরীরে।

ধূসর পাণ্ডুলিপি। ফাল্গুন ১৩৬৩

তখন অনেক দিন হয়ে গেছে

তখন অনেক দিন হয়ে গেছে—চলে গেছি পৃথিবীর থেকে ;
হয়তো ভাবিবে তুমি এক দিন : 'ভুলেছি কি—তারে গেছি ভুলে
কেন, আহা !' আঙুল ঠোঁটের 'পরে রেখে দিয়ে চুপে চোখ তুলে
ব্যথা পাবে একবার—সারারাত টেবিলের 'পরে মুখ ঢেকে
রবে তুমি—অনেক অনেক দিন রাত কেটে যাবে একে একে
ব্যথা নিয়ে ; ভূত তবু আসে নাকো ; কে তারে ঘাসের থেকে খুলে
ছেড়ে দেবে ! ভূত নাই, ঘাসেও সে থাকে নাকো—তাই ক্লান্ত চুলে
বিনুনি রিবন বেঁধে—একরাশ পৃথিবীরে লবে তুমি ডেকে

ডেকে লবে কাছে তুমি ইহাদের : বাগানের ক্যানা ফুল—আলো
জামরুলে মৌমাছি—বিড়ালের ছানাগুলো—শাদা শাদা ছানা
ন্যাটা ফল আতা ক্ষীর—কমলা রঙের শাল—এক ডিম উল্
নতুন বইয়ের পাতা কবিতার যেইখানে সহজে ফুরাল
পুরোনোরা ; যেইখানে শেষ হল আমাদের শেষ ধুয়া টানা :
তারপর সেই স্বপ্ন সাধ এসে খুঁজে গেল আমাদের ভুল।

ধূসর পাণ্ডুলিপি। ফাল্গুন ১৩৬৩

কেন ব্যথা পাবে তুমি ? কোনোদিন

কেন ব্যথা পাবে তুমি ? কোনো দিন বেদনা কি দিয়েছি হৃদয়ে
যত দিন পৃথিবীতে তোমার আমার সাথে হয়েছিল দেখা,

তারপর আমি চলে গেলে পরে মনে কর যদি খুব একা
একা হয়ে গেছ তুমি—ভাব যদি কোথায় সে ঘাসের আশ্রয়ে
চলে গেল—ভালোবেসে, ঘৃর্ণা পেয়ে ; এই ব্যথা ভয়ে
জেগে থাক যদি তুমি অন্ধকারে—সেজো নাকো ব্যথার রেবেকা ;
তুমি প্রেম দাও নাই—জানি আমি—তবুও রক্তাক্ত কোনো রেখা
সোনার ভাঁড়ারে আমি রাখি নাই শীত মধু মোমের সঞ্চয়ে,
কুয়াশা হতাশা নিয়ে সরে আমি আসি নাই পৃথিবীর থেকে ;
তোমারে দেখেছি আমি পৃথিবীতে—নতুন নক্ষত্র আমি ঢের
আকাশে দেখেছি তাই—তোমারে দেখেছে—ভালোবেসেছে অনেকে—
তাহাদের সাথে আমি—আমিও বিস্ময় এক পেয়েছি যে টের—
গভীর বিস্ময় এক শুধু তার ম্লান হাত—চুল চোখ দেখে।
কুয়াশা হতাশা নিয়ে সরে আমি আসি নাই পৃথিবীর থেকে।

ধূসর পাণ্ডুলিপি। ফাল্গুন ১৩৬৩

কমলাবতীর ভালোবাসা

একটি খড়ের ঘর যেন এই মাটির সন্তান :
সারাদিন শুয়ে থাকে সূর্যের দেশে ;
উঁচু উঁচু জাম ঝাউ ঝিরঝির আবেশে
নেজনী নদীর ঢেউয়ে পেতে থাকে কান।

বিকেলের মরচে রঙের স্থির মেঘে
আতুর কাকের জন্ম হয়—
পৃথিবীর, তবু যেন তারা কেউ পৃথিবীর নয়।

কোলাহলে সাম্রাজ্যেরা ভেঙে গেলে পর
তারপর থাকে নাকো কোনো কলরব ;

ফাটল—খড়ের মাঠ—প্রচুর, নীরব,
ফরসা ডানার পাখি ঠোঁটে তার খড় ;
এইসব থাকে শুধু—পশ্চিমে সূর্যের গন্ধ : যেন মেঠো চাষা ;
মাটি যেন ধেনো ঝাঁজ, কমলাবতীর ভালোবাসা।

ঊষা। [?] ১৩৬৩

যখন ক্ষেতের ধান ঝরে গেছে

যখন ক্ষেতের ধান ঝরে গেছে—ক্ষেতে ক্ষেতে পড়ে আছে খড়
আম বাঁশ ডুমুরের পাতাগুলো মাঠে মাঠে করে মর্মর
ফাল্গুন ঘাসের ঘ্রাণে ফড়িং এ জীবনের গন্ধ ভালোবাসে
(বিশুষ্ক পুঁয়ের মাচা ঘিরে ঘিরে প্রজাপতিগুলো উড়ে আসে)
হলুদ-জর্দা-শাদা প্রজাপতি—হলুদ-জর্দা-নীল-লাল—
দুপুরের মাঠে শুয়ে এই পল্লী—নিস্তব্ধতা—এই খোড়ো চাল—
ভুতুড়ে স্বপ্নের মতো ডালপালা—নীরব নরম দাঁড়কাক—
তেরছা ডানার ছায়া : চিল বুঝি ?—লাল বনে শালিকের ঝাঁক—

এই সব ভালো লাগে—দু দিনেই চুল তবু হয়ে যাবে শাদা
এইখানে মাঠে শুয়ে ভালোবাসিবার পথে আরো ঢের বাধা
জমে যাবে ; এখুনি তো ফাল্গুনের মায়াময় অপরাহ্ণ ভরি
পরীর মুখের মতো কারা যেন সোনার পাখির পিঠে চড়ি
কুয়াশায় মুছে যায় মুছে গেছে ;—কোনো দিন ফিরিবে না আর
যদিও ফাল্গুন আছে—আমি আছি—প্রজাপতি আছে নীল লাল পাখনার।

[?] ১৩৬৪

তোমায় আমি

তোমায় আমি দেখেছিলাম বলে
তুমি আমার পদ্মপাতা হলে ;
শিশিরকণার মতন শূন্যে ঘুরে
শুনেছিলাম পদ্মপত্র আছে অনেক দূরে
খুঁজে খুঁজে পেলাম তাকে শেষে।

নদী সাগর কোথায় চলে বয়ে
পদ্মপাতায় জলের বিন্দু হয়ে
জানি না কিছু—দেখি না কিছু আর,
এত দিনে মিল হয়েছে তোমার আমার
পদ্মপাতার বুকের ভিতর এসে।

তোমায় ভালোবেসেছি আমি, তাই
শিশির হয়ে থাকতে যে ভয় পাই,
তোমার কোলে জলের বিন্দু পেতে
চাই যে তোমার মধ্যে মিশে যেতে
শরীর যেমন মনের সঙ্গে মেশে।

জানি আমি তুমি রবে—আমার হবে ক্ষয়,
পদ্মপাতা একটি শুধু জলের বিন্দু নয়।
এই আছে, নেই—এই আছে, নেই—জীবন চঞ্চল ;
তা তাকাতেই ফুরিয়ে যায় রে পদ্মপাতার জল
বুঝেছি আমি তোমায় ভালোবেসে।

দেশ। ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪

চিঠি এল

কত বছর পরে তোমার চিঠি পেলাম আবার :
এই সকালবেলার রৌদ্রে
আমার হৃদয়ে
বারুণীর কোটি কোটি সহচরী
তিমির পিঠ থেকে মকরের পিঠে আছড়ে পড়ে
নটরাজ্ঞীদের মতো
মহান্ সমুদ্রের জন্ম দিল।

আমি মুদ্রিত চোখ নিয়ে
তোমাকে অনুভব করি,
মনে হয়, যেন সূর্যাস্তের জাফরান আলোয়
শাদা গোলাপের বাগান ছড়িয়ে রয়েছে মাইলের পর মাইল,
একটা সজনে গাছও নেই,
তাই বিরাট আকাশচিল উড়ে এসে
শূন্য বাতাসের ভিড় আঁকাবাঁকা ব্যর্থ জ্যামিতির দাগ রেখে গেল শুধু,
তারপর দূর নীড়ের দিকে উড়ে গেল
হৃদয়ের পানীয়ের দিকে।

এই পৃথিবীর অব্যবহারের দিকে তাকিয়ে
কেমন একটা তুহিন ছিল হৃদয়ে :
তোমাকে দেখে ভেঙে গেল ;
সমুদ্র যখন (শীতের শেষে) আকাশকে ভালোবাসে
শত শত স্ফীত খোঁপার প্রেমিকা নারীর জন্ম দেয়। সে তার জলের ভিতরে
তাদের সমস্ত ক্ষুধা জড়ো ক'রে
আকাশের পানে গভীরভাবে নিক্ষেপ করে সে :

তোমার উত্তাল গম্বুজের উদ্দেশে
আমার অনুভূতির আলোড়ন—
সেইসব স্ফীত খোঁপার নারী
তোমার নিস্তব্ধ নীল ভাস্কর্যকে চূর্ণ ক'রে
গুঁড়োয় গুঁড়োয় পৃথিবীর শস্যক্ষেতে ছড়িয়ে দেবে ;
হৃদয়ের ভিতর প্রতিভার নব নব সন্তান কলরব করে উঠবে।

কবিতা। আষাঢ় ১৩৬৪

আমি

রাতের বাতাস আসে
আকাশের নক্ষত্রগুলো জ্বলন্ত হয়ে ওঠে
যেন কাকে ভালোবেসেছিলাম—
তখন মানবসমাজের দিনগুলো ছিল মিশর-নীলিমার মতো।

তার তৎপর হাত জেগে রয়েছে সৃষ্টির
অনাদি অগ্নিউৎসের প্রথম অনলের কাছে আজও
সমস্ত শরীর আকাশ রাত্রি নক্ষত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠছে তাই,
আমি টের পাই সেই নগ্ন হাতের গন্ধের
সেই মহানুভব অনিঃশেষ আগুনের
রাতের বাতাসে শিখা-নীলাভ এই মানবহৃদয়ের
সেই অপর মানবীকে।

সমস্ত নীলিমা-সময়—প্রেম কী উদার অনল সংঘর্ষময়ী বাসনা
মহনীয় অগ্নিপরিধির অন্তহীন কারুশিল্প সংগীতে লীন,
সেই নারীর গুঞ্জরণ শুনছি আমি
আমার গানে হৃদয় বিকম্পিত হয়ে উঠছে তার,

কোথাও মৃত্যু নেই—বিরহ নেই
প্রেম সেতুর থেকে সেতুলোকে—
চলছে—জ্বলছে দেখ। এল আলো
গতির গলিতশরীরী আগুনের ;
কোথাও প্রয়াসের শেষ নেই—আমি গতিবহ্নি, হে তপতীলোক,
হে অন্ধকার—
হে বিরাট অন্তরীক্ষ অগ্নি।

কবিতা। আষাঢ় ১৩৬৪

কনভেন্‌শন্‌

প্রথম বক্তা

এ যুগের, আমাদের এ যুগের
জন্ম হয়েছিল বটে শূকরীর পেটে ;
কলম ছেড়েছি তাই অসূয়ায়
কেননা খড়্গো র সাথে এঁটে
এখন কলম কাত রবে ঢের দিন ;
তারপর যখন সে মনীষীর হাতে
ধরা দেবে পুনরায়—ঢের দিন কেটে গেল বলে
তখন বেবুন ছাড়া কে উঠেছে মনীষীর জাতে ?

দ্বিতীয় বক্তা

পৃথিবীতে ঢের দিন টেকা গেল
সভাসমিতির ফাইল নেড়ে
জলের গেলাসে স্বচ্ছ সূর্যকে রেখে।
মদের পিপেয় সব বাছুরকে ছেড়ে
মনে হয়েছিল যত পিপে রয়ে গেছে

আর যত বাছুরের লোম,
ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তারা রয়ে গেছে ব'লে
আমাদের চামড়ার জুতোও নরম।
সে সব বাছুর তবু এত দিনে ষাঁড় হয়ে গেছে,
মদের পিপের থেকে (শেষ অবলেপ সব) উঠে
চাঁদের আলোয় সব গোল হয়ে বসে
আবার নতুন কিছু মাল গেছে জুটে।
তা না হলে দেবদূত হয়ে যেত এতদিনে সব,
আমাদের মর্মরের মত সিলিঙ
ভরে যেত তাহাদের ধবল শপথে ;
আমাদের চুল থেকে বার হত শিঙ।

তৃতীয় বক্তা

সমিতিতে—কৌন্সিলে—গ্যালারিতে যে সব মানুষ
সময় কাটায়ে গেছে আমাদের বক্তৃতা শুনে,
প্রত্যক্ষদর্শীর মতো তারা যেন সব
আমাদের উড়ে যেতে দেখেছে বেলুনে।
সময় গিয়েছে কেটে বিবেকের গোলালো তৃপ্তিতে
কথা বলে—কথা বলে—কথা বলে—তবুও এখন
আমাদের চেয়ে ঢের হালুবালু ভালো জানে বলে
বেবুন চালাবে মাইক্রোফোন।

চতুর্থ বক্তা

চেয়ে দেখি চারি দিকে আজ
যাদের চোয়ালগুলো লণ্ঠনের মতো
গরিলা বানাতে গিয়ে নিসর্গ যাদের

মানুষ বানাল প্রথমত—
কারণ, অনেক কাজে লিপ্ত থেকে ন্যুব্জ নিসর্গ
মাঝে মাঝে ভুলে যায় ইঞ্চি ইঞ্চি স্তর—
প্যারাশুট বেয়ে তারা নারী আর ধর্মযাজকের মতো নেমে
সূর্যের আলোর নীচে সব চেয়ে বিখ্যাত রগড়।
তবু এরা মদ পেলে খুশি হয় খুব,
নির্মল ভাঁড়ের মতো রসিকতা জানে,
শান্তির দেবতা কোনো যদি নেমে এসে ইহাদের
মাথা ধরে কান টেনে আনে,
আজ তবু ভুল করে দশজন নারী হত্যা করে
একজন দালারের ঋণ করে শোধ,
যেন শুধু সরমাকে নগ্ন করে সারমেয়দের
চাঁদের আলোর নীচে সব চেয়ে বিখ্যাত আমোদ।

পঞ্চম বক্তা

তবুও ঘোষণা করে চলে যাই :
ধরেছি অনেক মাছ স্ফটিকের মতো শাদা জলে,
নির্জন পবিত্র রৌদ্রে ঘুরায়েছি শাটিনের ছাতা,
পরিশ্রান্ত পা দুটোকে ঢুকায়ে চপ্পলে
ডোরাকাটা জামা গায়ে ঢিলে করে নিয়ে
বিবেক ব্যথিত হয় বলে আঁট নেকটাই খুলে
শাদা মোম জ্বেলে নিয়ে ঘুমোবার আগে
হঠাৎ দেখেছি শিঙ—চুলে।

ষষ্ঠ বক্তা

কিছু নয়—লঘু অবলেপ শুধু—দু-এক নিমেষ ;

এ যুগের জন্ম হয়েছিল তবু খানার ভিতরে ;
যখন বাজার বেশ শান্ত হয়ে রবে
অতিরিক্ত তেজি হয়ে—মন্দা হয়ে প’ড়ে
যখন সবার কাজ ন্যস্ত রবে শ্বেতাশ্বতর শান্ত ঘুঘুর মতন
ব্যাঙ্ক বুলিয়ন কাঁচা-পাকা মাল নিয়ে
পরস্পরের সব মুকুরের মতো মুখে চোখ চেয়ে দেখি
আমার কানের দিকে থতমত খেয়ে কেন রয়েছি তাকিয়ে !

পঞ্চম বক্তা
(উপসংহার)

এখন উইল করে চলে যাই তবু
হয়তো বা কোনো এক অতীতের তরে—
তবু আমি আশাস্থির—বর্তমান টপকায়ে
অতীতই তো আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে ;
এখন উইল করে চলে যাই তবে—
ছাতা লাঠি অমুকের হ্যাভেনা—দলিল—
সুন্দর জিনিস সব—বিপর্যস্ত এই পৃথিবীর—
এখন ভূতের হাতে খেয়ে গেল কিল।

আমাদের কপোলের একটি আঁচিল যেন তবু
আমাদের নাসিকার সরলরেখার মতো ডাঁশা
আমাদের জাহাজের—উড়োজাহাজের
লস্কর ও মিস্ত্রিদের জ্ঞাপন করেছি ভালোবাসা।
যদিও পৃথিবী আজ (আমাদের) টেনে নেয় জঙ্গলের দিকে,
রেডিয়োও ব্যবহার করে যায় বেবুনের ভাষা ;
আমাদের জাহাজের—উড়োজাহাজের
লস্কর ও মিস্ত্রিদের জ্ঞাপন করেছি ভালোবাসা।

কেননা আমরা ঢের পড়েছি বিজ্ঞান ইতিহাস—
অধমর্ণ কখন ঘুরেছে উত্তমাশা ?
আমাদের জাহাজের—উড়োজাহাজের
লস্কর ও মিস্ত্রিদের জ্ঞাপন করেছি ভালোবাসা।
আমরা দেখেছি ঢের সমাজের ভাঙন-গড়ন—
বিপ্লবের সূত্রগুলো ভুল গণিতের মতো কূট ভাসা-ভাসা ;
আমাদের জাহাজের—উড়োজাহাজের
লস্কর ও মিস্ত্রিদের জ্ঞাপন করেছি ভালোবাসা।

মানুষের সভ্যতা বিজ্ঞান ধর্ম : রাজমুণ্ড ঘিরে
দীনারের মতো গোল—অকৃত্রিম গোল হয়ে আসা।
আমাদের জাহাজের—উড়োজাহাজের
লস্কর ও মিস্ত্রিদের জ্ঞাপন করেছি ভালোবাসা।
সভ্যতাকে ভেঙে দিতে চায় যারা দাঁত বার ক'রে
তাহাদের হালুবালু জঙ্গলের ভাষা—
আমাদের জাহাজের—উড়োজাহাজের
লস্কর ও মিস্ত্রিদের জ্ঞাপন করছি ভালোবাসা।

অনুক্ত। শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৪

তুমি আলো

তুমি আলো হতে আরো আলোকের পথে
চলেছ কোথায় !
তোমার চলার পথে কি গো তপতীর
ছায়ার মতন থাকা যায় !
হয়তো আলোর ছায়া নেই ;

আলো তুমি তবুও তো—
আলো তুমি ছায়ারও মনেই ;
বাহিরে বিশাল ঐ পৃথিবীর জাতীয়তা অ-জাতীয়তায়
তুমি আলো।
তুমি আলো
যেইখানে সাগর নীলিমা আজ মানুষের সন্দেহে কালো,
ভাইরা ব্যথিত হলে ভাইদের ভালো,
মানুষের মরুভূমি একখানা নীল মেঘ চায়।

দেশ। শারদীয় ১৩৬৪

ইতিবৃত্ত

একদিন কোনো এক আঞ্জিরগাছের ডালে সকালের রোদের ভিতর
সোনালি সবুজ এক ডোরাকাটা রাক্ষুসে মাকড়কে আমি
একটি মিহিন সুতো নিয়ে দুলে নির্জন বাতাসে
দেখেছি স্বর্গের থেকে পৃথিবীর দিকে এল নেমে,
পৃথিবীর থেকে ক্রমে চলে গেল নরকের পানে ;
হয়তো সে ঊর্ণনাভ নয়।
অগস্ত্যের মতো নানা আয়ুর সন্ধানে
চোখে তার লেগে ছিল ব্রহ্মার বিস্ময়।

ঢের আগেকার কথা এই সব—তখন বালক আমি পৃথিবীর কোণে।
অশ্বত্থের ত্রিকোণ পাতায় যেন মনে হত বালিকার মুখ
মিষ্টি হয়ে নেমে আসে হৃদয়ের দিকে,
নদীর ভিতরে জলে যেন তার করুণ চিবুক
স্থিরতর কথা ভাবে—সমস্ত নদীর ঘ্রাণ আরো
অধিক উদ্ভিদ মাটি মাংস—ধূসর হয়ে থাকে ;

যেন আমি জলের শিকড় ছিঁড়ে এক দিন হয়েছি মানুষ,
কাতর আমোদ সব ফিরে চায় আবার আমাকে।

পৃথিবীর ঘরে তবু ফিরে গিয়ে—অভিভাবনায়
সেগুন কাঠের শক্ত টেবিলের ’পরে
নীরবে জ্বেলেছি আলো ছিপছিপে ধূর্ত মোমের
তবুও যখন চোখ নেমে এল বইয়ের ভিতরে
এক—আধ—দুই ইঞ্চি ঘুমের ভিতরে ডুবে গেল,
কঠিন দানব এক দাঁড়াল মুখের কাছে এসে—
যেন আমি অপরাধে বিবর্ণ বালক
উলঙ্গ পরীর চুল—কিংবা তার ঘোটকীয় লেজ ভালোবেসে।

তবুও আকাশ থেকে পুনরায়—ধীরে
জলপাই-ধূম্র এক ভোরবেলা উদ্‌গীরিত হলে
সকলের আগে ক্ষুদ্র জাগরূক বর্তুল দোয়েল
তখনও বাতাস পেয়ে জাগে নাই বলে
নদীর কিনার দিয়ে শঙ্খচূড় সাপের মতন
আমার এ শরীরের ছায়াকে বাঁকিয়ে নিতে গিয়ে
সহসা দেখেছি তুমি কর্কচের মতন আলোকে
শ্বেতকায়া সাপিনীর মতন দাঁড়িয়ে।

উত্তরসূরি। পৌষ ১৩৬৪

কোনো ব্যথিতাকে

এখন অনেক রাতে বিছানা পেয়েছ।
নরম আঁধার ঘর
শান্তি নিস্তব্ধতা ;

এখন ভেবো না কোনো কথা।
এখন শুনো না কোনো স্বর।
রক্তাক্ত হৃদয় মুছে
ঘুমের ভিতর
রজনীগন্ধার মতো মুদে থাকো।

দেশ। ২৫ মাঘ ১৩৬৪

শবের পাশে

(পুরোহিতের প্রার্থনা : অসামাজিক)

মৃত ?
তবুও সে মাটি নয়।
মাথার চুল যেন আরো অনেক কাল ব্যবহার করবে সে—
তার হাতির দাঁতের মতো ধূসর কপালের উপর
ভোরের অজস্র দাঁড়কাকের মতো চুলের আনন্দ,
চুলের আবেগ : যেন মিশরের মহীয়সী শাল পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে
লাল নীল কাচের জানালা খুলে দিয়ে
নব নব ভোরের রৌদ্র ও নীল আকাশকে আস্বাদ করবার জন্যে !

কোন্-এক অন্ধকার লাইব্রেরির নিস্তব্ধ হলুদ পাণ্ডুলিপির মতো
দেখলাম তাকে :
শ্রাবণের রৌদ্রে রেবা নদীর মতো ছিল যে এক দিন ;
সে আর ঘুমোবে না কোনো দিন,
স্বপ্ন দেখবে না ;
তার মৃত মুখের বিমর্ষ মোমের গন্ধকে ঢেকে ফেলে
শুধু তার ঘন কালো চুল
সেই আবহমান রাত্রি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জেগে রয়েছে
কোনো এক দূর, ভালো দ্বীপের মতো

যেখানে জাগ্রত পাখিদের প্রেম
ধূসর সমুদ্রকে জাগাতে পারে না আর।

যে সমুদ্রের কোনো বেলা নেই,
পাণ্ডুর দেহের নীরবতা নিয়ে তারই ভিতর নামল সে ;
জ্যামিতির ভিতর থেকে রূপ তার কুহক হারিয়ে ফেলেছে ;
তারপর বিশৃঙ্খল মাংসের দুর্বলতা নিয়ে
পৃথিবীর বড়ো বড়ো নাবিকের বিবর্ণ ভয় ও বিস্ময়ের জিনিস সে।

এই নারী আজ নিস্তব্ধ ;
মনে হয় যেন কোনো সুদূর দ্বীপে ঘুম রয়েছে শুধু ;
এর দেহের ভিতর বিবর্ণ দারুচিনি ছালের গন্ধ,
এর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়
কোনো অসীম নির্জনতার ভিতরে উঁচু উঁচু গাছের ধীর আলোড়ন যেন
(আরও নিস্তব্ধ)
এই মৃতার শরীরে সেই দূর দ্বীপের সবুজ শব্দ—স্বাদ—ছায়া-রৌদ্রের বুনুনি—

আমলকী গাছে কোকিল এই নিষ্পাপ স্রোত অনুভব করেছে,
তাই সে ধূসর সম্রাটের জন্যে সংগীত খুঁজতে চলে গিয়েছে :
মৃত্যুর মহান্ আত্মীয়তা
পৃথিবীর পাখিদের কাছেও মৈথুনের চেয়ে প্রগাঢ়।

কবিতা। চৈত্র ১৩৬৪

রজনীগন্ধা

এখন রজনীগন্ধা—প্রথম—নতুন—
একটি নক্ষত্র শুধু বিকেলের সমস্ত আকাশে ;
অন্ধকার ভালো বলে শান্ত পৃথিবীর

আলো নিভে আসে।

অনেক কাজের পরে এইখানে থেমে থাকা ভালো ;
রজনীগন্ধার ফুলে মৌমাছির কাছে
কেউ নেই, কিছু নেই, তবু মুখোমুখি
এক আশাতীত ফুল আছে।

কবিতা। চৈত্র ১৩৬৪

তোমার আমার

তোমার আমার ভালোবাসার এই
পথ ছাড়া পথ নেই
জেনে নদীর জলে চেয়ে দেখি
কালো নদীর রঙ মিশেছে এসে।

এই দু রঙই ভালো,
শাদা পাখির কালো
কালের পাখি সাথী
উড়ছে দেশে দেশে।

তোমার আমার ভালোবাসা—তা কি
একটি পাখি—একটি শাদা পাখি !
সময় কি তার পথ দেখিয়ে দিয়ে
সঙ্গে চলে ভেসে।

শাদা পাখিই কালো পাখি কি-না
চিনি না আমি, চিনি না চিনি না ;

কালো-শাদার ধাঁধার ব্যথা সব
ফুরিয়ে গেছে তোমায় ভালোবেসে।

আনন্দবাজার পত্রিকা। শারদীয় ১৩৬৫

সুদর্শনা

সুদর্শনা মিশে যায় অন্ধকার রাতে।
নদীর এপারে ব'সে একদিনও দেখিনি ওপার,
প্রকৃতি চায় নি সেই মেয়েটি এ আলো আর রাত্রির আঘাতে
পৃথিবীকে কূট চোখে দেখে নেবে—বুঝে নেবে জীবনের গ্লানি অন্ধকার।
চায় নি সে কলমীর ফুল ভরা রক্তাক্ত প্রান্তরে
অথবা চিন্তায় রূঢ় ক্ষেম সৎ পাণ্ডুলিপি যা খণ্ডন করে
মৃত্যুকে দেবার আগে এই সব একবার তুলে নেবে হাতে

প্রথম ঢেউয়ের থেকে দূর সূচনার মতো নদীর ভিতরে
অরবে সে চলে যায়—এক খণ্ড রাত্রি মনে হয়
পৃথিবীর রাত্রিকে যেন তার অন্তরের কাছে ;
সব হাঁস ঘুমালেও নক্ষত্রালোকিত হংসী আছে
সমুদ্রের পারে এসে বড়ো চাঁদ এর চেয়ে নির্জন বিস্ময়
দেখে নিকো কোনো দিন ; অনেক পবনে মৌমাছিদের ভিড়
যদিও খেয়েছে ঢের আকাশের বাতাসের মতন শরীর
তবু সে শরীর নয়—মাংসের চোখে দেখা নক্ষত্রেরা নয় তার তরে।

উষা। শারদীয় ১৩৬৫

সবারই হাতের কাজ

সবারই হাতের কাজ শেষ করে নিতে হবে পৃথিবীতে আজ।
তাদের ভিতরে তবু (মুষ্টিমেয়) কেউ-কেউ ভালো ক'রে করে ;

তাদের রুধিরে আছে জীবনের সম্পূর্ণ গরজ
সবই অভিনয় জেনে—বিখ্যাত মঞ্চের 'পরে (তবুও তো) চড়ে।
ভালো ক'রে পরে নেয় অবিকল কালো পরিধান ;
সেখানে ক্বচিৎ প্রেম সততা মহত্ত্ব আছে অগণন দালালের বুকে
যেখানে ক্বাথের দিকে চেয়ে ভাঁড় বলে যায় 'অনোরণীয়ান'
দার্শনিক গাধা বলে ফেঁসে যায় দু-এক চাবুকে,
সেখানে তবুও তারা চাঁই সাজে, মন্ত্রী হয়—মুদ্রারাক্ষস
কিংবা শ্লীল প্রেমিকের খেলা খেলে দগ্ধ করে চাঁদনীর চক ;
কানে ধরে টেনে এনে ইহাদের মাথার তাড়স
বার করে দিতে চায় অতি সন্দিহান বিদূষক ;
তবুও বিয়োগনাট্যে প্রদীপ্তির কাজ করে যারা
—টেবিলে ভাঁড়ের সাথে কাসুন্দিতে প্রায়শই পেয়েছে আমেজ,
তবু জানে নিজেদের পরিধানে গুরুতর বিষয়ের জামা,
ভাঁড়ের ধুতির ভাঁজে লুকায়ে রয়েছে শুধু লেজ।

এই পরিপূর্ণ জ্ঞানে বোঝে তারা তাহাদেরও মেরুদণ্ড বেয়ে
ব্যাঙাচির মতো কিছু সততই নড়ে যায় ধীরে ;
এ না হলে অনিরুদ্ধ, কৌটিল্য ও কর্ণ, দেবযানী
ভূত হয়ে মিশে যেত কোন্ কালে নাট্যের তিমিরে
এখনও অঙ্গার থেকে জন্ম নেয় এই সব বীজ ;
চেয়ে দেখে ঊর্ধ্বে মেঘ—সম্মুখেতে সিংহ মেঘ ষাঁড়
পায়ের ভঙ্গির নীচে কর্কট বৃশ্চিক
পাদপ্রদীপের আলো কেবলই খেতেছে অন্ধকার।
নাট্যের লিখন তারা—তবু তারা পড়েছিল মৃগশিরা নক্ষত্রের নীচে,
কথোপকথন গান স্বগতোক্তি নেপথ্যের রব
শিশিরবিন্দুর মতো শব্দ করে দর্শকের কানে ;
গ্যালারিতে মৃগীরোগাতুর নীল মহিলারা সব

কলরব করে ওঠে ভয়ংকর করতালি দিয়ে
চামুণ্ডার মতো নেচে ছিঁড়ে ফেলে চুল
মাথার উপরে সব অগণন ভূতযোনি দেখে
তারা আর তাহাদের প্রণয়ীরা নাচায় লাঙ্গুল ;
অতএব যবনিকা মাঝপথে নেমে পড়ে বটে
ম্লান হয়ে নিভে আসে পাদপ্রদীপের গোল আলো,
তবুও মঞ্চের 'পরে অনিরুদ্ধ দেবযানী কচ
নিজেদের ভাষা ভেঙে একটুও হয় না দাঁতালো।

ময়ূখ। অগ্রহায়ণ ১৩৬৫

তোমায় আমি

তোমায় আমি দেখেছি ঘুরে ফিরে
দেয়াসিনীর মতন শরীরে
খুঁজছ এসে নিজের মনের মানে
কাকে ভালোবেসে যেন—ভালোবাসার টানে।

অনেক দূরের জলের আলোড়ন
যেন তোমার মন ;
সেই নদীর জল
যেন আমার মনের কোলাহল ;
তোমায় খুঁজে পায় না, তবু
ঘুরছে আমরণ।

অন্ধকারে ঘুমিয়ে পড়ার আগে
শঙ্খসাগর এ রোদ ভালো লাগে।
এখুনি ঘুম এসে যাবে, কাছে

কালের কালো মহাসাগর আছে।

দেশ। ২০ অগ্রহায়ণ ১৩৬৫

পৃথিবীর উদ্যমের মাঠে

পৃথিবীর উদ্যমের মাঠে মাঠে যারা খেলা করে,
কিংবা যারা অগণন ঘরের ভিতরে
আকাশকে টের পায় ;
কোথাও আকাশ আছে মনে করে
কোনো এক নিদারুণ জ্যামিতিক বেদীর মতন,
কিংবা যারা দীর্ঘ—দীর্ঘতর মঞ্চে করে আরোহণ
ক্লান্ত হয় নাকো যারা যশে জয়ে কপালের ঘামে—
এই সব অবিরাম ধুলো যারা কিনে নেয় নক্ষত্রের দামে,
অক্লান্ত থাকুক তারা—ভয় পাক—ক্রমে ক্রমে স্থবির বয়স
কেড়ে নিক তাহাদের—

আশ্চর্য নিশীথে আজ ভাবি আমি ; যুবা আমি ?
হয়তো যুবক নই

অই সব নক্ষত্রেরা—এই শান্তি—শিশিরের এই শব্দ সব
মসৃণ চামড়া নীল বাদুড়ের—সৃষ্টির এইসব অনাদি বয়স
আমাকে দিয়েছে অব্যাহতি—
চারি দিকে কেবলই বন্দর আর নগরের কথা কাজ শব্দ আর গতি
বাঘের মতন যেন হরিণের ঘাড়
ভেঙে বারবার ইতিহাসে অন্ধকার

যারা রৌদ্রে সারা দিন টহল দিচ্ছে পৃথিবীতে

হুণ্ডি ফাঁদছে লুটছে ঘুরছে সাগরে,
কিংবা যারা ভিক্ষা চেয়ে দোরে দোরে ফেরে,
যারা তিক্ত কিংবা যারা মদের পিপের মতো মিঠে ;

এখন করুক তারা স্বার্থের প্রয়োজনে রঙ্গ আর রণ,
অথবা জলের গায়ে কিংবা পাথরের বুকে লিখে যাক নাম,
হোক তারা ইন্দ্রপ্রস্থ মিশরের মতো দীর্ঘ থাম,
সমুদ্রের মতো করে করুক পৃথিবী আলোড়ন ;

অথবা দেখুক ভিক্ষাপাত্রের ফাটল আরো কী করে চৌচির হয়ে যায়
ক্ষয়িত হয়েছে যা, তা আরো পায় ক্ষয় ;
লক্ষ টন ইতিহাসে ছটাক কর্পূর
আছে কি না জেনে আবার গড়ুক রোম লন্ডন বেবিলন উর।

নবান্ন। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬

কোনো-এক জ্যোৎস্না রাতে বারবার শিকারির গুলির আওয়াজ শুনে

শূন্য রূঢ় অসুন্দর : কতবার ঘুরে ফিরে দেখিতেছি তাহাদের পৃথিবীর পথে :
দিনরাত ও বস্তিটা...গলায় বুঝিছে দড়ি তরুণীর...জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতায়
বারবার গুলির আওয়াজ ;
ইচ্ছা হয় কোনো দূর প্রান্তরের কোলে গিয়ে শ্যামাপোকাদের ভিড়ে—
কাশ মাখা সবুজ শরতে
বসে থাকি ; আবার নতুন করে গড়ি সব ; আবার নতুন করে গড় তুমি ;
বিধাতা, তোমার কাজ সাঙ্গ হয় নাই ;
মানুষ ঘুমায়ে থাক—এ সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাক কাচপোকা মাছরাঙা

পানকৌড়ি দয়েল চড়াই।

এক দিন হবে নাকি তাই ?
বিধাতা, তোমার কাজ সাঙ্গ হয় নাই।

কবিতা মেলা স্মারক গ্রন্থ। ভাদ্র ১৩৬৬

নির্জন হাঁসের ছবি

নির্জন হাঁসের ছবি দেখি স্বপ্নে—চারি দিকে অন্ধকার ঘর
রুপালি গরিমা তার—যেন হীরা তরবার ঘুমের ভিতর
যত দূর চোখ যায় কাহার মুখের মেধা নদী যেন স্থির
কাহার মুখের মেধা যেন অরণ্যেরা
রাত যেন লেবুর ফুলের মতো নক্ষত্রের গন্ধ দিয়ে ঘেরা
শান্ত সব প্রতিবিম্ব—কবেকার জীবনের এইসব বেদনার স্তর।

কবিতা। আশ্বিন ১৩৬৬

বড়ো বড়ো গাছ

বড়ো বড়ো গাছ কেটে ফেলেছে তারা।
এইসব উঁচু উঁচু গাছকে আমার ইচ্ছা লালন করেছিল ;
আমার দেহের ভিতর রক্তাক্ত কাঠের গন্ধ,
আমার মনে শহর ও সভ্যতার মতো শূন্যতা,
আমি দিনের আলোয়
কিংবা নক্ষত্র যে আভা আনে রাতের পর রাতে
এই মৃত গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি।

কারা যেন অগ্রসরের কবিতা লিখছে কোথায়
কমিউনিজ্‌মের স্তম্ভ তৈরি করেছে
মানুষকে দাঁড় করাতে চাচ্ছে আজও মানুষের প্রয়াস।

অনেক দিন দেখেছি ; উঁচু উঁচু গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে সব ;
আরো অনেকদিন দেখেছি : উঁচু উঁচু গাছ কাকের ভিড়ে
          নীল জাফরান হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সব ;
তবুও তারপর দেখেছি : রাত্রির সমুদ্রের পারে
          নিস্তব্ধ লুক্কায়িত দ্বীপ যেন এক-একটা গাছ—
হৃদয়কে বাদুড়ের মতো আকাশের দিকে ভেসে যেতে বলে—

কিন্তু তোমার এ বিস্ময় থাকুক
গাছ নয়—মানুষকে দাঁড় করাও।

কবিতা। আশ্বিন ১৩৬৬

মনকে আমি নিজে

এই জীবনের ছকে-কাটা খেলার ঘরে এসে
হিসেব করে তোমায় ভালোবেসে
আমি যদি জয়ী হতাম—আলো পেতাম না তো।
ভালোবাসার অকূল সাগর বটের পাতায় ভেসে
পাড়ি দিতে চেয়েছি আমি তোমাকে ভালোবেসে।

*

তোমায় ভালোবেসেছি বলে ঋণ
অথবা চুরি করে আমি এই জীবনের দিন
পেয়েছি—চোর ভালোবাসার ধর্মে জ্ঞানী ব’লে
মরণনদী মুছে জীবননদীর পটভূমি
জেনেছে এই নিখিলে শুধু রয়েছ একা তুমি।

*

যদি এমন চলে যাবে তবে
কালের মহাসাগর হয়ে রবে
আমার হাতের জলের অঞ্জলি—

মন ছাড়া কেউ বোঝে না তাই মনকে আমি বলি।

কবিতা। আশ্বিন ১৩৬৬

তুমি যদি

তুমিই যদি চলে যাবে তবে
হরির নামের চেয়েও কেন বড়ো হয়ে রবে
তোমার জন্যে আমার ভালোবাসা
অনন্তকাল বটের গাছে পাতার যাওয়াআসা
তুমি বুঝি যাবে একটিবারের জন্যে এসে ?

যদি এমন চলে যাবে তবে
কোনো দিনও স্থির হয়ে কি রবে
গাছের পাতা জীবননদীর জল
তোমায় পেলে পাবে সে শেষ ফল
ঘুমে—অন্ধকারের ঘুমে এসে।

জানি নদী নীল সাগরও দুদণ্ডে শুকায়
চিতায় শরীর ফেলে রেখে মনও কোথায় যায়,
তোমার আমার ফুরিয়ে যাবার সময় তবু নেই
জন্মে জন্মে—তবুও জন্মে জন্মে ভালোবেসে।

নবান্ন। অগ্রহায়ণ ১৩৬৬

সূর্য এলে

সূর্য এলে মনে আসে পৃথিবীর এক কোটি প্রান্তরের কথা—
অসংখ্য আঞ্জির গাছে ঊর্ণনাভ—মাছি ;
জীবনকে পুনরায় ময়দানবের মতো বুনন করার লোলুপতা

যদিও পিঙ্গল ধূমা কোথাও রয়েছে কাছাকাছি ;

ইতস্তত মিনারের রুপালি আগুন ;
কেলাসিত হয়ে আছে নক্ষত্রের দোষ ;
আপাদমস্তক ঘিরে যেন তাহাদের
মৃত এক ডাইনীর সজীব মুখোশ ;

দাঁড়ায়ে রয়েছে তারা ; মিনারবিহীন
মূর্খ দেশ-দেশান্তের নিচু নীলিমাকে
পুনরায় ঊর্ধ্বে তুলে—সূর্যের কাছে—
যতদিন গিরেবাজ পাখি বেঁচে থাকে।

দিকে দিকে বুলভার জ্বলে ওঠে, তাতে
মানবিক চোখগুলো বিকশিত হয় ;
জেব্রা ক্যাঙারু পুমা হলুদ রঙের বাঘ চিতা
পরস্পরের প্রতি মুখোমুখি অনুভাবনায়

চেয়ে থাকে জানলার চিলে ফাঁক দিয়ে,
এক মুঠো ডাইনামোর অন্তরাল থেকে,
স্টেশনের গ্যাসোলিন-মুণ্ডের পিছে ;
কৃমিকীটদের মতো স্থির নিখুঁত বিবেকে

খোঁড়লের মতো কুরে কুরে খেয়ে ফেলছে হৃদয় ;
দিকে দিকে শুরু হল নগরীর ভোর—
এই সব কথা কিছু অতীতের। এক চুল ভ্রান্তির বিপদে
এখন সকল দেশে রয়েছে ভোরের হাড়গোড়।

উত্তরসূরি। পৌষ ১৩৬৬

জল

তোমায় ভালোবেসেছি আমি, তাই
অন্ধকারে ঘাসের গন্ধ পাই ;
কালো বেতের ফলে নিবিড় দিন
কোথার থেকে আবার এল ভেসে।

মনে পড়ে, জলের মতন ঘুরে অবিরল
পেয়েছিলাম জামের ছায়ার নীচে তোমার জল,
যেন তোমার আমার হাজার হাজার বছর মিল,
মনের সঙ্গে শরীর যেমন মেশে ;

মৃত্যু এলে, মরে যেতে হবে
ভালোবাসা নদীর জলের মতন হয়ে রবে,
জলের থেকে ছিঁড়ে গিয়েও জল
জোড়া লাগে আবার যেমন নিবিড় জলে এসে।

দেশ। ১২ চৈত্র ১৩৬৬

মাঝে মাঝে

মাঝে মাঝে অন্য সব সত্য থেকে ছুটি
নিয়ে সব জল হয়ে মিশে যেতে চায়।
পৃথিবীর চলমান স্পন্দনের বিহ্বলতায়
রণ আছে, রক্ত আছে, রুজি আর রুটি
আছে—খাঁটি ভালোবাসা দিতে গিয়ে ত্রুটি
হয়ে যায় ; অন্ধকারে হৃদয়ের দায়
বিমুক্ত করার মতো কাকে আর পায়
জল ছাড়া ? চারি দিকে কেবলই ভ্রূকুটি

ছড়িয়ে এ পৃথিবীতে রক্তছাইরেখা
এঁকে মুছে ফেলে দিতে গিয়ে ইতিহাস
নদীর নিবিড় জলে কেবল জলের শব্দ খোঁজে ;
যেন কাছে—কোথাও গভীরভাবে রয়েছে সহজে
পৃথিবীর স্নিগ্ধ অন্ধকার জল একা :
কবের বিলীন হংসী আর তার হাঁস।

দেশ। ৩১ বৈশাখ ১৩৬৭

এখন ওরা

এখন ওরা ভোরের বেলা সবুজ ঘাসের মাঠে
হো হো করে হাসে—হো হো হি হি করে
অসংখ্যকাল ভোর এসেছে—আজকে তবু ভোরে
সময় যেন ঘোড়ার মতো নিজের খুরের নাল
হারিয়ে ফেলে চমকে গিয়ে অনন্ত সকাল
হয়ে এখন বিভোর হয়ে আছে ;
মাঠের শেষে ঐ ছেলেটি রোদে
শুয়ে আছে ঐ মেয়েটির কাছে।
অনেক রাজার শাসন ভেঙে গেছে ;
অনেক নদীর বদলে গেছে গতি ;
আবহমান কালের থেকে পুরুষ-এয়োতি
এই পৃথিবীর তুলোর দণ্ডে সোনা
সবার চেয়ে দামী ভেবে সুখের সাধনা
নষ্ট করে গিয়েছে তবু লোভে ;
ওরা দুজন ভালোবাসে অনন্ত ভোর ভ'রে
এ ছাড়া আজ সকল সূর্য ডোবে।

পূর্বপত্র। ভাদ্র ১৩৬৭

ডালপালা নড়ে বারবার

ডালপালা নড়ে বারবার,
পৃথিবীর উঁচু উঁচু গাছে
কথা আলোড়িত হয় ; কেমন সে কথা।
অন্ধকারে শঙ্খ নুড়ি ঝিনুকের কাছে
অবশেষে একদিন থেমে
মনে হয় ক্লান্তির সাগর
মাঝে মাঝে চেনাতে চেয়েছে তার
দুই ফুট জমিনের ঘর।

শূন্যে শূন্যে ঢের মেঘ মুছে গেছে, তবু
নীলিমায় গা ভাসিয়ে দিয়ে সাদা মেঘ
সারাদিন কী চেয়েছে তবে,
সারারাত কিসের উদ্‌বেগ।

কেন এই জীবনের সাগরে এসেছি,
হেসেছি খেলেছি কথা বলে গেছি কাজ করে গেছি,
আরো কিছু আলো পেলে ভালো হত ভেবে
তবু তার মূল্য সেই প্রাথমিক আলো হারিয়েছি।

হয়তো সূর্যই আলো—আলো মনোহীন ;
মানুষের মনন হৃদয়
আলোহীন, অথবা, যা আলো ছিল—আজ
আলো চাই নব আলো আশার আনন্দে জ্যোতির্ময়।

দেশ। শারদীয় ১৩৬৭

যাত্রা

জানি না কোথাও শুভ বন্দর রয়েছে কিনা ;
কোথাও প্রাণের কল্যাণ-সূর্যালোক আছে ?
কোথাও এ অসময় সময়ের নদী পার হওয়া যায় ?
পার হলে সাগর কি শান্তি আলো মুক্তির ভেতরে
যাত্রীকে আশ্বাস দেয় ?
মানুষের ভঙ্গুর সাহস ভয় যাত্রা আর জীবনের মানে
স্থান পায়—স্থানে এসে পরিণতি পায় ?
হয়তো বা পেয়ে যায় ; অথবা সকলই অন্ধকার।
মানুষ যাত্রা করে—
যাত্রার প্রথম ফল সাগরের পথে নিরাপদে চলা
বন্দরের দিকে নিরুদ্‌বেগে যেতে পারা
বন্দরের থেকে বন্দরের বাঁধা পথ ছেড়ে দিয়ে
সমুদ্রের বড়ো আবিষ্কারে নেমে পড়া ;
হৃদয় অন্তিম ফল হিসেবে আনন্দ চায়
শান্তি চায় নীল মহাসাগরের ভোরের আলোয়
আর একবার তার তারার আলোয়।
মানুষ জাহাজে চড়ে জীবনের সমুদ্রে ভিড়েছে ;
সাগর চলেছে—সময় চলেছে—মানুষ চলেছে—
ক্যাবিনের ছ্যাঁদার ভেতরে ঢুকে একা
(সাগরের স্পন্দনে শরীর অসহায়
বমি করে—কাঠবমি হল যেন—
নাড়ি যেন ছেড়ে গেছে বলে মনে হয়।)
ডেকে পাইচারি করে একা। একা। একা।
বর্শার ফলার মতো আলো এসে পড়ে।
স্তব্ধ হয়ে কোনো এক বিন্দুর ভিতরে থেমে থাকা।

অনেকের সাথে পরিচয় হয়, হাসিগল্প চলে,
মন ব্যথা পায়, বোকার মতন লাগে, ভীষণ অবাক মানে ;
শোকাবহ ক্লান্তি রয়ে গেছে ; ভয়াবহ বেদ আছে :
সূর্যের নক্ষত্রের জাহাজের বিদ্যুতের আলোর ভিতরে
কেউ কেউ গুঞ্জরণ উচ্চারণ করে যায় ;
কেউ কেউ অবচেতনায় চেপে রেখে দিতে চায় সব ;
কারো কারো মন স্বভাবত নিহতচেতন ;
হাসছে খেলছে গুলগল্পে গরমে মেতে আছে—
খাচ্ছে—ছুটছে—চালানি মালের মতো দিনরাত দিচ্ছে নিচ্ছে
দেহ—ভালোবাসা—(দেহমাংস)—
সারাদিন চামড়া মাংস বিকিকিনি শেষ হয়ে গেলে
তারার আলোয় এসে ঘ-মানুষের মতো এরাও মানুষ :
আচ্ছন্ন করুণ, চেতনা জেগেছে, পথ নেই, বিন্দুর ভিতরে
স্তব্ধ হয়ে রয়েছে জাহাজ—মুর্গির খাঁচার মতো যেন ;
তবুও তা নয়—
আকাশ বিমুক্ত হয়ে আছে।
অনন্তে যে কথা আছে সব স্পর্শসহ
বেতারের বুকে এসে ধরা পড়ে ;
জিজ্ঞাসার আলোড়ন—প্রশ্নের মীমাংসা—লেনদেন
কেবলই চলেছে সারা দিন।
জাহাজ চালায় যারা বুদ্ধিমান—নৌবিদ্যাপ্রবীণ
তবু বলে : জাহাজডুবির গল্পে সাগর ভরাট,
হাজার বছর ধরে কেবলই ডুবছে ;
যাত্রীরা মরে গেছে—নতুন যাত্রীর দল তারপর,
নৌজ্ঞান এবারে গভীরতর হয়েছে যদিও
কেবলই বিপদ আছে বাঁকে—পথে—তবু
যাত্রীরা বিপন্ন চিরদিন—

মরে যেতে হবে—যাত্রী, তবু চলো—
না ডুবেও ডুবে যাওয়া যায় দুটো সাগরের জলে—
না মরেও প্রতি মুহূর্তেই তবু মরে যেতে হয় ;
জীবনের বিনিপাত প্রতি নিমেষেই আছে—
প্রতি নিমেষেই জীবন মরছে, যাত্রী, সাগরনির্জন তলাতলে
কোথায় ডুবছে চিন্তা অনুবেদনায় ভরপুর যাত্রীদের মাথা
বুদ্‌বুদের শূন্যে ভরপুর
মৃত মাথা আপনার জীবনের খবর রাখছে—
কত বার মৃত্যু হল ভাবছে—গুনছে—
সাগরের তলে—আরও অন্ধকার তলে লীন হয়ে গিয়ে তবু
জাহাজের ডেকের ওপরে ফিরে আসা,
খাওয়া, হাসা, খেলা করা, কথা বলা, চিন্তা করা,
বন্ধু হওয়া, ভেক ধরে থাকা, পরামর্শ দেওয়া,
রেজিস্ট্রির সময় হয়েছে ভেবে খাতায় স্বাক্ষর করে বিয়ে করা
কাকে যেন : জীবন তো বিবাহিত হয়ে ছিল ঢের বার ;
বারবার ; বিচ্ছিন্ন হয়েছে বারবার
হয়তো এ জন্মে নয়—এই দিকে—এই প্রান্তে নয়—
চারি দিকে অন্ধকার বেড়ে ওঠে ;
ঘুমোবার ভান করে পড়ে আছে ঢের যাত্রী
ভান ঢের ভালো হলে অঘোরে ঘুমোবে ;
কারো চোখে ঘুম নেই ;
মৃত্যু হলে শব সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হয়—
সেই মৃত্যু নেই ;
অন্য এক হেঁটে চলা বসে থাকা কথা শেষ—
কথা শেষ না করার মৃত্যু আছে।
এক জোড়া তাস নিয়ে জাদুকর হয়ে
খেলা করা যেত যদি এই অন্ধকারে,

জাহাজ ভর্তি সব পুরুষমেয়েকে যদি খানিক উড়ুক্কু ভোজবাজি
কী করে টুপির থেকে অনেক পায়রা বার ক'রে
উচ্ছ্বাসে ওড়ানো যায়—দেখিয়ে ওড়ানো যেত হৃদয়কে
অনন্ত রাত্রির দিকে উন্মাদ উৎসবে—
জাহাজডুবির গল্পে সাগর ভরাট,
হাজার বছর ধরে কেবলই ডুবছে,
যাত্রীরা মরে গেছে—নতুন যাত্রীর দল তারপর,
নৌজ্ঞান এবারে গভীরতর হয়েছে যদিও
কেবলই বিপদ আছে বাঁকে—পথে—তবু
যাত্রীরা বিপন্ন চিরদিন—
মরে গিয়ে তবু
মৃত্যুশীল—মৃত্যুর নিঃশেষ নেই—নেই—যাত্রী চলেছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা। শারদীয় ১৩৬৭

বিকেলের আলোয়

রাতের কিনারে বসে নয়
বিকেলের আলোয় আমি স্বপ্ন দেখলাম :
কোন্ এক সুদূর মরুভূমিতে চলে গেছি
সেখানে গভীর জ্যোৎস্নারাত
বালির গাছে বালুকণার শব্দ
(পৃথিবীর পাতা ঝরার মতো)
স্ফটিকের নির্জন আলোর মতো বাতাস
কুমারীর নির্মল মসৃণ দেহের মতো।
কয়েকটি প্রেত উড়ে বেড়াচ্ছে সেখানে
মানুষের শব্দে চমকে হাওয়ার ভিতর হারিয়ে গিয়ে।
মরণের কত শত শতাব্দীর পর

সেই ধূসর পরিধি খুঁজে পাব আমি :
তার সেই হাত আমার জিভকে আচ্ছন্ন করবে
স্ফটিক আলোর মতো বাতাসের অনন্ত নিস্তব্ধতার ভিতর ?

পূর্বপত্র। আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

এখন রাতের শেষে

এখন রাতের শেষে আবার প্রান্তর আছে শ্যাম হয়ে প্রান্তরে ছড়ায়ে ;
ঊর্ণনাভের জালে আবার নেমেছে ব্রহ্মা হৃদয়ের কাজ বুঝে নিয়ে ;
সেইখানে শান্ত সব শিশিরের সূপে
ভোরবেলা থেকে থেকে জ্বলে ওঠে আধ ফুট সূর্যের রূপে ;
ঘাসের উপরে সব ভূতেরা গিয়েছে খেলে—জ্যোৎস্নার রাতে
মহেঞ্জোদড়োর থেকে এসে—
তাদের গায়ের ঘ্রাণ এখনও বাতাসে লেগে আছে মনে হয় ;
একটি ধবল ঘোড়া সন্দেহ আতুর হয়ে পল-নিপলের অবলেশে
তাকায়ে রয়েছে দূর চক্রবাল নীলিমার কুয়াশার দিকে :
সেইখানে কারা তবু আছে :
অনেক ধূসর ঘোড়া খেলে যেত যদি কোনো মেহগনি অরণ্যে সেখানে,
সোনালি সবুজ শাদা কাকাতুয়াগুলি জটিল শিকড়শীল গাছে
অসংখ্য ভাষায় হেসে খুন হয় কমলারঙিন রৌদ্র ঘিরে,
তা হলে এ পৃথিবীর রাজনীতিবিদ যোদ্ধা নেতারা এখন
ডুবে যাক সমুদ্রের পুরুভুজ—পাললিক মনের ভিতরে,
যদিও তাদের দেশে জন্মেছিল অপরূপ নারীমুণ্ড—শঙ্খের মতন শুভ্র স্তন।

উত্তরসূরি। পৌষ ১৩৬৭

অনেক রক্তে

অনেক রক্তে উত্তেজিত হয়েছে সারাদিন।
অনেক সাধ স্বপ্ন নিয়ে ফিরে

বুঝেছে প্রাণ মহৎ নামের অন্তরালে প্রেমও
ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে মানবশরীরে।

জানি আমি ; তবুও ভালোবাসা
মানবদেহ ছাড়া
মানবাত্মা কোথাও পায় নাকো
গভীর নারীশরীরে এর সাড়া।

মানবহৃদয় নির্মিত হয় তাই ;
প্রেমিক উপলব্ধি করে নিজের মনের কথা ;
ভালোবাসা, তোমাকে ভালোবাসা ;
না হলে সব জ্ঞানের নিষ্ফলতা।

উত্তরসূরি। পৌষ ১৩৬৭

এসো

এসো—(এসো—এসো) আমার কাছে তোমার আসা
না হলে মরে যাবে না ভালোবাসা ;
মানুষ শুধু চায়
কখনও নীল আকাশকে কি পায়
কোনো দিনের কোনো পথের শেষে।

পাখির পালক বটের পাতা হতেছে মলিন ;
কোথায় তুমি রয়েছ এত দিন ?
সময় তোমার আমার হাতে বুঝি
দেবে না আর যতই আমি খুঁজি
জলের মতন জলের খোঁজে ভেসে।

মন তবুও না হার মেনে চলে
নদীর জলে—পদ্মপাতার জলে
নিজেকে ঢেলে সাজিয়ে দিয়ে মন
সাত সাগরে ঘুরছে আজীবন
খুঁজছে আবার পদ্মপাতার এসে ॥

উত্তরসূরি। পৌষ ১৩৬৭

যেখানে মনীষী তার

যেখানে মনীষী তার মোম নিয়ে বসে আছে রাত্রির ভিতরে
মাথার একটি চুলও (হয়ে আছে) লোহার পিণ্ডের মতো ভারী
মনপবনের চাপ খেয়ে
সকল পাহাড় নদী ডিঙিয়ে এখন তাড়াতাড়ি
সেইখানে চলে এসো—কাচের গেলাসে তার—জলের ভিতরে
যখনই সে দিতে যাবে নির্জন চুমুক—
যেন তার সব চিন্তা—সব ক্লান্তি—সৃষ্টির প্রয়াস
হঠাৎ দেখতে পায় প্রমত্ত কুকুরদের মুখ।
আমরা শুনেছি তার কাঁধে এই পৃথিবীর ভার—
সর্বদাই তার মনে জন্ম নিতে চায়
নতুন সমাজ চিন্তা কবিতা প্রসাদ।
সম্মুখীন বিষয়ের মাঝখানে গিয়ে সে দাঁড়ায়।
সর্বদাই অসমাপ্ত কর্তব্যের স্তূপে।
তবুও অমূল্য : জল ! যদিও জলের মতো দর।
চলে এসো মনীষীকে গেলাসের ভিতরে দেখাই
মত্ত কুকুরের মতো আমাদের দাঁতের রগড়।

উত্তরসূরি। পৌষ ১৩৬৭

অনেক বছরের ধূসরতার ভিতর দিয়ে

অনেক বছরের ধূসরতার ভিতর দিয়ে তোমার মুখের ছবি ভেসে ওঠে (আবার)
(তোমার মুখ যেন) আমাকে নিয়ে জীবনের (অনেক) সহজ সৌন্দর্যের ওপর
হাত রাখে (আবার)
(মনে হয়) এক প্রান্তরের দেশে চলে গেছি আমরা
পশ্চিমের লাল সূর্য যেখানে চাষার মতো তার শেষ বোমা রাখে
যতদূর চোখ যায় সোনালি খড়ের কান্তার
উঁচু-উঁচু গাছের ডালপালা ঘিরে আকাঙ্ক্ষার করুণ ঝটপটানি
কাক-পাখিদের ডানার থেকে ঝরে পড়ছে
তাদের নীল মসৃণ ডানা মেঘের কমলা আলোর আভার ভিতর
বেঁচে থাকে সেইখানে
গাছের হলুদ-রক্তিম পাতা খসে-খসে লাল সূর্যের দিকে উড়ে যায়।

রচনাকাল : এপ্রিল ১৯৩৬
মানসী (এলাহাবাদ)। মার্চ ১৯৬১

কবিতার খসড়া

জীবনের ঢের কাজ হয়ে গেলে পরে
মনে হয় মানুষের শরীরের ক্ষয়
পৃথিবীর পথে গিয়ে করণীয় অনেক কাজেই
বিধাতার মতো আর নয়।
তখন নিজের কাছে পৌঁছে ক্রমে মন
অন্ধকারে নক্ষত্রের অগ্নির মতন
স্থান পেয়ে সময়ের সমস্ত আকাশে
নিজেকে সংকীর্ণ করে নিয়ে তবু গভীর পৃথিবী ভালোবাসে।
অপ্রেম বেদনা রক্ত ভয়ে ভুলে বিলোড়িত হয়ে

রাত্রিদিন কাছে চলে আসে ইতিহাস ;
তাকে যা দেবার দিয়ে তারই ভেতর থেকে তবু
জ্ঞান শান্তি বাস্তবতা প্রেমের নিশ্বাস
পাওয়া যায় কোনো-কোনো লক্ষ্য উৎস ব্যক্তির কাছে।
ইতিহাসে শোকাবহ অন্ধ বেগ আছে ;
যদিও আঁধার বড়ো, সংকল্প প্রেরণা প্রেম উদাসীন শক্তির মতন
ভেঙে ফেলে ; এখনও ভাঙেনি এই অগ্নি এই মন।

পূর্বপত্র। অগ্রহায়ণ ১৩৬৮

ঢেউয়ে-ঢেউয়ে

ঢেউয়ে-ঢেউয়ে হালভাঙা জাহাজের সাক্ষ্য রেখে দিয়ে—
কুয়াশায় ঘণ্টা নেড়ে কম্পাস তৈরি করে—চাকা
ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে কল ভেঙে গড়ে গড়ে ভেঙে গড়ে
বেনামি নদীকে নাম দান করে নাম ভুলে গিয়ে
মানুষের বিবরণে কুয়াশায় অন্দকারে চলেছে মানুষ ;
মৃত মানুষের বোঝা, বিধানের হৃদয়ের অবিরল পচনশীলতা,
মড়কের ইঁদুরের অন্তহীন খাঁচা নিয়ে চলেছে—চলেছে—
এ-সবের থেকে তবু উৎসারিত অনুভূতি জ্ঞান
প্রেম পেয়ে এইবার সব কুজ্ঝটিকা
শেষ করে মহাসাগরের ভোরে আলো
আরো আলো পাওয়া যাবে ?—আরো গাঢ় সম্মিলন ?
নদীর ও নীল সমুদ্রের আরো বড় রেখা ?
বলয়ের পরে আরো বলয় রয়েছে ;
সেখানে অন্তিম শূন্য আছে ;
শতকের মহাশতকের
উজ্জ্বলতা আছে।

শ্মশানের স্তব্ধতাও ভালো, তবু উৎস আলো শান্তি প্রীতি সব
ভেতরের—ওপরের—সূর্যের লক্ষ্যে প্রয়াণের।

উত্তরসূরি। কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮

হেমন্তের নদীর পারে

মাঝে মাঝে মনে হয়
হেমন্তসন্ধ্যায় এই বৃক্ষদের মুখ দেখে
আবছায়া নদীর দর্পণে :
যে বিতর্ক লোপ পায় বালিকার মেধে
অথবা যুবার চিত্তে অকালজটীর মতো আশ্চর্য নির্বেদে
কিংবা যোদ্ধৃদের প্রাণে সারা দিন বায়ুকুকুরের মতো ঘুরে—
তবু মানুষের সাথে শুক্ল পরিচয় চেয়ে নিশীথের ভূমিকায়
সেই সব চিন্তা এসে পিতাদের হৃদয়ে দাঁড়ায়।

প্রবন্ধ-পত্রিকা। মাঘ ১৩৬৮

মৃত, বর্তমানে উপেক্ষিত কবিদের উপর অনেক সমালোচনা পড়ে

শিল্পের উন্মার্গ নিয়ে বেঁচে ছিল যারা পৃথিবীতে
তাহাদের তাপ যদি এক মাঘে জন্ম নিয়ে অন্য এক শীতে
হয়ে যেত পৃথিবীর ভূস্তরে বিলীন,
তা হলে হৃদয়ে আর অহংকার থাকিত না ভাষ্যকারদের ;
মৃত্তিকার সাত হাত নীচে থেকে কবিও পেত না তবে টের
যেই সব ব্যূঢ় চিন্তা এক দিন করেছে সে মানুষের মতো দেহ ধরে
বিষুবরেখার সাথে ঘুরে
তাহারা বিষাক্ত সাপ যেন আজ ; আর সবই ভারতীয় খেলার সাপুড়ে।

প্রবন্ধ-পত্রিকা। মাঘ ১৩৬৮

শিল্পী

জীবন কাটায়ে দেয় যে মানুষ সূক্ষ্মতর শিল্পচিন্তা নিয়ে,
ফলকের পর ক্ষুদ্র নিয়ন্তা রেখার টানে ফেলেছে যে সীমানা হারিয়ে,
সেই সব মানুষের আত্মা যেন বিস্রস্ত মুকুরে
কেবলই নড়িতে আছে জলের আভার মতো উদ্‌বিগ্ন দুপুরে।
অথবা আশ্চর্য হংসী অব্যর্থ ডানার অসংযমে
নির্ঝরের কোনো এক রুপালি শঙ্কের মতো মাছকে প্রণয়ী বলে ভেবেছিল ভ্রমে ;
আজও ভাবে ; বরফের মতো শাদা ডানা নিয়ে পিঙ্গল ঢেউয়ের পিঠে চড়ে
যখন সে তীর খেয়ে—অথবা রক্তের হর্ষে সৌরপৃথিবীর মতো ঘোরে !

প্রবন্ধ-পত্রিকা। মাঘ ১৩৬৮

আমাদের বুদ্ধি আজ

আমাদের বুদ্ধি আজ অন্তহীন মরুচর, তাই
প্রাণে শুধু বিষয়ের নিত্য দাহ আছে।
তার শান্তি সময়ের সাগরের কাছে
হয়তো বা পাওয়া যেতে পারে ;
কিন্তু কোন্ সময়ের দিকে যেতে হবে ?
শূন্যের ভিতরে ফল যেখানে রয়েছে মনে হয় ?
অথবা যেদিকে গিয়ে হৃদয় ক্রমেই
শান্ত হয়ে টের পাবে শূন্য ছাড়া আর কিছু নেই ?
তবুও সূচনা থেকে যাত্রা করে কোনো প্রান্তে যাওয়া
ভালো ; কোথাও চিহ্নের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে
বৃক্ষ নদী কুজ্‌ঝটিকা রক্তের আকাশ শতাব্দীর ভাঙা বাটখারা ;
মূল্যনির্ণয়ের কাজে উঠছে পড়ছে—
ঘর বাড়ি সাঁকো নীড় ঘাস

ক্রেন এরিয়েল ট্রেন—গুনচট চালানির মাল
যে সাগর রোদে চলে—তবু কালো কুয়াশাকে আলো
মনে ভেবে অনাবিলভাবে চলে
বেতার কম্পাস বাষ্প কলকব্জা হাল মাস্তুলের
হাড়গোড়ে বুক ভরে কর্মোৎসাহী ব্যাপারীর মতো
সোনা-রুপো চলতি বাজারদর জানার ও জানবার বেগে,
চলে যায় অন্ধকারে ভেদ করে
অদ্ভুত আবছা মূর্তি বুকে টেনে নিয়ে
বদ্বীপ ও বন্দরের দিকে,
চেতনার সে রকম চলা হল ঢের।
দূর কাঁটা কম্পাসের দিক্‌চিহ্ন আজ
ক্রমায়ত শূন্যে বিলীন ?
একদিন যা-কিছু স্পষ্ট মনে হয়েছিল
সে সব এখন আর স্থির
নির্ধারিত সত্য নয় ;
আলো বেড়ে গেছে ; আবছায়া আরো
বেড়ে গেছে ;
আলো আরো বাড়লে ভয়াল পতঙ্গ সব ঘিরে রবে ;
শত্রুদের দণ্ড আরো বেড়ে যাবে ;
অনিশ্চিত বড়ো অন্দকার সব দেখা যাবে ;
হয়তো আগুনে পরিণত হয়ে যাবে আলো।
হে হৃদয়, তবুও আঁধারদর্শী চেতনা-বলের দরকার।
দূর থেকে আরও দূরে যাত্রার প্রয়োজন আছে।
ভুল ছেড়ে অন্য এক শুদ্ধ কেন্দ্রে গিয়ে—
তাও ঠিক শুদ্ধ নয়—কী হবে দাঁড়িয়ে।
জন্মের আগে সেই কুজ্‌ঝটিকা ছিল,
মৃত্যুর পরে যেই অন্ধকার নিঃশব্দতা রবে,

সেই সব কিছু নয় ;
জেনে মন চলেছে নতুন সূর্যে দিক্‌নির্ণয়ে
কিছু সূর্য—ঢের বেশি ছায়া দিয়ে হৃদয়কে ভ'রে
মধ্যবয়সী প্রৌঢ় স্থবির আত্মার বর্ণে
বারবার সূর্য ভেঙে গড়ে।

শতাব্দীর শত-কবিতা। বৈশাখ ১৩৬৯

টেবিলে অনেক বই

এইবার চিন্তা স্থির করবার অবসর এসেছে জীবনে
হৃদয় বয়স্ক হল ঢের ;
মোম জ্বলে নিভে যায় অনেক গভীর রাত হলে
অন্ধকারে এক-আধটা আবছা ইঁদুরের
আসাযাওয়া টের পাই ঘরের মেঝেয়
হয়তো বা সিলিঙের 'পরে
বাইরে শিশির ঝরে কুয়াশায়—শীতে
লক্ষ্মীপেঁচার ডানা সজনের ডালে শব্দ করে

টেবিলে অনেক বই ছড়িয়ে রয়েছে ;
চিন্তাগুলো যেন অনুলোম-প্রতিলোম
পরস্পরের প্রতি—ঠাণ্ডা শাদা নারীর মতন
দাঁড়িয়ে রয়েছে চুপে মোম—
একটি গভীর সূত্রে গ্রথিত কি হবে
বইয়ের সকল চিন্তা জীবনের সব অভিজ্ঞতা ?
সকল নক্ষত্র আর সময়ের অপার গতির
ইতিহাসবৃত্তান্তের আগাগোড়া কথা ?

এ সব আশ্চর্য তত্ত্ব ভেবে তবু মন
অনুভব করে এই অন্ধকার ঘরে আজ কেউ
নেই, শুধু এক বিন্দু মূল্যনির্ণয়ের চেষ্টা ছাড়া।
কোনো এক দূর মহাসাগরের ঢেউ
এসে এই অন্ধকার বন্দর স্পর্শ করে চুপে
কোন্ এক দূর দিকে চলে যায়, তবে
সময়ের অন্তিম সঞ্চয়ে প্রেম-করুণার বলয় রয়েছে ?
ব্যক্তির ও মানবের সফলতা হবে ?
হয়তো এ ব্রহ্মাণ্ডের অবিনাশ অন্ধকার ছাড়া
মানুষের ভবিষ্যতে কিছু নেই আর ;
সেবা ক্ষমা স্নিগ্ধতা যে-আলোর মতন
মানুষের হাতে, তার বুজে-যাওয়া অন্ধ আধার
বারবার বড়ো এক পরিবর্তনীয়তার দিকে
যেতে চায়—সনাতন অন্ধকারে এ প্রয়াস ভালো ;
তবু এই পৃথিবীতে প্রেমের গভীর গল্প আছে।
জীবনে রয়েছে তার (অপরূপ) প্রতিভাত আলো।

মনবিহঙ্গম। কার্তিক ১৩৮৬

কখনও মুহূর্ত

কখনও মুহূর্ত আসে সূর্য আর শিশিরের জলে
বসে থাকবার মতো—
অথবা কখনও দেখি দিন নিভে গেছে
হরিয়াল প্রান্তরের পারে চলে গেছে
ডানার ঝিলিকে তার সবচেয়ে শেষ রোদ্দুর
জ্বালিয়ে সে সূর্যকে নিভিয়ে এবার নিভে গেল।

পৃথিবীতে এইবার নদীর নিজের ঠিক মুহূর্ত এসেছে ;
টেরচা বাঁক ভাঙা পাড় দিয়ে হেঁটে হেঁটে
মনে হয়, মানুষের হাতে-গড়া সাঁকো
কোনো প্রতীকের মতো বস্তু নয়,
দিক্‌দর্শনের মতো নিজেই রয়েছে এই নদী
অন্ধকার জল থেকে ধূসর জলের দিকে চলে যায়, গেছে ;
আজকের কালকের আগামী কালের
নিরিখ ও নাবিককে বুকে করে নিয়ে চলে গেছে ;
জীবনকে নৌবিদ্যা শেখায়
ঝড়ে আর শান্ত জলে ঘূর্ণি জলে চোরাবালি পাঁকে
ঢের বার তোমাকে আমাকে গ্রাস করে
আবার ফিরিয়ে দেয় পৃথিবীর পটে—পটান্তরে—হৃদয়ে—বিষয়ে
দ্রুত ধাবমান শাদা-কালোর রঙের অক্লান্ত ভূমিকায়
যেতে চায় কোনো এক সাগরের দিকে
মানুষের বিবরণ প্রাচীন হয়েছে ঢের
আমাদের সকলের বয়স বেড়েছে খুব
নদী এসে বারবার যযাতিকে যৌবন দেয়
ঘনজলধন্যা নদী—স্থবিরতা নেই ;
পাড় ভেঙে ফেলে পাড়া প্রান্তরের দিকে চলে
যেন সে আকাশ নীল—আকাশের ঝড়—দুই দিকে তীর আছে—নেই
যেইখানে রাষ্ট্র নেই—সেই নৈরাজ্যের দিকে যায়
যেখানে মানুষ নেই—অপমানুষের ভিড় মরা-আধমরা
হাড় আছে রক্ত আছে বালি ফণিমনসার কাঁটা
নিয়ন টিউব গ্যাস বিদ্যুৎবাতির বিহ্বলতা
এই সব আলোড়ন ভাঙা শূন্য কান্তি আর নীড়
ভেদ করে বিষ গিলে অমৃতকুম্ভের মতো কোলাহলে
ঢের মৃত নাবিককে নিমগ্ন নিশ্চিহ্ন করে ফেলে

নব নব নাবিকের জন্ম দিয়ে তারা আর সূর্যের আলোয়
মাছরাঙা-বর্ণিমায় অন্ধকারে রোদের ঝিলিকে
কেবলই ব্যক্তির মন ভেঙে নিয়ে নিয়ে নদী নব নব জল গড়ে নিল
ইতিহাসবেলা ভেঙে অসীম সাগর
সিন্ধু অতিক্রম করে অপার আকাশ
মানুষকে অতিক্রম ক'রে ফেলে নবীন মানব
নব শীত নব রাত্রি বিপদের দিক্‌চক্রবাল
লক্ষ্য ক'রে অবিরল জলকল্লোলের রক্ত, জল,
আর মরুভূমি আর মানব চলেছে অবিরল।

মনবিহঙ্গ। কার্তিক ১৩৮৬

সুদীর্ঘকাল তারার আলো

সুদীর্ঘকাল তারার আলো মোমের বাতির দিকে
তাকিয়েছিল দুজন ওরা : শান্ত কক্ষে নীল জানালার পাশে
কাছাকাছি দুটো তারা : আলোকবর্ষ অনেক আলোকবর্ষ গেলে পরে
কাছে কাছে থেকে তারা রবে কি প্রবাসে ?
এই তারাটির আলো গিয়ে পড়বে না কি অপর তারার বুকে
মনের গভীরতম সুখে—সমস্ত অসুখে ?

এ নক্ষত্র ঝরে গেছে হয়তো তখন কালের নিয়মে
ও নক্ষত্রে পৌঁছাতেছে হয়তো তখন সে অনুপম মৃত তারার আলো

এমনি পটভূমির ভুলে কি আমাদের সময় ফুরাল ?
ফুরিয়ে যাক—ভুল তো নয়, সে ভুল যদি সত্য মনে হয়
জীবিত যা মৃত তারা বিশ্ব-অন্ধকারের আড়াআড়ি
অন্য মৃত বা জীবিত তারার দেখা চেয়ে

সময় কি শেষ করতে পারে ? আমরা তো তা পারি।

ঐ তো নারী বসে আছে হয়তো মৃত তারা ;
এই তো আমি তাকিয়ে আছি তারার আলোর মতো
আমরা দুজন অতল অমায় হয়তো নিভে গেছি ;
পাশাপাশি জ্বলেছিলাম, অনন্তকাল জ্বলছি ; প্রেমের অনির্বাণ স্বভাববশত।

পঁচিশে বৈশাখের কবিতা। বৈশাখ ১৩৭৪

কবের সে রাত্রি আজ

কবের সে রাত্রি আজ মনে পড়ে প্রিয়।
হঠাৎ এঞ্জিনরোল স্তব্ধ হল অন্ধকারে এসে
দিল্লির না লাহোরের বসন্তরাতের টার্মিনাসে,
অপ্রদীপ রাত্রি রীতি অহেতুক উৎসারিত জিনিস হৃদয়ে
ক্লান্ত শরীরের পরে তবু প্রিয় মননের জয়ে
ঈষৎ উৎসবে মেতে হুইলার স্টলের নিকটে বসেছিল
চা খেয়ে দু-এক কাপ বইগুলো নেড়েচেড়ে
তারপর কখন অনেক রাত হলে
মানব আত্মার ক্রান্তি আঁধার সমুদ্র বেয়ে চেনা
ধু ধু ঢেউদের সোরগোলে
কখন নিজেকে দেখে অচেনা পালকদামে আধা
বিভূষিত পাখি এক ঢেউয়ের উঠতি পথে শাদা
চাঁদের আলোয় দূর সুমুখের সমুদ্র নির্জন পরিষ্কার।
সাগরের পার দিয়ে দূর দিগন্তের টেলিগ্রাফ তার।
অথবা তা স্নিগ্ধ এক বাতাসের সুর ;
সময় চলেছে নিজ পথ কেটে বাতাসের মতন বিধুর
সেখানে প্রেমের কোনো কথা

পৃথিবীর শারীরিকতায় প্রিয় নারীমুখ কেউ
সৈকতের স্পর্শহীন চাঁদের দুয়ারে দূরে রয়ে গেছে বলে
কবেকার অ্যামিবার নীড় ভেঙে ঋজু নীল সমুদ্রের ঢেউ
মানবজাতির চোখে কেঁপে উঠে আজ
দেখাতেছে কাকে বলে প্রকৃতির বিচ্ছেদের রাত
অথবা তা সমাজের প্রেমিকের হৃদয়ের...
এইসব অবিচ্ছিন্ন অনুভব অন্ধকারে থাকবে হঠাৎ
কখন দাঁড়ালে তুমি নারীর মতন কেশপাশে।
নারী তুমি আমার না অপরের ?
কাহার পায়ের সুর যেন নেমে আসে
তোমার চোখের সুরে—অপরের অথবা আমার ?
বাতাসে অগুরু গন্ধ ভেসে ওঠে বাতিহীন রাতে
মৃত যারা মরে গিয়ে অন্ধ স্নিগ্ধ দিক্‌প্রান্তে সব
সময়ের বিছানায় শুয়ে আছে সব ক্ষোভ ভুলে
তাদের প্রশান্তি এই মেয়েটির আজানুলম্বিত ঘন চুলে
মৃতদের কাছ থেকে এরকম স্বাভাবিক ঋণ
সহজে গ্রহণ ক'রে নারী
দাঁড়ায়ে রয়েছে শাদা সুধাস্পর্শসাক্ষরিত হয়ে
কোটি কাল আগে আমি পৃথিবীতে সেই এক শরীর ছিলাম
যেই এক শরীরিণী জীবনীকে চেয়ে
অনেক নক্ষত্র ক্রান্তি শেষ করে সময়ের রূপ ভেঙে গড়ে
সে আজ নিকটে এসে দাঁড়ায়েছে অগণ্য আঁধার
ভেঙে ফেলে পুনরায় অন্ধকারে দাঁড়াবার সাধ
যেই সব দূর দূর দূরতার নক্ষত্রের
তাদের শখের মতো মেয়েটির গভীর চুম্বক
সৃজনের শোকাবহ অন্ধকারে কান পেতে কোন্ দূর অবক্ষয়ধূসর তারাকে
নিজের অভ্রান্ত একা আয়ুহীন কক্ষলোকে ডাকে

সেই নারী—কোথাও যুবক বুঝি বিশৃঙ্খল অন্ধকারে তাকে
নিয়ে গেছে—নিয়ে যাবে—নিয়ে যেতে পারে—
টার্মিনাসে মরু দিল্লীর রাত ভেঙে ফেলে আমরা দুজন
নক্ষত্রের পথে অন্য নক্ষত্রের আলোকবর্ষের সহ-অসহমরণ
প্রতিভাত করে নিয়ে নেমে গেছি কিছু দূর পৃথিবীর অসুখে আলোকে

হাতে তার দু-চারটে বই, স্টলের চায়ের
ঈষৎ সুমিষ্ট ঘ্রাণ—হৃদয়ে অ্যামিবা ঊর্মিময় এক নীল
সাগর অনন্তকাল পথ চলে আজ গভীর ফেনিল
মানুষের প্রমিতির মৃত পত্রে নীলোচ্ছ্বাস হয়ে গেছে বলে বুঝি
ব্যথায় আতুর হয়ে বলেছিলে ‘প্রিয়’
আমাকে না আমাদের দুজনের পাশে যে তৃতীয়
যুবক দাঁড়ায়েছিল তাকে ?
অনাথ অঙ্গার হয়ে সৃজনের দ্রুত অন্ধকারে
আমার মতন যুবা—হাতে ধরা মোমের বাতির মতো জ্ব’লে
উঠে যেতে যেতে চুপে অনন্ত সরল বক্র সিঁড়ির দুধারে
দেখেছে বেপথুমান মানবের মহামানবের যান
ক্রমাগত নিভে যেতে থাকে
তারপর দেখেছিল দেখেছি যে সূর্যচক্ষে
সংক্রান্তির সবিতার মতন তোমাকে।

জলসা। শারদীয় ১৩৭৫

এইখানে সূর্যের

এইখানে সূর্যের তত দূর উজ্জ্বলতা নেই।
মানুষ অনেকদিন পৃথিবীতে আছে।
‘মানুষের প্রয়াণের পথে অন্ধকার

ক্রমেই আলোর মতো হতে চায়—’
ওরা বলে, ওরা আজও এই কথা ভাবে।
একদিন সৃষ্টির পরিধি ঘিরে কেমন আশ্চর্য এক আভা
দেখা গিয়েছিল ; মাদালীন দেখেছিল—আরো কেউ কেউ ;
অম্বাপালী সুজাতা ও সংঘমিত্রা পৃথিবীর লৌকিক সূর্যের
আড়ালে আর-এক আলো দেখেছিল ;
হয়তো তা লুপ্ত এক বড়ো পৃথিবীর
আলোকের নিজ গুণ,
অথবা তখনকার মানুষের চোখের ও হৃদয়ের দোষ।

এই বিশ শতকে এখন
মানুষের কাছে আলো-আঁধারের আর-একরকম মানে :
যেখানে সূর্যের আলো নক্ষত্র বা প্রদীপের ব্যবহার নেই
সেইখানে অন্ধকার ;
যেখানে চিন্তার ধারা রীতিহীন—শব্দের প্রয়োগ অসংগত—
প্রাণের আবেগ ঢের শতকের আপ্রাণ চেষ্টায়
যেখানে সহিষ্ণু স্থির মানুষের সাধনার ফলে
বিপ্লবিনী নদীর বাঁধের মতো হয়ে—তবু কোনো একদিন
কেন যেন জলের গর্জনে আলুলায়িত হয়েছে
সেখানে (ওদের মতে) আলো নেই ;
অথবা নিজেকে নিজে প্রতিহত করে ফেলে আলো
সেইখানে অন্ধকার।

মনীষীরা এরকমভাবে আজ শুদ্ধ চিন্তা করে
সমাজের কল্যাণ চায়,
দিক্‌নির্ণয় করে।
অটুট বাঁধের মতো মনে হয় জ্ঞানীদের মন যেন—

টেনিসির দামোদর অথবা কোশীর।
তবুও আগুন জল বাতাসের প্লাবনের মানে
সেতু ভেঙে নব সেতু প্রণয়ন ; আজ তা আত্মস্থ সেতু জানে ?
মাঝে-মাঝে বাসুকির লিপ্ত মাথা টলে,
ক্লান্ত হয়ে শান্তি পায় অপরূপ প্রলয়কম্পনে ;
পৃথিবীর বন্দিনীরা হেসে ওঠে।...
রেলের লাইনের মতো পাতা জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্তহীন কার্যকারিতায়
সুখ আছে, সৃষ্টি নেই। অনেক প্রসাদ আছে, প্রেম নেই।
অনেক কল্যাণশীল নগর জাগছে ;
সেইখানে দিনে সূর্য নিজে,
নিয়ন টিউব গ্যাস রাত্রির ;
উন্মুক্ত বন্দর সব নীল সমুদ্রের
পারে পারে মানুষ ও মেশিনের যৌথ শক্তিবলে
নীলিমাকে আটকেছে ইঁদুরের কলে।
সূর্য ভারত চীন মিশরের ক্যালডিয়ার আদিম ভোরের
প্রাথমিক উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে ?

দিন প্রায় শেষ হয়ে এলে শাদা ডানার ঝিলিকে
আলো ঠিকরিয়ে গেলে বুঝেছি সংবাদবাহী আশ্চর্য পায়রা
উড়ে যায় সূর্যকে টুকরো করে ফেলে ;
খণ্ড আলোর মতো সঞ্চারিত করেছে আবেগে
প্রকৃতিতে ; কোনো কোনো মানুষের বুকে ; তারপর
মানুষের সাধারণ ভাবনার বজেট ইনকম ট্যাক্স প্রভৃতি বিষয়ে
    ঠেকে নিভে গেছে।

উৎসব হৃদয়ে-মনে কাজ করে গেছে একদিন ;
সমুদ্রের নীল পথে মহেন্দ্র চলেছে—

সমস্ত ভারত শিলালিপির উদ্যমে আনন্দে ভরে গেছে ;
এরকম উৎসাহের দিন আজ তবুও তো নেই আর ?
আমাদের কাজ আজ ছক ছলা, কিছু দূর চিন্তার সাধুতা
তত দূর শব্দযোজনার সতর্ক সংগতি নিয়ে ;
মাঝে-মাঝে হৃদয়েরও খুচরো টুকরো ব্যবহারে ;
(শাদা কালো রঙ এসে বারবার—কেবলই মিশছে অন্ধকারে)
সে হৃদয় মানুষের আধুনিক সভ্যতার পটভূমিকায়
শচীর মতন এসে দাঁড়াচ্ছে ;
অথবা সে ইন্দ্রাণীকে ভেদ করে অহল্যার মতো ;
সহস্র চোখ না যোনি এত দিন পরে আজ কলকাতায় ইন্দ্রের শরীরে ?

ইন্দ্র আজ এরা—ওরা ;
ইন্দ্রের আসনে আজ বেটপ্‌কা অনন্ত বসা যায়
শুল্ক আয়কর সুদ—বেশি সুদ অল্পকে অস্পষ্টভাবে দিলে।

*

আজও তবু অবিরাম প্রয়াণ চলেছে মানুষের :
শব্দের অঙ্গার থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো ভাষা জ্ঞান
জ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন শববাহনের শক্তি খুঁজে তবু প্রেম
পাওয়া যায় কিনা তার অক্লান্ত সন্ধানে ?
মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে
আবার যুদ্ধের ছায়া ;
পটভূমি দ্রুত সরে গেলে রূঢ় দেয়ালের মুখোমুখি এসে
আমরা সূর্যের যেই প্রাণ উজ্জ্বলতা
চীনে কুরুবর্ষে গ্রীসে বেথলেহমে হারিয়ে ফেলেছি—
তাকে শিশুসরলতা মূর্খের আরাধ্য স্বর্গ ভেবে
সূর্যের মাধ্যন্দিন বড়ো ভাস্বরতা
এখনও পাই নি খুঁজে।

এখানে দিনের—জীবনের স্পষ্ট বড়ো আলো নেই ;
ধ্যানের সনির্বন্ধ অন্ধকার এখনও আসে নি।
চারি দিকে ভোরের কি বিকেলের কাকজ্যোৎস্না-ছায়ার ভিতরে
আহত নগরীগুলো কোনো-এক মৃত পৃথিবীর
ভেতরের চিহ্ন বলে মনে হয় ; তবু
মৃত্যু এক শেষ শান্ত দীন পবিত্রতা ;
আমাদের আজকের পৃথিবীর মানুষ নগরগুলো সে রকম
আন্তরিকভাবে মৃত নয়।
বাজারদরের চেয়ে বেশি কালো টাকা ঘুষ দিয়ে
জীবনকে পাওয়া যাবে ভেবে
যেন কোনো জীবনের উৎস অন্বেষণে তারা সকলে চলেছে ;
পরস্পরের থেকে দূরে থেকে ; ছিন্ন হয়ে ; বিরোধিতা করেছে
সকলের আগে নিজে—অথবা নিজের দেশ—নিজের নেশন
সবের উপর সত্য মনে ক'রে ; জ্ঞানপাপে, অস্পষ্ট আবেগে।

মানুষের সকল ঘটনা গল্প নিষ্ফলতা যদি হাইড্রোজেনে
পুড়ে ছাই হয়ে যায় তবে হয়ে যাক :
এরকম অপূর্ব অপ্রীতি চারি দিকে
আমাদের রক্তের ভেতরে অনুরণিত হচ্ছে।
কোথাও সার্থককাম কেউ নয় ;
আমাদের শতাব্দীর মানুষের ছোটো বড়ো সফলতা সব
মুষ্টিমেয় মানুষের যার-যার নিজের জিনিস,
কোটি মানুষের মাঝে সমীচীন সমতায় বিতরিত হবার তা নয়।
এইখানে মর্মে কীট রয়ে গেছে মানুষের রীতির ভিতরে
রীতির বিধানদাতা মানুষের শোকাবহ দোষে।
প্রকৃতি আবিল কিছু, তবু মানুষের

প্রয়োজনমতো তাতে নির্মলতা আছে।
আরো কিছু আছে তাতে ; যেন মানুষের সব-রকম প্রার্থনা
মিটিয়ে বা না-মিটিয়ে প্রকৃতি ঘাসের শীর্ষে একফোঁটা নিঃশব্দ শিশিরে
নিঃশব্দ শিশিরকণা—সব মূল্যবিনাশের তীরে।
পাখিদের ডানা-পালকের থেকে বিকেলের আলো
নিভে গেলে রাত্রির নক্ষত্রেরা হৃদয়ের আচ্ছন্নতা নেড়ে
বাতাসের মুক্ত প্রবাহের মতো ; যেন কোনো ঘুমন্তের মনে
কথা কাজ চিন্তা স্বপ্ন অকুতোভয়তা
নিজের স্বদেশে এল।

চারি দিকে অবিরল নিমিত্তের ভাগীর মতন
এই সব আকাশ নক্ষত্র নীড় জল ;
মানুষের দিনরাত্রি প্রণয়নে অহেতুক নির্দেশের মতো
রয়ে গেছে শতাব্দীর আঁধারে আলোয়।
কেউ তাকে না বলতে এ পৃথিবী সকালের গভীর আলোয়
দেখা দেয় ; কেউ তাকে না চাইতে তবু ইতিহাসে
দুপুরের ঢেউ তার কেমন কর্কশ ক্রন্দনে কেঁপে ওঠে ;
নিসর্গের কাছে থেকে স্বচ্ছ জল পেয়ে তবু নদী মানুষের
মূঢ় রক্তে ভরে যায় : সময় সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করে, 'নদী,
নির্ঝরের থেকে নেমে এসেছো কি ? মানুষের হৃদয়ের থেকে ?'

কাব্যসম্ভার, ঢাকা। ভাদ্র ১৩৭৬

এখানে নক্ষত্রে ভরে

এখানে নক্ষত্রে ভরে রয়েছে আকাশ,
সারা দিন সূর্য আর প্রান্তরের ঘাস ;
ডালপালা ফাঁক ক'রে উঁচুউঁচু গাছে

নীলিমা সিঁড়ির মতো সোজা, আঁকাবাঁকা হয়ে আছে

যে যাবে—যে যেতে পারে তার ; নীচে রোদের ভিতরে
অনেক জলের শব্দে দিন
হৃদয়ের গ্লানি ক্ষয় কালিমা মুছায়ে
শুশ্রূষার মতো অন্তহীন।

কাব্যসম্ভার, ঢাকা। ভাদ্র ১৩৭৬

উনিশশো চৌত্রিশের

একটা মোটরকার
খটকা নিয়ে আসে।

মোটরকার সব-সময়েই একটা অন্ধকার জিনিস,
যদিও দিনের রৌদ্রআলোর পথে
রাতের সুদীপ্ত গ্যাসের ভিতর
আলোর সন্তানদের মধ্যে
তার নাম সব চেয়ে প্রথম।

একটা অন্ধকার জিনিস :
পরিষ্কার ভোরের বেলা
দেশের মটরশুঁটি-কড়াইয়ের সবুজ ক্ষেতে-মাঠে হাঁটতে হাঁটতে
হঠাৎ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছি
লাল সুরকির রাস্তার ভিতর দিয়ে
হিজলগাছদুটোর নীচে দিয়ে
উনিশশো চৌত্রিশের মডেল একটা মোটরকার
ঝকমক করছে, ঝড় উড়িয়ে ছুটেছে ;

পথ ঘাট ক্ষেত শিশির সরে যেতে থাকে,
ভোরের আলো প্রতিকূল যুক্তির বিরুদ্ধে কোণের বধূর মতো সহসা অগোচর,
মাঠ নদী যেন নিশ্চেষ্ট,
সহসা যেন প্রতিজ্ঞা হারিয়ে ফেলে,
এই মোটর অগ্রদূত,
সে ছুটে চলেছে
যেই পথে সকলের যাওয়া উচিত ;
একটা মোটরকারের পথ
সব সময়েই আমার কাছে খটকার মতো মনে হয়েছে,
অন্ধকারের মতো।

স্ট্যান্ডে
শহরের বিরাট ময়দানের পুবে পশ্চিমে—ফুটপাথের পাশে
মোটরকার ;
নিঃশব্দ।
মাথায় হুড
ভিতরের বুরুশ-করা গভীর গদিগুলো
পালিশ স্টিয়ারিং-হুইল হেডলাইট ;
কী নিয়ে স্থির,
কলকাতার ময়দানের একটা গাছ অন্য কিছু নিয়ে স্থির,
আমি অন্য কিছু নিয়ে স্থির ;
মোটরের স্থিরতা একটা অন্ধকার জিনিস।

একটা অন্ধকারের জিনিস :
রাতের অন্ধকারে হাজার হাজার কার হু হু করে ছুটছে
প্যারিসে—নিউইয়র্কে—লন্ডনে—বার্লিনে—ভিয়েনায়—কলকাতায়—
সমুদ্রের এপার ওপার ছুঁয়ে

অসংখ্য তারের মতো,
রাতের উল্কার মতো,
জঙ্গলের রাতে অবিরল চিতার মতো,
মানুষ-মানুষীর অবিরাম সংকল্প ও আয়োজনের অজস্র আলেয়ার মতো
তারাও চলেছে ;
কোথায় চলেছে, তা আমি জানি না।

একটা মোটরকারের পথ—মোটরকার
সব-সময়েই আমার কাছে খটকার মতো মনে হয়েছে,
অন্ধকারের মতো।

আমি অত তাড়াতাড়ি কোথাও যেতে চাই না ;
আমার জীবন যা চায় সেখানে হেঁটে হেঁটে পৌঁছুবার সময় আছে,
পৌঁছে অনেকক্ষণ বসে অপেক্ষা করবার অবসর আছে।
জীবনের বিবিধ অত্যাশ্চর্য সফলতার উত্তেজনা
অন্য সবাই এসে বহন করুক : আমি প্রয়োজন বোধ করি না :
আমি এক গভীরভাবে অচল মানুষ
হয়তো এই নবীন শতাব্দীতে
নক্ষত্রের নীচে।

কৃত্তিবাস। আষাঢ় ১৩৮০

এই সব পাখি

সারা দিন পাখিগুলো কোন্ আকাশ থেকে কোন্ আকাশে থাকে।
শহর কলকাতার শহর যেন পাখিহীন হয়ে থাকে :
পাখিদের আমি সবচেয়ে বড়ো ক্যাপিট্যাল মনে করি ;
জুটমিলের মালিকদের মতো অন্যরকম—
কিন্তু কলকাতা কি শুধু জুটওয়ালাদের ?

কলকাতা আমাদের,
এবং কলকাতা কলকাতাও পাখিদের।
কলকাতার আকাশে চৈত্রের ভোরে যেই
নীলিমা হঠাৎ এসে দেখা দেয় মিলাবার আগে
এইখানে সে আকাশ নেই ;
রাতে নক্ষত্রেরা সে রকম
আলোর গুঁড়ির মতো অন্ধকারে অন্তহীন নয়।

তবুও আকাশ আছে :
অনেক দূরের থেকে নির্নিমেষ হয়ে
নক্ষত্র দু-একজন চেয়ে থাকে ;
চেয়ে থাকে আমাদের দিকে—
যেন টের পায়
পৃথিবীর কাছে আমাদের
সব কথা—সব কথা বলা
ডাভেন্ট্রিডোমেই টাসে স্টেফানিতে
যুদ্ধ শান্তি বিরতির নিয়তির ফাঁদে চিরদিন
বেধে গিয়ে ব্যাহত রণনে
শব্দের অপরিমেয় অচল বালির
মরুভূমি সৃষ্টি করে গেছে ;
    —কোনো কথা কোনো গান
কাউকেই বলে নাই ;
কোনো গান
পাখিরাও গায় নাই। তাই
এই পাখিহীন নীলিমাবিহীন শাদা স্তব্ধতার দেশে
তুমি আর আমি দুই বিভিন্ন রাত্রির দিক থেকে
যাত্রা করে উত্তরের সাগরের দীপ্তির ভিতরে

এখন মিশেছি।

এখন বাতাস নেই—তবু
শুধু বাতাসের শব্দ হয়
বাতাসের মতো সময়ের।
কোনো রৌদ্র নেই, তবু আছে।
কোনো পাখি নেই, তবু রৌদ্রে সারা দিন
হংসের আলোর কণ্ঠ রয়ে গেছে ;
সারা দুপুর পাখিগুলো দূরের থেকে আরো দূরে কোথায় চলে যায় ?
শহর দরিদ্র হয়ে পড়ে।
শহর নির্জন হয়ে পড়ে।

ধীরে ধীরে বিকেলের নরম আলো
নরম আলো পৃথিবীতে নামে ;
ভিস্তির জলে তখন রাস্তা ঠাণ্ডা,
রাস্তায় ছায়া ;
ব্যস্ততা তখন কম—আরো কম ;
পাখিদের তখন পৃথিবীতে নামবার সময় ;
রোদের রঙ তখন পেঁয়াজি,
রোদের রঙ তখন সোনালি,
রোদের রঙের সময় শুধু তখন ;
ক্লাইভ স্ট্রীটের জানালাগুলোও সচকিত হয়ে ওঠে :
পৃথিবী কোন্ জিনের সমুদ্রের ভিতর চলে গেল !
পাখিরা তখন আকাশ থেকে নামে,
বলে তারা : ‘এমনতর কলকাতায় থাকতে পারা যায় ;
এই সন্ধ্যার সমুদ্রে
আমরা গোলাপের পাপড়ির মতো খসে পড়ছি।’

অনেকক্ষণ ছাদে দাঁড়িয়ে দেখি আমি
চারদিকে পাখনা পালক ;
পালক আর পাখনা
কলেজের উঁচু-উঁচু দেবদারু গাছের ভিতর ঘুরে যাচ্ছে ;
দেবদারু পাতার ফাঁক দিয়ে সোনার ডিমের মতো সূর্য
রুপোর ডিমের মতো চাঁদ,
শিশির ঝরছে ;

কলকাতা ?
কলকাতা !

কৃত্তিবাস। আষাঢ় ১৩৮০

জার্নাল : '৩৬

বিস্মৃতি ধুলোর মতো জড়ো হয় যেইখানে—
সেই হিম নিস্তব্ধ আঁধারে
একবার—আধবার—চেয়ে দেখি
আজও আমি সেইখানে তাকে
খুঁজে পাই ;—
নিচের তলায় ঠাণ্ডা রোগা অন্ধকারে
রেলিঙের পাশে
দাঁড়িয়ে রয়েছে ;—
আলোর বেগের মতো প্রাণ
ছিল সেই যুবকের :
সূর্য আর নক্ষত্রের যেন সে সন্তান।

তবু তার ভালো লাগে আজ স্থবিরতা ;
সেখানে সময় শুধু ধূসর ঘড়ির মুখে কথা

বলে ক্লান্ত—ক্লান্ত করে রাখছে হৃদয় ;
বসে থেকে বসে নেচে বসে থেকে মানুষের ক্ষয়
সেখানে একটি নারীর জন্য হয়।

আমার এ জীবনের দীর্ঘ—দীর্ঘতর স্তর—অলিগলি ঘিরে
ঈশ্বর বাসনা স্বপ্ন—কতবার গেছে সব ছিঁড়ে।
শুধু তার প্রতীক্ষা আমাকে
কুশপুত্তলীর মতো বারবার সৃষ্টি করে চলে।
ব্রহ্মাণ্ডের কত সৃষ্টি—কত প্রলয়ের কোলাহলে
টলে না তবুও তার প্রেমিকের মন।
তবু সে খাতক, আহা, সময়ই প্রকৃত মহাজন।

শতভিষা। শ্রাবণ ১৩৮৩

জর্নাল : ১৯৩৪

খানিকটা দূরে লাইন—রেলের কঠিন লাইন সব
    অন্ধকারে রয়েছে নীরব ;
এখানে ঘাসের 'পরে শুয়ে আছি কার্তিকের রাতে ;
    অসংখ্য আলোর বিন্দু নেভাতে-নেভাতে
    আবার জ্বালায় বারেবারে
নক্ষত্রেরা আকাশের এপারে—ওপারে।

হঠাৎ রেলের লাইন কেঁপে ওঠে : হিস হিস—
    চারিদিকে রূঢ় কলরব ;
এক সারি গাড়ি আলো কালো ধোঁয়া বিদ্রূপ বিপ্লব।
তবুও যখন তার লাল আলো মুছল কুয়াশায়
পৃথিবীর আদি দায় অনাদির দায়
ফুরিয়ে গেল কি কিছু? খানিকটা লাল নীল আলো

লজেনচুষের মতো গলে-গলে ক্ষীণ শিশু মৃত্যুতে হারালো।

শতভিষা। শরৎ ১৩৮৪

উপলব্ধি

কোথায় সে যে রয়েছিলাম—
আজকে মনে হয়
সাগর থেকে আরও বৃহৎ আলো
দেখেছিলাম—ঠিক তা সাগর নয়।
প্রশান্ত বা কৃষ্ণ বেরিং ভূমধ্যলীন ভারত মেরুসাগর তাকে বলে ;
সেইখানেতে ভোরের হাওয়ায় শাদা ঘোড়ার ভিড়ে
একটি ঘোড়া সূর্য হয়ে জ্বলে
নীল আকাশের এপার থেকে ওপার যাবার পথে ;
সুদর্শনা, সেই নীলিমা তোমার আকাশ ছিল ;
মনে পড়ে মাছের ঝাঁকে গহন সাগরজল,
ফেনার হাওয়ায় ফসকে শাদা পাখিগুলো দুরন্ত উজ্জ্বল ;
নীল কি রৌদ্র ? রৌদ্র কি নীল জলের কোলাহল ?

কৃত্তিবাস। আশ্বিন ১৩৮৫

হঠাৎ তোমার সাথে

হঠাৎ তোমার সাথে কলকাতাতে সে এক সন্ধ্যায়
উনিশশো-চুয়াল্লিশে দেখা হল—কত লোক যায়
ট্রাম বাস ট্যাক্সি মোটর জিপ হেঁকে
যাদের হৃদয়ে বেশি কথা হাতে কাজ কম—তাদের অনেকে
পায়ে হেঁটে চলে যায়—

কেবলই ক্লান্তিতে ধুঁকে আমাদের মুখে ঠোঁটে তবু যেই হাসি

ফুটে ওঠে স্বপ্নকে খণ্ডন করে বিষয়প্রত্যাশী
অমূল্য সংসারী সে-ই—বাজারে বন্দরে ঘোরে, মাপজোক করে
হিসেবের খতিয়ানে লাভ হলে রক্তের ভিতরে
তৃপ্তি পায়—লোকসান হয়ে গেলে অন্ধকারে নিগৃহীত মনে
অনুভব করে কোনো মনিবের সংকীর্ণ বেতনে
ভৃত্যের শরীর তার।—ভৃত্যের শরীরে তার মন
নারী আর নক্ষত্রের তবু মহাজন ?

তুমি এলে—সময়ের ঢের আয়ু শেষ করে তবে
এখনও প্রদীপ জ্বলে এ রকম স্থির অনুভবে
তোমার শরীর আজও সুশ্রী নম্র—তবুও হৃদয়
সেই স্নিগ্ধ শরীরের সতীনের মতো কাঁটা নয় ?
দুরু-দুরু হৃদয়ের বিস্ময়ে ব্যথায় এ কথা যদি ভাবি
তবু সে ব্যথার চেয়ে আরেক শক্তির বেশি দাবি
সেই স্বাদ তুমি—আমাদের চোখে এসেছিলে বলে
পৃথিবীকে ভালো করে পাই আমি—এ পৃথিবী অন্তর্হিত হলে
সত্যই সূর্যের আলো—তবুও সূর্যের চেয়ে সুখী
তোমার গভীরভাবে ভালো শরীরের মুখোমুখি
আমার শরীর-মন—ঈশ্বরেরও অনুরোধে কখনও সময়
গতি কি থামায় তার—লীন হলে অনুসৃত হয় ?
তুমি তাকে থামায়েছ—সৃষ্টির অন্তিম হিতাহিত
ভুলে আজ কলকাতার শীত রাতে কবের অতীত
বহমান সময়কে অন্ধকারে চোখঠার দিয়ে
নারীর শরীর নিয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে।
তোমার ঊরুর চাপে সময় পায়ের নিচে পড়ে
থেমে আছে বলে মৃত তারিখকে আবিষ্কার করে
ভালোবাসা বেঁচে উঠে, আহা, এক মুহূর্তের শেষে

তবুও কি মরে যাবে পুনরায় সময়ের গতি ভালোবেসে ?
অতীত তো সুজাতার শিশু ; নারি, মনীষীহৃদয়
সে শিশুকে বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত নয়।
হে সময়, একদিন তোমার গহন ব্যবহারে
যা হয়েছে মুছে গেছে, পুনরায় তাকে
ফিরিয়ে দেবার কোনো দাবি নিয়ে যদি
নারীর পায়ের চিহ্নে চলে গিয়ে তোমার সে অন্তিম অবধি
তোমাকে বিরক্ত করে কেউ
সব মৃত ক্লান্ত ব্যস্ত নক্ষত্রের চেয়েও অধিক
অধীরতা ক্ষমতায় ব্রহ্মাণ্ড শিল্পের শেষ দিক
এই মহিলার মতো নারীচোখে যদি কেউ খুঁজে ফেরে, তবে
সেই অর্থ আমাদের এই মুহূর্তের মতো হবে।

প্রতিক্ষণ। মাঘ ১৩৯০

রবীন্দ্রনাথ

তারপর তুমি এলে
এ পৃথিবী সলের মতন তোমার প্রতীক্ষা করে বসেছিল
সলের মতন দীর্ণ ক্ষুব্ধ এই দানব পৃথিবী
শক্তিমান রাজার মতন রূঢ় রূপবান রক্তাক্ত নক্ষত্র এই আমাদের
ঝলমল আলম্বিত চোগা পরে প্রবল উষ্ণীষ শিরে রেখে দিয়ে
কঠিন অসির ’পরে ভর করে
অসীমের অনাবৃত হলঘরে ক্ষণিকের দম্ভ ভুলে ক্যাম্পের নিষ্ঠুর ধাতুর বাদ্য
ইশারায় স্তব্ধ করে দিয়ে—
চোখ বুঝে অধোমুখে

এ পৃথিবী মুহূর্তের কাজ তার ভুলে গিয়েছিল

মুহূর্তের চিন্তা এসে কখন হঠাৎ তারে সচকিত শান্ত করে দিয়ে
চলে গিয়েছিল বলে
মুহূর্তের স্বপ্ন এসে লক্ষ-কোটি বছরের সম্পন্ন কাজের সমৃদ্ধির শিরস্ত্রাণ
নিজের পায়ের তলে রেখে দেয় বলে
আমাদের এ পৃথিবী নিজেরে ব্যথিত বোধ করেছিল
পরাহত—পাণ্ডু—ক্ষুব্ধ ;
অবসাদে হিম নীল জর্জরিত হয়েছিল
হয়েছিল না কি ?

তুমি এলে ?

আমাদের উপভোগে লালসার এত শক্তি সমুদ্রের মতো এক ব্যথারেও
বহিতে পারে সে—বহিতেছে ;

আমরা জানিনি তাহা
আমাদের অসুর পৃথিবী জানেনিকো।
কীট পোকা ফড়িঙ হরিণ পাখি মানুষের অবিশ্রাম জীবনের সাগরের
ঢেউয়ের ভিতরে
মুহূর্তে-মুহূর্তে যেই বেদনারা এশিরীয় সৈন্যদের মতো বর্শা তুলে নেচে ওঠে
তারা পরাজিত হয়
ফড়িঙেরও পাখার ভিতরে ব্যথা : তার শক্তি সম্রাটের ক্রূর আঘাতের
চেয়ে আরও ঢের কঠিনতা নিয়ে বেঁচে আছে
কীটেরও জীবনে এক সহিষ্ণুতা প্রাণ পায়
পাখিরও জীবনে এক প্রেম
এক ক্ষমা—এক প্রেম—মানুষের হাতের প্রতিটি কাজে বেঁচে থাকে

সৃষ্টি চলে তাই সুন্দরের দিকে

ক্ষমা প্রেম স্থিরতার পানে
নক্ষত্রের শান্তির উদ্দেশে।

এরা কি সুন্দর নয় ? ব্যথার সমুদ্রে ফোটে এইসব সূর্যমুখী

সবচেয়ে আসুরিক বিজয়ের সাম্রাজ্যের থাম ভেঙে সুন্দর পাবে না তুমি কিছু
সেখানে যে সহিষ্ণুতা নাই—ক্ষমা নাই—প্রেম নাই—
কোনো দিন ব্যথা ছিলনাকো—ছিলনাকো বিশ্ববোধ।
তাহাদের শক্তি ছিল—ব্যথিত ঘাসের কীট যেই শক্তি জানে, ছিল তাহা।

তবু তাহা সম্ভোগে অন্যায়ে জয়ে অত্যাচারে লক্ষ লাল লাম্পট্যের রাতে
রক্ত মাংস মাটি হয়ে গেছে
আর কিছু হয় নাই।

এই গান গাহিয়াছ কবি তুমি,
গেয়ে চলে গেছ।

অবনত রূঢ় বিদ্ধ একটি ভ্রূকুটি পীড়িত মুখে কোন্ এক দৈত্যসম্রাটের মতো
আমাদের পৃথিবী—শতাব্দী তাহা শুনিয়াছে
যেমন শুনেছে সল ডেভিডের গান
একদিন
আন্দোলিত হয়েছিল এক রাত
তুমি এই পৃথিবীরে তোমার গানের সূতা দিয়ে আকাশের অন্য সব
নক্ষত্রের সাথে বেঁধে দিয়ে চলে গেছ।
আজও তাই নক্ষত্রেরা এত কাছে, সুন্দর নিকটে এত—শান্তি, প্রেম, ক্ষমা।

আজও তাই নক্ষত্রেরা এত কাছে

তাদের নৃত্যের সুর তবু থেকে-থেকে ক্ষীণ হয়ে আসিতেছে
কবি-তুমি ক্রমে-ক্রমে হিম হয়ে পড়িতেছ বলে
সুন্দর যেতেছে মরে ধীরে-ধীরে
শান্তি আর থাকিবে না।

ব্যারাকে ধাতুর বাদ্যে হৃদয়ের ধাতব আঘাতে
রুপালি শলার সেই দীর্ঘদেহ গানগুলো বিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত হয়ে পড়ে রবে
মৎস্যনারীদের মৃত শরীরের মতো।
ব্যথা রবে শুধু।
সহিষ্ণুতা রবে।
প্রেম রবে।

প্রতিক্ষণ। বৈশাখ ১৩৯১

ভয় ভুল মৃত্যু গ্লানি সমাচ্ছন্ন পৃথিবীতে

ভয়-ভুল-মৃত্যু-গ্লানি-সমাচ্ছন্ন পৃথিবীতে আজ
দিন শেষ হয়ে যায়—রাত্রি আসে—
দিন নেমে আসে—
জ্ঞান আছে, তবু তার সে রকম প্রচলন নেই
প্রেম আছে—তবু সে প্রেরণা
কামনার চেয়ে তাকে উজ্জ্বলতায়
সকলের সাধারণ প্রয়োজনে দান করে
সেই প্রেম ফুরিয়ে এসেছে প্রায়।

একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেলে এবারে মানুষ
চেয়ে দেখে আরেক পৃথিবী বুঝি ধ্বংস প্রায় ;
লোভ থেকে লোভে তবু—ভুল থেকে ভুলে

শূন্যতার থেকে আরও অবিকল শূন্যতার দিকে
আবর্ত ক্রমেই আরও দ্রুত হয়ে আসে।

বেলা পড়ে গেলে পশ্চিমের
মেঘের ভিতরে যেই আভা লেগে থাকে কিছুক্ষণ
সেদিকে সম্পূর্ণ চোখে তাকাবার মতো লোক নেই,
যে আলো ঠিকরে ওঠে ভোরে
পথে মাঠে জানালার ভাঙা কাচে
রক্তে শূন্যে বচনে ও নিহতবচনে
তারও কোনো মানে নেই মানুষের মনে।
ক্লান্তি আছে—শীত আছে
অন্তহীন মৃত্যু রয়ে গেছে।

বারবার দৃশ্য মুছে ফেলে
মৃত্তিকার নির্জনতাকে শুধু সাক্ষী রেখে
নতুন আভাস আলো পটভূমি জাগিয়ে-জাগিয়ে
কাজ করে চলেছে সময় মনে হয় :

মৃত্যু যেন মৃত্যুর ভিতরে শুধু নির্লিপ্ত নয় ;
কেবলই ব্যক্তির মৃত্যু হয়—তবু সময়ের কাছে
মানব ও মানবতা শাশ্বত কাহিনী হয়ে আছে।
ওরা মরে—ফিরে আসে—নতুন চেতনা এনে দেয়
যেন তা অনাদিকাল থেকে শুধু অগণন গ্লানি ক্ষয় শব
অন্ধকারে বয়ে তবু মহাজিজ্ঞাসার মর্মে উজ্জ্বল মানব।

জীবনানন্দ-সমগ্র ১। প্রতিক্ষণ। মাঘ ১৩৯১

একবার ভালো নীল ভাঙা ভুল পৃথিবী

একবার (ভালো নীল) ভাঙা ভুল পৃথিবীর হাত থেকে বার হয়ে আমি
চলে যাব কোথাও হিরণ মেঘলোকে ;
তবুও তোমার দেহে রয়ে যাব—রয়ে যাব, নারি,
দেহের ভিতরে প্রাণে—প্রাণের ভিতরে মনোলোকে।
কঠিন আঘাত পেয়ে অন্ধকারে শিখার মতন
ধাতুর ভিতর থেকে জেগে উঠে আমি
সেই কথা আর সেই অন্ধকার পৃথিবীধাতুকে
পরিহার করে দূরে অভিযানকামী
আলোর মতন জ্বলে সূর্যে উড়ে যাব ;
মিশে যাব জ্যোতিষ্কের ভিড়ে ;
দেহ নেই মন নেই প্রাণ নেই অমেয় আভায়
প্রাণ মন দেহ হয়ে যাব আমি তোমার শরীরে।

জীবনানন্দ-সমগ্র ১। প্রতিক্ষণ। মাঘ ১৩৯১

যখন দিনের আলো নিভে আসে

যখন দিনের আলো নিভে আসে আমি ক্লান্ত—তবুও উদয়
জ্বলন্ত তারার মতো সময়ের অন্ধকার শক্তিনীলিমায় ;
আমার উৎসারী স্নেহ আলো মন প্রাণ
এখন ঠেকেছে এসে অকূলের পবিত্র সীমায়।
পৃথিবীর ধুলো নিয়ে মানুষ কি শরীরী হয়েছে ?
শরীর কি ভালোবাসে নারী—নারীমন ?
রাত্রির জ্যোতির পথে প্রাণ এক পুরুষনক্ষত্র ?
কিন্তু কতক্ষণ ?

কী সংগীত জানা আছে প্রাণের মনের
কোথায় সে পেয়েছিল অগ্নিউৎস আলোকের জ্ঞান ?
ভোরবেলা অস্তসূর্যে রাত্রির নক্ষত্রবেলায়
পুরুষ নারীকে দান করে তবু তার প্রতিদান
পেয়েছে সৃষ্টির সত্ত্ব : অন্ধকার ? অমেয় শীতের
শূন্যের সংঘর্ষ থেকে নীল শিখা বুনে
আমাকে জাগাবে, নারি, একদিন সৃষ্টি লোপ পেলে,
জেনে আমি গাঢ় স্বর্ণ অনন্তের স্বর্ণকার, তোমার আগুনে।

জীবনানন্দ-সমগ্র ১। প্রতিক্ষণ। মাঘ ১৩৯১

নক্ষত্রমঙ্গল

(১৯৪২-১৯৪৭)

রাতের আঁধার বাড়লে পথে প্রান্তরে কি ঘরে
থামে এসে সারাদিনের রীতি।
সার্থবাহ নটীর হিসেব ফুরিয়ে গেলে তবে
হস্তা স্বাতী বিশাখা শতভিষা

যত না প্রিয় বাতির মতন জ্বলে বলে যেন
তাহার চেয়ে অনেক বেশি ধীকলরোল করে :
‘সমস্ত দিন মেঘ ভেঙে কি বৃষ্টি হয়েছিল ?
কিংবা অঢেল রক্ত ঝরেছে

এক পৃথিবীর সন্ততিদের আলোড়নের থেকে ?
কালো মেঘের পিছে আকাশ ছিল কি নীল তবু ?’

‘জানি না সে সব। হে গুণ, মনপবনে প্রদীপ তারা,
আমার হৃদয় মৃৎশতাব্দীশীল ;

তবুও হাতের মুখের রক্ত শিশির ঘাসে মুছে
হৃদয় আমি তারকাদের পানে
মানবসময় সরিয়ে আইনস্টাইনি লোক ভেঙে
ছড়িয়ে দিলে দিতাম অনবতুল অনবতুলে ;
কী মানে তবু নক্ষত্রদের—প্রেমের প্রতীক যদি
ক্লেদপৃথিবীর পুরুষনারীর থেকে সরে গিয়ে
নিখিল রেতঃ হয়ে থাকে ? মাটি সহজ হয়
ইতিহাসের ক্ষমতাতীত রক্ত খরচ করে ?’

‘তবুও অর্থ রয়ে গেছে—সুপরিসর ঢের ;
ম্যামথ বা তার পাঁকের থেকে মানুষ এখন জেগে
স্বাতীতারার শিশির দিয়ে যে অনিমেষ গল্প বানিয়েছে
তাই তো প্রেম : যান নিরূপণ-জ্ঞানের প্রবলতর আবেগে।’

জীবনানন্দ-সমগ্র ১। প্রতিক্ষণ। মাঘ ১৩৯১

রাত্রি অনিমেষ

কেমন এক পরিচ্ছন্ন গভীর বাতাস ভেসে আসে।
অঘ্রান রাত্রির অগণন জ্বলন্ত নক্ষত্রের আলোয়
সমস্ত পৃথিবী তার জলঝরনার—নগ্ন নারীহস্তের নির্মলতায়
নিঃশব্দে উৎসারিত হয়ে উঠছে আজ।
পৃথিবীকে আকাশের মতন মনে হয় ;
আকাশকে সময়ের মতন ;

কোথায়ই বা উদয় হয়নি সে—কোথায়ই বা যায়নি ?
সমস্ত আধো-আলোকিত সৃষ্টির বুকের উপরে
যেন কার দীর্ঘ নারী-অঙ্গের ছায়া পড়েছে
মাঠে—খাদে—বস্তির মরণে—মিনারে—
শান্তি-অশান্তির কলরোলে—নগরীর জ্বলায়—মানুষের চোখের ঘুমে।

আকাশে তারা কম।
বাতাসে—শাদা মেঘের ফাঁকে একটি কি দুটি নক্ষত্রে আলোকিত রাত্রে
কোনো সার্থবাহের উটের পাশে কি এই ছায়া—
আমার জীবন থেমে আছে, অতএব তাকে নিমেষনিহত করে ?
কোনো ক্যাম্পে ঘুমিয়েছিলাম যেন সমস্ত হেমন্তকাল ;
জেগে উঠে দেখলাম কোথাও কেউ নেই আর ;
কোনো শব্দ নেই,
কোনো উট নেই ; উটের ছায়া রয়েছে মরুভূমির
অঘ্রানের আলোশক্তির শান্ত অপরিমাণ রাত্রে ;
কী এক গভীর বাতাসে প্রতিটি নক্ষত্র নিভে-নিভে-নিভে
আবার জ্বলে উঠছে সেই নারীর হাতের নিবিড় মোমের মতো।

জীবনানন্দ-সমগ্র ১। প্রতিক্ষণ। মাঘ ১৩৯১

হে হৃদয়, নীড় থেকে ঢের দূরে

হে হৃদয় নীড় থেকে ঢের দূরে ধরা পড়ে গেছ
বিকেলে আলোর রঙ নিজ মনে কাজ করে পাখিকে না বলে
ছায়ায় অঘ্রান মাঠ ঢেকে ফেলে চমকায়ে দিল
কেউ নেই—শূন্যাকাশ পটসঙ্গিনীর মতো হলে
তার কাছে বলা যেত : আমি ডানা-পালকের প্যাঁকাটির মতো হরিয়াল
কাউকে না পেয়ে একা চারিদিকে উপচানো রাত্রির মুফতে

ধাঁধার ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা ঘুম মরণের ঢেউয়ে
প্রেমের সূর্যকে কোনোমতে
জাগায়ে জ্বালায়ে আমি উড়ে যাই ডিসেম্বর রাতে—

এইসব ভোরভাষা নিচের নগর হ্রদ বস্তি মৃত্যুকে
দান করে বাতাসের ঘুরনচাকির আগে পাখি
টের পায় জীবনের ভিতরের অনুভূতিটিকে
কেলিরও চেয়ে সে ভালো অন্য এক আনন্দসাগর
সেদিকে যাবার পথে চোখ তার ভর্ৎসনা বেদনা ভয় দোষ থেকে মুক্তির মতন
আকাশ নদীর জল শ্মশান এয়ারোড্রোম ঝাউয়ের সাগরে
হঠাৎ সকলই সূর্য—নিজেও সে সূর্য একজন।

জীবনানন্দ-সমগ্র ১। প্রতিক্ষণ। মাঘ ১৩৯১

শহর-বাজার ছাড়িয়ে

শহর-বাজার ছাড়িয়ে আমার দৃষ্টি পড়ে নক্ষত্রদের দূর আকাশের পানে
যখন আমি রাতের বেলা দেখি—
নগরীর ঐ পুরুষ নারী কী চেয়েছে কোথায় যাবে—কিছুই জানে না
চারিদিকে প্রেম ও প্রাণের আততায়ী দীক্ষা অপশিক্ষা আগুন উত্তেজনার ঢেউ
ভাঙছে আমার শতাব্দীকে—স্বাতীতারার মতন তবু কেউ
নিজের স্বচ্ছ কক্ষ থেকে একা
এই পৃথিবীর সে কোন্ অধম শক্তিগুলোর 'পরে
ভালো হবে বলে শিশিরফোঁটার মতো ঝরে।

তোমার আসাযাওয়া কথা আদানপ্রদান কুশীলবের দূর বলয়ের থেকে
আমার পানে, নারি, তুমি আজকে রাতে আবার তাকায়েছ
কী যে কবে বলতে চেয়েছিলাম তোমায় আমি

কী যেন ঋণ—সে কোন্ সিঁড়ির ঘুরুনিতে মাঠে অন্ধকারে আজকে মনে নেই—
নিয়েছিলাম ? আমায় তুমি ফিরিয়ে দিয়েছিলে ?
দুইটি তট ; কিন্তু তবু একটি নদী দুইটি তট মিলে।
রোদ যেখানে হরিণ মেঘের মৌমাছিদের সেই পৃথিবীর তুমি
সরোবরের পথে বুকের ঐশী জিনিস ঢেকে
নীলকণ্ঠ পাখির গুঞ্জরনে চমক ভেঙে চেয়ে দেখে
আমার কণ্ঠবিষের পানে তাকিয়েছিলে।
চারিদিকে রক্ত ক্ষতি গ্লানির কাছে ঋণ
লাভ করে আজ শ্রীলাভ করার দিন
মানুষও তার আ-চলমান নিশ্চয় মৃত্যুর
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা—মাঝখানেতে চোরাবালি আশ্বাসে ভরপুর
আজ আমাদের পৃথিবী—এই শতাব্দী এ রকম।

তোমার কারণ ক্রান্তি তবু আমায় অভয় দিল
তোমার আলো আঁচল আভাস শরীর
নীল আকাশে শরৎ এলে সূর্য জ্যোৎস্না হরিয়ালের কথা
জাগিয়ে দিয়েছিল—
পাখিহন্তারকের প্রাণে—কামের চেয়ে প্রেমে তাহার দু-চোখ পূর্ণ করে
অন্ধকারে তারা নদী সাকোরখোরার ঝিরঝিরানির মতন তোমার চোখের মণি, চুল,
শরীর শান্ত দয়ালুতায় জেগে উঠে পরীর, মনে হয়,
জানে দয়ার মীমাংসা—দান, শরীরদান নয়।

তবুও কেন আমার পানে তাকিয়ে আছো একা
এগারো বৃহস্পতি বারো সূর্যে ভরা আজকে পৃথিবীতে
চারিদিকে আর্তি অব্যাহতি তলব সুখবরের দিনে
খাতক কেন আটকে পড়ে আছে তবু মহাজনের ঋণে ?
ক্রূর আমি ? তিক্ত তুমি ? কিংবা স্বীয় স্বীয়

প্রাণের বিনিময়ে সবই সত্য, স্থির : কাকচক্ষু জলে কি পূরণীয় ?

ঢের তাপিত জেগে উঠে ঐ মহিলার বলয়-আলোর পানে
কিশোর যুবা প্রবীণ মনে তবুও নতুন উত্তেজনা নিয়ে
কী চায়, আহা,
সে কোন্ নতুন আলোর গ্রন্থি সন্দীপনের তারা ?
আমার এসব কুশল প্রশ্নে চকিত হয়ে শচী অহল্যারা
বলছে হেসে, সেই রমণী এইখানেতেই আছে
এসো শরীর অথবা তার ব্যাধির অতীত মৃগনাভির কাছে
রাত্রিবেলা ঘাসের শিষে একটি শিশির ফোটে
চারদিকে তার নক্ষত্র ও শিশির লাখো-লাখো
প্রেম কি তাদের গণিত স্থির করে দেবার সাঁকো ?—
শুধাতেছে তোমার পানে তাকিয়ে মহীয়সী
সময় সূর্য সাগরপারে নতুন দিনে দণ্ডায়মান তুমি
দ্বৈপায়নের মতন অন্ধ মহাশূন্য দেখছ নাকি আলোর প্রতিসারী
প্রেম তবুও নিজের প্রতিভারই
মতন আরেক আঁধার আলো সময়বীমার শূন্য নিঃসময়,
কৃষ্ণা, তোমার আঁধার ঘিরে শাড়ির মতো নিজেকে মনে হয়।

জীবনানন্দ-সমগ্র। ১। প্রতিক্ষণ। মাঘ ১৩৯১

এখন এ পৃথিবীতে

এখন এ পৃথিবীতে ভালো আলো নেই—
ভাষার বেগের বিহ্বলতার শেষ করে অন্ধকার
মাঝে-মাঝে জীবনের পথে আসে,
আজকে সততা সত্য সুধা নেই—কিন্তু পৃথিবীর পথে রূঢ়
রক্তাক্ত অন্যায় আলো বেনামদারের মতো জেগে

নিজেকে প্রাণের সূর্য বলে যদি এখনও প্রচার করে তবে
যে আলোর প্রতিবাদে আজকের পৃথিবীতে অন্য আলো নেই
অন্ধকার রয়ে গেছে।

আজকের পৃথিবীর নরনারীদের
কেবলই হাতের কাছে পড়ে পাওয়া অন্ধকার নয়
আরেক গভীরতর ধর্মের জিনিস।

প্রকৃতিতে সূর্য আছে ; প্রকৃতিতে নয়—তার মানুষের মনে
সূর্য ভেঙে গেলে তার বুক থেকে নিঃসৃত নিষ্ফল অন্ধকার
আকাশের মতো বড়ো ব্যাপ্তির মতন
অখণ্ড অনন্ত এক
প্রাণের কামনা থেকে ইচ্ছুককে মুক্ত করে নিয়ে
হৃদয়ের সব দোষ প্রক্ষালন করে
কবেকার থেকে আজও ক্লান্তিহীন সময়ের সাধনার ফল অন্ধকার
মানুষের পৃথিবীতে সে অনেক শতাব্দীর আগে
ঈশ্বর স্খলিত হয়ে গেছে—তবু মানুষের স্বভাবের গভীরতা আছে
প্রেম চায়, ন্যায় চায়, জ্ঞান চায়—অথবা এ সব
আজ এই পৃথিবীর বিমূঢ় আলোয়
সকলই নিষ্ফলপ্রায় হয়ে গেলে অন্ধকার চায়
সকলই সফলকাম একদিন হয়ে যাবে বলে।

জীবনানন্দ-সমগ্র ১। প্রতিক্ষণ। মাঘ ১৩৯১

কোথায় গিয়েছে

কোথায় গিয়েছে আজ যেইসব পাখি,—আর সেইসব ঘোড়া—
সেই শাদা দালানের নারী ?

বাবলা ফুলের গন্ধে, সোনালি রোদের রঙে ওড়া
সেইসব পাখি, আর সেইসব ঘোড়া
চলে গেছে আমাদের এ পৃথিবী ছেড়ে ;
হৃদয়, কোথায় বলো—কোথায় গিয়েছে আজ সব !
অন্ধকার : মৃত নাসপাতিটির মতন নীরব।

জীবনানন্দ-সমগ্র ২। প্রতিক্ষণ। বৈশাখ ১৩৯২

পথের কিনারে

পথের কিনারে দেখলাম একটা বেড়াল পড়ে আছে,
আস্তে-আস্তে ছটফট করে মরে যাচ্ছে ;
কেন এই মৃত্যু ?—বরং অল্পবয়সের এই প্রাণীটির ?
একে ঘিরে কোনো জনতা নেই,
খানিকটা কলরবও নেই, এর মৃত্যুকে আস্তে-আস্তে ভালোবেসে তরিয়ে দেবার জন্য
বেড়ালটা তার শরীরের সমস্ত শাদা কালো রঙ দিয়ে
মুহূর্তের জন্য আমার মনের ভেতর চিন্তা হয়ে এল
তার নির্জন অদ্ভুত শরীরের সমস্ত শাদা কালো রঙ নিয়ে
আমার কবিতার ভেতর এল ;
বললে, 'এর চেয়ে অসাধারণ দাবি কোনোদিন করব না আমি আর।'

জীবনানন্দ-সমগ্র ২। প্রতিক্ষণ। বৈশাখ ১৩৯২

বাইরে হিমের হাওয়া

বাইরে হিমের হাওয়া
হেমন্তের হাত ;
দরজায়-জানালায়
অবিরাম রাতের আঘাত ;

যত দূর আকাশের কালো চোখ যায়
অগণন নক্ষত্রের ফোঁটা-ফোঁটা বরফ ঘুমায়।

পৃথিবীর সব নদী সকল সমুদ্র—
আর সব রাজপথ ফেলে
এসেছে প্রেমিক এক—
চারিদিকে ঠাণ্ডা ময়লা দেয়াল ও ঘর ;
কক্ষ থেকে কক্ষের ভেতর
এঁকেবেঁকে সিঁড়ি চলে গেছে।
পৃথিবী মানুষ প্রাণ হেতু অকারণ
নির্জন আঙুল তুলে করেছে বারণ :
'কোন্ কক্ষে যাবে তুমি সিঁড়ি বেয়ে—
কোন্ দিকে যাবে ?
এইসব সিঁড়িগুলো পার হয়ে শেষে
আদি শূন্য সিঁড়িতে দাঁড়াবে ফের এসে।'
জীবনের সময়ের বিশ্বের এই এক মানে
পথ ছাড়া নেই কিছু অনন্ত পথের অন্তর্ধানে।

জীবনানন্দ-সমগ্র ২। প্রতিক্ষণ। বৈশাখ ১৩৯২

মানুষের কবেকার অপলক সরলতা

মানুষের কবেকার অপলক সরলতা আজ
নষ্ট হয়ে গেছে বলে মৃত বই ছবি আলো জিনিসের সারি
হৃদয়ে বহন করে সচকিত সার্থবাহদের
পৃথিবী ও পৃথিবীর লক্ষ্যে দরকারী
অনেক নতুন জ্ঞান সহিষ্ণুতা অগ্নির বলয়

স্বভাবে সফল করে তোমার মতন নারী হয়।

আমার চোখের দিকে চেয়ে আধো-ইতস্তত মনের গরজে
কী এক অতলহ্রদের সীমা খোঁজে
কলকাতার বিকেলের নিভন্ত আলোকে
মনে হয় সেহ্রদের তলদেশ যেন তার চোখে।
তবু সে আমার নয়, অপরের, জেনে তার নেই সন্তাপ
এমনই সচ্ছল এই পৃথিবীতে উৎসারিত সূর্যের পাপ।

জীবনানন্দ-সমগ্র ২। প্রতিক্ষণ। বৈশাখ ১৩৯২

নক্ষত্রেরা অন্ধকারের পটভূমির থেকে

নক্ষত্রেরা অন্ধকারের পটভূমির থেকে
তাকিয়ে আছে হেমন্তলোক স্পষ্ট করে নিচের নিরাশায়
মৃতপ্রায় মানবতার অনাথ চোখের দিকে।
এই পৃথিবীর মৃত মহাজাতকের মুখচ্ছবির মতো
নক্ষত্রেরা শুভ্র শূন্য নিমেষনিহত।
চলার পথে শীত অতীতের প্রয়োজনীয় স্মৃতি
বহন করে ম্যামথ ম্যামাল কালক্রমে মানুষ বানাল,
নিনেভে রোম হিরোশিমায় পৌঁছে অ্যাটমের
হাতে মানুষ, মানব-ফসিল, ক্রমোন্নতির আলো।

জীবনানন্দ-সমগ্র ২। প্রতিক্ষণ। বৈশাখ ১৩৯২

তবুও মনকে ঘিরে

তবুও মনকে ঘিরে মহামানবিক আলোড়ন
আর এই পৃথিবীর অন্তহীন দ্বিধা দ্বেষ প্রেম সংগ্রাম

আমাদেরও রক্ত দিয়ে আদি রক্তবীজের নিধন
চেয়েছে, মিটিয়ে দেব ষোলো আনা দাম।

সুঅধ্যায় পর্বের প্রায় ক্ষয় হল আজ
এই শতকের দিন ক্ষয় প্রায় হয়ে এল আজ।
অনাদি আশার বার্তা কালে-কালে নীল নিরালয় শূন্যে ভেসে
অসংখ্য শতক ধরে অঙ্কিত রেখেছে সমাজ,
কিছুই হয়নি আজও।
তবুও মৃত্যু ভালো, যুগে-যুগে মহান এ যুদ্ধ ভালোবেসে।
আশাশীল রাত্রি আসে চিরায়িত আশা ভালোবেসে।
সচেতন রবে আলো অপ্রাপ্য ও আলো ভালোবেসে।
শত-শতাব্দীর আশা নষ্ট হলে মৃতপ্রায় মানবসমাজ
চলেছে তবুও
চলে।
বহু শত শতাব্দীর অনাগত আশা ভালোবেসে।
যুগে-যুগে আলম্বন অন্বেষণ করবার কাজ
রক্তাক্ত মানুষদের দিতেছে গভীর ভালোবেসে।

ঘরে কোনো লোক নেই—কয়েকটি গ্রন্থ তবু আছে,
রয়েছে অব্যয় ছবি তিনজন চারজন একান্ত শিল্পীর
ফ্রান্সের, ইটালির, নিম জাম আমলকী গাছে
রয়েছে অগণ্য সব পাখিদের নীড়।
বারবার নষ্ট হলে তবু ম্লান মানবসমাজ
চলবার বেগ পায় ইন্দ্রধনুকে ভালোবেসে।

শরীরিণীকে

নির্ঝর বনানী নদী আকাশ ও নারীর শরীর,
তোমাদের স্বাভাবিক সুকৃতি রয়েছে।
আমরা মৃত্যুর হাতে ভ্রান্ত হয়ে জীবনের সেবা
আধেক তো শুরু করি—সৌন্দর্যকে হয়তো আধেক
হৃদয়ে ধারণ করে চোখ বুজে চুপে বসে থাকি ;
দিনের সূর্যের দিকে আমাদের জীবনের বাতি
ঈষৎ ফিরিয়ে—রাতে অনিমেষ নক্ষত্রের থেকে
আশ্বাস হারিয়ে ফেলে, খুঁজি কেন অন্য এক সীমা !
কিছু নেই ; হবে না ; রবে না ঠিক ; তবু স্বাভাবিকতার সকল ম্লানিমা।
চারিদিকে সময়ের শূন্যতার থেকে
লীনপ্রাণ বৃক্ষকে ডেকে-ডেকে
যে রকম স্থির নীল হয় দিন হয় পাখি হয় পাখিদের নীড়
নক্ষত্র নির্ঝর নদীর নারীর শরীর।

জীবনানন্দ-সমগ্র ৩। প্রতিক্ষণ। মাঘ ১৩৯২

জল

অনেক বছর পরে এখন আবার দেখা ;—ভালো।
চারিদিকে কলকাতার হেমন্তের বিকেল নিভছে ;
গ্যাসল্যাম্পে বেশি আভা—আকাশে নক্ষত্রলোক হতে
কম আলো—কোথাও প্রকৃতি নেই—কিংবা তার ভিতরের পাখি
উচ্ছল পাতার মতো শব্দ হয়, জেগে ওঠে
কলকাতার ফুটপাথে ল্যাবার্নাম গাছে
নারীকে শুধানো যেত—তবু নিরুত্তর হয়ে আছে
বারো বছরের আগের মনের ভিতরে দূর দেশে ;

যেন গর্ভিণীর মতো ;—অজাত শিশুর ধ্যানে চুপ
হয়ে গিয়ে মুহূর্তেই অনুভব করেছে স্বরূপ
স্বভাববন্ধ্যার মতো যেন তার।

রূপকে এসব কথা ভেবে নিয়ে আমি
বুঝেছি, বুঝেছে সব—আমারই মতন অন্তর্যামী।
তারপরে বেশি হাসে কথা বলে দোকানের কেনাকাটা করে
আমি জল—তবু যেন অন্য কোন্ জল এসে পড়ে
চোখে মুখে নাড়ীর কম্পনে তার জানি
কোনো দূর অন্ধকারে অবিরল ঋণী যে কী ঝরঝরানি
এ নারীকে দেনা নিয়ে, অপর জলের দূর দেশ থেকে শোনা যায়—
সে এই নারীর স্বামী অথবা প্রেমিক
তবু জলের মতন যেন ঠিক ! ক্রমে সুদ খুব বেশি জ্বলে।
সব জ্ঞান ধর্ম উদ্যমের চেয়ে জল ভালো বলে
খাতক হয়েও তবু উত্তমর্ণ মহিলার চেয়েও সফল
সৃষ্টির অন্তিম কথা অন্ধকারে জল।

জীবনানন্দ-সমগ্র ৩। প্রতিক্ষণ। মাঘ ১৩৯২

যেন তা কল্যাণ সত্য চায়

যেন তা কল্যাণ সত্য চায়,—তবু অবাধ হিংসার
রিরংসা-পাকে ঘুরে-ঘুরে-ঘুরে শূন্য হয়ে যায়—
অন্ধকার থেকে মৃদু আলোর ভেতরে
আলোর ভেতর থেকে আঁধারের দিকে
জ্ঞানের ভেতর থেকে শোকাবহ আশ্চর্য অজ্ঞানে
বারবার আসাযাওয়া শেষ করে ফেলে।

একদিন আরও জ্ঞানী হয়ে তবু ক্লান্ত হয়ে রবে।
ব্যবসা-বাণিজ্য যুদ্ধে বারবার বিজ্ঞান বিষম
হলে তা বিশুদ্ধ জ্ঞান ভয়াবহ ব্রহ্মাণ্ডের ;
সময়ের আবর্তনে নিমিত্তের ভাগী বুঝি প্রেম।

সনাতন সময়ের উন্মোচনে তবু
হৃদয়ে এসেছে প্রেম বারবার ;

চিরকাল ইতিহাসবহনের পথে
রক্ত ক্ষয় নাশ করে যে এক বলয়ে
মানুষের দিক্‌চিহ্ন মাঝে-মাঝে মুক্ত হয়ে পড়ে
অচিহ্নিত সাগরের মতন তা, দূরতর আকাশের মতো ;
কোনো প্রশান্তি নয়, মৃত্যু নয়, অপ্রেমের মতো নয়,
কোনো হেঁয়ালির শেষ মীমাংসার গল্প নয়,
শুধু আরও শুদ্ধ—আরও গাঢ় অনির্বচনীয় সম্মেলন :
(হৃদয়ের ভূগোলের মহাদেশ আবিষ্কৃত হবে।)
সব পেছনের পার্শ্বের লীন লীয়মান
অন্তর্হিত হয়ে গেলে কূলহীন পটভূমি জেগে ওঠে।

জীবনানন্দ-সমগ্র ৩। প্রতিক্ষণ। বৈশাখ ১৩৯২

যদিও আজ তোমার চোখে

যদিও আজ তোমার চোখে আমি ছাড়া অন্যরা বিখ্যাত
মনে পড়ে অনেক আগে এমন ছিল না তো
মাঠে ঘরে সম্মেলনের থেকে ফিরে
তখন তুমি সহজ স্বাভাবিকের মতন ছিলে
আমিও তখন তোমাকে ছেড়ে সমাজ পৃথিবীর

অসংগতির করুণ ক্লান্ত ভাষা
শুনিনি এমন। গভীর অন্তরঙ্গ আঘাত করে :
চূর্ণ করে ফেলতে পারে তোমার আমার মতন ভালোবাসা।

দিনে তোমায় সঙ্গে নিয়ে নদী নগর প্রাক্‌সামরিক রাষ্ট্রে পৃথিবীতে
হৃদয় ভরে কিছু নিতে, কিছু দিয়ে দিতে
ব্যস্ত থেকে ভুলে যেতাম বীজাণু রোগ মৃত্যু মলিনতা
ক্লান্তি বিয়োগ ছিল, তবু সে সব নিছক মাংসপেশীর ব্যথা
সুস্থিরতার কাল চলেছে তখনের প্রায় ভারতে ইউরোপে
প্রথম মহাযুদ্ধ সবে শুরু তখন, কানে খানিক জল
ঢুকে গেলেও পূর্বাচার্যেরা সব ঝেড়ে
ব্যাঙ্কে ধর্মে যৌন সম্মিলনে সূর্যে আশ্চর্য সফল।

দিনের বেলা ফ্যাক্টরি ডক বস্তি ফাঁড়ি আজিকাজি ডাঙার ভিতর দিয়ে
ঢাকনি খুলে ঘুরে বেড়ায় সে সব পথে তোমার কাছে গিয়ে
পরিহাসের রসিকতায় উৎসারিত হয়ে
সৈন্য, নটী, দালাল, ভাঁড়, ব্রাত্য, সার্থবাহের ঘরে
সচ্ছলতা আশা আপোস কাড়াকাড়ি বিলাস ব্যর্থতায়
দেখেছিলাম কল্কী ও তার ঘোড়া রগড় করে।

আঁধার সভা স্বদেশী মেলা ঢের জানালার হৃদয়বিদারক
অন্ধকারে চেয়ে থেকে পূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও ছক
হৃদয় এল ধীরে—ক্রমে—বিষণ্ণতার স্থির প্রতীকের মতো।
ইতিহাসের নিয়ম কঠিন, তবুও ফোঁটায় করুণাবশত
অপার আশার আকাশকুসুম ; লোকায়ত সফলতায় প্রবেশ করে নিতে
দেরি করে ;—মানুষেরাও ক্লান্তিবিহীন প্রাণের প্রকাশ দেখিয়ে দিতে জানে
বলে ; তখন লোহা পাথর ছিল, এখন অণুর বিদারণে

পথে এল, আলো পেল মানবতার মানে।

এখনও সে তেমন হতে পারেনি কিছু তবু
ভেবেছিলাম মানুষ ইতিহাসের হাতে ক্রমেই বড়ো হবে
মেশিনকে বশ করে খেলার চেয়ে
হয়ে পড়ে অন্য সফলতায় প্রবীণ ;—তবুও মানুষ খেয়ে
মেশিন ক্রমেই আজ পৃথিবীর একক শক্তি হল
প্রেমের ছেদ হয়ে তার নিউক্লিয়ার বোমীয় ক্ষমতা
বেড়েই গেল—জ্ঞানের পরিণামের মানে হল
এই ধরনের পৃথক করার কথা ?

এখনও ঢের আলোয় পথিক রয়েছে তবু জানি
অনেক অমর অর্ধসত্যে অবিশ্রান্ত রাজকীয় চালানি
চলছে আজও স্পষ্ট শতাব্দীকে স্পষ্ট অর্থে দাঁড় করাতে গিয়ে
দেখেছি সে কাজ প্রমথদের ; চারিদিকের অন্দকারের ভিতরে দাঁড়িয়ে
তবুও দেশ সময় ও সমাজ বাস্তবতা
অনেক দূরের থেকে করুণ সুরের মতো ক্রমে-ক্রমে বজ্রশব্দে এসে
আজকে যুগের গণনাহীন ব্যক্তি জাতি অর্থ প্রয়াস রীতির স্তম্ভ ভেঙে
মৃত্যু সে কি, গভীরতর (সফলকাম) সত্য ভালোবেসে।

জীবনানন্দ-সমগ্র ৩। প্রতিক্ষণ। বৈশাখ ১৩৯২

আকাশে রাত

এখন আকাশে রাত,
সে অনেক রাত ;
উনিশশো অনন্তের রাত্রি নাকি।

সময় ও অসময়—সকলের সুর
স্থির স্থিরতর হয়ে উঠে
জলের ওপরে জলকণিকার কথিকার শব্দের মতন
অবনমনের ব্যাপ্তি পায়।
পৃথিবীর জাগরীর গুঞ্জরন দূরে
সৈন্য নটী ভিখিরির ;
তারপর কোনো এক সময়ের জন্য নীরবতা
মেনে নিতে হবে জেনে সার্থবাহদের
আলাপ মিইয়ে আসে মুখে
এখন ঘুমের আগে
গভীর রাত্রির পথে।
পৃথিবীর নানা দেশনগরীর কয়েকটি সচকিত ছবি
প্রাণে উৎসারিত হয়ে যেতে চায় :
দিল্লি, চীন, প্যালেস্টাইন, কলকাতা, করাচি,
এথেন্‌স, মিশর, ফ্রান্স, মস্কৌ, লন্ডন, ন্যুইয়র্ক, ওয়াশিংটন,
আধুনিক ভূমিকার গাঢ় মানদণ্ডের মতন
এইসব।
এইসব নগর বন্দর দেশ আজও
অতীতের উত্তরাধিকার থেকে ক্লান্ত প্রাণে উঠে
নতুন সূর্যকে সেধে তবু তাকে শীত করে দিতে চায় যেন।
কোথাও হ্বার্সাই প্ল্যানে লোকার্নো জেনিভা প্রেত...প্রাণে
কথা কয় বলে মনে হয় ;
নিথর আটোয়া-চুক্তি ফেঁড়ে গিয়ে—থেমে
কেউ নয় আজ আর ;
মিউনিখ প্যাক্ট চিরন্তন বিষয়ের
লক্ষ্যভেদ হয়ে গেছে ভেবেছিল ;
প্রায়ান্ধ দেবীর মতো নীলজলরাশির ওপার থেকে দ্বীপ

সমস্যার নিরসন হবে বলেছিল
ভারতকে যাকে যা দেবার সব স্থির করে ভালো করে
দান করে ;
আরও পরে কনফারেন্স কমিশন প্ল্যান
বিদেশ স্বদেশ সমসাময়িকতার হয়ে তবু
যেন ঢের বিস্তীর্ণ সময়
অধিকারে রয়ে গেছে মনে ভেবে বিহ্বলতায়
মানুষকে বিজড়িত করে চলে গেছে।
কবেকার অন্ধকার আদি দায়ভাগ থেকে ক্রমে মানবের
জীবন বন্ধনমুক্ত হতেছিল নাকি ?
কারা যেন সেই
সমুদ্রের মতন মুক্তিকে
গোষ্পদে বিমুক্তি দিতে গিয়ে নেশনের
ব্যবহারে ব্যভিচারে বারবার ছেনেছে ছিঁড়েছে।

রাষ্ট্রনীতি কামনাকেলির চুক্তি সব ;
এছাড়া এ সব দেশ জাতি অধিনায়কের প্রাণে
কোথাও প্রেরণা নেই—দীপ্তি নেই ;
আজ এই আধুনিক দিনে মাসে সময়ে কী কাজ হতে পারে
সে জ্ঞান হারায়ে ওরা অন্তহীন হেতুহীন সময়ের হাতে
সব ভুল শুদ্ধ হবে ভেবে
অবচেতনায় অন্ধকারে প্ল্যান গড়ে, প্যাক্ট করে।
সময়ের ব্যাপ্ত চোরাবালির ভিতরে
ডুবে যায়।
তবুও এখন ওরা
নতুন শক্তির মতো
নিজেদের মতো সেই মূল্যজ্ঞান রয়েছে ; তাছাড়া

কোথাও অপর কাজে মূল্য নেই মনে ভাবে ওরা
আবার প্রলুব্ধ করে যায়,
অবসন্ন পৃথিবীর প্রাণে আত্মপ্রসাদের ঋতু
আবার নেমেছে বলে।

বলে নিতে চায় : সবই নেশনের-নেশনের-নেশনের।
কানাডার সমুদ্র ও বল্‌কান্ বল্‌টিক্ গ্রীক সাগরের থেকে
দিল্লি লন্ডন কাইরো ডাম্বার্টন ওক্‌স্ টেহেরান ইয়াল্টায়
ফ্রান্স লেক্‌সাক্‌সেস্ চীন আমেরিকা সোভিয়েটে
বিরাট বিসার নাদ মনে হয় যেন ব্যস্ত, অন্তরীক্ষে ঘুরে
সন্তানের মতো নিঃসীম জীবনের জননীকে খুঁজে
শিহরিত হয়ে তবু দেখে গেছে আজ এই অন্ধকার পৃথিবীর সীমা
যদিই-বা আলোকিত হয় তবে সে এক বিমূঢ় হিরোশিমা।
চারিদিকে তাই ব্যর্থ মৃত্যুশীল তবুও আশ্চর্য সব
আশাশীল মানুষের আলোড়ন।

তারা স্থির নেই ;
দিন শেষ হয়ে গেলে আরও বড়ো রাত্রির ভিতরে
ঘুমে নেই ; মৃত্যু আছে ; অথবা আমৃত্যুলোক—পামর, অনন্দা ;
সেসব মরণোত্তর ভিড় আজ অন্ধভাবে অনুভব করে ;
তাদের দেহের সব অনাগত সন্তানের তরে রেশনের
নির্দিষ্ট মাত্রার মতো কোনো দিকে নারী,
নারীরা রয়েছে—কিংবা নেই ;
প্রেম নেই, প্রীতি নেই, সূর্য নেই, অন্ন নেই, কিংবা মহাকাল
কেউ নয়

অন্ন নেই—অন্ন নেই—নেই ;

ইতিহাস : বিছানায় মৃতপ্রায় মুগ্ধা অন্তঃসত্ত্বার মতন ;
বাকি সব সন্তানের সন্তানেরা এসে একদিন
লিখে যাবে।

মানুষের চেতনার দাহ আছে আজও শোকাবহ
যত বেশি আলো তাতে আরও বেশি তাপ
সংগতি বেড়ে গেলে পেতে পারে ক্রমেই স্নিগ্ধতা
প্রাণের প্রেমের স্বচ্ছ আবরণ দিয়ে তাকে ঢেকে দিতে হবে
দিতে হবে ক্রমেই স্নিগ্ধতা
এ না হলে বিজ্ঞানের মর্মে-মর্মে কীট আর ব্যথা
নিরন্তর দোষে পরিণত হবে মানবের প্রতিভার গুণ
সব আলো হয়ে যাবে ক্ষমাহীন নিয়মের আগুন।

জীবনানন্দ-সমগ্র ৩। প্রতিক্ষণ। বৈশাখ ১৩৯২

অঘ্রান রাত

অনেক-অনেক দিনের পরে আজ
অন্ধকারে সময় পরিক্রমা
করতে গিয়ে আবছা স্মৃতির বইয়ের
পাতার থেকে জমা—
খরচ সবই মুছে ফেলে দিয়ে
দানের আয়োজনে নেমে এল,
চেয়ে দেখি নারী কেমন নিখুঁতভাবে কৃতি ;
ডানা নড়ে শিশির শব্দ করে
বাহিরে ঐ অঘ্রান রাত থেকে ;
এ সব ঋতু আমার হৃদয়ে
কী এক নিমেষনিহত সমাহিতি

নিয়ে আসে ; ভিতরে আরও প্রবেশ করে প্রাণ
একটি বৃক্ষে সময় মরুভূমি
লীন দেখেছে, গভীর পাখি গভীর বৃক্ষ তুমি।

কবিতাসমগ্র : জীবনানন্দ। ঢাকা। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

এখানে দিনের—জীবনের স্পষ্ট বড়ো আলো নেই

এখানে দিনের—জীবনের স্পষ্ট বড়ো আলো নেই
ধ্যানের সনির্বন্ধ অন্ধকার এখানে আসেনি
চারিদিকে ভোরের কি বিকেলের কাকজ্যোৎস্না ছায়ার ভিতরে
আহত নগরীগুলো কোন্ এক মৃত পৃথিবীর
নিহত জিনিস বলে মনে হয়, তবু,
মৃত্যু এক শেষ শান্ত দীন পবিত্রতা

আমাদের আজকের পৃথিবীর মানুষ—নগরগুলো সে-রকম আন্তরিকভাবে মৃত নয়
বাজারদরের চেয়ে বেশি কালো টাকা ঘুষ দিয়ে জীবনকে পাওয়া যাবে ভেবে
যেন কোন্ জীবনের উৎস অন্বেষণে তারা সকলে চলেছে
পরস্পরের থেকে দূরে থেকে—ছিন্ন হয়ে—বিরোধিতা করে
সকলের আগে নিজে—অথবা নিজের দেশ নিজের নেশন
সবের উপরে সত্য মনে করে—জ্ঞানপাপে অস্পষ্ট আবেগে
পৃথিবীর মানুষের সকল ঘটনা গল্প নিষ্ফলতা সফলতা যদি দেশলাইয়ে
পুড়ে ছাই হয়ে যায় তবে
আমি ও আমার দেশ আমার স্বজন ছাড়া ওরা
উৎসাদিত হয়ে যাক—এই ভাব—এমনি কঠিন অপ্রীতি চারিদিকে
আমাদের রক্তের ভিতর অনুরণিত হতেছে
তবুও সার্থককাম কেউ নয়

আমাদের শতাব্দীর মানুষের ছোটো বড়ো সফলতা সব
মুষ্টিমেয় মানুষের যার-যার নিজের জিনিস
কোটি মানুষের মাঝে সমীচীন সমতায় বিতরিত হবার তা নয়
এইখানে মর্মে কীট রয়ে গেছে মানুষের রীতির ভিতরে
রীতির বিধানদাতা মানুষের শোকাবহ দোষে।
প্রকৃতি আবিল কিছু, তবু মানুষের
প্রয়োজনমতো তাতে নির্মলতা আছে
আর কিছু আছে তাতে, হেন মানুষের সব প্রয়োজন সীমা
শেষ করে অহেতুক অন্তহীন চকিত জিনিস
রয়ে গেছে—এক-আধজন কবি প্রেমিকের তবু
এ সব জিনিস নিয়ে প্রয়োজন—সকলের নয়।

প্রকৃতি ও জীবনের তীরবাসী জ্ঞানময় মুক্ত মানুষের
নিকট সংস্পর্শে এসে শান্ত শান্তিকাম
হবে না কি আমাদের শতকের অবিশ্বাসী অধীর মানুষ
কবে সে উজ্জ্বল হবে প্রিয় হবে সহৃদয় হবে
পৃথিবীর অগণন সহোদর জীবনের তরে।

সাগরকণ্ঠের মতো রাত্রির বাতাস অন্ধকারে
আমাদের শরীরের শুভ্রশঙ্খে কেমন বিধৌত হয়ে উচ্ছলিত হয়
মানুষের কানে-কানে কথা বলে সমস্ত আকাশ
সহসা সুদূরে গিয়ে আধো-পরিচিত মহিলার
শাড়ির মতন নীল—উপস্থাপিত হয়ে রৌদ্রের ভিতরে
নীলিমা কি প্রকৃতির? অথবা সাধনোচিত নারীর প্রতিভা?
পাখিদের ডানা-পালকের থেকে বিকেলের আলো
নিভে গেলে রাত্রির নক্ষত্রেরা হৃদয়ের কৃতার্থতা ভেঙে
প্রশান্তির বাতাসের মতো আসে, যেন কোনো ঘুমন্তের মনে

কথা কাজ চিন্তা স্বপ্ন অকুতোভয়তা
নিজের স্বদেশে এল—
এইসব অবিরল উৎসারিত বন্ধুর মতন
আমাদের চারিদিকে দিন রাত্রি আকাশ নক্ষত্র নীড় সিন্ধুজল
সমাজের শুভ দিন প্রণয়নে অহেতুক নির্দেশের মতো
আশ্চর্য প্রাণের উৎসে রয়ে গেছে শতাব্দীর আঁধারে আলোকে
কেউ তাকে না বলতে এ পৃথিবী সকালের গভীর আলোয়
ছেয়ে যায় ;—কেউ তাকে না চাইতে তবু ইতিহাসে
দুপুরের জল তার, কেমন কর্কশ ক্রন্দনে কেঁপে ওঠে
প্রকৃতির ভালো জল—সঞ্চারিত নদী মানুষের
মূঢ় রক্তে ভরে যায়—সময় সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করে : নদী
নির্ঝরের থেকে নেমে এসেছ কি ? মানুষের হৃদয়ের থেকে ?
শুভ্র হবে, কখন উন্নত হবে, মানুষের নিজের হৃদয়।

কবিতাসমগ্র : জীবনানন্দ। ঢাকা। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

কে কবিতা লেখে

কে কবিতা লেখে
মানুষ, কবি, পুরাণপুরুষ
সূর্য, অন্তহীন শূন্য আধারের স্বগত নীলিমা ?
কে ?
যেন সময়ের কৌতুকী উৎস থেকে উদ্বেলিত হয়ে উঠছে
পাপ, অন্ধকার, রিরংসা, মৃত্যু
তবু অগ্নিশ্বেত নারীর মতো জেগে উঠছে স্ফুলিঙ্গের সংঘর্ষে
এইসব অপরিমেয় সচ্ছল নদী পৃথিবীর,
জ্বলন্ত রাত্রির মতো এইসব অকুতোভয় আলো

ভোরের বেদনার বিপ্লবের ব্যাপ্তির
ক্যাসান্ড্রা কণ্ঠের মতন উজ্জ্বল বাণীর
বিদুর, দ্বৈপায়নের মতন অনিমেষ নির্মম প্রেমের শক্তির।

বর্ষবিদায়

পৃথিবীর আলো-অন্ধকারে এই মানবজীবন
একদিন শুভ পাবে ;—হয়তো বা অতীতেই পেত :
সবাই সবার হলে ;—ক্ষুধা পেলে কেউ
একগাল বাতাস কি খেত।

অনেক মানুষ ভেবে গিয়েছিল স্বপ্নই সফল।
দিনরাত নক্ষত্র নীলিমা অনুভব
করে তারা নিজেদের মননের দেশ গড়ে তবু
দেখেছিল পৃথিবীর রক্তাক্ত বিপ্লব।

তাই আরও বাস্তবিক হয়ে তারা সমস্তই ঠিক
করে নিতে চেয়েছিল শূন্য, সীমা অনর্থ ও অমেয়তা ভেঙে ;
মানুষের জীবনের প্রতিটি দিনের কাজে লেগে
ইতিহাস বিকথিত সমাজে নগরে
জেগেছিল। করাল রাত্রির দিকে, নীহারিকা, নারীদের দিকে
নিজের সৃষ্ট ড্রোম, ক্রেন, প্লেন, কালো আকাশের পানে তাকায়ে জীবন
এই মৃগপিপাসায় তবুও মানুষই হতে চায় ;—

গভীর রৌদ্রের প্রেমে লোকসাধারণ
সফলতা পেতে গিয়ে সৃষ্টি করে নবীন মৃত্যুর দিন তবু ?
—জেনে লোক ক্রমশই জীবনে মহৎ
হলেও তো হয়ে যেত ;—ইতিহাসবিষমতা আর ইলেক্‌ট্রোন—

—অন্ধতাকে মেনে তবু মহাসামাজিকভাবে সৎ
হওয়া যেত নীড় আর নিখিলের বঞ্চনার পথে।

কবিতাসমগ্র : জীবনানন্দ। ঢাকা। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

মনমর্ম্মর

আমার মনের ভিতরে ছায়া আলো এসে পড়ে ;
যেইসব অনুভূতি ঝরে গেছে তাদের কঙ্কাল
নদীকে দিয়েছি আমি—বিকেলকে—নক্ষত্রের দাহনে বিশাল
আকাশকে ; ফিরে আসে নব দিকচিহ্ন নিয়ে মর্মের ভিতরে।

সময়ের ঢের উৎস গ্রন্থ ছবি মননের পদ্ধতি সব
নিয়ে যায় হৃদয়কে যেন কোন্ শেষ অনুশীলনের পানে ;
অন্তহীন অন্ধকার রয়ে গেছে হয়তো সেখানে :
অসীম আলোর মতো তবুও করেছি অনুভব।

জীবনানন্দ : কবিতাসমগ্র। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

অনেক মুহূর্ত আমি ক্ষয় করে

অনেক মুহূর্ত আমি ক্ষয়
করে ফেলে বুঝেছি সময়
যদিও অনন্ত, তবু প্রেম সে অনন্ত নিয়ে নয়।

তবুও তোমাকে ভালোবেসে
মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এসে
বুঝেছি অকূলে জেগে রয়

ঘড়ির সময়ে আর মহাকালে যেখানেই রাখি এ হৃদয়।

জীবনানন্দ : কবিতাসমগ্র। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

তুমি এই রাতের বাতাস

তুমি এই রাতের বাতাস
বাতাসের সিন্ধু—ঢেউ
তোমার মতন কেউ
নাই আর !
অন্ধকার নিঃসাড়তার
মাঝখানে
তুমি আনো প্রাণে
সমুদ্রের ভাষা,
রুধিরে পিপাসা
যেতেছে জাগায়ে,
ছেঁড়ে দেহে—ব্যথিত মনের ঘায়ে
ঝরিতেছে জলের মতন,
রাতের বাতাস তুমি,—বাতাসের সিন্ধু—ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর।

জীবনানন্দ : কবিতাসমগ্র। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

নদী

১. ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ঐ যাইছে বহিয়া।
কত শত জীবজন্তু বক্ষেতে ধরিয়া।
স্রোতস্বিনী বহে ঐ কল-কল রবে।

উতরিয়া কত দেশ সমুদ্রেতে যাবে।

২. সমুদ্রের পানে সদা ছুটিতেছে নদী।
কুলু-কুলু রব করি বহে নিরবধি।
কখন বা বড় হয় কখন বা ছোট।
তরণী পোতাদি কত বহিতেছে মোট।

৩. পর্বত প্রমাণ উঠে বীচিমালা কভু।
কভু শান্ত করে রাখে দয়াময় প্রভু।
কত পোত মনুষ্যাদি করিছে ভক্ষণ।
কখন করিছে নদী ভীষণ গর্জন।

৪. উর্বর করিছে কত দেশ কত গ্রাম
নীরবে সে করিতেছে আপনার কাম
করিতেছে কত দেশ শস্যশালিনী
নীরবে করিছে নাহি একটিও বাণী।

দেশ। নভেম্বর ১৯৯৮

কখন আসিবে চোখ ঘুমে স্বপ্নে ভরে

কখন আসিবে চোখ ঘুমে স্বপ্নে ভরে
আমরা কি জানি কিছু?—দিনের আলোয় পথ ধরে
চলি আজ,—অবসর নাই কারু,—কেউ কারু কাছে
থাকিবে না,—যেই ব্যথা সহিবার জন্য আসিয়াছে
মানুষ,—যে ব্যর্থতা মানুষের মেনে নিতে হবে
চুলে,—একা, (সঙ্গে তার কে আবার রবে!)

শিখিতেছি—জানিতেছি শুধু তারই ভাষা
ঘুমাবার আগে তবু, ঘৃণা এক—কিংবা ভালোবাসা
নিবিড় আনন্দ এক,—কোনো এক গভীর উল্লাস
অসীম কলঙ্ক এক কিনিবার চাই অবকাশ
চাই তাই,—তারপর চোখ বুজে সকলের মতো
ঘুমাব, হব না তবু আমি পরাহত
আমার মরণে,—
কারণ,—ঘুমের আগে জীবনের ব্যর্থতার ভাষা
ভুলে গিয়ে এক ঘৃণা—কিংবা এক গাঢ় ভালোবাসা
নিবিড় আনন্দ এক—কিংবা এক গভীর উল্লাস
অসীম কলঙ্ক এক কিনিবার ছিল অবকাশ।

দেশ। নভেম্বর ১৯৯৮

এত দিন ডাকি নাই

এত দিন ডাকি নাই,—তবু আজ—আজ তুমি চলে এস কাছে !
রেলের লাইনের পাশ দিয়ে আমি চলিতেছি মেঠো পথ ধরে,
এমনই তো বিকালের অন্ধকারে এইখানে ছিলে,—মনে আছে ;
এই আবহাওয়া ছিল একদিন তোমার মতন ঘ্রাণে ভরে !
এখানে ঘাসের পথে আমাদের চোরকাঁটা ফুটেছে কাপড়ে,
এখানে পাখির নাম জানি নাই,—গান শুধু শুনেছি বিকালে ;
সন্ধ্যায়—তারপরে অন্ধকারে মাটির আঘ্রাণ মনে পড়ে,
বাতাসের ফোঁপানি—সে মনে পড়ে বাবলার বকুলের ডালে।
বিকালের অন্ধকারে মাঠের হেমন্তে আজ বেড়ায়েছি একা,
সেইসব পাখিদের গান আমি শুনিয়াছি, আড়ষ্ট এমন !—
তোমার ভূতের সাথে হলুদ ঘাসের পরে হলে যেন দেখা,—

আগুনের মতো কেঁপে—হাতের হাড়ের মতো শাদা সে কেমন !—
আমারে সে দেখা দিয়ে দাঁড়াল না,—চলে গেল আলেয়ার পাছে
এত দিন ডাকি নাই, তবু আজ—আজ তুমি চলে এস কাছে।

দেশ। নভেম্বর ১৯৯৮

আশ্বিন কার্তিক রাত এইখানে

আশ্বিন কার্তিক রাত এইখানে সমুদ্রের মতো
তারই তীরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
মনে হয় বিরাট প্রাসাদ যেন একে-একে কক্ষ খুলে দেয়
ঢের দূরে—রাত্রির গায়ে

এ পৃথিবী চলে গেছে—ঘুমের ভিতরে
যে মিনার বাজারের বন্দরের নয়
সমুদ্রের রূঢ় জল স্তব্ধ হয় যেন মনে হয়
যখন সে প্রাসাদের আলিসার জ্যোৎস্নার বিস্ময়
চোখে এসে লাগে তার—আমিও দেখেছি তাই নিশীথের তীরে
ঝাউয়ের নির্জনে নিত্য অবিনাশ পাখিদের কথা
মনে পড়ে ;—সেইসব পাখি এই পৃথিবীর নয় ;
পৃথিবীতে পাখি আর পাখিনী হত্যার নিষ্ফলতা।

দেশ। নভেম্বর ১৯৯৮

সময়ের কাছ থেকে

সময়ের কাছ থেকে যদি কিছু নিতে চায় বিহ্বল মানুষ
পাখি ও নির্ঝর প্রীতি সংস্কৃতির থেকে চেয়ে নিক
ঘাসের তরঙ্গ—রোদ—বেঁচে থাকা : পবিত্র জিনিস
এ সবের চেয়ে কি অধিক

সাধ কেউ চেয়েছিল কোনোদিন কারু কাছ থেকে

সকলের সফলতা সকলকে দিতে তবু চেয়েছিল না কি
সারাদিন প্রিয় সৃষ্টি রাত্রির আলোকবর্ষ চোখে রেখে ঘুম
ঘুমের ঈষৎ আগে স্মরণীয় জীবনের প্রতিধ্বনি
আবার ভোরের রৌদ্রে সমাজ শুভ্রতা, পাখি, নভোনীল—
আকাশ-কুসুম
আজ সব। মানুষের আগে পাখি দূর চিত্রভানুলোকে উড়ে চলে গেলে
মৃতদের অনাগতদের কাছে আমাদের ঋণ
মুক্ত হোক মধু হোক সুবাতাস শুভ্র সূর্য হোক
সে অনেক-ইতিহাস-তীর্ণ নরনারীদের রীতিতে নবীন।

দেশ। নভেম্বর ১৯৯৮

স্ট্যাঞ্জা তিনেক

আকাশের মেঘ থেকে গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে ভিজে গেছে ধূলো,
এখন মাটির গন্ধ চারিদিকে টের পাওয়া যায়
ষ্টেশন ছাড়িয়া ট্রেন চলে গেল,—এঞ্জিনের কালো ধোঁয়াগুলো
চাঁদের আলোয় যেন বাদুড়ের মতন লাফায় !

আধ ঘণ্টা কেটে গেছে : একটা কি দুটো কালো মোটরের পিছে
ব্রুহ্যাম—ছ্যাকড়া গাড়ি চলে গেছে যে যাহার দিকে ;
কারা এল ? ঐ দূরে সাহেবের ল্যাণ্ডোর ল্যাম্প কি জ্বলিছে ?
শব্দ নাই কোনো দিকে,—বাতাস ছাড়িয়া গেছে ঝাউ গাছটিকে।

এখন তোমার নাম ধরে ডাকি,—ভাবি আমি, তুমি যে কোথায় !
এখানের ভিজে মাটি ঘাস পাতা ডালিয়ার কামিনীর ঘ্রাণে

কোনো পাখি জেগে নাই আমার মতন একা—একা—অসহায়
এখন তোমার নাম ধরে ডাকি,—কই তুমি !—কেউ কি তা জানে !

দেশ। নভেম্বর ১৯৯৮

এ ও সে

(সংলাপ কবিতা)

এ

শীতের সকালবেলা রোদের ভিতর
ডেক-চেয়ারের পরে ঢের বসা যায় ;
পাখির মতন বুড়ো হয়ে
এইখানে তবু যেন বুড়ো আর হয় না হৃদয় !
ঐখানে গেলাসের জলের ভেতরে
মুক্তা এক পড়েছিল—
সারারাত গলে-গলে
তারপর পৃথিবীতে
ছড়ায়ে পড়েছে যেন !

সে

তবুও সে মুক্তা কেউ চুরি করে নিতে পারে !

এ

কোথায় ? কখন ?

সে

সেইদিন শীত আরও বেশি হবে ;
কাঁকড়াবিছের ছানা এসে
তোমার হাড়ের থেকে মাংস খেয়ে বেঁচে রবে ;
কেউ জানে ?

তোমরা জান না কিছু ;
মুক্তা চুরি গেলে কোথাও রবে তা তবু ;
কোথাও গেলাসে জল রয়ে যাবে ;
আমার টেবিলে নয়
অন্য কারু দেরাজের নিচে
রবে তবু ;
তবুও তা রবে !

আজ তবু এখানেই আছে ;
তোমার হৃদয় থেকে হয়তো কাহারও হাত এসে
মেয়েমানুষের পেটে সন্তানের মতো
বাঁচায়ে রেখেছে তারে !
এমন সকালে
আকাশের নীলের চেয়েও
নীল মলাটের বই ভালো লাগে !

সমুদ্রের জলের চেয়েও তারা নীল ?

আরও নীল !

বইগুলো ঝেড়ে দেই ?
মনে হয় ময়লা হয়েছে
শাদা বিড়ালের লেজ অন্ধকারে
ঝেড়ে দিয়ে যায় ;
তখন সে ঘুমায়ে-ঘুমায়ে
হয়তো হলুদ এক বিড়ালমেয়ের

সবুজ চোখের স্বপ্ন দেখে !
নরম থাবার নিচে
রুপার মতন তার নখ ;
আমিও দেখেছি তারে।

সেইসব অন্ধকারে দেখেছ তো !
—এখন দিনের বেলা ;
টেবিলের থেকে গেলাস সরায়ে রাখি ?
কোথাও কি নিয়ে যেতে চাও ?

কোথাও ;

নিয়ে যাও ;

একখানা বই তুমি নেবে নাকি ?

দাও ;

হাতের ভিতরে বই রেখে দিয়ে
চোখ বুজে আছ তবু ?

নিয়ে যাও ;
(বইখানা ফিরিয়ে দিয়ে)
পাতার ভেতর থেকে কোন এক গন্ধ এসে যেন
নরম থাবার নিচে রুপার নখের কথা
সেইসব রূপকথা বলে !
সেইসব অন্ধকারে শোনা যাবে ;

এখন শীতের বেলা তাড়াতাড়ি বেলা পড়ে যায় ;...
দুধের ভেতর থেকে মাখন কোথায় যেন তোলে,—
আমি সেই শব্দ পাই !

কোথায় ?

দুধের ফেনার চুমা কাহারও বুকের দুধে লাগে ?

কই ?...
হয়তো কাপাশ ফেটে গিয়েছে কোথাও !
তারই শব্দ হয়তো শুনেছ ;
ভোরের হাওয়ায় তুলো তার ভেসেছিল ;
চোখের পাতার পরে কেউ এসে কার যেন আঙুলের মতো লেগে থাকে !
আঁতুড়ের ঘরে এমন আঙুল থাকে,
মাখনের গন্ধ লেগে থাকে তাহাদের গায় যেন !
সন্ধ্যার অন্ধকারে সেসব দেখেছি ভেবে।

এখন সকালবেলা তবু ;

মাকড়ের পেটের ডিমের মতো শাদা অই আলো !
তবুও পৃথিবী যেন সেই ডিম লয়ে
চোখ বুজে একদিকে রয়ে গেছে সরে ;
স্বপ্ন দেখে তাহার সময় কেটে যায় !

ঐ হাওড়ের জল যেইখানে ফুরায়ে গিয়েছে
আরেক পৃথিবী থাকে তবু ;
তারে তুমি দেখ নাই

কেমন সে ?
সেইখানে মাঠের উপরে
গোল হয়ে 'গোসেমার' নাই ?

নাই ;

সেইখানে বিকালের হাওড়ের জলে
মাছরাঙা ঢিলের মতন শব্দ করে
ডুবে যায় নাকি ?

সেইখানে হাওড়ের জল ফুরায়েছে ;

আমি তবু সেই দেশে যাই নাই ;

ডেক-চেয়ারের গাছ এই দেশে আছে ;—তবু—
চেয়ার সেখান থেকে আসে ;
কাঠের পালিশ আছে সেইখানে,
লাল নীল কেম্বিশ্ রয়েছে,
দেরাজ টেবিল আছে,
এনামেল-রুপার পেয়ালা ;
তোমার এ ঘরখানা একদিন তারা এসে করে গেছে।
এইখানে হাড়ের চিরুনি হাতে নিয়ে
এলোমেলো রোগা চুল বুলোতে-বুলোতে
যখন দু-চোখ তবু বুজে আসে সন্ধ্যায়,
আমার মাথার স্বপ্ন রুপার জালের মতো হয়ে
হাওড়ের অন্ধকার জলের উপর থেকে
ছায়া ধরে আনে !

তাই খেয়ে বেঁচে থাকে !

পৃথিবীর থেকে তুমি ন্যাকড়ার থলির মতন
খসে গেছ ;
সোনায় রুপায় তার পেট চিরে যাবে,—
পাখির ঠোঁটের থেকে এক মুখ বাতাস সে চায় !

রচনাকাল : ১৯২৯ (?)
দেশ। নভেম্বর, ১৯৯৮

শিকার

(সংলাপ কবিতা)

একজন শিকারি

মিছেমিছি কেন অই শিকারির সাথে
আমরা শিকারে যাই ?

আর জন

শিকার জানে না সে কি ?

এক জন

ধলা এক ঘোড়া শুধু আছে ;

আর জন

দুধের ভিতর থেকে সেই যে মাখন তোলে
গয়লার ধলা মেয়ে ভোরের বেলায়
ফেনার ধোঁয়ায় তার দুই চোখ ঘোলা হয়ে আসে ;
তাদের সবার কথা মনে হয় যেন
ঘোড়ার পিঠের দিকে চেয়ে,—

আমরা ঘোড়ার মুখ দেখিনাকো !

এক জন

কেবল সে চলে যেতে আছে ;

আর জন

কোথায় সে যায় ?
আমরা জানি না কেউ !
তবু তার পিছে যেতে হবে ?

স্বপ্নের ভিতরে যেন চলিতেছি !
আমাদের লাল ঘোড়া ;

আমাদের ঘোড়া এত লাল,—
তাহাদের লোম যেন কালো হয়ে আসে !

ওদের গায়ের রং আমাদের ক্ষুধার মতন ;

পৃথিবীর জল থেকে ফিরে
মিছেমিছি অন্য দিকে যায় এরা ;
কোন ঘাস কোন জল এদের সান্ত্বনা দেবে ?
এরা মরে যাবে,—আমরাও ;
আমরা রয়েছি বেঁচে পৃথিবীতে তবু,
সেইখানে আমাদের খুঁজে পাবে—দেখ ;
বুড়ো পাখিদের মতো সেইখানে থাকি না আমরা ;
গাঁসের ছানার মতো পাখনায় ভিজে
ছোট এক পুকুরের পাড়ে

আমরা সেখানে থাকি ;

তারপর বড় হই ;
আমরা হইনা তবু বুড়ো ;

হাঁসের মতন ডিম পাড়ে সেইখানে
আমাদের হৃদয়ের আশা !

হাঁসের মতন ডিম,
তবুও সোনার ডিম নয় !
খড়ের কুটার মাঝে অনেক ময়লা ডিমে অন্ধকারে বসে
ভেবেছি অনেকদিন এই কথা ;—
এই ডিমে ব্যথা পাই !

এর চেয়ে বেশি ব্যথা আছে,—

জানি আমি ;
কোনোদিন কড়ি ফেলে তেল আমি নেই নাই,—
তবু কোনো কুনো ব্যাঙ কানাকড়ি দেবে ?
কানাকড়ি ছাড়া তবু তেল পাবে না কি ?
তাই আমি হিজলের গাছে
এবার লয়েছি নাও বেঁধে !
দাও ছাড়া কথা নেই ;
সাড়ে সাত চোর যদি মরে বেঁচে ওঠে
আমি সেই আধখানা চোর হব !
মেয়েমানুষের ব্যথা,—
আমার মদের মুখ নাই !

মদের পিপার পরে সারা রাত একা বসে থেকে
আমি তবু মাংসের—মাংসের কথা ভেবে-ভেবে
মেয়েমানুষের স্বাদ চাই আমি শুধু ;
এর চেয়ে কম কিছু নয় !

গাছের খোড়লে থেকে সারা দিন বসে
পেঁচানীর কাছ থেকে পেঁচার মতন
চুমো খেয়ে তোমরা হয়েছ ক্লান্ত,—জানি
কিন্তু আমি কিছু পাই নাই !

আমরা হইনি ক্লান্ত ;

তোমরা অনেক চুমো পেয়েছ তবুও ;
পেঁচার মতন তবু,—ঘুঘুর মতন কিছু নয়

জানি আমি ;—চুমা তবু চুমা ;
তোমরা পেয়েছ চুমা আর সব চুমার সন্তান
তোমরা পেয়েছ ;
আমি তবু একদিন ঘুম থেকে উঠে
রাতের বিছানা ধরে শুয়ে থাকি ;
তবুও দেখিতে হবে চূনের মতন আলো এসে
চূন শাদা করে গেছে জুলপির কাছে ;
কাদাখোচা জলপিপি আবার এসেছে
চোখের ঘুমের পাতা খুড়ে-খুড়ে খেতে ;
নষ্ট বিড়ালের মতো সারাদিন মন
শুকনো পাতার পিছে ছুটে-ছুটে অবসন্ন হয় !

পৃথিবীতে ক্লান্ত হয়ে আমরা তো বেঁচে থাকি তবু ;

চুমো পেয়ে বেঁচে থাকি ;
তবু জানি অন্য দিকে কোনো এক চুমো বেঁচে থাকে
আমাদের সব মেয়েমানুষেরা মরে গেলে !...
রুপার হাঁসের পাখা দেখি নাই,
তবুও রুপার হাঁস আছে
কোনো এক পালকের বিছানার পরে ;
সাত দিন সাত রাত শেষ হলে বনের ভিতরে
যে মানুষ মরেনাক তার মেয়েমানুষ সে আছে— ।

আমরা কি সেই দিকে চলিতেছি ?

ধলা ঘোড়া সেই দিকে যায় ;

আমরাও ?
পিছে-পিছে যাই ;
তবুও এ দিকে গিয়ে কেউ খুসি হয় ?

আমি খুসি হবনাকো আর ;

কেন তুমি ?

আইবুড়ো ;
দেশে ফিরে গিয়ে
আমার করিতে হবে বিয়ে !

হাঃ ! হাঃ ! হাঃ !

আমি এ সবের নই ;

আমিও না ;

আমাদের ফিরে যেতে হবে ;

হয়তো হিজল গাছ সেখানেও আছে ;

হয়তো ;

ওর ঘোড়া চলে যাক ওর চাঁদকপালের দিকে ;

যেই দিকে যায় চলে যাক ;
(শিকারি দুজন ফিরে চলে গেল ।)

তুমি

তোমার পিছনে কারা ?

আমি

আমার পিছনে আমি এতদিন ঘুমে-জেগে কি কয়েছি কথা
কেউ তুমি শুনেছ কি ?
চাঁদের আলোয় এসে যেন কোন্ চিতাবাঘ হয়ে
ঘাড় ধরে কামড়ায়ে গিয়েছে আমারে আকাশের চাঁদ যেন !
ব্যথা পেয়ে তবুও দেখেছি
চিতার উজ্জ্বল ছালে রূপ লেগে আছে !

চোখে তার পৃথিবীর কোনো এক মেয়ের মতন
ভালোবাসা আছে !
তাই আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি।

তুমি

কোথায় যেতেছ তুমি ? পৃথিবীর শেষে ?
তুমি খুসি হবেনাকি পৃথিবীতে থেকে ?
অন্য সকলের মতো ডিমের হলুদ খেয়ে তুমি
স্বাদ তবু পাবেনাকি ?
জলের পদ্মের বড় পাতার নিচেতে
ছায়া খুঁজে থাকিবে না মাছের মতন ?
—মাছের আঁশটে গায়ে লেগে
কোথাও পুঁটির মুখে রূপ খুঁজে !
তুমি ধান ভানিবার উঠোনের পরে
ইঁদুরের শরীরের ঘ্রাণ নিয়ে এসে
রবেনাকি ছোট এক ইঁদুরের সাথে
সকল ভয়ের থেকে ছুটি নিয়ে—ভালোবেসে—?
কমলালেবুর মতো লাল রোদ গিলে ?
—অশথ বটের গাছে পাখিদের মতো
বসে থেকে দুই ঠোঁট বাঁকা হবেনাকি !
বুড়ো পাখিদের মতো হবেনাকি আর
পৃথিবীতে বসে থেকে !

আমি

বেহালার মতো তবু সেই সব পড়ে আছে ;
তবুও কোথাও কানে দোষ ;
তাই আমি অশথ বটের গাছে বাঁকা ঠোঁট লয়ে
পাখিদের মতো বেঁচে বুড়ো হবনাকো !
তবুও শেখাও

গাছের ছালের পরে ঠোঁট ভেঙে ফেলে
পাখিরা কি মরে যায় ?
অনেক দেখেছি মেয়ে পড়ুশিনীদের ;
তাদের বুকের থেকে ক্ষুদের মতন ঘ্রাণ পেয়ে
কেউ যেন একবার গিয়েছিল খেয়ে
মুখের স্বাদের মতো তাহাদের স্বপ্নের হৃদয় !
তারে তারা একদিন মশারির জালের ভিতরে
মাথার স্বপ্নের মতো
কাছে পেতে চেয়েছিল !
কিন্তু তবু এক ভোরে পচা এক ডিমের মতন
সেইসব ভেঙে ফেলে চলে গেছে তারা ;
মাংস আর রক্তের বিছানার পরে—তারপর
সন্তানের জন্ম তারা দিয়েছে সকলে ;
...আমি তবু তাহাদের মতো নাই।

স্বপ্ন নয়,—কিন্তু তবু যাদের হৃদয় জ্ঞান আছে
তাহাদের ঠোঁট বাঁকা !

জানি আমি ;

পৃথিবীতে বসে থেকে তাহাদের রোম সব শাদা হয়ে গেছে,
তাদের কপালে শিঙ পেঁচার মতন জেগে ওঠে ;
অনেক রাতের বেলা জেগে থেকে তাহারা তারার কাছ থেকে
ফিতা আর চাখড়ির শাদা লাঠি ধার করে আনে ;
তারপর পৃথিবীর মানুষের হৃদয়েরে মেপে ফেলে।
তাহাদের কথা তবু সকলেই মানে।

—জানি ;

স্বপ্ন নয় ;—তাদের হৃদয়ে বোধ আছে !
পাঁকের জলের মতো তারা নয়,—তাহাদের গভীরতা আছে !
তবু তারা ভালোবাসে !
তবুও তারার মতো আমি কোনো সবুজ পাহাড়ে
অন্ধকারে তাহাদের দেখি নাই !
তারা পাহাড়ের নিচে তারার আলোর মতো আছে ;
সেইখানে ? ঘোড়া আর কুকুরের সাথে ?
চাঁদের শিঙের দিকে চেয়ে
পাহাড়ের পাথরের গায় মাথা খুঁড়ে
তাহার অলস নয়— !
ছোট মেয়েদের মতো হয়ে গেছে আমার হৃদয় !
পৃথিবীর অন্ধকারের ভয় পেয়ে তবুও সে পারেনি ঘুমাতে,
লুকাতে চেয়েছে মুখ বিছানার কাপড়ের তলে ;
সেইখানে স্বপ্ন খুঁজে ভুলিতে চেয়েছে ব্যথা,
তবু তার বুড়োরা তো ঘুমায়েছে ;
তাহারা ঘুমায়।

কোন্ এক ইঁদুর এসে ঘুম ভেঙে গেছে ?
কোন্ ভয় ?

আমি এক বোতলের মতো করে তোমার নিকটে যদি রাখি
আমার এ হৃদয়েরে,—
তুমি তার ছিপি খুলে দেখো ;—
কিছু কি দেখিতে পার ?
ছিপি তুমি খুলে দাও ;

আমি এক কাচের গেলাসে সব হৃদয়েরে ঢেলে
তোমার ঠোঁটের কাছে তুলে ধরি যদি ;

সেই জলে কার যেন মুখ ভেসে ওঠে !
চেয়ে দেখ,—
তবু তারে কোথাও কি দেখা যায় ?
...কোথাও সে চলে যেতে আছে !
ইঁদুরেরা খুঁজে গেছে সব সব-শেষ শিষ,
ছড়ায়ে-ছড়ায়ে ছিঁড়ে ইঁদুরেরে খুঁজে গেছে পেঁচা,
তারে তবু দেখে নাই কেউ !

আমার হৃদয়ে তারে তবুও দেখেছ ;

সেখানে পেঁচার পাখা রুপার মতন,
তাদের কপাল থেকে দুই শিঙ উঠে
চাঁদের শিঙের সাথে মিশে গেছে যেন ;
সেই সরু পোলের উপর দিয়ে হেঁটে
মুখের রূপের মতো কারা সব আসিতেছে যেন !
রূপ তাই বেড়ে গেল এত !
—তবু তারে পৃথিবীতে চাই আমি !

যারা চায় তাদের বিষণ্ণ হতে হয় !

সব বিষাদের স্বাদ জানি ;

তবু তারে পাবে না তো ;

হৃদয়ে অনেক স্বপ্ন আছে !

পাখার মতন স্বপ্ন তাহার পায়ের চারিপাশে,—

স্বপ্নের ওপর দিয়ে তবুও সে চলে যায় !

গেলাসে-গেলাসে আমি হৃদয়েরে ঢেলে দিয়ে
সেই জলে ছবি খুঁজে-খুঁজে
অবসন্ন হয়ে গেছি ;

অবসন্ন হতে হয় ;

চাঁদের আলোয় এক সমুদ্রের নৌকার মতো
আমার হৃদয় ;
ভূতের নাওয়ের মতো,—আমি তবু একা তার হালে ;
কোনোদিকে কোনোখানে কেউ নাই আর !
সমুদ্রের বড় সেই শাদা পাখি চলে গেছে উড়ে
যেইখানে জ্যোৎস্নায় ছাওয়া থাকে হয়তো সে দিকে ;
অথবা যে মরে গিয়ে রয়েছে পিছনে ;
ময়লা আলোয় তার ডানা যেন দেখিয়াছি আমি
মাঝ-সাগরের ঢেউ ভেঙে-ভেঙে আসিতেছে কাছে ;
আমারে সে নিয়ে যাবে ;
শান্ত ঘুঘুর মতো এক রাতে তবুও হৃদয়
শেষের চাঁদের শীতে বইঠার পরে
একাই ঘুমায়ে থাকে ;
সেই ঘুম ভেঙে দিয়ে তবু

কোলের ছেলের মতো কেঁদে ওঠে ঢেউ !
মাঝ রাতে মোম জ্বেলে কে তুমি এসেছ !
চোখ কচ্‌লায়ে উঠে দেখি নাই আর,—
বাতাসে মোমের গন্ধ পড়ে থাকে পিছের সাগরে !...
অস্পষ্ট ভূতের ছাওয়া দেখা যায় ঢের
মাঝসাগরের পথে চাঁদের আলোয় !

—তোমার হৃদয় মরে গেলে তবু এ সব থাকে না।

আমার হৃদয় তবু বেঁচে আছে ;
খোলা পাখা তবু তার রয়েছে পিছনে ;

কখনো সুমুখে ;
কখনো বা ডান ধারে,—কখনো বা বাঁয়ে ;
ঢেউ ভেঙে বার-বার সে আমার কাছে এসে পড়ে ;
কোথায় সে নিয়ে যাবে ?

কোথাও সে নিয়ে যেতে পারে ;

তবু তার ঢেউ ভাঙা হয়নাক শেষ ;
একদিন শেষ হবে,—কেউ জানে ?
তবু তার পাখা যেন পৃথিবীর মতো নয় ;
কাঁচা চোখে উঠে
ময়লা আলোর ঢেউয়ে দূরে
আর দেখে মাঝসাগরের ঢেউ ভয় পেয়ে ওঠে !
তবু তার মোহ আছে,—
ভয় হয়—আমি তারে একদিন ভালোবাসি যদি !

তারে ভালোবেসে তুমি ঢের দূরে চলে যেতে পার,
সেখানেও সুখ আছে ;
সেইখানে হৃদয়ের স্বপ্নের শিশুরা সব বড় হয়ে বেড়ে গেছে,—
ঢের বড়ো সুন্দরীর মাংসের মতন !
সেইখানে রূপসীর মাংসে শুধু রূপসীর মাংস জন্ম লয়,
তারপর মাংসে পোকা পড়ে যায় !
সবচেয়ে রূপ যারা ভালোবাসে
তাহারা রূপের স্বপ্ন ভালোবাসে সব চেয়ে !
তবুও সেখানে সব স্বপ্ন নষ্ট হয় !

কারা তবু সেইখানে যায় ?

পৃথিবীতে বিবাহের বিছানায় শুয়ে
যাহারা অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছে।
—তাহাদের ঢের অবসাদ,
তবু তারা আরও ক্লান্তি চায় ;
তাহাদের মাংস ছুঁয়ে দেখেছ কি ?

দেখি নাই ;

হয়তো দেখিবে তুমি একদিন !
আমি মাঝ-সাগরের চাঁদের আলোয় একা আছি ;
কিন্তু চাঁদ হেলে পড়ে গেলে
কপাল ঘামায়ে পড়ে ঘুম থেকে জেগে উঠে,
তখন ব্যথার জন্ম হয় ;
পৃথিবীর মানুষেরা সেই ক্ষুধা জানে !

বুড়ো মরা পাখিদের গলার নলির মতো নষ্ট মনে হয়
সকল মাংসের কথা এইখানে !

স্বপ্নের নাড়ির সাথে হৃদয়ের নাভি যারা বাঁধে
তারা কি হয় না নিঃসহায় !
...ভেবে দেখ তবু তুমি।

এইখানে হালে বসে
পৃথিবীর মেয়েদের রূপ তবু আমার পড়েছে মনে ;
তাদের মাড়িতে আর দাঁত নেই ;
তাদের নাকের ডাঁশা ভেঙে পড়ে গেছে ;
তাহাদের পেট থেকে অনেক সন্তান
কৃমির মতন করে খেয়ে গেছে তাহাদের ;
কোনোদিন যারা আর মরেনাকো তাহাদের মনের ভিতর
রূপ হয়ে বেঁচে আছে তারা তবু !

অনেক-বয়সের মেয়ে

তোমাদের সব কথা আমিও শুনেছি,
ঘুমাতে-ঘুমাতে তাই জেগে বসে আছি ;
হয়তো আমার মুখ ধনেশ পাখির মতো হবে ;
তাহার তেলের মতো মন তবু ;
আমার হৃদয়ে আছে অসুখের তবুও ওষুধ !

তুমি

কোনো এক মেয়েলোক ?

আমি

পৃথিবীর বিছানায় শুয়ে

মানুষের বুক থেকে সেই সব ভালোবাসা ফুরায় না ;
ভোরের আলোর মতো আঁশটে জালের থেকে ফেঁসে
তবু আমি চলে গেছি !

অনেক-বয়সের মেয়ে

তবু তুমি রূপ ভালোবাসো !

আমি

মাছের আঁশের মতো তবু তুমি ;

অনেক-বয়সের মেয়ে

আমার পেটের থেকে যাহারা হয়েছে ?—

আমি

তারাও তোমার মতো হবে ;

অনেক-বয়সের মেয়ে

তাদের মতন কেউ সুন্দরী কি আছে ?

আমি

মন্ত্রী-কোটালের সাথে তাহাদের বিয়ে হয়ে যাবে ;
পৃথিবীর মানুষেরা তাহাদের নিয়ে ক্লান্ত হবে,
তাহাদের মতো আমি কেউ নই ;

অনেক-বয়সের মেয়ে

রূপ নয়—রূপ নয়—কোনো এক ডাইনীর হাতে

কাপাশ তুলার মতো হৃদয় তোমার ধরা পড়ে গেছে !
চরকায় সব শেষ সূতা কেটে তোমারে সে ছেড়ে দেবে,—
তারপর হৃদয়ের রবে কিছু ?

তুমি

কে জানে হয়তো তারা ঠিক কথা বলে
পৃথিবীর এই সব মেয়েমানুষেরা !

আমি

এরা শুধু পৃথিবীর মানুষেরে দেখেছে যে,
সেখানে হৃদয় তবু অনেক সহজে খুশি হয় !
সবুজ তোতার মতো মটরগুঁটির ক্ষেতে থেকে
দুই ঠোঁট লাল করে তারা আর চায়নাকো কিছু !
কিন্তু আমি পৃথিবীর মটরের ক্ষেতে গেলে মরে যাব,—
দু-ঠোঁট হলুদ হবে,—তারপর শাদা হয়ে যাবে ;
বল তুমি, এমন বিষণ্ন মুখ দেখেছ কি !

আমি তবু পারি না কি খুশি হতে
পৃথিবীর পথে গিয়ে ?

পৃথিবীতে কে তোমারে দেখেছিল ?

হয়তো দেখেছে কেউ,
একজন থাকে, দেখে ফেলে ;—

হয়তো সে পৃথিবীর গর্ভের ভিতর আজও এসে জন্মে নাই,
কিংবা তার জরায়ুতে সোনার ডিমের মতো উঠিতেছে ফলে !...
অথবা,—

মাংস আর রক্তের জীবাণুর ঢেউয়ে
কোথাও অনেক স্বপ্ন বেঁচে থাকে !
(সমুদ্রের ভেতর দামি জাহাজ ডুবে যাচ্ছে।)

তুমি

ঐখানে কারা ?

আমি

কোনো এক রানী হবে,
আর তার মেয়েমানুষেরা ;
কোথায় চলেছে তারা ?

ওদের জাহাজ অই সমুদ্রের হীরেকষ ফেনার ভিতরে
ডুবে যায় ;—চেয়ে দেখ !

তুমি (অবাক হয়ে)

জাহাজের অই সব পুরুষেরা এই-এই মেয়ে নিয়ে ছিল !...
পৃথিবীর শেষে গিয়ে কোথাও তবুও
অই সব মানুষেরা আবার বাঁচিতে পারে।
মরে যায় ;—
ওদের মেয়েরা তবু এদের এখন ভালোবাসে ?

আমি

মখ্‌মল্ পেটারার থেকে লাল রেশমের রুমালের মতো
এ সব মেয়েরা ;
সাগরের সবুজ চোখের রঙে তাহাদের ভয় নেই,
‘এলডোরেডোর’র থেকে সোনা খোঁজে যারা

তাহাদের হৃদয়েরে জুতোর হিলের তলে রেখে
তাদের সোনার থলি এরা ভালোবাসে— ।

তবুও ডাকাত যদি রাজা হয় ?

বেদে আর ডাকাতেরা তবুও অনেকবার রাজা হয়,—
তা না হলে পৃথিবীতে রুপার পেয়ালা সব চুরি যাবে ;
পৃথিবীতে রূপ আর রবে না তো কিছু !
দাঁত থেকে এনামেল নষ্ট হলে
সেখানে রুপার দাঁতে রূপ তবু থাকে ?

রুপা আর রূপ !...
চাঁদ হেলে চলে গেলে অন্ধকারে জলের ভিতরে
মুখ তার,
সে কাহার মেয়ে !

যখন সে চলে যাবে
এক মুখ বাতাস সে রেখে যাবে
পাখির মুখের মতো মুখ থেকে ;
আর কিছু থাকিবে না !
দেখেছি অনেকবার ;
তবুও বুঝেছি—আমারে সে ধরা দেবে !

সময়ের শেষে গিয়ে তারে পাওয়া যাবে !

আমার হৃদয়ে তবু সময়ের শেষ আছে ;

তবে তুমি বেঁচে থেকে দেখো,—
সব পেঁচা মরে গেছে জ্যোৎস্নায় হিমশিম হয়ে !
ইঁদুরেরা মরে গেছে আগে ;
সকল চাঁদের শিঙ খসে গেছে আকাশের থেকে
ভেড়ার শিঙের মতো বুড়ো হয়ে ;
ফুটোনো জলের থেকে ধোঁয়ার মতন
আমার হৃদয় তবু ভাসিতেছে !

সব ধোঁয়া কোথায় যেতেছে ?

জল হয়ে ফিরে আসে সব !

যখন ভেঙেছে সব, হারায়েছে, গেছে সব চুরি
তোমার হৃদয় এক বাসনের মতো তুমি রেখেছ গুছায়ে ;
আমার চোখের জল মাংসের মতো তার !
তাই খেয়ে বেঁচে থাকে !

দেশ। ডিসেম্বর ১৯৯৮

তোমার সবিতা ভালোবেসে

তোমার সাথে আমার ভালোবাসা ;
সাগর যেন ডাক দিয়ে যায়
গৃহবলিভুখের ডানায়,
পিঞ্জরে তার বাসা।
আমার পথে সূর্য রৌদ্র জ্বলা
নীল নিখিলের সমুদ্র নেই ;
তবুও সাগর আছে মনেই ;

আমার প্রাণের সাগরতীরে
শাদা ডানায় উড়ছে কি রে
পাখি,—না সে পাখি হওয়ার মতন পিপাসা !
আমার সাথে তোমার ভালোবাসা
নয় তো আকাশ সাগরও নয় ;
দুয়ের মতন তবুও উদয় ;
জাগায় প্রাণে অপার আশা
অসীম নিরাশা।

রচনাকাল : ১৯৪৭-৪৮ ?
শারদীয় আজকাল : ১৪০৬

এ কি আলো ! এ কি আঁধার

এ কি আলো ! এ কি আঁধার
সৃষ্টিধারার অলখ থেকে আসে !
কোথাও তুমি নেই তবুও
তোমারই কেশপাশে
রাত্রি-ঝরে-পড়ার আকাশ কালো ;
আঁধার আকাশ আলো
করে সে মুখ বনজুঁয়ের বৃষ্টি জ্বালালো
মউমাছিদের রৌদ্রে বাতাসে।
এই আলো কি কালের দেয়াল-বিজয়িনী পাখি ?
তোমারই চোখ প্রেমের ক্ষমতা কি !
তবু সিন্ধুর দুই তীরেতে দুজন একাকী,—
অঙ্গে কেঁদে উঠে দূরের অঙ্গ ভালোবাসে।

রচনাকাল : ১৯৪৭-৪৮ (?)
শারদীয় আজকাল : ১৪০৬

শোনো—শোনা—নীলকণ্ঠ পাখিরা

শোন—শোনো—নীলকণ্ঠ পাখিরা
আলোর ফোয়ারাপারে
তোমারই ঘুমের কুহেলি ঝরার আগে
পেয়ে গেছে নীলিমারে।
এসো-এসো-এসো প্রথম ভোরের অনুভাবনায়
আজ পৃথিবীর ঘুম ভেঙে যায় ;
আকাশের নীল নিরালায়
ডেকে যায় বারে-বারে
কোনোদিন এই মাটি পৃথিবীর মনে
কোনো প্রণয়িনী-জন চেয়েছিল যারে।
সোনালি রৌদ্রে মৌমাছি অনুরাগে
উড়ে গেলে আলো চোখে এসে ভালো লাগে ;
কি কবে হারায়ে গিয়েছে সে কথা অন্তরে যদি জাগে
সে ব্যথা তবুও নেই আজ এই আলোকের পারাবারে।

রচনাকাল : ১৯৪৭-৪৮ (?)
শারদীয় আজকাল : ১৪০৬

আলো দূরে—আরও দূরে

আলো দূরে—আরও দূরে
চলে গেছে কোন সংগীতে উড়ে—
ভোরের মেঘের দিকে কোন আকাশে।
সেখানে চাতকী তার প্রিয়ের পাশে
প্রবাল রঙের ডানা জ্বালে

পৃথিবীর নীল সকালে,
চঞ্চল চেতনার সমুদ্দুরে।
আমার প্রাণের বীণ
তবুও কি আঁধারে অন্তর্লীন !
কেন মনে হয়
বাতাস নিজেরই ব্যথা বয়,
জল সে একাকী কথা কয়
বন্দিনী নদীদের নিয়মে ঘুরে !

হে প্রেম, অমেয় প্রেম, তুমি
সূর্যের মতো আজ লুকায়ে রয়েছ
গ্রহণের লগ্নে তুমিও ;
তবু জানি অপরূপ আলোর সাগর স্মরণীয়
রয়ে গেছে চাতকের কালো চোখে প্রিয়
নভোনীলে চাতকীর চঞ্চল নিঃসৃত সুরে।

রচনাকাল : ১৯৪৭-৪৮ (?)
শারদীয় আজকাল : ১৪০৬

তোমারে ডেকেছি আমি

তোমারে ডেকেছি আমি
মায়াবীর মতো নেমে এসে।
চিত্রা তারার মতো রাতের দেশে
ধীরে আসে ধীরে নারী,
মায়াবিনী ক্রান্তি ঘনায় ;
রক্ত দাহন দিন নগরী সমাজ দূরে যায় ;
আমরা কি সৃষ্টির আঁধারের

বাহিরের দূর বিদেশে !
অনেক তারার ভিড় মিনারের ফাঁকে
একটি তারার মতো
পৃথিবীর পানে চেয়ে থাকে ;
চিত্রা তারা তো তুমি হিমের শেষে !
সুদূর সাগর থেকে হাওয়া
সময়ের থেকে সময়ের পানে যাওয়া ;
গান কি অন্ধ পাখি ?
প্রেম কি তিমিরে গান গাওয়া—
সূর্য নিভায়ে, নারি,
তোমার সবিতা ভালোবেসে।

রচনাকাল : ১৯৪৭-৪৮ (?)
শারদীয় আজকাল : ১৪০৬

সে জাহাজ দেখেছে কি কেউ ?

(সংলাপ কবিতা)

সে জাহাজ দেখেছে কি কেউ ?

গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে ভুলে গিয়ে শীতের সাগরে
কোথাও চাঁদের আলো বরফের মতন সবুজ ;
—সেখানে পালের শব্দ একবার শুনেছি বাতাসে,
যেন কার মস্‌লিন্ শাড়ির ভিতর থেকে এসে
নীল রেশমের মতো চোখের পাতার পথ খুঁজে
আসিতে সে চেয়েছিল,—সেইসব আমাদের নাই ;
জেগে উঠে তারে আর দেখি নাই কিছু !

তবু তুমি বল না কি সে জাহাজ আছে !

আমরা নাবিক ;
মাথার ভিতরে এক সাগর রয়েছে যেন আমাদের !
ঢেউয়ের ফেনার ঝিমে আমাদের নীল শিরা ভরে গেছে ;
আমরা হয়েছি তাই সমুদ্রের স্পঞ্জের মতন—
সাগরের ঢের গল্প খেয়ে ফেলে বেঁচে থাকে !
স্বপ্নের বুদ্বুদ্ ঢের সমুদ্রের সেইখানে জমে আছে,
আর তুমি নিঙড়ায়ে লও যদি—

নাবিক, অনেক বুড়ো হয়ে গেছ তুমি ;
বুড়ো এক পেঁচার মুখের মতো জাহাজের হালে বসে থেকে ;
তোমার এপ্রন পালে ডানা মেলে অনেক সমুদ্র ঘুরে এসে
কোথাও কখনো ঘুমে শুয়ে থেকে বুঝেছ কি তুমি
জাহাজের পোষা তোতা পাখা মেলে উড়ে যেতে চায় !
কেউ তারে নাম ধরে ডেকেছে কি অন্য এক ডেকে !
কোন ডেক্ ?

শুনেছ কি উড়ে যেতে গিয়ে পালকের রোম তার খসে গেছে,—
একখানা—দুইখানা—তিনখানা—পাখার পালক তার পড়ে যায় !
তবুও সে উড়ে গেছে !
জাহাজের নাবিকেরা তখন ঘুমায়ে থাকে ;
মাঝ-সমুদ্রের শীতে জ্যোৎস্নায় একা যদি জেগে ওঠে কেউ
ঢেউয়ের ভিতরে আলো চিতার মতন তারে কামড়ায়ে ফেলে যেন !
দুই হাত হিম হলে হৃদয়ে অনেক ব্যথা জমে যায়।

শুক্তির খোলায় ফুটো হয়ে গেলে রক্ত দিয়ে সেইসব ভরে ফেলে তারা ;

জান তুমি সেই রক্তে কিসের অবাধ জন্ম হয় !...
অনেক সমুদ্রে তুমি বেঁচে থেকে সে-সব বুঝেছ।
যেইখানে আরসীর মতো সব মানুষের মুখে
আমাদের মানুষের মুখ সব দেখা যায়
অনেক দেখেছি আমি সেইসব ;
তাহাদের হৃদয়ের সব লোনা গল্প আমি জানি !
মাংসের পায়ের 'পরে ভর করে কাঠের ডেকের পরে হাঁটে যারা,
কাপড়ের পাল তোলে,
যাহাদের জাহাজের অত উঁচু মাস্তুলের থেকে
সমুদ্রের তিমিরেও ইঁদুরের মতো মনে হয়,
তাহাদের সেইসব গল্প আমি জানি ;
দাড়ির ভিতরে শাদা বরফের মতো বুড়ো—বুড়ো হয়ে জমে আছে সব !
তুমি কোনো অন্য এক জাহাজের পিছে-পিছে যাও নাই ?

উত্তরের হাওয়া ছেড়ে পৃথিবীর মধ্যের সাগরে
বিষুবের ঢেউ থেকে দক্ষিণের গরমের সমুদ্রের দিকে
স্পেইনের জল-ডাকাতের মতো
অনেক অদ্ভুত জলে আমরা ঘুরেছি !
কোথাও দেখেছি কোনো জাহাজের পালে আজও 'স্কাল্' আর 'ক্রস্‌বোন্' আছে,
বাবড়ির মতো চুল—দুই কানে মাক্‌ড়ি রয়েছে
কোথাও বা নাবিকের !

আজও তবে তারা বেঁচে আছে ? তাহাদের জানি আমি,—
তাহারা অনেক সোনা চুরি করে বাঁচে,
তোমার জাহাজ থেকে তোতা তবু চুরি করে নেয় নাই তারা।

আবার তোতার কথা বল তুমি ? শোন তবে, মনে পড়ে গেছে—

অনেক-অনেক দিন আগে এক রাজা ছিল যেন,
তার এক রানী ছিল ;—শোন তুমি, রূপকথা নয় ;—
তাহারা জাহাজে চড়ে একদিন আমাদের মানুষের পাশে এসেছিল,
হয়তো তাহারা কোনো ‘এল্‌ডোরেডো’র !
মস্‌লিন সোনার কথা শুনিবে না তুমি আর ?
আমরাও অবসন্ন হয়ে গেছি অনেক রেশম রুপা দেখে,—
তবু সেই জাহাজের ভিতরের দিকে
একবার চেয়ে দেখা যায় !
আমাদের সবুজ তোতারে সেই তাহাদের ভালো লেগেছিল ;
সারাদিন সেই পাখি টি-টি করে কেঁদেছিল তাহাদের কাছে গিয়ে তবু,
কেন ? তুমি বল দেখি !

বিমর্ষ ঘুঘুর মতো সে রানীর মুখ ?

হয়তো বা ;

তার মুখে পৃথিবীর বিষণ্নতা লেগে আছে ;

তবুও তা এমন সুন্দর !

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি রূপ বেঁচে থাকে বিমর্ষের মুখে,—
তবুও তা পৃথিবীর ;
অনেক সাগর ঘোরে যে সব জাহাজ
তাহাদের হাওয়ার ভিতর কোনো-কোনো পাখি থাকে
গল্পের ছবির মতো কি খেয়ে যে তারা বেঁচে আছে
সবচেয়ে বুড়ো—বুড়ো নাবিকেরা জানেনাকো !
কাহার সে পাখি ?...জাহাজের নয় ?

তবে কার ?

কে তাহারে কিনেছিল ?...
বাইজেনটিয়ামে—রোমে—অজন্তায়—এলোরায় কোনো কারিগর
সোনার ভিতর থেকে গেলে-গেলে গড়ে নাই তারে ;
যে সব বিড়াল শাদা—
গল্পের ভিতরে থাকে পরীদের হাতে
তাহাদের সবুজ চোখের মতো পালকের রং !
হয়তো দেখেছি তারে...কে তাহারে কিনেছিল ?

বুয়েন্‌স আইরিস ছেড়ে
হয়তো জাভার দিকে চলেছিল তখন জাহাজ,—
কোনো এক ট্যারা মানুষের কাছে কোথাও বন্দরে
হয়তো পেয়েছি তারে ;—তার হাতে ঢের তোতা থাকে।

কুৎসিতের হাতে রূপ পৃথিবীতে আছে !
যখন বন্দর ছেড়ে তবুও জাহাজ
রুপার নখের মতো বাঁকা এক চাঁদের ভিতরে
ঢুকে-ঢুকে যেতেছিল চুপে,
পৃথিবীর বুড়ো মেয়েদের সেই স্বপ্নের সময়,—
এখন তোমার তোতা কোনো এক গল্প বলেছে কি ?

কারে ?

সেই গল্প কারো মনে নাই ?

আমরা তোতার গল্প শুনি নাই ;

কানে তবু পালের হাওয়ার শব্দ ঢের শোনা যায় ;

জাহাজের হাল ঘেঁষে শুয়ে থেকে সেসব শুনেছি আমি জ্যোৎস্নায়—শীতে
তবুও তো বুঝি নাই অন্য কোনো জাহাজের ডেক থেকে কেউ
আমাদের সবুজ তোতারে কবে শিস্ দিয়ে ডেকে গেছে !—

কখনো কি শোন নাই ?

কেউ কি শুনেছে ?
এমন নাবিক তবু থাকে না কি সমুদ্রের পরে...
পালের হাওয়ার গান শুনে-শুনে যাদের খাবার
ঠাণ্ডা হয়ে যায়।
কোথাও আস্বাদ বেশি রয়ে গেছে পৃথিবীর মাংসের চেয়ে !
কোথাও আমরা ছায়া,—আমাদের স্বপ্ন সব শরীরের মতো !
কোথাও রয়েছে বাতি,—আমরা তাহার ছায়া শুধু।
সবচেয়ে বেশি যারা স্বপ্ন দেখে তাহাদের মাথার ভিতরে
মুক্তার মতন ঘোলা আলো রয়ে গেছে,—
একদিন ক্রমে-ক্রমে তারার মতন
আরও আলো প্রসবের স্থান হবে তাদের হৃদয়ে ;
আমরা এমন করে বাড়ি ;

জালের ছ্যাঁদার থেকে সমুদ্রের জলের মতন
সকল নীলাভ গল্প সকলের হৃদয়ের থেকে
পলায়ে যেতেছে তবু !
মাছের মতন মাংস পাই না কি তবু ?

শুধু এক চামচের নীল ঢেউ তবু যদি ধরে রাখা যায়
মাছের আঁশের সাথে ছাই তবে হবে না মিশাতে !
ঘাঁটাতে হবে না তবে কিছু আর !
সেইসব—সেইসব ব্যথা ভুলে যাবে।

সেসব বেদনা তবু করেনিকো বিষণ্ন আমারে ;
জলের ভিতরে ডুবে স্নান করে সমুদ্রের জাহাজের মতো
আমিও উঠেছি বেড়ে,—বুড়ো হয়ে—আরও বুড়ো হয়ে !
সাগরের ঈগলের মতো আমি,
শরীরে শাদা-শাদা লোম থেকে সমুদ্রের লোনা জল ঝরে !
সকালের আলো থেকে দুপুরের—দুপুরের রোদ থেকে বিকালের নীল জ্যোৎস্নায়
দুই হাতে—দুই পায়ে—লোমে—মাংসে বেঁচে আছি আমি,—
তোমরা বিমর্ষ তবু হও !

তুমি এক অন্য কোনো নাবিকেরে দেবে কি পাঠায়ে ?

সকল সমুদ্র ঘুরে এমন বিষণ্ন কেউ থাকে ?

বিমর্ষ রানীর মুখ মনে আছে ?

কোথাও সাগরে আমি তেমন বিষাদ আর দেখি নাই,—জানি ;—

তাহাদের সে জাহাজ কবে চলে গেছে !

কোনদিকে ?

কেউ তার খোঁজ জানেনাকো ;

তোমরা সে জাহাজের পিছে আর যাও নাই ?

আমরা তাদের মতো নই ;
তোমাদের ক্ষুধা আছে,
তবুও সেখানে আরও ক্ষুধা বেঁচেছিল ;—

আরও ক্ষুধা ? আমাদের চেয়ে আরও বেশি ?
আরও বেশি ;

বেতের লতার মতো সরু এই সূতার ভিতরে ?

ভিতরের সেই ক্ষুধা আমাদের মাংস খেয়ে ফেলে।
আমরা খাপের মতো,
আগুন লেগেছে যেই তরোয়ালে, সেই ক্ষুধা তাই !
আমার হৃদয়ে ক্ষুধা জমে উঠে ঝরে যায়নাকো ;
সে কোথাও—সে কোথাও বেঁচে আছে তবে :
যার চোখে মুখ দেখে মুছে যাবে আমার চোখের... ।
যে চুমার স্বাদ খুঁজে দুই ঠোঁট তিতা হয়ে আছে
কোথাও রয়েছে বেঁচে সেই ঠোঁট !

পৃথিবীতে পাও নাই কিছু ?

যখন দুপুরবেলা পৃথিবীর পথে বসে থেকে
শরের ভিতরে ভিজে বাতাসের শব্দে ব্যথা পাই,
বাজকুড়ুলের ডাকে যখন হৃদয়ে ব্যথা পাই ;

তখন বুঝেছি আমি পাই নাই !—

পৃথিবীতে পাওনি যা সমুদ্রের পথে তারে পাবে ?
কোনো এক জাহাজে সে আছে !

কোথায় শুনেছ ?

বিকালের অন্ধকারে ডেকে বসে থেকে
সমুদ্রের দিকে চেয়ে হয়তো দেখেছি তারে !
হঠাৎ পেয়েছি তারে,—অনেক নিকটে যেন থাকে ;
এত কাছে চলে এসে তবুও সে ফিরে যায়,
জাহাজের রেলিঙের 'পরে হাত রেখে
আঙুলে আবার শীত লাগে !—

কাল রাতে তোমারে পাইনি কেন বিছানায় ?

আমি কি অনেক রাত বিছানায় কাটাইনি তবু ?

ডেকে তুমি গিয়েছিলে ?

ডেকে ;
তোমার লোমের কোট পিছে রেখে গিয়েছিলে কেন ?
শাল কেন নেও নাই ?
কাল রাতে জেগে উঠে এসব দেখেছি,—পড়ে আছে ;
তবুও তোমারে আমি দেখি নাই,—এমনই কি কোনোদিন হত ?

কোনোদিন হয়নি যা একদিন তবুও তা হয় ;

শিস্ কেউ দিয়েছিল ?

আমি কারু পোষা পাখি ?

জাহাজের ’পরে ঢের ট্যারা লোক থাকে—
মাথার ওপর থেকে তাহাদের টুপি খসে যায় !
একরাশ পরচুলা তাদের মাথার থেকে ঝুলে পড়ে ;
তাহাদের বাঁ-পায়ের মোজা খুলে পড়ে গেছে গুড্ডুলির পরে ;
তাহারা অনেক রাত জেগে থেকে ঝিনুকের মালা গাঁথে,—
জালের মতন খিঁচে সাগরের জলে ফেলে দেয় !
তবুও জাহাজে সব মেয়ে থাকে তাহাদের তামাশায় আছে !

তাহাদের হয়তো বা তামাশার সময় এসেছে ;

সমুদ্রের জাহাজের ’পরে ঢের ভাঁড় বেঁচে থাকে,
পৃথিবীতে এত নাই !

এখানে চাঁদের আলো ঘুমন্তের মাথা নিয়ে খেলা করে,
কোথাও এমন চাঁদ পৃথিবীতে দেখেছে কি কেউ !
সাগরের থেকে এক বাঁকা মরা মাছের মতন
তাহার সবুজ মুখ ভাসে যেন সমুদ্রের জলে !
সাগরের ফেনার মতন হাত হিম হয়ে যায়
ডেকের রেলিঙ আরও ঠাণ্ডা—আরও ঠাণ্ডা হয়ে আসে !

আর কেউ ডেকে ছিল ?

দেখি নাই ;

অসম্ভব জলে-জলে যখন জাহাজ চরে তখন ঘুমাতে হয় !—
পুরুষের রক্তে তার যেইখানে বিছানা গরম
তখন সেখানে তার বিবাহের মেয়েলোক থাকে।
সেখানে থেকেছি আমি বিবাহের শীত রাত থেকে ;
সে রাতে কি শীত ছিল ?

ঢের শীত জমেছে শরীরে তবু বিছানায় শুয়ে।

ডেকে আরও বেশি শীত।

সেখানে তবুও লোক থাকে ;

লোক ? মেয়েলোক ?

এমন মানুষ আছে
সমুদ্রের ঢেউয়ে দুলে অন্ধকারে ঘুমায় না আর !

দোলনায় শিশুদের মতো এই সমুদ্রে আমরা,
এখানে সহজে ঘুম আসে !

সকল মানুষ আর শিশু নয়,—কেউ-কেউ বেড়ে যায় !
জাহাজের ইঁদুরের মতো তারা,—তাহাদের অসুখ রয়েছে !

জাহাজের মানুষের চেয়ে তবু জাহাজের ইঁদুর তরাসে ;
অসুস্থ জাহাজ ছেড়ে চলে যায় তারা,

তাহাদের বেশি ব্যথা আছে।

তবুও জাহাজ আজও পচে নাই,
কেউ কারে ডাকে তবু অন্য এক জাহাজের ডেকে ?
এমন সময় চলে আসে
কুঠুরির অন্ধকারে শুয়ে থেকে ঘুম ভেঙে যায় ;
তখন কেবিনে ভেঙে পড়ে এলোপাথারি সাগর !
সমুদ্রের বাতাসের মুখ কোনো মানুষের মতো কথা কয় !
কারে সে ঘুমাতে দেবে ? ঘুম নাকি সবচেয়ে ভালো ?
তবুও ঘুমের থেকে ভালো এই জেগে থাকা,—এই জেগে থাকা !
আমরা বাঁচিয়া থাকি আমাদের হৃদয়ের দোষে,—
অবসাদ ধরে গেলে অবসন্ন হতে চাই আরও !
পালকের বিছানায় শুয়ে তাই অপরাধ জমে,
অপরাধ—অপরাধ—অপরাধ—অপরাধ জমে !
মাঝের সমুদ্রে এসে এইখানে কোথাও তবুও
হৃদয়ের হাত থেকে রক্ত মুছে ফেলে
মুক্তার গেলাসে আমি জলের মতন তারে রেখে দিতে চাই !
কখন হৃদয়ে তার পাপ জমেছিল ?

কেউ আর সেই কথা জানিবে না !

আমিও না ?

তুমিও না,—একজন ছাড়া।

একজন ছাড়া ? কোথায় সে ?

সে কোথাও আছে ;

এই ডেকে ?

ডেকে গিয়ে দেখা যায় তারে ?

কখন ?

তোমার বিছানা ছেড়ে যখন তাহার কাছে যাই ;—

মেয়েলোক, তোমার পুরুষ যেই বিছানায় আছে
সেইখানে কি রয়েছে ?
তারে ছেড়ে অন্য এক বিছানায় মেয়েলোক কেন তবু যায় !
আমি কোনো মেয়েদের বিছানায় কোনোদিন যাই নাই ;
এখন অনেক আলো দিনের সমুদ্রে দেখা দেবে
এইসব অসম্ভব ইচ্ছা মুছে যাবে ;
এখন ঘুমায়ে পড়,—ঘুমায়ে-ঘুমায়ে পড় তুমি ;
ঢের-ঢের অসুস্থ হয়েছ !

তুমি নও,—আমি কারো হৃদয়ের বোন !

কার ?

আমারে অনেক ভেবে চুল তার শাদা হয়ে যায়।

কখনও পড়ার বইয়ে এই কথা থাকে ? কোথাও গল্পের বইয়ে ?

অন্ধকারে—দিনের আলোয়—পৃথিবীতে—সমুদ্রের শেষে—
আমি কারো—আমি কারো হৃদয়ের বোন।
কোনদিকে জাহাজ চলেছে ?

চলে গিয়ে কোথাও সে হৃদয়েরে নিয়ে যাবে ;

এখানে সমুদ্র খুব দোলে।

হয়তো জাহাজ আর কোনোদিন আসে নাই এমন সাগরে ;

জাহাজের নাবিকেরা পথ ভুলে গেছে ?
সবচেয়ে বুড়ো—বুড়ো নাবিকের চোখে
সমুদ্র চোখের ধুলো দেয়।
জাহাজ আবার দুলে উঠিতেছে ;

আমাদের কেবিনের অন্ধকারে এলোমেলো হয়ে গেছে সব,—
গুছায়ে দেবে না তুমি ?

এইখানে অইসব এলোমেলো হবে ;

তবুও গুছাবে চল ;

এখন না ;

তোমার মাথার থেকে খোঁপা
পালের মতন ছিঁড়ে যায়
তোমার মুখের চুল গুছাবে না !

এখন না ;

দাও,—আমি সাজায়ে দিতেছি ;

সমুদ্রের দোলা শেষ হলে,—

সমুদ্রের দোলা শেষ হয় ?

কারা যেন কেঁদে ওঠে।

কোথায় ?

শোনা না কি ?
জাহাজ কি ডুবে যায় ?
হয়তো ;
না—না—না—না—কেউ আর কাঁদেনাকো ;
জাহাজ ডোবেনি,—তবুও কোথায় যাও তুমি ?

না—না—না—না,—জাহাজ ডোবেনি !

ডুবে-ডুবে বেঁচে গেছে !

এখানে এসেছ কেন এত রাতে ? ডেকে আর কেউ নাই।

কেবিনে যাবে না ফিরে তুমি ?

না—না—না—না—এইখানে চাঁদের আলোয় আমি শিস্ দিতে ভালোবাসি

তবু আমি ফিরে যাব ;

কোথায় ?

একদিকে ফিরে যাব ;

হঠাৎ তোমারে এই কালো কোটে এইখানে দেখে
অনেকের ভয় লাগে !

কেউ তবু এইখানে থাকেনাকো এমন সময় !

কেউ-কেউ এসে পড়ে !
না—না—না—না—এখন ঘুমায়ে থাকে সব !

ঘুমায়ে-ঘুমায়ে কেউ হাঁটিবে না ?

এখন,—তুমি কেন এখানে এসেছ ?

এইখানে বার-বার পায়চারি করে আমি দেখেছি তাকায়ে
আমার লম্বা ছায়া একাই আমার সাথে হাঁটে !
কখনো বা ডান দিকে,—কখনো চলিতে থাকে বাঁয়ে,
কখনো সুমুখে এসে পড়ে,—কখনো পিছনে তারে পাওয়া যায় ;
তবু, জান ?—এমন এ জ্যোৎস্নায় কেউ আর কোনোদিন নিকটে থাকেনি
আমার লম্বা ছায়া ছাড়া !
সেই ছায়া মাঝে-মাঝে বেঁটে হয়ে যায়,—তবুও সে কাছে থাকে ;
আমার এ হৃদয়ের কাছে আর কেউ থাকেনাকো,
কেবিনের অন্ধকারে ছায়া তবু চলে যাবে,—সেইখানে কেউ-কেউ রবেনাকো আর।

তাই এই জ্যোৎস্নায় শীতে কেঁপে তবু আমি ভালোবাসা শিখি— ।
কোথায় তোমার ছায়া ?

এবার পিছনে ;

দেখা যায় ;

চেয়ে দেখ, আবার সুমুখে চলে আসিবে সে !

দেখা যাবে ;

একবার চলে যাবে ডান দিকে, একবার চলে যাবে বাঁয়ে ;
কুকুরের মতো ক্ষেপে সমুদ্রের ঢেউ যদি খেতে আসে
ভয় পেয়ে পিছাবে না !
কোনো এক মেয়েমানুষেরে আমি ভালোবাসি যদি
হিংসা করে তবুও সে আমারে কি ছেড়ে যাবে ?—এই ছায়া ?
মেয়েমানুষেরা তবু একদিন ভালোবেসে আমাদের হিংসা করে ছেড়ে যায় ;
বইয়ে পড়ে দেখেছি সে-সব !

আমিও দেখেছি,
বইয়ে—বইয়ে—বইয়ে—বইয়ে পড়ে !
হাতের চুরুট আর জ্বালাবে না ?

জ্বালাবে ;

ভেবে-ভেবে জ্বালাতে পারেনি আর এতদিন ;
কতদিন ?

তিনদিন—চারদিন আঙুলের ফাঁকে রয়ে গেছে,
কখনো পকেটে নেমে—কখনো ডেকের পরে পড়েছে গড়ায়ে ;
জ্বালাবে তবুও ;

দেশলাই আছে ?

এত রাতে ডেকের উপরে ?

হয়তো আমার কাছে আছে তবু,—এখানে বাতাসে সব নিভে যায়।

কেবিন তো ভালো ছিল ?
হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ—চুরুট জ্বালাতে,—

এইখানে তার চেয়ে বেশি কিছু আছে ?

এইখানে পায়চারি করে-করে তবু কিছু পাওয়া যায় !

কোথায় চলেছ তুমি ?

কোনদিকে জাহাজ যেতেছে ?

জাহাজের দিক নিয়ে যারা বাঁচে তুমিও কি তাদের মতন ?

আমার নাকের নিচে এই ডেক—একখানা ডেক বেঁচে আছে।
তবুও ডেকের নিচে ফুটো করে ইঁদুরের মতো লেজ তুলে
হৃদয় এখানে কারে খোঁজে !

কাহারও পায়ের পাতা তারে এসে পিষে ফেলে যদি,
সে যদি শুকায়ে থাকে চার ঠ্যাং তুলে,
পচে যায়—পচে-পচে যায়,
তখন তোমরা তারে সমুদ্রের জলে ফেলে দেবে !
সমুদ্রের ঢেউয়ে আমি এখন ঝাঁপায়ে পড়ি যদি
তাহলে তোমরা এসে জাল দিয়ে মাছের মতন
আমারে তুলিতে তবু যাবে !

এই কথা ভাব তুমি ?
এইসব ভেবে-ভেবে আমার হৃদয় ঢের বুড়ো হয়ে গেছে।

বেঁচে থেকে আরও বুড়ো হয়ে যাবে !

সমুদ্রের জলে গিয়ে পচা-পচা ইঁদুরেরা লেজ তুলে খুঁজে-খুঁজে মরে না কি আর।

সেইসব দেখা যাবে সমুদ্রের জলে গেলে ;
আগে তবু একবার জলের ভিতরে গিয়ে ডুবে থাকা চাই !

চল তবে ;

চল ;

ডেকের উপর থেকে দুইজন লোক চলে গেছে
তাদের দেখেছে কেউ ?
এইখানে এত রাতে তুমি ?

কি হয়েছে ?

দুই হাত হিম হয়ে যায় !

দস্তানা আছে হাতে ?

সেসব হারায়ে গেছে,—কোনোদিন ছিলনাকো আর !

তাহলে শীতের আর দোষ ?

কুঠের হাতের মতো অনেকের হাত থেকে দস্তানা খসে যায়, তবু,
তাদের আঙুল হিম হয়ে যেতে চায় !

সেইসব জানিনাকো,—কত রাত ?

রাত ঢের !

কোনদিকে জাহাজ চলেছে ?

ওসব কে জানে !

কোথাও বন্দর আছে কাছে ?

কেন ?

জাহাজের ইঁদুরেরা পালাতেছে না কি ?

কে বলেছে ?

তাহাদের শব্দ আর শুনিনাকো !

তুমিও কি জাহাজের ইঁদুরের শব্দ নিয়ে অন্ধকারে বেঁচেছিলে ?
তোমার মুখের পরে ইঁদুরে লেজের ছায়া ফেলে নাই তবু !

কত রাত ?

অনেক,—অনেক !
ভোর খুব কাছে ?

দেরি আছে ;

অন্ধকারে পায়চারি করা যায় ;

দুইজন এইখানে পায়চারি করে গেছে ;

তাদের দেখেছি আমি ;

আমিও দেখেছি ;

কোথায় পালাল তারা ?

দু-জন ইঁদুর ;—

কোথায় গিয়েছে ?

তারাও জাহাজ ছেড়ে পালায়েছে ;

এখানে সমুদ্র খুব দোলে !
জাহাজের হাল ভেঙে যায় যদি—ইঁদুরেরা পালাতেছে তাই !
যাদের বুটের তলে আঁটা নাই পিছলায়ে পড়ে যায় তারা,
জাহাজ তবুও তার বন্দরের দিকে চলে যাবে।

—বন্দরের দিকে ঠিক যাবে ? জান তুমি ?

নাবিক, তোমার কি মনে হয় ?

অনেক খারাপ গল্প শুনেছি আমরা
আমাদের এসব বয়সে— !

গল্প তবু গল্প বলে শেষ হয়,

তাদের ভিতরে কোনো রক্ত নাই,—মানুষের মাংসে তারা বাঁচেনাকো।

মানুষের কেবিনের জানালায় তবু তারা বেঁচে থাকে !

জানালায় আমরা পর্দা টেনে দেই ;
সমুদ্রের বাতাসের হাত এসে সেইসব তুলে ফেলে ;

কেন ?

কোথাও সমুদ্রে আলো এইখানে পৃথিবীতে চাঁদের আলোর মতো নয় !
কোথাও হৃদয়ে খুব শান্তি আছে,—তবুও সেসব শান্তি দেরি করে আসে ;

এখানে জলের শব্দে—সমুদ্রের বাতাসের স্বরে
ঘুম থেকে জেগে উঠে যাহারা বিবর্ণ হয়ে যায়,
কোথাও—কোথাও গিয়ে একদিন শান্তি পাবে তারা !
ফুটো কলসির মতো ঘুমায়ে-ঘুমায়ে কোনো শান্তি আছে আজ ?

এইখানে কে কাহারে চুমো দেয়।

চেয়ে দেখ।

একদিন সে কাহার বিছানায় ছিল !

তোমারও বিবর্ণ হতে হবে।

কোন কথা ভেবে ?

তোমার বিছানা ছেড়ে একজন চলে গেছে ;

সে কাহারও বিছানায় যায় নাই !

বিছানায় নাই কিছু...কোথায় যেতেছ তুমি ?

অইখানে আরও আগে—ডেকে।

ভোর হয়ে গেছে !

সমস্ত সমুদ্র ভরে এখন কুয়াশা !

শীত লাগে ?

এই শীতে হৃদয়ের ভালো করে ;

তোমার আঙুল তবু হিম হয়ে গেছে ;
একদিন জাহাজের রেলিঙের চেয়ে আরও বেশি হিম ছিল তো আঙুলে,
সেদিন সাগরে তবু রোদ ছিল ;

তবু এই কুয়াশার দিকে তুমি চেয়ে দেখ ;

মাথার ভিতর থেকে যদি কোনো শাদা চুল দেখা দেয়
এ কুয়াশা সেইসব মুছে ফেলে যেন ;
বড় হয়ে বেড়ে গিয়ে একদিন কুয়াশার দিকে আর চেয়ে দেখি নাই,
সাগরের পরে তবু আবার সকাল আসে যখন হৃদয় বুড়ো নয় !
এই শীতে একদিন তবু এক অন্য কথা মনে হত,
তখন বুকের পরে শাল রেখে চেয়েছি সহজ হতে,
কিন্তু তবু সেইসবে কোনোখানে কোনো এক খোঁচ রয়ে যায় !
চেয়ে দেখ বুকের ওপরে আজ কিছু নাই,—
এই শীতে—কুয়াশায় কোথাও এসেছি তবু সেইসব দিনে
পৃথিবীর বুড়োদের সাথে মিশে হৃদয় যেখানে আর ফিরিতে পারে না।

রচনাকাল : ১৯২৯ (?)
শারদীয় প্রতিদিন : ১৪০৬

এখানে মরণশীল হংস নেই আর...

এখানে মরণশীল হংস নেই আর...
আর পাখপাখালির নীড় নেই গাছে,

এখানে পৃথিবী নেই, সৃষ্টি নেই, তুমি
আমি আর অনন্ত রাত্রির বৃক্ষ আছে।

অনুবর্তন। মাঘ-চৈত্র ১৪০৬

স্থির হয়ে আছে মন, মনে হয়, তবু—

স্থির হয়ে আছে মন, মনে হয়, তবু—
সে ধ্রুব গতির বেগে চলে
মহা-মহা রজনীর ব্রহ্মাণ্ডকে ধরে
সৃষ্টির গভীর—গভীর হংসী প্রেম
নেমেছে—এসেছে আজ রক্তের ভিতরে।

অনুর্বতন। মাঘ-চৈত্র ১৪০৬

কৃষ্ণাদশমীর রাতে : তোমাকে

এখানে পৃথিবী আর নেই
বলে তারা মনকল্যাণেই
            হিংসা—ক্লান্তির পানে
বিদায় নিয়েছে ;
কল্যাণ-কল্যাণ ; এই রাত্রির গভীরতর মানে।

অনুবর্তন। মাঘ-চৈত্র ১৪০৬

যারা এই জীবনের স্বাদ

যারা এই জীবনের স্বাদ
পেতে চায়—তাহাদের তরে ;
সবুজ গাছের থেকে ভোরবেলা শিশিরের মতো যেন ঝরে

তোমাদের দেহ থেকে রাতের শিশির
ভোরের বাতাসে কেঁপে বার-বার ;—
শীতল জলের সুর যেন আর থামেনাকো
হয়নাকো স্থির
তোমাদের মাথার ভিতরে ;
দিনের আলোর বেলা এ পৃথিবী জেগে গেলে ’পরে
শিশুদের স্বর
ভেসে আসে দূর থেকে যেন তারপর
মাথার ভিতর !
তাহাদের আসা-যাওয়া—হাসি—কোলাহল
মুছে লয় যেন ঐ শিশিরের জল !
ঘাসের বিছানা থেকে ধীরে
শুকায়ে যেন তা যায় তোমাদের এইসব ঘাসের শরীরে ;
ধীরে—আরও ধীরে।

রচনাকাল : ১৯২৮ (?)
কল্লোল। শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে উৎসব। জুলাই ২০০০

যদিও প্রেমের মৃত্যু হয়ে গেছে

যদিও প্রেমের মৃত্যু হয়ে গেছে এ জীবনে,
জীবনের রক্তে তবু ঘ্রাণ আছে—তবু আছে স্বাদ !
এ জীবন,—মানুষের এ জীবন—সে যে কি অগাধ !
একবার নক্ষত্রের দিকে চেয়ে
একবার পৃথিবীর চোখে চোখ রেখে
পুরানো রাতের ধোঁয়া উড়ায়ে দিতেছি সব এ মাথার থেকে !
পৃথিবীর—নক্ষত্রের নতুন আস্বাদ
জানিতেছি ;—এ জীবন,—সে যে কি অগাধ !

নক্ষত্রের বুক ঘেঁষে রাতের আকাশে
ফেনার মতন মেঘ-মেঘ হয়ে ভাসে
সুস্থ স্বচ্ছ সহজ হৃদয় !
নতুন শিশুর মতো আবার প্রেমের জন্ম হয়,
যদিও প্রেমের মৃত্যু হয়ে গেছে জীবনে আমার ;
পুরানো মায়ের মতো যদিও মরেছে প্রেম
নতুন শিশুর মতো তার
প্রেম তবু আসিতেছে ফিরে !
পৃথিবীর মানুষের ভিড়ে
আকাশের নক্ষত্রের ভিড়ে
ঘ্রাণ আছে—জীবনের রক্তে আছে স্বাদ ;
এ জীবন—আমাদের এ জীবন—সে যে কি অগাধ !

রচনাকাল : ১৯২৮ (?)
কল্লোল। শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে উৎসব। জুলাই ২০০০

ঘুমাও ; কারণ, ঘুমের মাঝে

ঘুমাও ; কারণ, ঘুমের মাঝে মৃত্যুর মতন শান্তি আছে ;
যাহাদের জীবনের জ্বর ছাড়িয়াছে
ঘুমায়েছে তারা !
জেগে আছে যারা
নদীর জলের পরে তারা মুখ দেখে
তাহাদের ;—ম্লান মুখ ;—ক্লান্ত হয়ে তারপর চুপে একে-একে

তাহারা ঘুমায়ে পড়ে ;
তবুও নদীর জলে নড়ে !
নড়ুক তা,—অমন নড়ুক !

আকাশের নক্ষত্রের মুখ
ভাসুক নদীর জলে একা,
অনেক হয়েছে মুখ-দেখা
আমাদের ;

ঘুমাও ; সকল সুর মাথার ভিতর
থেমে যাক সব,—মাথার ভিতরে সুরে জ্বর—শুধু জ্বর !
আমাদের রক্তে ঘ্রাণ
আমাদের রক্তে রূপ—স্বাদ
মুছে যাক ; ক্লান্ত হয়ে ঘুমাবার সাধ
আসুক চোখের 'পরে—মাথার ভিতর !
সব সুর থেমে যাক,—সুরে জ্বর
সুরে শুধু জ্বর !

ঘুমাও ; তবুও নদীর জল নড়ে ?
নড়ুক তা ;—অমন নড়ুক ;
আকাশের নক্ষত্রের মুখ
ভাসুক নদীর জলে একা ;
অনেক হয়েছে মুখ-দেখা
আমাদের।

রচনাকাল : ১৯২৮ (?)
কল্লোল। শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে উৎসব। জুলাই ২০০০

আমার হাতের কাজ অন্ধকারে

আমার হাতের কাজ অন্ধকারে ফুরোল যখন,—
যখন অনেক গল্প শেষ হল,—অবসন্ন মন

একা জেগে রয় যদি সেদিন এ পৃথিবীর ’পর,
বাদুড়ের মতো একা কোটরের ছায়ার ভিতর
তখন সে জেগে রবে !—এই কালো দেয়ালের পাশে
যখন অনেক রাতে অন্ধকার—শীত নেমে আসে,
পুরানো মানুষ যারা তাদের মতন শব্দ করে
পুরানো গাছের পাতা কুয়াশায় পড়িতেছে ঝরে
তখন অনেক রাতে !—

এই কালো দেয়ালের পাশে
জাগি যদি—জেগে রব—জেগে রব দিনের আশ্বাসে।
গাছের গুঁড়ির মতো হয়ে যাবে যখন শরীর,
মাথার কোটরে তবু স্মৃতি আর স্বপ্নের ভিড়
জেগে রবে ; জেগে রবে বাদুড়ের মতো ডানা মেলে
আমার হাতের কাজ অন্ধকারে শেষ হয়ে গেলে !

রচনাকাল : ১৯২৮ (?)
কল্লোল। শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে উৎসব। জুলাই ২০০০

মনে হল—হয়তো যেতেছি আমি মরে,—

মনে হল—হয়তো যেতেছি আমি মরে,—
দু-চোখ আসিতে আছে অন্ধকার করে !
পাখির বাসার ’পরে ছানার মতন
শীতের সকাল বেলা জেগেছিল মন ;
অন্য এক শীত তবু এই শীত হতে
এক রাত দুই রাত হয়তো ঘুমতে
চলে যাই ; তারপর জাগিতেই হবে !
কাহাদের সাথে চেনা হয়েছিল কবে,—
আবার আসিতে হবে তাহাদের কাছে ;

তখন হয়তো এক বেলা পড়িয়াছে,
অন্ধকার আসে নাই,—শীত তবু আসে !
কুয়াশা জমিয়া যায় হয়তো আকাশে !
এরই মাঝে তার সাথে হয়ে যাবে দেখা,
একদিন যারে আমি পৃথিবীতে একা
ফেলে রেখে—ছেড়ে দিয়ে গেছিলাম চলে,—
একে-একে সকলের সাথে দেখা হলে
যখন পৃথিবী আরও অন্ধকার হয়,
পথে শেয়ালের বুকে কি যেন কি ভয়
যখন চমকে দেবে, তখন তোমারে
হয়তো দেখিতে পাব ; কাছে ডেকে কারে
বসে আছ,—হাসিতেছ,—বলিতেছ কথা ;
আমারে যা বলেছিলে তারেও বল তা ;
দুই-ঠোঁট কেঁপে-কেঁপে—কেঁপে কথা কয় !
পথে শেয়ালের বুকে কি যেন কি ভয়
তখন চমকে দেবে !—তখন তোমারে
আবার দেখিতে পাব,—কাছে ডেকে কারে বসে আছ !

কবিতীর্থ। আশ্বিন ১৪০৭

শাদা হাঁস খেলা করে সন্ধ্যার জলের কোলাহলে

শাদা হাঁস খেলা করে সন্ধ্যার জলের কোলাহলে ;
দুই গাল ভেঙে যায় তবুও তো,—বুড়ো হতে চলে !
এখন তো সেই মেয়ে আসিবে না কাছে,
হয়তো আমার মত বুড়ো হয়ে আছে !
তখন সোনালি ছিল সেই মেয়ে—যখন শিশির ছিল ঘাসে ;

সন্ধ্যায় সব হাঁস শাদা হয়ে আসে !
আমি তবু খুঁজি নাই—খুঁজিনাকো তারে ;
চোখ বসে গেল তবু পাইনাকো চেয়েছি যাহারে !
যাদের দেখেছি আমি তাহার মতন নয় তাহাদের মাংস আর মন,
তোমরা এমন সব, আমরা এমন ;
...তারে খুঁজে দুই-গাল ভেঙে যায়, বুড়ো হতে চলে ;
শাদা হাঁস খেলা করে সন্ধ্যার জলের কোলাহলে !

কবিতীর্থ। আশ্বিন ১৪০৭

এইবার ছুটি পেয়ে

এইবার ছুটি পেয়ে
ফিরিব না পৃথিবীতে আর !
মূর্তি যারা গড়ে শুধু রুপার-সোনার,
তাহাদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে মন
হবেনাকো কোনো কাঠ গাছ ধাতু দাঁত আর হাড়ের মতন !
আমারে পাবে না খুঁজে আর কোনো মায়াবীর মন !
আমারে পাবে না খুঁজে—
আমারে পাবে না খুঁজে যেইখানে বাদুড়ের ডানা নড়ে-চড়ে
কোনো এক গুহায় কোটরে
পৃথিবীর ’পরে !
তোমাদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে মন
হবেনাকো কোনো কাঠ গাছ দাঁত আর হাড়ের মতন !
আমারে পাবে না খুঁজে আর কোনো মায়াবীর মন !

কবিতীর্থ। আশ্বিন ১৪০৭

অন্ধকারে খ্যাঁকশিয়ালিরা এসে খেয়েছে হৃদয়

অন্ধকারে খ্যাঁকশিয়ালিরা এসে খেয়েছে হৃদয়,
হৃদয়,—কোথায় তুমি ছিলে !
যেইখানে বিড়ালের চোখে লাল আগুনের রঙ লেগে রয়,
সব বুড়ো বিড়ালেরা মিলে
অন্ধকার করে,
সেই এক ছায়ার ভিতরে
গিয়েছিল আমার হৃদয় !

আমার হৃদয়,
গল্প তুমি বলিবে না আর
পরী আর পরীর পাখার ?
শবের ভিতর থেকে বাতাসের শব্দ শেষ হয়,—
ঝরে গেছে আমার হৃদয় !

তথ্যকেন্দ্র। শারদ-সাহিত্য ১৪০৭

যখন অনেক স্বপ্ন দেখা শেষ হয়েছে আমার

যখন অনেক স্বপ্ন দেখা শেষ হয়েছে আমার,
খয়ে গেছি সমুদ্রের পারে বালির মতন,
শাদা চুল আঁচড়াবে চেরুনিতে যখন সে তার,
তখন হাওয়ার নায়ে চড়ে চলে যাবে এই মন
হটর্-হটর্ করে কোনো এক বুড়ির মতন !
আকাশের শেষে গিয়ে বিকালের চাঁদের ভিতরে
আবার স্বপ্নের খেই লয়ে জাল বুনে যাবে মন,

যখন অনেক স্বপ্ন শেষ হল পৃথিবীর ’পরে !

তথ্যকেন্দ্র। শারদ-সাহিত্য ১৪০৭

সেই ফুল মেখে দেব আমি তার চুলে

সেই ফুল মেখে দেব আমি তার চুলে,
ভোমরার মতো এক বন খুঁজে বনের ভিতরে,
আমি উড়ে চলে যাব মস্‌লিন্ দুই পাখা তুলে !
সে ফুলের রেণু নিয়ে ফিরে এসে ঘরে
সেই ফুল মেখে দেব আমি তার চুলে ;
ভোমরার মতো এক বন খুঁজে বনের ভিতরে
আমি উড়ে চলে যাব মস্‌লিন্ দুই পাখা তুলে।

তথ্যকেন্দ্র। শারদ-সাহিত্য ১৪০৭

আমরা হতেছি বুড়ো—শাদা হতে নষ্ট হতে হয়

আমরা হতেছি বুড়ো—শাদা হতে নষ্ট হতে হয়
দুই হাত হাড় হয়ে নড়ে ওঠে অন্ধকারে শীতে !
ভালোবাসা সারাদিন ভালো করে পারে না বাসিতে,
সময়ের আগে শেষ হয়ে যায় আশার সময়।

বুড়ি হয়ে যাবে তুমি,—বুড়ো হয়ে চলিতেছি আমি
জেলের জালের মতো আমাদের ফেলিতেছে ঘিরে
দিন আর রাত এসে,—সময়ের সমুদ্রেতে নামি।
মাছের মতন আমি চলিতেছি জাল ছিঁড়ে-ছিঁড়ে।

এরই মাঝে ভালোবেসে ফেলিবার ছিল অবসর,
আশার সময় ছিল,—আস্বাদের গল্প ছিল না কি !
আমি বুড়ো হয়ে যাব, তুমি বুড়ি হয়ে তারপর—

তথ্যকেন্দ্র। শারদ-সাহিত্য ১৪০৭

পড়িবে না তোমার এ লেখা এসে মানুষেরা কোনো দিন

পড়িবে না, তোমার এ লেখা এসে মানুষেরা কোনো দিন !
হাতের এ লেখা নয়,—নয় বাইজেনটিন্ !
—সেইসব পরিপাটি কামারের শাদা আগুনের জ্বালা সবিস্ময়ে
ফলিয়া ওঠেনি আর সুন্দর সোনার মতো হয়ে !
খনির ভিতর থেকে মণি লয়ে কোনো কারিগর
বানায় না এ জিনিস পৃথিবীর 'পর ;
এ কবিতা হয় নাই পৃথিবীর ধাতুর মতন,—
কিন্তু এই মাংসের গিট ছিঁড়ে মন
এখানের হাত ছেড়ে দিয়ে
সকালের মেঘ থেকে বিকালের,—বিকালের মেঘ থেকে সকালের নীল মেঘে গিয়ে
কি জিনিস নিয়ে
বানায়েছে শরীর তাহার !
—পৃথিবী তা বুঝিবে না—পৃথিবী তা বুঝিবে না আর !

তথ্যকেন্দ্র। শারদ-সাহিত্য ১৪০৭

নিজেরে অনেক ভেবে

নিজেরে অনেক ভেবে
দুই-গাল ভেঙে গেছে তার।
দুই-হাত রোগা হয়ে রোগীর খাবার
মুখে তুলে লয় ;

—ছায়া ছাড়া আর কিছু নয় !

নিজেরে অনেক ভেবে দুই-গাল ভেঙে গেছে তার ;
দুই-হাত রোগা হয়ে নড়ে ওঠে বিকালবেলার
অন্ধকারে ;—সেখানে সে পায়চারি করে
গাছের ছালের কাছে,—ছায়ার ভিতরে !

তথ্যকেন্দ্র। শারদ-সাহিত্য ১৪০৭

তুমি চলে আসো কাছে, চলে আসো নিভৃত-নিভৃত

তুমি চলে আসো কাছে, চলে আসো নিভৃত-নিভৃত !
নির্জন-নির্জন পথ, তোমরা চলিয়া আসো কাছে !
আমাদের হৃদয়ে যে শীত এত,—হৃদয়ে যে শীত !
পৃথিবীর পরীরা যে আমাদের ভালোবাসিয়াছে
অনেক ধুলার পথে আমাদের ডেকে লয় তারা,—
শিকারের কুকুরের শব্দ অই আমাদের ডাকে !
আমরা দেখেছি সব সন্ধ্যার নদীর জল ছাড়া !
সন্ধ্যার নদীর জল,—কোনোদিন দেখেছ আমাকে ?
পৃথিবীর লাল পথ ভাঁড় আর ভাঁড়ের মতন ;
সেখানে টুপির ছবি,—সেখানে ঘণ্টার শব্দ হয় !
সেখানে মুকুট পরে অবসন্ন হয়ে যায় মন,—
উজ্জ্বল দিনের সূর্যে-রৌদ্রে-রঙে নাইক বিস্ময় !
পাহাড়ের বুকে থেকে সেখানে পাথর শাদা হল,
সেখানে সময় তার আরও শাদা—শাদা হয়ে আছে,
সেখানে নদীর ঢেউয়ে ঢেউ তুমি—ঢেউ তুমি তোল !
সন্ধ্যার নদীর জল,—তোমারে সে ভালোবাসিয়াছে !

তথ্যকেন্দ্র। শারদ-সাহিত্য ১৪০৭

আমি সব ছেড়ে দিয়ে পুরানো গাছের মতো হয়ে

আমি সব ছেড়ে দিয়ে পুরানো গাছের মতো হয়ে
অই দূর বিকালের লাল মেঘে জেগে রব একা !
মানুষের ছাল ছেড়ে গাছের ছালের গন্ধ লয়ে ;
বিকালের অন্ধকারে বাদুড়ের সাথে হবে দেখা।

সেখানে অনেক শাদা পথ এক আরও শাদা হয়,
সময় হতেছে শাদা পাহাড়ের বুকে লেগে থেকে ;
আমি যাব,—সেই পথ—পাথরের মুখের বিস্ময়
আমার এ মানুষের মতো মুখে লব আমি মেখে !

তথ্যকেন্দ্র। শারদ-সাহিত্য ১৪০৭

শীত রাত আসিতেছে নেমে

শীত রাত আসিতেছে নেমে
কখন কাজের শব্দ গেছে সব থেমে
মাঠে-মাঠে
নাই—কিছু—আছে শুধু ক্ষেতের ফাটল
পেঁচার চোখের ’পরে শিশিরের জল

চুপ-নদী   চুপ-গাছ   চুপ-চাঁদমারি
কোথায় ‘রুকারি’
চলে গেছে !

পৃথিবীর সব সোনা স্খলেছে, [বিদায় ।]
মৃত ইচ্ছা—মৃত প্রেম—মৃত স্বপ্ন কই চলে যায়
তুমি জান চাঁদ-পেঁচা-তুমি চাঁদমারি
আমাদের সোনার গ্র্যানারি
কই গেল !

তথ্যকেন্দ্র। শারদ-সাহিত্য ১৪০৭

তোমার চোখের নিচে আমি এক মাছের মতন

তোমার চোখের নিচে আমি এক মাছের মতন,—
রুপালি ঢেউয়ের তলে-তলে
সমুদ্রের জলে !
তোমার রুপার জাল যেতেছে জড়ায়ে
রুপার সূতার মতো গায়ে !
বারবার পড়িতেছি ফেঁসে ;
আমার খুঁজিবে তবু
সমুদ্রের শেষে গিয়ে,—সমুদ্রের শেষে !
আমারে ডাকিবে তুমি আমার রূপের নাম ধরে,
তবুও ঝিনুকে-শাঁখে তোমার রুপার জাল ভরে
ফেনার ভিতরে যাব ফেঁসে !
আমারে খুঁজিবে তবু সমুদ্রের শেষে গিয়ে সমুদ্রের শেষে।

তথ্যকেন্দ্র। শারদ-সাহিত্য ১৪০৭